বাংলার লোকশিল্প
ও
লোকনৃত্য

বাংলার লোকশিল্প
ও
লোকনৃত্য

গুরুসদয় দত্ত



ছাতিম বুক্‌স্

প্রথম প্রকাশ মে ২০০০

প্রচ্ছদ শিল্পী অর্ণব সেনগুপ্ত

প্রকাশক শুভ্রমণি দে
ছাতিম বুক্‌স্
৭ডি, ৯৯-এ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ফোন ঃ ২২২৭ ৪৯৪১/৪৯৫৩
e-mail : chhatim_books@dataone.in

পরিবেশক প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
ফোন ঃ ২২৪১ ৬১৩৮/২২৫৭ ১০৭০

মুদ্রক অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৮১ সিমলা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

ভূমিকা

শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত বীরশ্রী গ্রামে ১৮৮২ খ্রি. গুরুসদয়ের জন্ম, পিতা রামকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী। মেধাবী ছাত্র ছিলেন, প্রবেশিকা পরীক্ষায় জেলা থেকে দ্বিতীয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় প্রথম। ১৯০৩-এ বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার্থে বিলেত যাত্রা, এক বছর পর আই.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯০৫-এ দেশে ফিরে চাকরিতে যোগদানের আগে কিছুদিন কেম্ব্রিজের ইমান্যুয়েল কলেজে অধ্যাপনাও করেছেন।

ভারতীয়দের পক্ষে আই.সি.এস. ছিল উচ্চতম সরকারি পদ, স্বাভাবিকভাবেই সরকার চাইতেন এই কর্মচারীরা হবে অতি অনুগত, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের আবশ্যিক অঙ্গ। গুরুসদয় সর্বাত্মক আত্মসমর্পণে রাজি ছিলেন না, হাওড়ায় ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন বামুনগাছিতে এক গুলিবর্ষণের ঘটনায় শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সুপার ও মিলিটারি অফিসারদের তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯৩০ সালে লবণ আইন সত্যাগ্রহে মহাত্মা গান্ধির গ্রেপ্তারে ক্ষুব্ধ জনতার মিছিলে ওপরওয়ালার আদেশ ছিল গুলি চালনার, গুরুসদয় সে আদেশ অমান্য করেন। ক্রুদ্ধ সরকার তাঁকে বীরভূমে বদলি করে দেয়। বীরভূম আগমন গুরুসদয়ের জীবনে এক নতুন মোড়। কিন্তু তার আগে পটভূমিকা একটু বলা দরকার।

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় থেকে দেশাত্মবোধের যে নতুন জোয়ার আসে, তার প্রাথমিক পর্ব প্রস্তুতির। বিদেশি শাসন-মুক্তির একমেব লক্ষ্যে সংহত হতে তখনো অনেক দেরি। প্রস্তুতির নানা দিক, একদিকে বিলাতি পণ্য বর্জন, জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, অপর দিকে শরীরচর্চা, চরিত্রগঠন। বাঙালি জাতিসত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান রূপ নিয়েছিল দেশীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার-প্রচেষ্টায়। আর একটি অঙ্গ, গ্রামোন্নয়ন। দেশের ক্ষুদ্রতম একক গ্রাম। গ্রামে গ্রামে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হলে দেশের স্বরাজ আসতে পারে না। প্রয়োজন পল্লিসমিতি গড়ে তোলা, আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গঠনই স্বদেশি আন্দোলনের ভিত্তি, বলেছেন অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ। পল্লিসমিতির কর্তব্য যেমন পথঘাট সংস্কার, জঙ্গল সাফ, প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত,

তেমনি মহাজনের হাত থেকে চাষি ও কুটিরশিল্পকে রক্ষার জন্য সমবায় সমিতি বা বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সালিশি গঠন।

১৯২৫-এ প্রকাশিত হয় গুরুসদয়ের দুটি বই, 'পল্লী সংস্কার' ও 'Village Reconstruction'। ১৯২৯-এর শেষের দিকে তিনি ময়মনসিংহের কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন গ্রামোন্নয়ন আন্দোলন শুরু করেন। গ্রামে পরিচ্ছন্নতার মূল্য, দৈহিক শ্রমের মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে ১৯৩১-এ পত্তন করেন Rural Preservation Society of Bengal। লোকান্তরিত স্ত্রীর নামে প্রতিষ্ঠা করেন আরো দুটি সমাজ-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান, সরোজনলিনী শিক্ষা সমিতি ও সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি।

বীরভূমে আসার পর ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি শিক্ষা শিবির থেকে যার সূত্রপাত, ১৯৩২-এ প্রতিষ্ঠিত সেই ব্রতচারী আন্দোলন গুরুসদয়ের সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

ব্রতচারী স্ত্রীপুরুষ-জাতি-ধর্ম-বয়স নির্বিশেষ সংগঠন, যার উদ্দেশ্য আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি। জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি বিশ্বনাগরিকত্বের অঙ্গীকার। শরীর ও মন গঠন, দেশীয় ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ ও চর্চায় উৎসাহ দান, বিশেষত লোকসংগীত ও লোকনৃত্য।

ব্রতচারীদের পঞ্চ ব্রতে দীক্ষিত হতে হতো চরিত্রগঠন ও দেশসেবায় আত্মোৎসর্গ করার জন্য, জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ। ব্রতচারী জীবনসাধনার চারটি পর্ব নির্দিষ্ট, চরিত্র, কৃত্য, সংঘ ও নৃত্য। প্রতিজ্ঞা করতে হতো ষোলটি, আমি বাংলাকে ভালোবাসি, আমি বাংলার সেবা করব, আমি বাংলার ব্রতচারী হব থেকে জ্ঞানের সীমা প্রসারণ, শ্রমের মর্যাদা-বর্ধন, সময়নিষ্ঠা নিবর্তন, জঙ্গল-পানা নির্বাসন, সবজি-ফলের উৎপাদন, গোরুর পুষ্টি সম্পাদন, আলো-হাওয়ার সঞ্চালন প্রভৃতি।

কিশোর যুবকদের মধ্যে ব্রতচারী আন্দোলন যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়, অখণ্ড বাংলার বহু জায়গায় বাংলা ব্রতচারী সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। ১৯৩২-এ দক্ষিণ ভারতেও South India Bratachari Society স্থাপিত হয়। খোলা হয় সর্বভারতীয় ব্রতচারী সমাজ। মূল কার্যালয় ছিল কলকাতার ১২নং লাউডন স্ট্রিটে। ১৯৪১ সালে কলকাতার অদূরে স্থাপিত হয় ব্রতচারী গ্রাম, 'ব্রতচারী জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠান' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনসহ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন, সমাজসেবায় সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি ব্রতচারীদের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ছিল আবশ্যিক। লোকসংগীত যেমন, ময়মনসিংহের জারি, ফরিদপুরের সারি, নদিয়ার বাউলের সঙ্গে যেমন তাদের পরিচয় ঘটানো হতো, তেমনি যশোরের ঢালি (ঢাল ও সড়কির লড়াই), বীরভূমের রায়বেঁশে প্রমুখ বারোটি নাচ এবং

চারটি বাজনা যথা, ঢোল, কাঁসি, মাদল ও খমক ব্রতচারীদের শিখতে হতো। সদস্যরা বিভিন্ন শিক্ষা শিবিরে অংশ নিতেন, মান নিরূপণের জন্য পরীক্ষাও দিতে হতো।

গুরুসদয়ের দ্বিতীয় পরিচিতি লোকশিল্প-সংগ্রাহক হিসাবে। শুধু সংগ্রাহক বললে তাঁর ভূমিকাকে খাটো করা হয়, বঙ্গীয় লোকশিল্পকে কুলীন শিল্পকলার জগতে তিনিই পরিচয় করিয়ে দেন। লোকশিল্প তখনো ব্রাত্য, প্রশংসার বাণী এক-আধটা জুটলেও তাকে রীতিমতো সংগ্রহ, সংরক্ষণ বা যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার কথা কেউ ভাবেননি। ১৯২৯ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর জার্নালে গুরুসদয়ের নকশি কাঁথা বিষয়ক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, ওই বিষয়ে সেটিই পথিকৃৎ।

মোটামুটি ১৯২৯ থেকে ১৯৪০ (১৯৪১-এ তাঁর মৃত্যু হয়), এই এগারো বছর সময়ের মধ্যে তিনি অখণ্ড বঙ্গের নানা স্থান থেকে প্রায় আড়াই হাজার নিদর্শন সংগ্রহ করেন। যার মধ্যে রয়েছে পট, নকশি কাঁথা, দারু-ভাস্কর্য, পুতুল, পুথির পাটা, গৃহস্থালির সরঞ্জাম, ধাতু-ভাস্কর্য, গহনা, মাটির পাত্র প্রভৃতি। ১৯৩২ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর সহযোগিতায় কলকাতায় এক প্রদর্শনীতে তাঁর সংগ্রহ দেখানো হলে কলারসিক মহলে রীতিমতো সাড়া পড়ে। প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচক শাহেদ সোহরাওয়ার্দী বলেন, গুরুসদয় 'এই বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের শিক্ষিতজনদের দৃষ্টিগোচরে আনা ছাড়াও তিনি, যে বাঙালি শিল্পধারা, যা প্রাথমিক সাফল্যের পর কল্পনাহীনতা ও একঘেয়েমিতে পরিণত হয়েছে, তাতে শক্ত নাড়া দেওয়ার জন্যেও আমাদের ধন্যবাদার্হ।' তাঁর এই বিশাল একক সংগ্রহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আজকের গুরুসদয় সংগ্রহশালা, পূর্ব ভারতের বৃহত্তম লোকশিল্প সংগ্রহ।

গুরুসদয়ের কাজ শুরুর সময় মোটামুটি ১৯২৯, অর্থাৎ ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের পর প্রায় পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত। পঁচিশ বছরে পরিবর্তন ঘটেছে অনেক, আন্দোলনের শুরুতে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেরই স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছে। স্বদেশি আন্দোলনের সিংহভাগ তখন বক্তৃতাসম্বল, বয়কট ক্ষীণপ্রায়, সরকারি দমননীতিতে অধিকাংশ সমিতি লোপ পেয়েছে। অপরদিকে রাজনৈতিক পন্থা হিসাবে অসহযোগ আর অহিংস সত্যাগ্রহ যেমন জায়গা করে নিচ্ছে তেমনি যুবশক্তির একাংশের সন্ত্রাসবাদে যোগদান অব্যাহত। জাতিগঠনের উদার আহ্বান তখন স্তিমিত, পল্লিসংস্কারের কর্মসূচি একক বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় নির্বাসিত।

১৯০৫-এর আন্দোলনের অপর মুখ্য বিষয় ছিল হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী। তারও প্রায় বিপরীত ফল, ১৯০৯-এর সংস্কার আন্দোলন মুসলমান বিচ্ছিন্নতাকামীদের আরো শক্তিশালী করেছে। যে কোনো শরীরচর্চার আখড়া বা যুব-কিশোর সংগঠনকে ব্রিটিশ সরকার সন্দেহের চোখে দেখতো, কারণ এগুলিই ছিল সন্ত্রাসবাদীদের সূতিকাগার। এই

সংগঠনগুলিতে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদী দলে মুসলমানদের পরিহার করা হতো।

এই পরিস্থিতিতে গুরুসদয়ের ব্রতচারী আন্দোলনের শুরু। গ্রামসেবা, শরীরচর্চার পাশাপাশি ষোলোআনা বাঙালি হয়ে ওঠার ডাক। দ্রুত বিস্তার ও জনপ্রিয়তা লাভ করে, বঙ্গদেশের নানান জায়গায় এর শাখা স্থাপিত হয়।

ব্রতচারী আন্দোলন ইংরেজ সরকারের সন্দেহভাজন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, হয়তো রাজনীতির লেশ না থাকায় উল্টে অর্জন করে প্রশংসা। বিচ্ছিন্নতাকামীদের যথেষ্ট প্রতাপ সত্ত্বেও প্রচুর মুসলমান যুবা-কিশোর ব্রতচারী আন্দোলনে যোগদান করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসান প্রমুখ অনেকেই ছিলেন ব্রতচারী।

দুটি আপাতবিচ্ছিন্ন লক্ষণও গুরুসদয় সরকারি কর্মচারী বিধায় ব্রতচারী আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান ছিলেন। কেউ মনে করেছেন সরকারি আমলার খামখেয়াল, হয়তো গুরুসদয়ের ব্যক্তিগত জেদ, অসহিষ্ণুতা তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ তাঁর অনুরূপ অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন।

কিন্তু গুরুসদয়ের স্বদেশপ্রেম প্রশ্নাতীত, তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব ব্রতচারী আন্দোলনের মাধ্যমে দীক্ষিতদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত করা, প্রাচীন সম্পদ-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করা, খাঁটি বাঙালি করে তোলা। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালি সংস্কৃতির সার্বিক পুনরুজ্জীবন, এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সর্বব্যাপী, সর্বত্রচারী। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ' তাঁর অনুপ্রেরণা। সেই আবেগ, সেই আগ্রহ তিনি সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন অনুগামীদের মধ্যে।

শিল্পী কামরুল হাসান বাংলা পটের ঢঙে ছবি এঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, সেই সৃষ্টির বীজ উপ্ত হয়েছিল গুরুসদয়ের দ্বারা। তাঁর জবানিতে আরো জানা যায় ব্রতচারী আন্দোলনের তৎকালীন রূপ, তার শিক্ষা। কৈশোর থেকেই কামরুলের শরীরচর্চায় অনুরাগ, তাঁদের একজন ট্রেনার মেজর তোজাম্মেল হোসেন "...হঠাৎ কাগজে দেখলেন যে, ব্রতচারী শিক্ষা শিবির হবে, দেড় মাসের জন্য। আমি খুব ভালো কাঠি নাচ করতে পারতাম। উনি বললেন, কামরুল তুমি ব্রতচারী নাচটা শিখে এসো। আসলে আমি নাচ শেখার জন্যই ওখানে গেলাম। ....১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি, বোধ হয় ১৫ই ডিসেম্বর হবে, গুরুসদয় দত্ত, যিনি ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, উনি শিবির ওপেন করলেন। ....গুরুসদয় দত্ত যে ধরনের বক্তৃতা দিলেন, তাতেই আমি খুব চমকে উঠলাম....মানে একটা মানসিক পরিবর্তন এলো। দেখলাম, নাচ শিখতে তো আসিনি। এর পিছনে একটা বিরাট উদ্দেশ্য আছে। মোটামুটি সাধারণ লোকেরা যারা বুঝতো, শিক্ষিতরা, তারা জানতো ঠিকই যে, এটা বয়েজ স্কাউটের কাউন্টার। বাংলাদেশের জন্য

বয়েজ স্কাউট। কারণ, উনিও বললেন, 'এসব গরীব দেশ'... তারা এতসব খাকি পোশাক, লাঠি, হুইসেল, ব্যাজ-ট্যাজ এই সব এ্যাফোর্ড করবে কোত্থেকে? তাদের জন্য এমন একটা জিনিস উনি চাইলেন যে সহজ-সরলভাবে, বাঙালি হয়ে ভালো ভালো কাজ কি করা যায়। মোটামুটি নাচ-গান ছাড়া অন্য সব কাজে বয়েজ স্কাউটের সঙ্গে ব্রতচারীর মিল ছিলো। এই জনসেবা করা, কোনো জায়গায় বিপদ-আপদ হলে বা কোনো গ্রামে কিছু অসুবিধা হলে, রোগ বা মহামারী দেখা দিলে সাহায্য করা, হঠাৎ কোনো বাড়িতে আগুন লেগেছে, গিয়ে সাহায্য করা যা বয়েজ স্কাউটরা করতো, আমরাও তাই করতাম।

... আর তারপর একটা কথা বলেছিলেন, ...ডঃদীনেশ সেনের বৃহৎবঙ্গ, এই সবের কথাও উল্লেখ করতেন। সেদিনও করেছেন। আর প্রত্যেক রোববার উনি আমাদের ক্যাম্পে আসতেন, সারাদিন আমাদের সঙ্গে থাকতেন, আর এইসব নানান কথা হতো। আমাদের যাঁরা সেইসময় ট্রেনার ছিলেন....তার মধ্যে ছিলো দুলে বাগদী... যে রকম ধরণীধর বাউরী বলে একজন—সে একদম জাইগ্যান্টিক শরীর—তারা এক সময় ডাকাতি করতো। এরা এক সময়...গ্রামে গিয়ে নাচ-টাচ দেখাতো, ঐ ঘাঘরা-টাঘরা পরে, মেয়ে সেজে, রঙটঙ মেখে—আর তাদের মধ্যে কিছু লোক চরের কাজ করতো। মানে কোন্ কোন্ বড়লোকের বাড়ীতে, কোন্ দিক দিয়ে ঢোকা যায়, কি করা যায়, এসব খোঁজ-খবর নিয়ে ঐ নাচ-টাচ দেখাবার কয়দিন পরেই ওরা গিয়ে ডাকাতি করতো সেই সব জায়গায়। ...গুরুসদয় দত্ত, তখন তিনি বীরভূম জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, উনি দীনেশ সেনের ওটা পড়ে খুঁজছেন যে এরা কোথায়। তখন ওদের একজন লোক, নবনীধর বন্দ্যোপাধ্যায়... উনি আমাদের নায়ক ছিলেন, উনি (গুরুসদয়) আবার কিছু কিছু আরবী শব্দ ব্যবহার করতেন—আলা মানে শ্রেষ্ঠ, উনি নায়ক আলা বলতেন আর আমরা তাঁকে আলাজী বলতাম। আর আমাদের নামের শেষে জী বলা হতো, আমাকে বলতো কামরুলজী। ...উনি বললেন যে, আমি দলবল নিয়ে আসছি।

...ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নাচ দেখতে রাজী হলেন। তারা ঐ ঘাঘরা-টাঘরা পরে নাচছে। দেখে উনি খুব চটে গেলেন যে, আমি এই জিনিস তো চাই না।... ওদের খুব তীব্রভাবে সমালোচনা করলেন—প্রায় গালাগালি করার মতো। তখন ঐ ধরণীধর চুলটুল ঝাঁকিয়ে 'ইয়া' বলে, লাফ দিয়ে পড়লো, 'হুজুর আমি জানি, আপনি যা চাচ্ছেন।' উনি বললেন, 'তাহলে কর দেখি'। তখন সে ঐ রায়বেঁশে নাচটা শুরু করলো।

...তা এইভাবেই উনি আস্তে আস্তে শুরু করলেন। আমাদের ক্যাম্পে ঐ ধরণীধর বাউরী, রামপদ, কালীপদ—এরা সব আসতো। আর একজন আসতো, মটরু নামে একজন পটুয়া। যে মুর্শিদাবাদের লোক। এরা খানিকটা বাউলদের মতো, না মুসলমান, না হিন্দু—এই রকম এদের একটা ধর্মবিশ্বাস, নিরীহ টাইপের। মটরুর ছবি আঁকা দেখে অবাক হতাম...।

আমি তখন আর্ট কলেজের... সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র। অলরেডী ফর্মালি ছবি আঁকা শুরু করেছি। আর ইউরোপিয়ান টেকনিকে আঁকছি। গুরুসদয় দত্ত আমাকে খুব ভালবাসতেন। উনি বললেন, 'কোনো শিক্ষার ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, বাধাও নেই। শিক্ষার সুযোগ যেখানে আছে, সেখানেই তোমাদের বিচরণ করতে হবে। তবে তুমি যেটা শিখছো, সেটা তো ইউরোপিয়ান ধাঁচে। মটরু যেটা করছে, সেটা একদম বাঙালী পদ্ধতিতে ছবি আঁকছে। এটি হচ্ছে তোমার নিজস্ব ধারা।'

...আমাকে আসলে গুরুসদয় দত্ত পুরোপুরি বাঙালী তৈরি করে দিয়ে গেছেন। সেই যে বাঙালী ভাবটা জাগলো, সেটা আমার এখনো, এই ছেষট্টি বছর বয়স চলছে, আমি এখনো ওটা ধারণ করে আছি। যদিও পাসপোর্টে সিটিজেনশীপ বাংলাদেশী লিখতে হয়, আমি কিন্তু বাঙালী।"

এখানেই গুরুসদয়ের চরম সার্থকতা, তাঁর কৃতিত্ব।

অরুণ নাগ

প্রকাশকের নিবেদন

বিংশ শতাব্দীতে গুরুসদয় দত্ত ছিলেন একজন বর্ণময় ব্যক্তিত্ব। আক্ষরিক অর্থেই একজন বিস্ময়কর স্পর্ধিত ব্যতিক্রমী মানুষ। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন না, ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রয়াত হন। তাঁর জীবনকালে তিনি যে ব্যাপ্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থেকে চরম সফলতা অর্জন করেন তা বিশ্লেষণ করলে বিস্মিত হতে হয়। পেশাগত জীবনে ছিলেন প্রশাসনের উচ্চপদে, গোটা জেলার জটিল সব দায়িত্বে যুক্ত। অথচ প্রশাসনিক এসব প্রথাগত কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করে কীভাবে সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বিপুল কর্মভার বহন করেছিলেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া দুষ্কর।

কিন্তু তাঁর জীবন-দর্শনের পরিচয় ভালোভাবে অনুভব করলে বিষয়টি বোঝা যাবে। তাঁর সকল কর্মের প্রেরণা ছিল সুস্থ জাতীয়তাবোধ, স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি। তাঁর জাতীয়তাবোধে কোথাও সংকীর্ণতা ছিল না। যাঁর ভাবনার মূলে রয়েছে মানুষের হিতসাধনার ব্রত, তাঁকে ক্ষুদ্রতা আচ্ছন্ন করতে পারে না। তিনি জন্মভূমি সোনার বাংলার জয় ঘোষণা করেছেন, মাতৃভূমি সোনার ভারতের জয় ঘোষণা করেছেন, এবং একই সুরে সোনার বিশ্বভুবনের কথাও উচ্চারণ করেছেন। বিশ শতকের বাংলায় স্বদেশি যুগের আবহাওয়ায় জাতীয়তাবোধের সঙ্গে এই বিশ্ব-ঐক্য-অনুভূতির মিলন ঘটানো বড় সহজ ছিল না। আন্তর্জাতিকতাবোধের এই রূপটি আমরা রবীন্দ্র-দর্শনে পেয়েছি। 'জয় সোনার বিশ্বভুবনের' এই বাক্যটি গুরুসদয়ের সেই জীবন-দর্শনেরই পরিচয়। বিষয়টি অনেক সময়েই আমরা ভুলে যাই।

এই জাতীয়তাবোধ, স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতির সঙ্গে যুক্ত হয় আর একটি মানবিক গুণ। তা হল 'লোকহিত সাধনের' আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। তিনি এই গুণটি পেয়েছিলেন পারিবারিক সূত্রে এবং সেই ঐতিহ্য পূর্ণতা পেয়েছে জেলায় জেলায় কর্মরত অবস্থায় গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সংস্রব গড়ে তোলার আগ্রহের মাধ্যমে।

গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের মধ্যে যে সম্মিলিত ইতিবাচক লোকহিত-সাধনের প্রক্রিয়াটি রয়েছে তা ঋষিসুলভ প্রত্যয়ে বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অসুস্থ

রবীন্দ্রনাথ ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ২৫ আষাঢ় একটি চিঠিতে লেখেন, —এই ব্রতচর্য্যা পালন করলে প্রাণের আনন্দ, কর্ম্মের শক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা ও লোকহিতসাধনের উৎসাহ দেশে বললাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

ব্রতচারী আন্দোলন যখন পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে প্রবল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তখন আমাদের স্বদেশবাসী কিছু মানুষ ও রাজনৈতিক দল বিরূপ মন্তব্য করেন। গুরুসদয় সেসব প্রতিকূলতার কোন উত্তর দেননি। তাঁর অভিজাত রুচিতে প্রতিবাদের কোন স্থান ছিলনা। তিনি জানতেন ভারতীয় মানুষের কল্যাণে যা করছেন তা সঠিক। আর এই মানসিকতার পেছনে ছিল একধরনের কর্মনিষ্ঠা ও জেদ, সমস্ত চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করার দুর্মর ক্ষমতা। মানুষের প্রতি অপার ভালোবাসা তাঁকে অন্য মানসিকতায় উত্তীর্ণ করেছিল।

সরকারি প্রশাসনের উচ্চপদে যাঁরা থাকেন তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার অজুহাতে ক্রীতদাসত্ব করতে বাধ্য হন। স্বাধীন ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। অথচ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে একজন আই. সি. এস জেলাশাসক ইংরেজের অমানবিক আচরণের যেভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন, তা ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

১৯২৮ সালের ২৮ মার্চ লিলুয়া রেল কারখানার মজদুররা মাইনা বাড়ানোর দাবিতে জমায়েত হলে হাওড়া পুলিস সুপারিনটেনডেন্টের আদেশে গুলি চালায়। চারজন মারা যান। একজন মজদুরের মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়া হয়। জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত বিনা প্ররোচনায় গুলিচালনা ও অকারণ হত্যার তীব্র নিন্দা করেন। এই প্রতিবাদ যে সেদিন কত কঠিন ছিল তা প্রাজ্ঞ মানুষই বুঝতে পারবেন। আসলে অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ও মানুষের প্রতি মানবিকতাবোধ গুরুসদয়কে অন্যবিধ চারিত্রিক দৃঢ়তায় মহান ব্যক্তিত্বে উন্নীত করেছিল।

তিনি ছাত্রাবস্থায় জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। কৃতী ছাত্র গুরুসদয় প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠরত অবস্থায় কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্‌স্টিটিউট হল কিংবা ওয়াই.এম.সি.এ.তে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ খ্যাতনামা দেশনেতাদের ভাষণ শুনতে যেতেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করেছেন। অর্থাৎ স্বদেশ-প্রেমের উৎস সেই ছাত্রজীবনেই।

কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেমের সংজ্ঞা ছিল অন্যরকম। কোন দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া নয়, স্বদেশপ্রেম তাঁর কাছে মাটির কাছাকাছির মানুষের কল্যাণ-সাধনের ব্রতকেই বোঝাত। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সুস্থ দেহ সুস্থ মনকে গড়ে তোলে আর সুস্থ সবল দেহমন যে কিশোর-যুবকের রয়েছে তারাই স্বাদেশিকতা-স্বদেশপ্রেম-স্বাজাত্যবোধ প্রভৃতির মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। দুর্বল জাতি কখনও স্বদেশপ্রেমের সুকঠিন ব্রতকে সার্থক

করতে পারে না। প্রাচীন গ্রিসের প্রাজ্ঞ দার্শনিকেরা যে তাঁদের ছাত্রদের সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের অধিকারী করে গড়ে তোলার নির্দেশ দিতেন, গুরুসদয়ের স্বদেশচেতনার দর্শনও তাই ছিল।

ভারতবর্ষের প্রাণ তার গ্রামগুলি। শতকরা নব্বই জন মানুষ গ্রামবাসী। তাদের মানসিক উন্নয়ন না ঘটিয়ে দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা অসম্ভব। গুরুসদয় জীবনের প্রথম ১৬ বছর বড় হন গ্রামে। এবং চাকরির সুবাদেও বাংলার গ্রামীণ এলাকার সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই শত-কোটি মানুষের জীবন ও সংস্কৃতিকে না জানলে দেশকে জানা যাবে না। তাই তিনি আজীবন লৌকিক সংস্কৃতি, লোকজীবনের চর্চা বিষয়েই মনোযাগী ছিলেন। আর এ বিষয়ে তিনি 'কর্ম ও কথায় সত্য আত্মীয়তা' অর্জন করেছিলেন। শুধু নির্দেশ দান নয়, নিজেও সেই কর্মকাণ্ডের একজন শরিক হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মনে করতেন, প্রকৃত স্বদেশ রয়েছে গ্রামেই।

রবীন্দ্র-ভাবনার সঙ্গে তাঁর ভাবনার অনেক মিল রয়েছে। ক্ষীণভাবে হলেও রবীন্দ্রনাথের গ্রামভাবনা ও স্বদেশচেতনা গুরুসদয় দত্তকে হয়তো প্রাণিত করেছিল।

তেইশ বছর বয়সে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে গুরুসদয় বিলাত থেকে আই.সি.এস. হয়ে দেশে ফেরেন। একই সময়কালে ১৩১২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অভ্যর্থনা করবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে সভা আহ্বান করেছিলেন সেখানে অনেক বক্তব্যের মধ্যে দুটি মন্তব্যের সঙ্গে গুরুসদয়ের আজীবনের কর্মকাণ্ড জড়িত রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সেদিনের ভাষণে বলেছিলেন,---

ক. আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnology-র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম কৈবর্ত-বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনি বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে, —পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি।

....সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। ....এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত, দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে,....।

খ. ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র—কিন্তু, ভারতমাতা

যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।

ভারতের প্রাণভোমরা গ্রামীণ লোকসমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার সঙ্গে গুরুসদয়ের অভিজ্ঞতার কোন পার্থক্য নেই। আর এই দুজনেই গ্রামীণ উন্নয়নে সমানভাবে ব্রতী হয়েছিলেন।

গুরুসদয়ের গ্রাম-ভাবনার পরিচয় জানা দরকার। তিনি অনুভব করেছিলেন, কৃষি-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনের প্রাচীন সংস্কৃতির উদ্ধারসাধন এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয় জরুরি। এর ফলেই কৃষিই হোক আর শিল্পই হোক অনুপ্রেরণা জাগে। বাস্তবিক, আমাদের বর্তমান প্রধান কর্তব্য হচ্ছে জাতীয় জীবনের পুনঃসংস্কার। বাইরের আলো আমরা অবশ্যই গ্রহণ করব কিন্তু শেকড় থাকবে জাতীয় জীবনের গভীরতম তলদেশে, সেখান থেকে চিন্তা ও ভাবের অনুপ্রেরণা আহরণ করে তার অন্তরকে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের 'পল্লীসম্পদ সমিতি' সেই সংযোগ ঘটাতে পারে। শুধু মন্দির ও প্রাচীন মূর্তির মধ্যে দিয়ে নয়, জীবন্ত রসকলার ভেতর দিয়েই প্রাণের সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় ঘটা সম্ভব, যেসব জীবন্ত রসকলা এখনও বেঁচে আছে, শিক্ষিতের সংস্পর্শ থেকে বহু দূরে—নিরক্ষর জনসমাজে, যেসব পল্লির মেয়েরা এ যুগের আলো পায়নি তাদের মধ্যে, সেসব বেঁচে আছে বাউল জারি পটচিত্র রায়বেঁশে লোকশিল্পের মধ্যে। মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষের আত্মা আছে তার পল্লিগ্রামে। যেদিন পল্লিগ্রামের অসংখ্য মানুষের কণ্ঠ মুক্ত হবে, যেদিন পল্লির রসকলা সংস্কৃতি যোগ্য মর্যাদা পেয়ে ছড়িয়ে পড়বে সেদিন আমাদের দেশে ধর্মীয় সংকীর্ণতা-দলাদলি-গোঁড়ামি ও বিভেদ বিলুপ্ত হবে। আর তাই আমরা লোকসংস্কৃতি উদ্ধারে ব্রতী হয়েছি। তিনি বলেছেন,—'পৃথিবীর অনেক দেশ দেখেছি, আমার মনে হয় বাংলার রসকলা যেরূপ পরিপূর্ণ তেমন আর কোথাও নেই। শুধু এই দিক দিয়েই আমাদের দেশ আবার পৃথিবীতে গৌরবময় আসন পাবে। পল্লীসম্পদ-রক্ষা সমিতির কাজ এই জন্য অতি বৃহৎ।'

'বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ সমিতি'র দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে গুরুসদয় দত্ত যে ভাষণ দিয়েছিলেন, 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকার চৈত্র, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে 'বাংলার পল্লীসম্পদ' নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় সেখানে তাঁর এই অনন্য জীবন-দর্শনের কথা রয়েছে।

এইসব দেশপ্রেমিক মানসিকতা ও দেশের প্রাণভূমি গ্রামীণ মানুষের সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক টানে তিনি একদিকে যেমন লোকসংস্কৃতির উজ্জীবনে গোটা বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করে লৌকিক সংস্কৃতিকে সংগঠিত করবার জন্য উদ্যোগ নিলেন, তেমনি গ্রাম-গ্রামান্তরের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে লৌকিক ঐতিহ্যের নমুনা সংগ্রহ করতে লাগলেন। শুধুমাত্র নির্দেশ-

দান নয়, সেইসব সংস্কৃতি নিজে শিখে গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে অংশগ্রহণও করলেন। গ্রামীণ শিল্পবস্তু সংগ্রহ করে তা ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখলেন না, গোটা দেশের মানুষ যাতে সেসব প্রত্যক্ষ করতে পারেন তার জন্য সংগ্রহশালা গড়ে তুললেন। ব্রতচারী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ও সংগ্রহশালার জন্য মৃত্যুর এক বছর আগে ঠাকুরপুকুরে ১০১ বিঘে জমি ক্রয় করে 'ব্রতচারী গ্রাম' প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে থাকবে বিদ্যালয়, ব্যায়ামাগার, কারিগর বাড়ি, চাষ বাড়ি, গ্রন্থালয়, সেবা বাড়ি অর্থাৎ গ্রামোন্নয়ন এবং সংগ্রহ বাড়ি অর্থাৎ সংগ্রহশালা।

গুরুসদয় দত্তের এইসব গ্রাম-সম্বন্ধীয় লোকহিতৈষণার জীবন-দর্শন সম্পর্কে অবগত হলেই তাঁর লোকসংস্কৃতি-চর্চার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে।

সংকলন প্রসঙ্গে ঃ এটি একটি সংকলন গ্রন্থ। 'বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য' নামে গুরুসদয়ের কোন গ্রন্থ নেই। যদিও আজীবন তিনি এই দুই বিষয়ে চর্চা করে এসেছেন। তাঁর জীবিতকালে লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় দুটি, —১৯৩৩ সালে Indian Folk Dance and Folk Song Movement এবং ১৯৩৯ সালে পটুয়া সংগীত। লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীভূমি, ভারতবর্ষ, ভূমিলক্ষ্মী, সোনার বাংলা, বঙ্গলক্ষ্মী, গ্রামের ডাক, সৌরভ, কাজের কথা, মাসিক বসুমতী, প্রবাসী, বিচিত্রা, ব্রতচারী বার্তা, বাংলার শক্তি, অলকা, স্মরণিকা, মডার্ন রিভিউ, ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, প্রবুদ্ধ ভারত, সায়েন্স অ্যান্ড কালচার, ইণ্ডিয়ান অ্যাডাল্ট হ্যাণ্ডবুক প্রভৃতি পত্রিকায়।

এছাড়া ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৪১ সাল বারো বছরে লোকসংস্কৃতি, পল্লিসংগঠন ও ব্রতচারী বিষয়ে লেখেন অনেকগুলি গ্রন্থ। ভজার বাঁশি, গোড়ায় গলদ, পল্লীসংস্কার ও সংগঠন, বাংলার সামরিক ক্রীড়া, পটুয়া, ব্রতচারী সখা, ব্রতচারী মর্মকথা, ব্রতচারী পরিচয়, Agricultural Organisation and Rural Reconstruction in Bengal, A woman of India, Folk song and Folk dance in Indian School, Bratachari Synthesis প্রভৃতি। গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তুর নির্বাচন অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে গ্রামসংগঠন ও লোকসমাজের সংস্কৃতি-ভাবনা কীভাবে তাঁর জীবনদর্শনকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

তাঁর ভারতবিখ্যাত দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। একটি লোকশিল্প ও অন্যটি লোকনৃত্যবিষয়ক।

ক. The Folk Dances of Bengal প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালের ১৫ আগস্ট। মৃত্যুর আগেই গুরুসদয় গ্রন্থটির প্রায় সম্পূর্ণ খসড়া করে রেখেছিলেন। সমস্ত আলোকচিত্রও

তিনি নির্বাচন করে রেখেছিলেন। The Estate of Late Gurusaday Dutt-এর তরফ থেকে তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রসদয় দত্তের উদ্‌যোগে গ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয় আই.সি.এস. অশোক মিত্রকে। প্রকাশক ছিলেন বীরেন্দ্রসদয় নিজেই। সম্পাদক অশোক মিত্র একটি অসাধারণ তথ্যসমৃদ্ধ ভূমিকা লেখেন।

খ. Folk Arts and Crafts of Bengal : প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। উদ্‌যোগী হন তাঁর পুত্রবধূ আরতি দত্ত। সীগাল বুকস্ থেকে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চমানের একটি ভূমিকা লেখেন।

তাঁর লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সব গ্রন্থই আজ দুষ্প্রাপ্য। আর বিলুপ্ত পত্রপত্রিকায় যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোও রয়েছে দু-তিনটি গ্রন্থাগারে। সাধারণের নাগালের বাইরে।

আমরা যখন এই সংকলনটি প্রকাশের উদ্‌যোগ গ্রহণ করি তখন লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক লেখাগুলি একত্রিত করার কথা ভাবি। অনেক আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সংকলনটি হবে এইরকম ঃ

ক. লোকশিল্প

খ. লোকনৃত্য

ক. ১. পটুয়া সঙ্গীত (পটচিত্র ছাড়া পটুয়া সংগীত অপ্রাসঙ্গিক। পটুয়ারা পটগুলি দেখিয়ে জড়ানো পট খুলে খুলে সংগীত পরিবেশন করেন। গুরুসদয়- নির্বাচিত পটচিত্রও আছে এই গ্রন্থের সঙ্গে)

২. বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লোকশিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ। পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিসহ।

খ. ১. বাংলার বীরযোদ্ধা রায়বেঁশে (১৯৯৪ সালে ব্রতচারী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত)।

২. পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লোকনৃত্য বিষয়ক প্রবন্ধ। পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিসহ।

৩. The Folk Dances of Bengal গ্রন্থে এমন অনেক লোকনৃত্যের উল্লেখ রয়েছে যার অধিকাংশই পত্রপত্রিকার প্রবন্ধে নেই। কিন্তু সেইসব লোকনৃত্যের পরিচয় না দিলে বাংলার লোকনৃত্য আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। তাই এই ইংরেজি গ্রন্থটির তাত্ত্বিক আলোচনার অংশগুলি বাদ দিয়ে যেখানে শুধু লোকনৃত্যের পরিচয় আছে তার বাংলায় অনুবাদ প্রকাশ করা হল। ইংরেজি এই গ্রন্থের রায়বেঁশে লোকনৃত্যের অংশটি অনুবাদ করা হয়নি, কেননা এই লোকনৃত্যের বিস্তৃত পরিচয় রয়েছে 'বাংলার বীরযোদ্ধা রায়বেঁশে' বাংলা গ্রন্থে।

The Folk Dances of Bengal গ্রন্থের অনুবাদ করা হয়েছে, —পৃষ্ঠা, ১-২৪, ৩৪-১০৪ এবং ১১৬।

আমাদের বিশ্বাস এই সংকলন গ্রন্থটির মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ যেভাবে নির্বাচিত হয়েছে তাতে গুরুসদয় দত্তের বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য বিষয়ে পাঠক একটি সার্বিক ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন।

কৃতজ্ঞতা : প্রকাশক হিসেবে গুরুসদয় দত্তের লোকশিল্প ও লোকনৃত্য গ্রন্থটি সংকলনের সময়ে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়। সকলেই গুরুসদয় দত্তের লোকশিল্প ও লোকনৃত্যের প্রসঙ্গে তাঁর অনন্য অবদানের কথা জানেন। কিন্তু আক্ষেপ করেছেন সেসব সংগ্রহ করবার ইচ্ছা থাকলেও পড়ার সুযোগ পাননি। বিশেষ করে পত্রপত্রিকার প্রবন্ধাবলি।

এই সংকলনের সুবাদে যাঁদের কাছেই গিয়েছি তাঁরা সকলেই সাগ্রহে সহযোগিতা করেছেন। এই প্রাপ্তি বোধহয় গুরুজি গুরুসদয়ের জাদু নামের কারণে। কিংবদন্তি-সদৃশ মহান মানুষদের নাম-মাহাত্ম্যই এর কারণ।

গুরুসদয় দত্তের গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলিতে যেসব আলোকচিত্র ছিল সময়ের কারণেই সেগুলো বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। অথচ এসবের নমুনা সবই রয়েছে ব্রতচারীগ্রামের গুরুসদয় সংগ্রহশালায়। গ্রন্থটির ছবিগুলি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের জন্য তৎপর হন গুরুসদয়ের পৌত্র দেবসদয় দত্ত। তিনি গ্রন্থটির প্রকাশকাল থেকেই সার্বিক সহযোগিতা করে চলেছেন। নতুনভাবে লোকশিল্পের আলোকচিত্র-গুলির সংগ্রহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন দেবসদয়। আর সেইসঙ্গে সহযোগিতা করেন গুরুসদয় সংগ্রহশালার সব কর্মী। কিছু আলোকচিত্র তোলেন শ্রীরাজা সরকার।

গুরুসদয়ের জীবৎকালে পত্রপত্রিকায় যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তার কাগজের ফটোকপি অনেক সময়ই পড়া বেশ দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। সেগুলো কম্পোজ করা ছিল দুরূহ। গুরুসদয়ের পৌত্রবধূ শ্রীমতী প্রিয়দর্শিনী দত্ত সেসব প্রবন্ধ পড়ে অনুপমভাবে প্রেসকপি করে দিয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

গুরুসদয়ের 'জীবন ও রচনাপঞ্জি' রচনা করেছেন ব্রতচারীগ্রামের একনিষ্ঠ কর্মী শ্রীনরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি গুরুসদয়ের লিখিত সমস্ত প্রবন্ধতালিকা কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার পঞ্জি তৈরি করেছেন। তাঁর পঞ্জি থেকেই আমরা লোকশিল্প ও লোকনৃত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি এই সংকলনে দিয়েছি। তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

গ্রন্থটির 'ভূমিকা' লিখবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনের প্রাজ্ঞ মানুষ শ্রীঅরুণ নাগকে। তিনি গুরুসদয়ের কর্মকাণ্ডের এবং তাঁর অবদান বিষয়ে অনন্য বিশ্লেষণ করে লেখাটি পাঠিয়েছেন।

গুরুসদয় সংগ্রহশালার সকল কর্মীর সহযোগিতা ও আন্তরিকতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

ইংরেজি The Folk Dances of Bengal গ্রন্থটির প্রাসঙ্গিক অংশের অনুবাদ করেছেন দ্য এশিয়াটিক সোসাইটির শ্রীমতী সুরঞ্জনা চৌধুরী।

সংকলনটি প্রকাশের প্রথম থেকেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন শ্রীদিব্যজ্যোতি মজুমদার। এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও অংশগ্রহণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। সম্পাদনার সমস্ত দায়িত্ব তিনিই পালন করেছেন।

এই সংকলন গ্রন্থটি যদি নতুনভাবে গুরুসদয়-ভাবনাকে উজ্জীবিত করতে পারে তাহলে আমাদের সম্মিলিত কর্মপ্রেরণা সার্থক হবে বলে আশা রাখি।

'ছাতিম বুক্স্'এর পক্ষে

বিষয়সূচি

বাংলার লোকশিল্প

বাংলার লোকনৃত্য

বাংলার লোকশিল্প

পটুয়া সঙ্গীত

পরিচায়িকা

পট ও পটুয়া

সংস্কৃত ভাষায় 'পট্ট' বা 'পট' বলিতে মূলতঃ কাপড় বুঝায়। প্রাচীন ভারতে কাপড়ের উপর চিত্র লিখিবার রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। যে কাপড়ের উপর চিত্র লিখিত হইত, পট বলিতে বিশেষ করিয়া সেই কাপড়টিকেই বুঝাইত। কালক্রমে পটের শেষোক্ত অর্থ অধিকতর প্রচলিত হইল। এই জন্য 'পটকার' বা 'পট্টীকার' বলিতে চিত্রকর সমাজকে বুঝাইতে লাগিল। 'পট' শব্দের উত্তর সম্বন্ধ-বাচক 'উয়া' প্রত্যয়যোগে 'পটুয়া' শব্দের উৎপত্তি। সাধুভাষা বা পুরাতন বাংলার শব্দ 'পটুয়া'র আধুনিক প্রাদেশিক রূপভেদ পউট্যা, পউটা, প'টো (পোটো)। 'পটুয়া'রা নিজেদের 'চিত্রকর' জাতি বলিয়া উল্লেখ করে।

বাংলা দেশে 'পটুয়া' জাতি ছাড়াও অপর কোন কোন জাতির লোক চিত্র লিখিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আচার্য্য-ব্রাহ্মণ ও কুম্ভকার সমাজের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহারা জাতিতে চিত্রকর সংজ্ঞার অন্তর্গত নয়। ইহাদের বিষয় বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য নয়।

এখন কাপড়ের উপর চিত্র লিখিবার রীতি প্রায় লোপ পাইয়াছে। কাগজের উপরেই সাধারণতঃ চিত্র লিখিত হয়; কিন্তু 'পট' নামটি রহিয়া গিয়াছে। কাপড়ের উপর অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র এখনও দুই-চারটি পাওয়া যায়; আমার সংগ্রহেও উহা রহিয়াছে।

বহুচিত্র দীর্ঘপট ও পটুয়া সঙ্গীত

বাংলা দেশের পটগুলিকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) একচিত্র-সম্বলিত ছোট ছোট 'চৌকা' পট, (২) পর-পর অঙ্কিত বহুচিত্র-সম্বলিত 'দীঘলপট' বা

▶▶ 'পটুয়া সঙ্গীত" জুলাই ১৯৩৯

'জড়ানোপট'। এই বহুচিত্র দীর্ঘপটগুলি অবলম্বন করিয়াই পটুয়াগণ গীতিকাব্য রচনা করে এবং সুর-সহযোগে তাহা আবৃত্তি করে। বীরভূম, বৰ্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের পটুয়াগণ ৮।১০ হাত হইতে ২০।২৫ হাত দীর্ঘ কাগজের উপর এই শ্রেণীর বহুচিত্র দীর্ঘপট প্রস্তুত করিয়া উহার উপর এক-একটি কাহিনীর বিবৃতিসূচক পর-পর অনেকগুলি চিত্র অঙ্কিত করে এবং বাংলার নানা জেলায় ঘুরিয়া ছবি দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাহিনীগুলিই সুর-সহযোগে আবৃত্তি করিয়া থাকে। প্রত্যেক দীর্ঘপটের দুই প্রান্তে দুইটি বাঁশের দণ্ড লাগান হয়; শেষ প্রান্তের দণ্ড হইতে জড়াইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পটটি গুটাইয়া রাখা হয়। সুতরাং দীর্ঘপটের প্রথম চিত্রের উপরিভাগে সংলগ্ন দণ্ডটি বাহিরে থাকে। পট দেখাইবার সময় জড়ানো পটটি একটি বাঁশের ছোট চারপায়ার উপর রাখা হয়; প্রদর্শক পটুয়া বাঁ হাতে উপরিভাগের দণ্ডটি তুলিয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রথম চিত্রটি খুলিয়া দেখায় ও ডান হাতে চিত্রে অঙ্কিত বিষয়গুলি নির্দেশ করিয়া তাহার কাহিনী সুর-সহযোগে বিবৃত করে। তারপর উপরের দণ্ডটি ঘুরাইয়া প্রদর্শিত প্রথম চিত্রটি তাহার উপর জড়াইয়া দ্বিতীয় চিত্রটি উন্মোচন করে এবং তাহার কাহিনী এইরূপভাবে বিবৃত করে। এই প্রকারে দীর্ঘপটে অঙ্কিত সমস্ত চিত্রগুলি প্রদর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিষয়বস্তুগুলি গীতিকাব্যে বিবৃত করা হয়। এই শ্রেণীর কয়েকটি গীতিকাব্য বর্ত্তমান গ্রন্থে পটুয়া সঙ্গীত আখ্যায় প্রকাশিত হইল।

পটুয়া-শিল্প ও পটুয়া-সঙ্গীতের অনুসন্ধান ও প্ররক্ষণ-ব্যবস্থা

বাংলা দেশে আজকাল পটুয়া-শিল্পের প্রতি যে অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে উহা বাংলার গণ-সঙ্গীত, গণ-নৃত্য ও গণ-শিল্পের প্রতি নব অনুরাগের ইতিহাসেরই একটি অঙ্গস্বরূপ। এই নব অনুরাগ-সৃষ্টির ইতিহাস সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৯২৯ অব্দের নভেম্বর মাসে আমি যখন মৈমনসিংহ জেলার কালেক্টর ছিলাম, তখন সেখানে সেই জেলার হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বাউলসঙ্গীত ও বাউলনৃত্য এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত জারিসঙ্গীত ও জারিনৃত্য ইত্যাদি মূল্যবান গণ-সংস্কৃতির প্ররক্ষণ ও পুনঃপ্রচলনের উদ্দেশ্যে একটি 'গণ-গীতি ও গণ-নৃত্য সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করি। ১৯৩০ অব্দে আমি বীরভূম জেলায় বদ্‌লি হই; এবং সেখানে রায়বেঁশে নৃত্য, কাঠিনৃত্য ও গীত, ঝুমুরনৃত্য ও গীত প্রভৃতি মূল্যবান পল্লী-সংস্কৃতির এবং তৎসহ পল্লীর অন্যান্য গণ-শিল্পের, যথা—প্রাচীর-চিত্রের এবং কাষ্ঠ-ভাস্কর্য্যের পুনরাবিষ্কার করি। লোকসমক্ষে সেগুলির মূল্য যথাযথভাবে বুঝাইবার জন্য এবং পল্লী-সংস্কৃতির সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে

গবেষণা করিবার জন্য আমি ১৯৩১ অব্দের জানুয়ারি মাসে 'বঙ্গীয় পল্লী-সম্পদ-রক্ষা সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করি।

এই গবেষণার প্রবৃত্ত হইয়া ১৯৩১ অব্দে বীরভূমের নানাগ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই জেলার পল্লী-সংস্কৃতির অন্যান্য নিদর্শনের সহিত পটুয়া ও পটুয়া সঙ্গীতের সঙ্গে আমার পরিচয় লাভ হয়। পশ্চিম বাংলার রাঢ়প্রদেশের পটুয়াদের অঙ্কিত রঙ্গীন বহুচিত্র দীর্ঘপটের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে বর্তমান বাংলার দুই-একজন শিল্পী ও শিল্প-রসিক তখনও অবগত ছিলেন বটে, কিন্তু ইহাদের চিত্র-শিল্পের প্রকৃত মূল্যের সম্বন্ধে খুব কম লোকেরই তখন ধারণা ছিল;এবং এই চিত্র-শিল্পের ব্যাপক প্রসারের সম্বন্ধেও শিক্ষিত-সমাজের অতি অল্প লোকই অবগত ছিলেন। বিশেষ করিয়া এই পটুয়াগণ পট-চিত্র-অঙ্কন ছাড়াও যে কাব্য রচনা করিয়া সেগুলি গাহিয়া চিত্র-প্রদর্শন করিয়া থাকে, এবং সেই কাব্যগুলির যে সাহিত্য-হিসাবে সবিশেষ মূল্য আছে তৎসম্বন্ধে আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

১৯৩২ অব্দের মার্চ মাসে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট (Indian Society of Oriental Art)-এর আনুকুল্যে সেই সমিতির ভবনে আমি একটি গণ-শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করি। ভারতের শিল্প-ইতিহাসে ইহাই প্রথম গণ-শিল্প প্রদর্শনীয় বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান। এই প্রদর্শনীতে বাংলার নিজস্ব আলপনা-শিল্প, কাঁথা-শিল্প, মৃৎশিল্প ও কাষ্ঠভাস্কর্য্য-শিল্প প্রভৃতি নানা পল্লী-শিল্পের সঙ্গে যে কেবল পটুয়াদের অঙ্কিত বহুসংখ্যক রঙ্গিন বহুচিত্র দীর্ঘপট প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা নহে;পটুয়া সঙ্গীতও যে একটি শ্রেষ্ঠ ও সরস শিল্প তাহা প্রতিপন্ন ও ঘোষণা করিবার জন্য আমি বীরভূমের তিন-চারি জন পটুয়াকে প্রদর্শনীর উদ্বোধন-উৎসবে উপস্থিত করিয়া তাহাদের দ্বারা তাহাদের অঙ্কিত বহুচিত্র দীর্ঘপট গীতি-কাব্যের সুর-সহযোগে গানের সঙ্গে প্রদর্শন করাই। ডক্টর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীগণ পটুয়া-চিত্রের এই অপূর্ব্ব প্রদর্শনী-দর্শনে ও পটুয়া সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া রসশিল্প হিসাবে ইহাদের উচ্চ স্থান পাইবার দাবী স্বীকার করেন।

প্রদর্শনীর পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান ও তৎসম্পর্কিত গবেষণার ফলে পশ্চিম বাংলার পটুয়াদের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এবং তাহাদের অঙ্কিত চিত্র-শিল্প ও তাহাদের দ্বারা রচিত গীতি-কাব্যের শিল্প হিসাবে মূল্য সম্বন্ধে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, তাহা আমি একটি কবিতার আকারে লিপিবদ্ধ করি এবং ইংরাজীতে তাহার পদ্যানুবাদ করি। এই বাংলা ও ইংরাজী উভয় কবিতাই উল্লিখিত লোক-শিল্প-প্রদর্শনী উদ্বোধন-সভায় পঠিত হয়।

পটুয়া-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা

বাংলার পল্লীচিত্র-শিল্পের মধ্যে গ্রাম্য পটুয়াদের অঙ্কিত বহুচিত্র দীর্ঘপটগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উচ্চাঙ্গের রস-শিল্প। বাংলার সামাজিক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় রীতি-নীতির পরিবর্ত্তনে এবং বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে ইহা এখন বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই বিলুপ্তপ্রায় অবস্থাতেও ইহা যে এখনও বাংলার জাতীয় জীবনের একটি শ্রেষ্ঠতম গৌরবময় সম্পদ তাহা নিঃসন্দেহভাবে বলা যাইতে পারে।

বর্তমানকালে বাংলাদেশে কলিকাতার কালীঘাট অঞ্চলের পটুয়াদের অঙ্কিত চিত্রকলা সাধারণের কাছে পরিচিত। কালীঘাটের পটুয়াগণ শহুরে ও বিজাতীয় আবহাওয়ায় পড়িয়া তাহাদের প্রাচীন, বিশুদ্ধ ও সুন্দর পটাঙ্কন-কৌশল প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম-বাংলার সদূর পল্লীতে-পল্লীতে দীন-দরিদ্র গ্রাম্য পটুয়া-শ্রেণীর মধ্যে এখনও সেই প্রাচীন ধারা ন্যূনাধিকভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাদের পূর্বপুরুষদের অঙ্কিত পটের যে কয়েকটি নিদর্শন সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, তাহাতে বাংলার এই পল্লীবাসী পটুয়া-শ্রেণীর চিত্র-শিল্পে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহারা এই সকল পট বাড়ি বাড়ি দেখাইয়া এবং তৎসঙ্গে রামলীলা-পটের, কৃষ্ণলীলা-পটের, শক্তি-পটের ও যম-পটের কাহিনী স্বরচিত গীতি-কবিতায় সহজ ও সরলভাবে বিবৃত করিয়া এবং সুললিত সুরে তাহা গাহিয়া গাহিয়া বিস্তর রোজগার করিয়া বেড়াইত। সম্প্রতি আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার ও শহুরে শিক্ষার প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাহিদা এবং গুণগ্রাহিতা বাংলার গ্রাম হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুপম শিল্পকলা-নিপুণ এই গ্রাম্য পটুয়াদের অন্ন-সংস্থান হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছে। চাহিদার অভাবে বাধ্য হইয়া ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোককেই পট-আঁকা ও পট-দেখান ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া জন-মজুরের বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া, হিন্দুধর্ম্মের মূলনীতিগুলিতে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন এই সুনিপুণ চিত্রকরগণ এখনও হিন্দুদের পূজার জন্য দেব-দেবীর ছবি আঁকা ও মাটির প্রতিমা গড়িবার কাজে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও ভারত-ইতিহাসের ও বাংলার ইতিহাসের প্রহেলিকাময় আবর্ত্তনে হিন্দুসমাজের গণ্ডী হইতে বিতাড়িত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে,এবং এই দুই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের গণ্ডীর বাহিরে অনশনে ও অর্দ্ধাশনে অতি দুর্ভাগ্য দীন জীবন যাপন করিতেছে।

সামাজিক নিদারুণ নিপীড়ন সত্ত্বেও ইহারা পুরুষানুক্রমে যে চিত্রকলা-সম্পদ সযত্নে চর্চ্চা ও বহন করিয়া আনিয়া বর্ত্তমান বাংলাকে দান করিয়াছে, তাহা অমূল্য ও অতুলনীয়;

এবং জগতের চিত্রশিল্পের আসরে ইহা যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। ইহাদের চিত্র-শিল্প-পদ্ধতি প্রাচীন ভারতের প্রাগ্-বৌদ্ধ যুগের আদিম চিত্রকলা-পদ্ধতির অবিরল প্রবাহিত, অভ্রষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাগত রূপ-ধারা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সেই অতি-প্রাচীন প্রাগ্-বৌদ্ধ যুগের চিত্র-শিল্প তাহার আদিম পদ্ধতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু বাংলার প্রতিভা যে সেই অসাধ্য-সাধনে সফল হইয়াছে, বাংলার দীন-দুঃখী পটুয়াগণের চিত্র-কলা তাহার জীবন্ত প্রমাণ।

ইহাদের বর্ত্তমান অতি শোচনীয় আর্থিক ও সামাজিক দুর্গতির মধ্যেও ইহারা উৎসাহ ও সুযোগ পাইলে এখনও বাংলার প্রাচীন নিজস্ব জাতীয় ধারা-অনুযায়ী রেখা ও বর্ণের অনুপম বলিষ্ঠতা, "চিত্রলেখা" পুস্তিকায়, "বঙ্গলক্ষ্মী" (কার্ত্তিক, ১৩৩৯, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০) পত্রিকায় এবং এই পুস্তকে প্রকাশিত বর্ত্তমান পটুয়াগণের অঙ্কিত চিত্রগুলিতে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পটুয়ার প্রাচীন ইতিহাস

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই মানুষ চিত্র লিখিয়া * আসিতেছে। ভারতবর্ষেও চিত্র-লিখন ও চিত্র-প্রদর্শন রীতি অতি প্রাচীন। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এই বিষয়ের প্রচুর উল্লেখ আছে।

বাণভট্টের হর্ষচরিত সপ্তম শতাব্দীর প্রথমপাদে রচিত হয়। সেখানে যমপট-ব্যবসায়ীর কথা লিখিত হইয়াছে—

রাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের পীড়ার কথা শুনিয়া হর্ষবর্দ্ধন শিকার হইতে ফিরিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—দোকানের পথে অনেকগুলি কৌতূহলী বালকদ্বারা পরিবৃত একজন যমপট্টিক বা যমপট-ব্যবসায়ী পট

*'চিত্রলেখা' শব্দটি বহু প্রাচীন। প্রাচীন ভারতে 'চিত্র' শব্দে অঙ্কিত ছবি ও ক্ষোদিত বা উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্য-শিল্প উভয়ই বুঝাইত। তখন তুলি দিয়া অঙ্কিত ছবিকে 'লেপ্য' চিত্র ও উৎকীর্ণ চিত্র হইতে বিশ্লিষ্ট করিবার জন্য 'লেখ্য' চিত্র, এবং ছবি অঙ্কন করাকে 'চিত্রলেখন' বলা হইত। বর্তমানে পটুয়াগণ 'চিত্রলেখা' কথাটির উপরি-উক্ত ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও 'পট আঁকা' না বলিয়া 'পট লেখা' বলিয়া থাকে। এই 'লেখা' কথাটি হইতেই তাহাদের সঙ্গে প্রাচীন চিত্রলেখকদের সংযোগ সহজেই অনুমান করা যায়। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে তাই চিত্রাঙ্কন না বলিয়া 'চিত্রলিখন' ব্যবহার করিয়াছি।

দেখাইতেছে। লম্বা লাঠিতে ঝুলানো পট বাঁ হাতে ধরিয়াছে, ডান হাতে একটা শরকাঠি দিয়া চিত্র দেখাইতেছে। ভীষণ মহিষারূঢ় প্রেতনাথ প্রধান মূর্ত্তি। আরো অনেক মূর্ত্তি আছে। যমপট্টিক গাহিতেছে—

মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
যুগে যুগে ব্যতীতানি কস্য তে কস্য বা ভবান্।।.....

বিশাখাদত্ত-প্রণীত সুবিখ্যাত মুদ্রারাক্ষস নাটক অষ্টম শতাব্দীতে রচিত বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। তাহাতেও যম-পটের উল্লেখ রহিয়াছে; যথা—

(নানাস্থান হইতে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাটলীপুত্রে ফিরিয়া চাণক্যের গৃহে প্রবেশ-মুখে)

চর— পণমহ জমস্স চলনে কিং কজ্জং দেহএহিং অণ্ণেহিং।
এসোক্খু অণ্ণভত্তাণং হরই জীঅং চডপডন্তং।।
অপি চ পুরিসস্স জীবিদব্বং বিসমাদো হোই ভত্তিগহিআদো।
মাবেই সব্বলোঅং জো তেণ জমেন জীআমো।।

জাব, এদং গেহং পরিসিঅ জমপডং দংসঅন্তো পবিসিঅ গীআইং গাআমি।

এতদ্ভিন্ন কালিদাসের (পঞ্চম শতাব্দী?) অভিজ্ঞান-শকুন্তলা এবং মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকদ্বয়ে, ভবভূতির (অষ্টম শতাব্দী) উত্তররামচরিত নাটকে চিত্র-লিখন ও চিত্র-দর্শনের বিশেষরূপ উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে পরাশরস্মৃতি, রূপগোস্বামীর বিদগ্ধ-মাধব নাটক ও গোপালভট্টের হরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থ হইতেও প্রাচীন সমাজে চিত্রানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

হর্ষরচিত ও মুদ্রারাক্ষসে যে যমপট্টিক অর্থাৎ যমপট-ব্যবসায়ীর উল্লেখ আছে, তাঁহারা সুদীর্ঘ পটের উপর ধর্ম্মরাজ যমের মূর্ত্তি এবং যমালয়ের নানা ভয়ঙ্কর দৃশ্য লিখিয়া গীতি-সহযোগে গৃহস্থ-বাড়িতে সেই পট দেখাইতেন। যমালয়ে পাপী যে নিদারুণ শাস্তি ভোগ করে, চক্ষের সম্মুখে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষকে পাপ ও অন্যায় হইতে বিরত করিবার উদ্দেশ্যে এই পটগুলি গীতি-সহযোগে প্রদর্শিত হইত। বাংলার পটুয়ারা অদ্যাপি এইরূপ যম-পট দেখাইয়া থাকে। এমন কি তাহাদের দেখাইবার প্রণালীও হর্ষচরিতে উল্লিখিত প্রণালীর অনুরূপ। গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে পটুয়াদের পট দেখাইবার একটি ভঙ্গির ফোটোগ্রাফ ছাপা হইল (পৃঃ ১৫)। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে গণ-শিল্প-প্রদর্শনীর উল্লেখ করিয়াছি, সেই সময়ে সুদূর পল্লী হইতে আগত একজন পটুয়া কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে গান গাহিয়া পট দেখাইয়াছিল, ফোটোগ্রাফটি সেই সময়ের। হর্ষচরিতের বর্ণনার সহিত লোকটির পট দেখাইবার ভঙ্গি হুবহু মিলিয়া যাইতেছে। হর্ষচরিতের আমলে পটের সঙ্গে

গান গাহিবার রীতি ছিল, এখনও আছে। এখন রাম অবতার, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি পটের শেষভাগে যম-পটের স্থান; কাজেই মূল-পালার শেষ অংশেই যমপটের গান থাকে। গ্রন্থের মধ্যে পাঠকেরা যমপট-সম্পর্কিত গান প্রচুর পরিমাণে পাইবেন।

অতএব সন্দেহ নাই, এই চিত্রকর জাতি সুপ্রাচীন। প্রাচীন কাল হইতে ইহারা চিত্র লিখিয়া লোকের মনোরঞ্জন এবং তাহাদের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়া আসিতেছে।

ছবিলাল চিত্রকরের বাস বীরভূমের পানুড়িয়া গ্রামে। তখন তাহার বয়স ষাট বৎসর। তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, কি করিয়া তাহাদের জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। পটুয়াজাতির উৎপত্তি সম্পর্কে যে কিংবদন্তী পুরুষপরম্পরাক্রমে চলিয়া অসিতেছে, নিরক্ষর বৃদ্ধ পটুয়া তাহা বলিতে লাগিল। তাহারই ভাষায় উহা অবিকল লিপিবদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে—

আমরা বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বটি, আমরা বাঙালীর ছেলে; কর্ম্মদোষে ছোট হ'য়ে পড়েছি।

আমাদের একটি পূর্ব্বপুরুষ মহাদেবের বিনা হুকুমে তাঁর ছবি এঁকে ফেলেছিল, তাতে তাঁর ভয় হ'ল যে মহাদেব হয়ত রাগ করবেন। তখন মহাদেব সে দিকে আসছিলেন। পাছে মহাদেব জানতে পারেন যে সেই ছবি সে-ই এঁকেছে, সে জন্যে সে তাড়াতাড়ি ছবি আঁকার তুলিটি মুখের ভিতর পুরে লুকিয়ে দেয়। তাতে তুলিটি সকড়ি হ'য়ে গেল।

তখন মহাদেব বললেন, তুলিটি সকড়ি কেন করলে?

সে বললে, ভয়ে।

মহাদেব বললেন, সে তুলিটা দুরে ফেলে না দিয়ে মুখে দিয়ে সকড়ি করে অন্যায় করেছে। তাই তিনি রাগ করে বললেন, তোরা এর জন্যে পতিত হ'লি। যা, তোরা ছোট হ'য়ে সমাজে থাক গে।

তারপর সব জ্ঞাতিরা কাঁদতে কাঁদতে এসে মহাদেবকে বললে—আমরা খাব কি ক'রে? তখন মহাদেব বললেন—তোরা হিন্দুও হবি না, মুসলমানও হবি না। তোরা মুসলমানের রীতি করবি আর হিন্দুর কর্ম করবি অর্থাৎ ছবি আঁকবি ও পড়বি।

সেই থেকে আমরা মুসলমানদের মত নমাজ পড়ি আর হিন্দুর মত দেব-দেবতার ছবি আঁকি ও সেই সব গান করি। আর আমাদের নামগুলি সব হিন্দুর মত— যেমন ভক্তি, হরেন্দ্র, নোঙ্গর, পঞ্চানন, সতীশচন্দ্র, গরীব, সমন্ত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের (একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী) দশম অধ্যায়ে চিত্রকর জাতির উৎপত্তির একটি কাহিনী পাওয়া যায়। তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত অশিক্ষিত পটুয়া-কথিত কিংবদন্তীর অনেক মিল আছে। ব্রাহ্মণবেশী ভগবান বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে গোপকন্যাবেশী অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রকর জাতির আদিপুরুষ জন্মলাভ করেন। বিশ্বকর্ম্মা ও ঘৃতাচীর পুত্র জন্মিয়াছিল

নয় জন :—তাঁহাদের নাম মালাকার (মালাকর), কর্মকার, শঙ্খকার, কুন্দিবক (তন্তুবায়), কুম্ভকার, কাংস্যকার, সূত্রধার, চিত্রকার (চিত্রকর) ও স্বর্ণকার। এই হিসাবে পটুয়ারা হিন্দুসমাজের অপর শিল্পী-শ্রেণীর সগোত্র তাহাদেরই মত সম্মানার্হ।

চিত্রকরেরা কি কারণে এই সম্মান হারাইয়া সমাজে হীন বলিয়া পরিগণিত হইল, ব্রহ্মকৈবর্ত্ত পুরাণে তাহারও উল্লেখ আছে। ইহারা ব্রাহ্মণ-নির্দ্দিষ্ট চিত্র-পদ্ধতির ব্যতিক্রম করিয়াছিল, তাই ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন; তখন হইতে ইহারা সমাজে পতিত হইল। কিংবদন্তীতেও অভিশাপের কাহিনী পাইতেছি। মহাদেবই হউন, আর ব্রাহ্মণই হউন—পুরাণ ও লোক-প্রবাদ উভয়ই স্বীকার করিতেছে, চিত্রলিখন কর্ম্মে তাহারা শাস্ত্রীয় রীতির বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। পরশুরামের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিও এই অনুমানের পোষকতা করিতেছে বলিয়া বোধ হয়—

ব্যতিক্রমেণ চিত্রাণাং সদ্যশ্চিত্রকরস্তথা।
পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোপতঃ।।

(চিত্রকর চিত্রসকলের ব্যতিক্রম করায় ব্রাহ্মণগণ-দ্বারা ক্রোধে শাপগ্রস্ত হইয়া সদ্যঃ পতিত হইয়াছে।)

পটুয়ার জাতিভ্রষ্টতা-সম্পর্কে একটি অনুমান

বাংলার গণজাতির হিন্দুধর্ম্মের রূপ চিরকালই শাস্ত্রীয় ব্রহ্মণ্যধর্মের রূপ হইতে পৃথক হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালীর স্বভাবতঃ অদম্য স্বাধীন আত্মা ধর্ম্মাচরণ-ক্ষেত্রে ও দেবমূর্ত্তি-পরিকল্পনার শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের খুঁটিনাটি দাসের মত মানিয়া লইতে পারে নাই; পরন্তু তাহার আত্মার নিজস্ব ভাব ও রসপ্রেরণা প্রসূত রূপে সে দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছে। তাই বাংলার গণজাতীয় রাধাকৃষ্ণ-রূপকল্পনা পুরাণের পরিকল্পনা হইতে পৃথক। তাহার রাম-লক্ষ্মণ-সীতার পরিকল্পনা বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের রামায়ণের পরিকল্পনা হইতে পৃথক, এবং তাহার শিবদুর্গার পরিকল্পনা শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক শিবদুর্গার পরিকল্পনা হইতে পৃথক।

গণজাতির প্রয়োজনের আহ্বানে ও স্বকীয় আত্মার অনুপ্রেরণার ফলে বাংলার জাতীয় শিল্পী পটুয়াগণ তাহাদের গীতিকায়, চিত্রে ও মৃণ্ময়ী প্রতিমা-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বাংলার নিজস্ব ভাব ও রসের ব্যঞ্জনাময় রূপ-কল্পনা করিতে সাহস প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মণসমাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়াছিল বলিয়াই যে তাহারা সমাজ হইতে ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক পতিত হইয়াছিল এইরূপ মনে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক ও সমাজ-কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইয়াও এই জাতীয় ভক্ত সাধক শিল্পীগণ

জাতীয় ভাবধারা ও রূপধারাকে যে বর্জ্জন করে নাই, ইহা বাংলার গণজাতীয় আত্মার দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতা-প্রিয়তারই প্রকৃষ্ট পরিচয়।

বাংলার জীবন ও সাহিত্যে পটগীতির স্থান

বাংলার জীবনে ও বাংলা সাহিত্যে পটগীতির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বাংলার অধ্যাত্মজীবনে সবর্বাপেক্ষা গভীর স্তরের ভাবধারা ও রসধারা এই পট-গীতিতে রূপায়ণ লাভ করিয়াছে—সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় ও ছন্দে। ইহা কোন অভিজাত সমাজের ভাববিলাসব্যঞ্জক সাহিত্য নয়—জাতির সাধারণ জনগণের প্রাণ যে অনাবিল ও বিলাস-কলুষহীন ভাবধারার ও কল্পনাধারার জীবন্ত প্রবাহে ভরপুর ছিল তাহার এবং বাঙালী হিন্দুর গভীর অন্তশ্চ রিত্রের ও ধর্ম্মবিশ্বাসের রসপূর্ণ অথচ সহজ স্বাভাবিক ও সরলতামাখা রূপায়ন।

বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলার আত্ম-সংস্কৃতির ও সভ্যতার মূল-উৎসের সন্ধান এই পটগীতি বা পটুয়া সঙ্গীতগুলিকে যেরূপ সহজ, সরল, সুস্পষ্ট ও অনাড়ম্বরভাবে পাওয়া যায়, সেরূপ আর কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

পটুয়া, পটচিত্র ও পটগীতির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ

অদ্যাবধি আমাদের দেশের শিল্পী ও কলারসিকগণ পটুয়াদিগের অঙ্কিত চিত্রের কেবলমাত্র চিত্র-হিসাবে মূল্য নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ প্রয়াস যে ভ্রমাত্মক তাহা এই চিত্রশিল্পের প্রকৃতির সম্বন্ধে সম্যক অনুধাবন করিলেই প্রতিপন্ন হইবে।

আজকাল শিল্পী বলিতে আমরা যাহা বুঝি, পশ্চিম-বাংলার পটুয়াগণ সেই শ্রেণীর শিল্পী নহে। ইহারা স্বকপোলকল্পিত অথবা আত্ম খেয়াল প্রসূত কোন বিষয়ের চিত্র লিখনের চেষ্টা করে নাই। জাতির গভীর অধ্যাত্ম-জীবনে যে ভাব-নদীর ধারা প্রবাহিত হইত, ইহারা সেই ভাব-ধারায় আপন আত্মাকে ওতঃপ্রোতভাবে পরিপ্লুত করিয়া একান্তভাবে তাহারই ভক্তসাধক হইয়া সেই ভাবধারা-সঞ্জাত রসাবলীর সহজ রূপ সৃষ্টি করিয়াছে—চিত্রে, কাব্যে ও সুরে। সুতরাং একাধারে ইহারা ভক্ত-সাধক, কবি, গায়ক ও চিত্র-শিল্পী—অর্থাৎ একদেশদর্শী শিল্পী নহে;আত্মার সুগভীর ভাবরসের ও ভক্তির, চিত্র-শিল্পের, কাব্যের ও সুরের স্রষ্টা ও সাধকরূপ পূর্ণাঙ্গ শিল্পী। জাতির অন্তরাত্মার গভীর ভাবরসের ও ভক্তির সরল ও একান্ত সাধন ব্যতীত ইহারা এই পূর্ণাঙ্গ শিল্প রচনা করিতে কদাপি সমর্থ হইত না।

ইহাদের রচিত গীতিকাব্যগুলি বাংলার হিন্দুজাতির গণ-সমাজের অধ্যাত্ম-জীবনের ধ্যানমন্ত্র-স্বরূপ। এই ধ্যানমন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া পটুয়াগণ তাহাদের সাহায্যে আপন আপন মনোমধ্যে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে রূপ কল্পনা করিয়া তুলিত;এবং সেই রূপ-পরিকল্পনা আপনা হইতেই তুলিকার টানে এবং রং-এর বিন্যাসে পটভূমিতে বিনা আয়াসে প্রতিফলিত হইয়া উঠিত। সুতরাং ইহাদের চিত্র-লিখনের প্রণালী ও উৎস বর্ত্তমান শিল্পীদের ধ্যানহীন আয়াস-সাধিত শিল্পসৃষ্টির প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নই ছিল। তাই যদিও আজকাল অনেক শিল্পী পটচিত্রের অনুকরণে চিত্র লিখনের চেষ্টা করেন, তথাপি সেগুলি প্রাণহীন বাহ্য রেখা ও রং-এর বিন্যাসেই পর্য্যবসিত হয়—ধ্যানলব্ধ রূপ-কল্পনা প্রতিফলনের সজীবতা, সরসতা ও শিষ্টতা লাভ করিতে সফল হয় না; জাতির আত্মার গভীরতম ভাবরসের জীবন্ত রূপায়ণ দান করিতে পারে না।

পটগীতি ও পটচিত্রের জাতীয় স্ব-ভাব ও স্ব-ধারাগত রূপ

আয়াসলব্ধ ও অনুকরণগত নয় বলিয়া বাংলার এই ভক্তসাধক শিল্পীদের গীতিকাব্যের ভাব ও ভাষা এবং পটচিত্রের ধারা বাঙ্গালী জাতির আত্মার স্ব-ভাব ও স্ব-ধারায় গঠিত এবং একান্তভাবে বিজাতীয়তা-দোষ-বর্জ্জিত। বস্তুতঃ জাতির আত্মা-সংস্কৃতির দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে এই পটগীতি ও পটচিত্রগুলি সম্যগ্‌ভাবে বাংলার স্বাধীন শিল্প ও বাংলার আত্মার চিরন্তন স্বাধীনতা-পরায়ণতার প্রকৃষ্ট ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত নিদর্শন।

বাঙ্গালীর জীবনকে আবার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইলে বাংলার মানুষকে ও শিল্পীদিগকে এই জাতির স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারার সাধনা করিতে হইবে। এই দিক দিয়ে দেখিতে গেলে জাতির ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পটগীতি ও পটচিত্রের মূল্য অসীম ও অতুলনীয়।

পটচিত্র ও পটগীতির পরস্পর সহযোগিতা

পটচিত্রগুলি পটগীতির হুবহু প্রতিকৃতি-মূলকভাবে রচিত হয় নাই;আবার পটগীতিগুলিও পটচিত্রের হুবহু বর্ণনাত্মক নহে। বস্তুতঃ ইহারা একে অন্যের পরিপোষক। চিত্রে যাহা রূপায়িত হইয়াছে, শিল্পীগণ গীতিকায় তাহার বর্ণনা না করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ভাব ও রসের অভিব্যঞ্জনা করিয়াছে এবং এক চিত্র হইতে অপর চিত্রের বিষয়-বস্তুতে উপনীত হইবার পথে মধ্যবর্ত্তী ভাব ও ঘটনার রসাত্মক বর্ণনা করিয়াছে। গীতিকায় যাহা উহ্য, তাহার অভিব্যঞ্জনা দেওয়া হইয়াছে চিত্রে; আবার চিত্রে যাহা উহ্য, তাহার অভিব্যঞ্জনা দেওয়া হইয়াছে গীতিকায়।

জাতির গণ-সমাজের সাধারণ ভাষাকে পটুয়া-শিল্পীগণ আড়ম্বরহীনভাবে কাব্যে রূপ দিয়াছে। কোন কষ্টকল্পিত বা আয়াসসাধ্য অলঙ্কারের বালাই ইহাতে নাই, অথচ অন্তরের ভাবের প্রাচুর্য্যের ও ভক্তির একনিষ্ঠ প্রবাহের ফলে এই গীতিকাগুলি সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত রসসম্পদে ভরপুর। এই সকল গুণাবলীর বিদ্যমানতার ফলে বাংলার গণ-সাহিত্যে পটুয়া-গীতি গৌরবময় স্থান লাভ করিবে।

বাঙালীর জীবনের নিখুঁত রূপ

কি কৃষ্ণলীলা কাব্যে, কি রামলীলা কাব্যে, কি শিবের শঙ্খপরানো কাব্যে, কি শিবের মাছধরা কাব্যে, কি গো-পালন কাব্যে বাংলার স্ত্রী-পুরুষের ও বাংলার জীবনের এক-একটি নিখুঁত প্রতিকৃতি রচিত হইয়াছে। শিল্পীর জাতীয় ভাব তাহাকে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ ইত্যাদির কেবলমাত্র অনুকরণে বিরত করিয়াছে। শিল্পী জাতির মজ্জাগত আদর্শগুলিকে আপন জাতীয় স্ব-ভাবের ও স্ব-রূপের ছাপ দিয়া সম্পূর্ণ নব সৃষ্টিময় শিল্প রচনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম, দর্শন ও পুরাণের মূল তত্ত্বগুলি যে বাঙালী হিন্দুসমাজের গণ-জীবনে অতি সহজভাবে অনুসঞ্চারিত হইয়া দৈনন্দিন ভাব ও চিন্তাধারার অঙ্গীভূত হইয়াছিল, তাহার একটি বিশেষ পরিচয় আমরা এই পটুয়া সঙ্গীতের মধ্যে পাই। তথাকথিত অশিক্ষিত পটুয়া-রচিত সঙ্গীতগুলিতে দার্শনিক ও পৌরাণিক তত্ত্বগুলি অবলীলাক্রমে মিশিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার ও পদাবলীর সঙ্গে কোথাও কোথাও সামঞ্জস্য থাকিলেও বৈষ্ণব কবিতায় ও পদাবলীর যে আড়ম্বরপূর্ণ ভাব-বিলাসিতার উদাহরণ পাওয়া যায়, পটুয়া-গীতিতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হইবে। পটুয়া-শিল্পীর বৃন্দাবন বাংলাদেশে, অযোধ্যা বাংলাদেশে, শিবের কৈলাস বাংলাদেশে, তাহার কৃষ্ণ, রাধা, গোপ-গোপীগণ সম্পূর্ণ বাঙালী। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বাঙ্গালী, শিব ও পার্ব্বতীও পুরা বাঙ্গালী। বড়াই বুড়ীর ছবি বাঙ্গালী ঠাকুরমা ও দিদিমার নিখুঁত রসময় প্রতিমূর্ত্তি। রামের বিবাহ হইয়াছে ছাতনাতলায়। পার্ব্বতীর কাছে সব অলঙ্কার হইতে শাঁখার মর্য্যাদা ও আদর বেশী।

এই জাতীয় শিল্পীগণের ধ্যানে দেবতাগণও বাঙ্গালী রূপ ছাড়া অন্য রূপ ধরিয়া থাকিতে সমর্থ হন নাই। বাঙ্গালীর সাধারণ জীবনকে দেবভাবে পরিকল্পিত করিয়া ইহারা জাতির আত্মাকে পরম্ গৌরবদান করিয়াছে। তাই বাংলার ঘরে ঘরে ও দ্বারে দ্বারে সাধারণ নরনারীর ও বালক-বালিকার কাছে বৎসরের পর বৎসর প্রদর্শিত এই চিত্রসম্পদ ও বৎসরের পর বৎসর গীত এই গীতিকা-সম্পদ্ বাংলার গণ-শিক্ষার ও গণ-সংস্কৃতির

এক অমূল্য ও অতুলনীয় প্রণালীস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল এবং বাংলার আবালবৃদ্ধ বনিতার জীবনকে এক অদ্ভুত আনন্দ-রসময় জগতের সন্ধান দিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বাংলার লোক বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার দাসত্ব হইতে আপন আত্মাকে মুক্ত করিয়া যে কোন অধ্যাত্ম আদর্শই গ্রহণ করুক না কেন, জাতির গণ-সমাজের কোটি কোটি নরনারীর জীবনকে প্রকৃত শিক্ষা ও প্রকৃত সংস্কৃতিতে পূর্ণ করিতে হইলে বাংলার পটুয়া-শিল্পীর অতুলনীয় শিল্প-প্রণালীরই অনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

পটুয়াদের অঙ্কিত চিত্রশিল্পের মূল্য

দেশ-বিদেশের অন্যান্য বিখ্যাত অতি-মার্জিত চিত্রপদ্ধতির ন্যায় বাংলার এই নিজস্ব চিত্রপদ্ধতি বিশ্বমানবের আদিম যুগের সরল ভাব, পৌরুষের ভাব, অকৃত্রিমতার ভাব এবং সজীবতা, সরসতা ও তেজস্বিতার ভাব হারায় নাই। এক দিকে যেমন এই সকল গুণ ইহাতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তেমনি আবার এই মুক্ত ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহা অন্যান্য আধুনিক মার্জিত চিত্রকলা-পদ্ধতির সমতুল অথবা তদধিকভাবে লাবণ্য ও লালিত্য যোজনা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাতে অতি-বিলাসিতার, অতি-আলঙ্কারিকতার ও অতি-সাম্প্রদায়িকতার মুদ্রা-দোষের অথবা কোনরূপ আড়ষ্টতা-দোষের ছাপ পড়ে নাই। এই চিত্রকলার ভাষার অক্ষর-প্রকরণ অতি স্বল্প ও সহজ। ইহা কেবল রেখার সতেজ, সুনিপুণ, প্রখর ও ভাবব্যঞ্জক প্রয়োগ এবং অল্প কয়েকটি প্রাথমিক বর্ণের অমিশ্র ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। ইহার ভাষার ব্যাকরণ অতি সহজ ও অতি প্রাঞ্জল। পরিপ্রেক্ষিতের মাপকাঠির খুঁটিনাটি ও আলোছায়ার লীলাখেলার চাতুরতা ও বাহুল্য মিশাইয়া ইহা কখনও আপনার ব্যাকরণকে অযথা জটিল কবিয়া তুলিবার প্রয়াস করে নাই। ইহার আকারবিন্যাস এবং বর্ণসমাবেশ ও সমন্বয় অতিশোভন ও অনিন্দ্যসুন্দর। আলঙ্কারিকতার চূড়ান্ত কৌশলও যে এই চিত্রকরগণ প্রদর্শন করিতে পারে, তাহারও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই সকল প্রাচীন পট হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলায় কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে রূপকল্পনার বিলাসিতার অযথা বাড়াবাড়ি নাই, অথচ ইহা রসপ্রাচুর্য্যে ভরপুর। ইহাতে অঙ্কিত মনুষ্যগণের আকৃতি ও হাবভাব সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিমতা ও মুদ্রা-দোষ-বিহীন এবং সাধারণ মানুষের সহজ ও জীবন্ত ভাবে পরিপূর্ণ। এক দিকে বাংলার এই পল্লী-শিল্পীদের জীবজন্তু-অঙ্কনের ক্ষমতা যেমন অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক, তেমনি অপর দিকে মানুষের অন্তরতম মনোভাবের অবিকল ব্যঞ্জনা তুলির অবলীলাময় টানে ফুটাইয়া তুলিতেও ইহাদের ক্ষমতা অদ্বিতীয়। বৃক্ষলতাদির পত্রের অঙ্কনের অতি

চমৎকার ও মনোহর আলঙ্কারিক রীতিও এই চিত্রপটগুলির ও এই চিত্রকরদের একটি অন্যতম বিশেষত্ব। এইসকল চিত্রপটে এক দিকে পুরুষ-দেহের বীরোচিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও ভাব-ভঙ্গীর অঙ্কন-প্রণালী ও অপর দিকে নারীদেহের লীলায়িত রূপলাবণ্য-মাধুরীর বিচিত্র অঙ্কন-কৌশলের স্বভাবজাত সমাবেশ দেখিয়া অবাক হইতে হয়। অনুকরণ-মূলক অঙ্কনবাহুল্য বর্জন করিয়া ইঙ্গিতে ভাবের ও রসের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনাশক্তি এই সকল চিত্রপটের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার একটি চিত্রেও কোনরকম ভাবের অপরিস্ফুটতা অথবা ধোঁয়াটে ধরণ নাই। চিত্রে অতিপরিস্ফুটভাবে কাহিনী বিবৃত করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই চিত্রকলাপদ্ধতি ভারতের আদিমযুগ হইতে পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে। রামপটে অঙ্কিত কর্ম্মযোগমূলক পৌরুষ-কাহিনীর ইতিহাস ও প্রাচীনভারতের পারিবারিক জীবন-প্রণালী, শক্তিপটে অঙ্কিত গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানমূলক দার্শনিক সত্য, এবং কৃষ্ণপটের আধ্যাত্মিক প্রেমমূলক ভাব-তরঙ্গ—বাংলার এইসকল প্রাচীন শিল্পীগণ অতি সরল ও সহজভাবে সাধারণের বোধগম্য করিয়া চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়াছে এবং উহাদিগকে অসাধারণ ভাবব্যঞ্জক অনিন্দ্যসুন্দর রূপ প্রদান করিয়া তাহাদের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। সবের্বাপরি বাংলার পল্লীগ্রামের সরল প্রকৃতির স্ত্রী-পুরুষগণের চরিত্রের একটি অনির্বচনীয় ও অতুলনীয় নিজস্ব মাধুর্য্যরসে এইসকল চিত্রপটের রেখা, বর্ণ ও রূপকল্পনা ওতঃপ্রোতভাবে পরিপ্লাবিত।

বাংলার এই প্রাচীন চিত্র-শিল্পীগণ রস-শিল্পের সঙ্গে ধর্ম্মের যে ঘনিষ্ঠ ও অটুট সম্বন্ধ তাহা কখনও ভুলিয়া যায় নাই; এবং উহা মানুষের মনে অবিরত জাগাইয়া দিবার জন্য প্রত্যেক চিত্রপটের শেষভাগে যমরাজার সভায় চিত্রগুপ্তের অভ্রান্ত খাতার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া এবং যমরাজার অনুশাসনে ধর্ম্মের অন্তিম জয় ও অধর্ম্মের অন্তিম পরাজয়ের কাহিনী অতিজ্বলন্তভাবে বিবৃত করিয়া সমাজে ধর্ম্মভাবের প্রচলন বজায় রাখিবার অমূল্য সহায়তা করিয়াছে।

পটচিত্রের নমুনা

বর্ত্তমান গ্রন্থে পটচিত্রের একখানি রঙ্গীন ও আটখানি একরঙ্গা আলোকচিত্র প্রকাশিত হইল। মূল-চিত্রের সবগুলিই বহুবর্ণ চিত্র; লীলায়িত রেখার সঙ্গে নানা রং-এর অতি মনোহর ও রসপূর্ণ সমাবেশ এই শ্রেণীর চিত্রগুলিকে শিল্প-হিসাবে অতি গৌরবময় বৈশিষ্ট্য দান করে। সুতরাং একরঙ্গা আলোকচিত্র হইতে মূল-চিত্রের শিল্প-সম্পদের ও রস-সম্পদের অতি অল্প আভাসই পাওয়া যায়। বহুচিত্র দীর্ঘপটের যে বিপুল সংগ্রহ আমার আছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পটচিত্রগুলির প্রতিচ্ছবি এই গ্রন্থে দেওয়া সম্ভব হয়

নাই। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রঙ্গিন ছবিগুলির নমুনা আমার লিখিত প্রবন্ধের সহিত 'জার্নেল অব দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' (Journal of the Indian Society of Oriental Art) এবং 'রূপলেখা' পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। পাঠকগণ সেইগুলি দেখিয়া পটুয়াদের চিত্রশিল্প-প্রতিভার অপেক্ষাকৃত পূর্ণ রূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

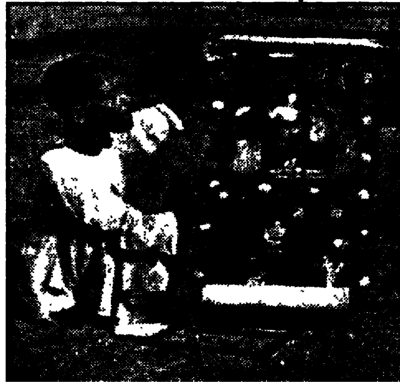
পটগীতির শ্রেণীবিভাগ ও প্রকৃতি

পটগীতিগুলি সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়;যথা—(১) লীলা-কাহিনী—কৃষ্ণ-লীলা, রাম-লীলা, গৌরাঙ্গ-লীলা, শিবপার্ব্বতী-লীলা। (২) পাঁচ-কল্যাণী—এগুলি বিশেষ কোন লীলাকাহিনী বা আখ্যায়িকা-অবলম্বনে রচিত নয়। নানা দেবদেবী-সম্বন্ধে ছড়ার পাঁচমিশালি সমাবেশ। (৩) গোপালন-বিষয়ক গীতিকা। কৃষ্ণ-লীলা, রাম-লীলা ও গৌরাঙ্গ-লীলা গীতিকার রচনাপ্রণালীর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। পটুয়াগণ সমস্ত আখ্যায়িকার বিবরণ দিবার চেষ্টা করে নাই, আখ্যায়িকার যে ঘটনাগুলিতে বিশেষ করিয়া গভীর ভক্তিরস, প্রেমরস, বাৎসল্যরস অথবা দাম্পত্যরসের সমাবেশ আছে, সেইগুলিকে তাহারা বাছিয়া লইয়া ঐ রসগুলি নিবিড়ভাবে কাব্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। জাতীয় সংস্কৃতির অংশরূপে কাহিনীগুলি মোটামুটিভাবে জাতির সমগ্র জনগণের মনোরাজ্যের সাধারণ পটভূমিতে যে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা তাহারা ধরিয়া লইয়াছে। তাই কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কেবলমাত্র গভীর রসপূর্ণ ঘটনাগুলিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদের অঙ্কিত চিত্রের এবং তাহাদের রচিত কাব্যের ও গীতের দ্বারা এইগুলির উপরই বিশেষ করিয়া উজ্জ্বল ও রঙ্গিন আলোকসম্পাত করিয়াছে; এবং এই ঘটনাগুলির অনুভূতিকে জাতির জনগণের মনোজগতে বৎসরের পর বৎসর নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিয়া জাতির সাধারণ জনগণের জীবনকে অনুপ্রাণিত এবং একটি সম-সংস্কৃতির ঐক্যসূত্রে যুক্ত করিয়া রাখিবার অমূল্য সহায়তা করিয়াছে।

শিব-পার্ব্বতীর লীলাকে বাংলার চিত্রকরগণ বাংলার পারিবারিক ও দাম্পত্য-জীবনের অনুরূপ করিয়া রচনা করিয়াছে। শিবকে তাহারা চিত্রিত করিয়াছে বাংলার গৃহস্বামীরূপে, এবং পার্ব্বতীকে চিত্রিত করিয়াছে বাংলার সাধারণ গৃহিণীরূপে। শিব ও দুর্গাকে তাহারা শাস্ত্রীয় রূপ দিযা জাতির সাধারণ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন অতিদূরের জিনিষ করিয়া দেখে নাই, অথবা অভিজাত-সমাজের গৃহস্থ ও গৃহিণীর বিলাসী রূপ দেয় নাই। দুর্গাকে বাগ্দিনীর রূপে চিত্রিত করিতে তাহারা সাহস করিয়াছে। তাহাদের স্বভাবজাত অসাধারণ কবিত্ব-প্রতিভার ফলে তাহারা দেখাইতে পারিয়াছে যে, বাগ্দীর মেয়ে সমাজের চক্ষে ঘৃণ্য ও

অস্পৃশ্য হইলেও বাস্তবিক পক্ষে ভগবতীরই অংশ;এবং প্রকৃত কবির ও স্পষ্টদর্শীর চক্ষে সকল সম্প্রদায়ের নারীর মধ্যেই ভগবতীর রূপ সমানভাবে বিরাজিত। বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের মর্য্যাদার অতুলনীয় চিত্রণ এই সঙ্গীতগুলির একটি বৈশিষ্ট্য। শিবদুর্গার লীলাচিত্রের বর্ণনার ছলে বাংলার সাধারণ গৃহস্থদম্পতীর জীবনের নিবিড় কৌতুক-রসাত্মক দিকটা পটুয়াগণ তাহাদের সহজ কবিত্বশক্তির মধ্য দিয়া অতি সুন্দর অথচ সহজ বর্ণনা করিয়াছে। বাংলার কৌতুক-রসসাহিত্যে ইহা উচ্চস্থান লাভের যোগ্য। 'চাষ-পালা' গীতিকার মধ্যে মহাশক্তির পরিচালনায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বীজের সাহায্যে ভীমের প্রয়োগে পৃথিবীর সৃষ্টি একটি অনুপম সৌন্দর্য্যময় পরিকল্পনা। 'গো-পালন' গীতিগুলিতে কপিলার মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইতে প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ এবং পরে মনুষ্যজাতির সেবার জন্য দেবগণের সনির্ব্বন্ধ মিনতিতে স্বীকৃত হইবার করুণ কাহিনী পড়িয়া পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হইবে; এবং গো-জাতির প্রতি হিন্দুর ভক্তির মূল-উৎস যে কোথায় তাহার সহজ ও সরল নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে। আজকালকার নব সভ্যতার ফলে গো-জাতির প্রতি বাংলার শিক্ষিতা নারীদের অবজ্ঞা ও নির্দ্দয়তাপূর্ণ ব্যবহারের যে নির্ম্মম চিত্র পটুয়াগণ অঙ্কিত করিয়াছে, এবং তাহার কঠোর শাস্তির যে কবিত্বময় নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহা হইতে পরিচয় পাওয়া যাইবে যে, এই পটুয়াগণ কেবলমাত্র ভক্ত, সাধক বা ভাবুক কবি নহে, পরন্তু নির্ভীক ও স্পষ্টভাষী সমাজ-সংস্কারক।

জাতির মনোরাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শগুলি পটুয়াগণ অপরিসীম নিষ্ঠা ও ভক্তিপূর্ণ সাধনার দ্বারা সঙ্গীত ও চিত্রে রূপায়িত করিয়াছে এবং উহাদের ভিতর দিয়া জাতীয় জীবনকে গভীর অধ্যাত্ম আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে।



পটুয়া সঙ্গীত

(১)

কৃষ্ণের অবতার

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়
গিন্নির পাপে গিরস্ত নষ্ট ঘরের লক্ষ্মী উড়ে যায়।
মহারাজের দেশে দেখ জল নাইক হ'ল   শনি-বিগ্রহ
রাজার প্রজাগণ কষ্ট পেয়ে পলাইতে লাগিল।
নারদ মুনি কইছে শুনেন মহাশয়
শনিকে বধিলে পরে তবে জল হয়।
রথ ঘোড়া পিড়া সারথি সাজিয়ে
মহারাজ শনিকে বধিতে চলিলেন।
যত তত মারেন বাণ শনির উপরে.
কংস রাজার দেশে হরির নাম যেবা লিবে

১-২ অনুরূপ উক্তি—৩।৪ শত বৎসর পূবের্বকার কুমিল্লা অঞ্চলে অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ রচিত "মাণিক চন্দ্রের গানে" আছে—

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট ভাবি চাহ মনে।
স্ত্রীহ্ন পাপে গ্রিহ লক্ষ্মী পলাএ আপনে।।

২ গিরস্ত—গৃহস্থ।
১০ লিবে—লইবে।

▸▸ *"পটুয়া সঙ্গীত" জুলাই ১৯৩৯*

কংস-শাসন—

হাতে বেড়ী পায়ে বেড়ী বক্ষঃস্থলে পাষাণ চাপা দিবে।

বসু-দৈবকীর প্রতি স্বপ্ন—গর্ভবাস

কোথা ছিলেন বসু-দৈবকিনী হরির নাম যে লিয়াছে।
শ্বেত মাছির রূপ ধারণ করে নারায়ণ দেখায় স্বপন
তোমার গর্ভে তিলেক দাওগা ঠাঁই।
ছয় পুত্র হলরে বাপ কংস রাজা মেরেছে কাছিড়ে
এক পুত্র হয়ে কিবা ভাগ্য হবে।
এক মাস দুই মাস মায়ের হইল কানাকানি
তৃতীয় পঞ্চম মাসের সময় হ'ল জানাজানি।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম—যমুনা পার—সন্তান-পরিবর্ত্তন

দশ মাস দশ দিন মায়ের শুভ পূর্ণ হ'ল
বসুমতী দাইমা হয়ে নিজে কৃষ্ণকে কোলে কোরে নিল।
আঁওয়ালে জাঁওয়ালে দিচ্ছেন বসুদেবের কোলে
বসুদেব লুকাইতে চলল নন্দালয়ে নন্দঘোষের ঘরে।
কৃষ্টকে দেখে যমুনা উথলে উঠিল
ভগবতী শৃগাল-মূর্ত্তি হয়ে যমুনা পার হ'ল।
দশ মাস দশ দিন ছিলেন মায়েরি উদরে
আমার গর্ভে চান করেন ঠাকুর ভাগ্য হোক মোর।
এক কন্যা হয়েছে রাজা ভিক্ষা দাও মোরে
কিবা কন্যা কিবা পুত্র মারগা রজক-পাথরের উপরে।
হাতে হাতে ভগবতী স্বর্গ উড়ে গেল।
আমাকে যে মেলি বেটা কংস দুরাচার
তোকে যে মারিবে বেটা গোকুলে আছে ধর।
একে ত রাজার ভগ্নী পূতনা স্তনে বিষ মেখে গমন করিল
সই সই বলে যখন সম্বন্ধ করিল
অন্তরযামিনী ঠাকুর সবই জানিল।

১৪ দাওগা—(অনুরূপ উক্তি—করগা, খাওগা ইত্যাদি)।

১৫ কাছিড়ে—আছাড় মারিয়া।

১৭ কানাকানি—(এক কান হইতে অপর কান অর্থাৎ) গোপনে জানাজানি। ১৯ শুভ—গর্ভ।

২১ আঁওয়ালে জাঁওয়ালে—(আঁওল = The Foetus, জরায়ু বা গর্ভকোষ);জন্মিবামাত্রই শিশুকে অপরিষ্কৃত অবস্থায় বসুদেবের কোলে দিলেন।

৩৩ সম্বন্ধ করিল—আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা করিল। ৩৪ অন্তরযামিনী—অন্তর্য্যামী।

"কোহা" "কোহা" করে যখন কেঁদে যে উঠিল
দেখুন পূতনার কোলে দিল।
এক চুমুক, দুই চুমুক, তৃতীয় চুমুকের বেলায় পূতনা বধ হ'ল।
পূতনা ম'ল ভালই হ'ল শব্দ গেল দূরে — পূতনা-বধ
পূতনা পড়ে রইল চৌদ্দ ভুবন পর্ব্বত সমান জুড়ে।
কৃষ্ণের জন্ম শুনে দেব দেবতাগণ বড় আনন্দিত হইল।
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র — জন্মোৎসব
গোকুলে গোপাল নাচে পাইয়ে গোবিন্দ। — বা নন্দোৎসব
কি আনন্দ হলরে ভাই গোকুল নগরে
নন্দের ঘরে নন্দোচ্ছ্ব
নন্দের মাথায় দধি দুগ্ধ ছানা মাখন ঢালিল।
খোল বাজে করতাল বাজে মৃদঙ্গ বাজে হাতে
বাকুমুরারি বাজে সখীগণের মুখে।
চারি ধারে সখীগণ মধ্যে শ্যামরায়
ঢলে ঢলে পড়েন দেখ রমণীদের গায়।

---

৩৭ বেলায়—সময়ে (বা বারে)।

৩৯ চৌদ্দভুবন—(ভুবন—ভূলোক, ভুবর্লোক প্রভৃতি সপ্ত স্বর্গ এবং অতল, বিতল প্রভৃতি সপ্ত পাতাল—এই চতুর্দ্দশ ভুবন। এই চৌদ্দ ভুবন জুড়িয়া অতি বিরাট্ পর্ব্বতের মত।

৪০-৪৬ কৃষ্ণের জন্ম শুনে ইত্যাদি—চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালের বৈষ্ণব কবি শিবাই দাস বা শিবানন্দ রচিত এতদ্বিষয়ে যে পদ অবলম্বনে এই ছত্রগুলি রচিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন।।
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ।।
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইঞা।
হাতে নড়ি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া।।
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল।।

৪৭ বাকুমুরারি—বাঁকা মুরলী।

অনুরূপ— 'বাঁকুয়া পাঁচনী হাতে রাঙ্গিয়া রাখাল সাথে
বাহিব হৈল রোহিণী-নন্দন।' (জ্ঞানদাস)

বৃন্দাবনের মধ্যে তরুলতা এড়িবেড়ি যায়
ভোমরা ভোমরী তায় হরিগুণ গায়।
খেলা-রসে ছিলেন কানাই সুপলেরি সনে

বস্ত্রহরণ

হরিবে গোপীগণের বস্ত্র তাই প'ড়ে গেল মনে।
বস্ত্র দাও ঠাকুর পরিধান করি
শুকনো বস্ত্র পরে বুঝি নাম রাখিব কালী।
কালী কালী বলিস্ না গো শুন গোয়ালার ঝি
বিধাতা করেছেন কালো আমার সাধ্য কি?
বস্ত্র যদি না দিয়ো ঠাকুর যাব কংস রাজার ঠাঁই
কংসেরি তাপে ঠাকুরের জাতি কুল নাই।
বারে বারে দিস্ না তোরা কংসের তুলনা
অবোধ কালে বধেছিলাম কংসের ভগিনী পূতনা।
গাছ হতে নাম ঠাকুর পেড়ে দাও ফুল
ডাল ভেঙ্গে প'ড়ে মরবে শূন্য হয় গোকুল।
ডাল বেড়ি যখন বস্ত্র পেড়ে দিল

বড়াই বুড়ীর মথুরা-যাত্রা —মথুরায় বিকিকিনি

দৌড়াদৌড়ি করে সখীরা তখন নগরে চলে গেল।
সাজ সাজ ব'লে বড়াই নগরে দিলে সাড়া
বড়াই বুড়ীর বাত্রা পেয়ে নগরে দিল সাড়া।
কেউ করলে রস-বিল্যেস কেউ সাজালেন দধির পশরা।
নন্দ গেল বাথানে যশোদা গেলেন জলে

---

৫২ সুপলেরি—সুবল নামক শ্রীকৃষ্ণের সখা।

৫৮ ঠাঁই—স্থান বা নিকট।

৫৯ তাপে—প্রতাপে, দৌরাত্ম্যে।

৬৭ বড়াই বুড়ী—(= বড় + আই) মাতামহী (মায়ের পিসীমা)—ইঁহারই তত্ত্বধানে শ্রীমতী প্রভৃতি গোপীবৃন্দ মথুরার হাটে দধিদুগ্ধাদি বিকিকিনি করিতে যাইতেছেন।

বাত্রা—বার্ত্তা বা সংবাদ।

৬৮ রস-বিল্যেস—রস-বিন্যাস।

পশরা—পসার ও পণ্যদ্রব্য (সং—প্রসার)।

৬৯-৭০—অনুরূপ বৈষ্ণব পদ ঃ—

যমুনার জলে গেলা যশোদা রোহিণী।
শূন্য ঘর পাঞা লুটে এ ক্ষীর নবনী।। —ঘনরাম দাস।

৬৯ বাথানে—গ্রামের বাহিরে যে স্থলে গরুর পাল একত্র হয়।

খালি ঘর পেয়ে দুষ্টু ছেলে ননী চুরি করে
নন্দরাণী দেখতে পেয়ে বান্ধেন যুগল করে। ননী-চুরি লীলা
বেঁধো না মা নন্দরাণী বন্ধন-জ্বালায় মরি
হাতেরি মুরারি বেচে দিব ননীর কড়ি।
সখীরা বলে আমরা যে মথুরা যাব ভার কে বয়াবে শ্রীকৃষ্ণের ভারবহন
জগদীশ্বর হরি আছেন তিনি ভাব বয়াবেন।
শুভ শুবন্যার ভার দিলেন বেলল্যা পাটের শিকা
কৃষ্ণের কাঁধে লয়ে ভার চলিলেন রাধিকা।
ঠাকুর বললেন আমি ত ভার বয়াই নাই জগতেরি সার
শ্রীরাধিকার প্রেমের জন্য কান্ধে বয়াই ভার।
জলে কৃষ্ণ থলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহীমণ্ডলে
একা কৃষ্ণ নাম ধরেন জগতসংসারে।
বড় ঘর, মা, বড় দুয়ার, বড় কর আশা
সকল দর্ব্ব্য পড়ে রইবে গঙ্গার তীরে বাসা।

(বালিয়া-নিবাসী ত্রিলোকতারিণী চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

---

৭৩ কড়ি—মূল্য। ৭৪ বয়াবে—বহন করাইবে।
৭৬ শুবন্যার—সুবর্ণের।
শিকা—দড়িতে বোনা ঝোলা বা রজ্জুনির্মিত আধারবিশেষ।
অনুরূপ— 'চণ্ডিকা বলেন বাছা লহ শিকা ভার' (কঃ কঃ চণ্ডী, ২১৪ পৃঃ)
'সিকিয়া বাঁকুয়ে দিব দুইটা জলর হাঁড়ি'
—(মাণিকচন্দ্র রাজার গান)

বেলল্যা পাটের শিকা—
(বিল্ল = জলাভূমি) জলাভূমিতে উৎপন্ন এক প্রকার পাট হইতে প্রস্তুত শিকা। চণ্ডীদাস-প্রণীত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন' গ্রন্থে নালিচা পাটের শিকার কথা উল্লেখ আছে—

নালিচা কটিআঁ কাহ্নাঞিঁ মাঝ জলে থুইল।
বার পহর হরিলেঁ তাহাক তুলিল।।
সুখায়িআঁ বাছিআঁ পাট করিল দুসর।
চারিগুণ দড়ি পাকাইল দামোদর।।
সুদৃঢ় বন্ধনে কৈল দুই সিকিআ।
তলত গাঁথিল আর দুওটি বেড়ুয়া।।
বাঁহুক যোড়িআঁ গেলা যমুনার পারে।
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলী-বরে।

৭৯ বয়াই—বহন করি। ৮৩ দর্ব্ব্য—দ্রব্য

(২)

কৃষ্ণলীলা

ভূমিকা — হরি বিনে বৃন্দাবনে আর কি ব্রজের শোভা আছে
জলে কৃষ্ণ স্থলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহীমণ্ডলে।
একা কৃষ্ণ নাম ধরে জগতসংসারে
বাঁকা মুরারি বাজে গোপীগণের মুখে।
খোল বাজে মৃদঙ্গ বাজে বাজে করতাল
নৃত্য — তার মধ্যে নৃত্য করে মদনগোপাল।
দুই ধারেতে দুই সখীগণ মধ্যে শ্যামরায়
ঢলে ঢলে পড়ে গো সখী রমণীদের গায়।
কেও নাচে কেও বাজায় কেও দিচ্ছে তুড়ি
বৃন্দাবনের মাঝে নিতাই বলেন হরি হরি।
পাহাড়ে বস্ত্র লয়ে গোপীগণ স্নানে নামিল
একে একে গোপীর বস্ত্র চুরি করে ডালেতে বাঁধিল।
বস্ত্র-হরণ — ঝড় নাই জল নাই বস্ত্র কেবা হরে
নিলর্জ্জ চোরা কালা বসন চুরি করে।
বস্ত্র দাও প্রাণবন্ধু কাপড় দাও হে পরি
শুকন বস্ত্র পরে নাম রাখব কালী।
কালী কালী বলো না শোন গোয়ালার ঝি
বিধাতা করেছেন কালো আমার সাধ্য কি?
কাপড় যদি না দিবি কানাই যাব কংস রাজার ঠাঁই
কংসের তাপেতে গোপীদের জাতি কুল নাই।

৯ তুড়ি—অঙ্গুলীর ধবনি।
১১ পাহাড়ে—পুষ্করিণীর চতুস্পার্শ্বস্থ উচ্চ তীরভূমি।
১৫ পরি—পরিধান করি।
১৫-২৪—১ (৫৪-৬৫) দ্রষ্টব্য।
১৬ পরে—পরিধান করিয়া।
২০ তাপ—দৌরাত্ম্য।

গাছ হতে নাম ঠাকুর পেড়ে দাও ফুল
ডাল ভেঙ্গে প'ড়ে মরবে শূন্য হইবে কুল।
ডাল বেড়িয়ে ঠাকুর বস্ত্র পেড়ে দিল
ছোটাছুটি গোয়ালার কন্যা গৃহে চলে গেল।
সাজ সাজ ব'লে বড়াই বুড়ী নগরে দিলেন সাড়া
বড়াই বুড়ীর বাত্রা পেয়ে সাজলো গোয়ালপাড়া।
কেও করে কেশবিন্যাস কেও করেছেন তুরি
হস্ত ভরে বার করলেন সুবর্ণের চিরুণী।
অর্দ্ধেক দূরে যেয়ে ঠাকুর বসলেন বনমালী
মুখে বস্ত্র দিয়ে হাসে রাধা-চন্দ্রাবলী।
যেথা দধি না বিকাবে সেথা লয়ে যাব
মুনির খেয়ালে শ্যাম নগরে ফিরাব।

দধির ভার-বহন

দইএর লোব পৌণে পাঁচ বুড়ি দুধের লব কড়ি
একটি কড়া কম হলে মারব চোঙ্গার বাড়ি।
আগে যায় নন্দরাণী পেছুতে বড়াই।
ভারখানি বয়ে যায় এই শ্রীনন্দের কানাই।
নাগবতী দুটি কন্যা উপস্থিত হইল
খররা খরসি মায়ের হৃদয়ের কাঁচুনি।
নিকুঞ্জ পারগো দ্বারের প্রহরী। আ—আ—আ।
অজগর চূড়াতে মা বসিলেন বিষহরি
জয় দিয়ে বন্দিলাম গো মা জয় বিষহরি।

বিষহরি

অষ্ট নাগে ভর করে পদ্মের কুমারী
পদ্মফুলে জন্ম মা তোর পদ্ম নাম কমলা
পদ্ম নাম কমলা মা তোর পদ্ম নাম কমলা।

২৫-৩০—দ্রষ্টব্য—১ (৬৬-৬৮)।
৩৩ পৌণে পাঁচ বুড়ি—৪ গণ্ডা কড়ি মূল্য।
লব কড়ি—নয় কড়ি মূল্য।
৩৪ চোঙ্গা—(চোঙ্গ = সচ্ছিদ্র বংশদণ্ড) গোদোহনের বা দুগ্ধাদি-সংরক্ষণের আধারবিশেষ।
৩৮ কাঁচুনি—কাঁচুলি।
৪০ অজগর চূড়াতে—অজগর সর্পের মস্তকে।
৪১ বিষহরি—মনসা দেবী (বিষ হরণ করেন যিনি)।

গোষ্ঠ-সজ্জা

আজ শ্রীদাম সুদাম দামোদর সুপল গোষ্ঠেতে সাজিল
সিঙ্গুলি ধবলি গাভীর পাল ছেড়ে দিল।
পালিন দেখ ফেলে গায় বনের পালা জলা খায়।
চুড়া দিলে ধড়া দিলে পাঁচুনি দিলে হাতে
গোধেনু চরাতে যায় দাদা বলরামের সাথে।
এইখানে এই কৃষ্ণ এই দেখ এই নাগরিয় থানা
আজ কৃষ্ণের গলে দিলে বনমালা।
অবির পুত্র যমরাজা যম নাম ধরে
বিনা অপরাধে যম কাউরি দণ্ড নাই করে।

যমরাজ ও নরকযন্ত্রণা

একজন বলতে তারা দুই জনে যায়
কেও ধরে চুলের মুষ্টি কেও ধরে গায়।
পাপী লোক হলে লোহার ডাঙ্গে বেড়ে গো তার মস্তক ফাটায়।
ভাল জল থাকতে যে জন মন্দ জল দেয়
মৃত্যুকালে নরককুণ্ডে মুখে তার জল দেয়।
ঢেঁকি পেতে যে জন লোককে ধান ভানতে না দেয়
মৃত্যুকালে যমের দূতে ঢেঁকিতে তার মাথাতে পাহাড় দেয়
মস্তকে তার হাড়ের চিঁড়ে কুটে খায়।
আপনার পতি ছেড়ে যে জন পরপতি ভজে
খেজুর গাছে চাপি নারীর যম ডণ্ড করে।
জগন্নাথের পুরী যেতে যাত্রিগণ বড় পায় গো দুখ
দেখিলে জনম হয় গো দেখিলে চান্দ মুখ।

---

৪৬ সিঙ্গুলি-ধবলি—শ্যামলী ধবলী।
৪৭ পালা-জল—বনগুল্ম বা বৃক্ষের পত্র।
৪৮ ধড়া—পরিধেয় বস্ত্র।
৫০ নাগরিয় থানা—নাগরের বা শ্রীকৃষ্ণের স্থান।
৫২ অবির পুত্র—(রবির পুত্র) রবিসুত যম।
৫৩ কাউরি—কাহারও।
৫৬ ডাঙ্গ—দণ্ড।
বেড়ে— বাড়ি মারিয়া বা আঘাত করিয়া।
৬৫ চান্দ মুখ—জগন্নাথ দেবের চন্দ্রবদন।

হাড়ির খায় তোড়ানি মা গো কুবেরের খায় ঝাঁটা
খাট পালঙ্ক প'ড়ে রবে নদীর তীরে বাসা।
হায় রে হরি বিনে বৃন্দাবনে আর কি ব্রজের
শোভা আছে, হরি বিনে বৃন্দাবনে, এ, এ, এ। ৬৯

(আয়াস— বেলেবাড়ী-নিবাসী দেবেন্দ্র চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

(৩)

কৃষ্ণলীলা

নতার কদম্বমূলে নাগরিয়া থানা
বনের বনফুল গেঁথে কৃষ্ণের গলে বনমালা।
হাত বাঁকা পায় বাঁকা বাঁকা মাজাখানি
চরণে নেপুর বাঁকা চূড়ার টানুনি।
বৃন্দাবনে তরুলতা এড়ি বেড়ি যায়
ললিতে বিশাখা দুইজন চামর ঢুলায়।
সাত বহিনা তারা গো জলখেলা করে
পাহাড়ে বস্ত্র থুয়ে সখীরা নেমেছিল জলে।
ঝড় নাই বাতাস নাই দিদি বস্ত্র কেবা হরে
নন্দের বেটা চিকণ কালা গোপীদের বস্ত্র চুরি করে।
একহাত রাখিয়ে দিয়ে একহাত তুলে
কৃষ্ণের কাছে মাগে বস্ত্র মিনতি করিয়ে।

---

৬৬ হাড়ির খায় ইত্যাদি—(পুরীর 'হাড়ির ঝাঁটা' সৰ্ব্বত্র প্রসিদ্ধ)।
তোড়ানি—আমানি (অন্নপানি বা অন্ন জল; ফার্শি—তুর্শি = অন্ন, পানি = জল)।
১ নতার—লতানিয়া। ৩ মাজাখানি—মধ্যদেশ, কটিদেশ, কোমর।
৪ নেপুর—নূপুর। টানুনি—বিস্তৃতি।
১০ চিকণ কালা—(চিকণ = চিক্কণ = উজ্জ্বল)
অনুরূপ পদ :—(১) 'বরণ চিকণ কালা তাহে শোভে বনমালা
পীতাম্বর পরিধান করে।' পঃ কঃ তঃ ১৯২

বস্ত্র দাওহে নির্লজ কানাই কাপড় দাওহে পরি
আজ থেকে হব তোমার ষোল শ রমণী।
সেই কথা শুনে কৃষ্ণ কাপড় দিল পেড়ে
কার কোন কাপড় রাধে লওগো চিনে।
আজ খোল বাজে করতাল বাজে আর বাজে ঘড়ি
বৃন্দাবনের মাঝে ঠাকুর মুখে বলেন হরি।
আজ বেউড় বাঁশের বাঁকখানি যার তরুণ পাটের শিকে
কৃষ্ণর কাঁধে ভার দিয়ে চলছেন রাধিকে।

মথুরায় বিকিকিনি

ভার লাও ভারতী লাওগো গোয়ালিনী
দুরন্ত বেঁকের জ্বালায় কন্ধ জলে মরি।
খেয়েচো রাধিকার কড়ি ঠাকুর, হয়েচো বিগারী
আজ কেন বল ঠাকুর ভার বইতে নারি।
যে দেশে না বিকাবে দধি সেই দেশে নিয়ে যাব
নগরে নগরে তোমার ঘুরাইয়ে বেড়াব।
আজ আনিয়ে না নাশ পেটারী ঘুচায় ঢাকুনী
হস্ত দিয়ে বার করে সুবর্ণার চিরুণী।
কেশগুলি আঁচুড়িয়ে করেন গোটা গোটা

ননী-চুরি

কেশের মাঝে তুলে দিছে সিন্দূরের ফোঁটা।
নন্দ গেল বাতানেতে যশোদা গেল ঘাটে
শূন্য ঘর পেয়ে ঠাকুর সে দিন ননী চুরি করে।
এঁটে ক'সে বেঁধো না মা বন্ধন জ্বালায় মরি
নগরেতে ভিক্ষা ক'রে মা শুধব ননীর কড়ি।

১৯ বেউড়বাঁশ—একজাতীয় বাঁশ, এই বাঁশ অতি দৃঢ়।
তরুল পাটের শিকে—(তরুল = তরুণ = নূতন) ১ (৭৬) দ্রষ্টব্য।
২২ বেঁকের = বাঁকের।
২৩ বিগারী— বেগাব বা মজুর, যাহারা কোনরূপ পারিশ্রমিক লয় না বা পায় না।
২৭ নাশ পেটারী— বেশ-বিন্যাসের দ্রব্যাদিসংরক্ষণের জন্য পেটারী বা আধার।
৩১ বাতানেতে—বাথানেতে;বাথান—গ্রামের বাহিরে যে স্থানে গরুর পাল একত্র হয়।
৩১.৩২—১ (৬৯-৭০) দ্রষ্টব্য।
৩৩ এঁটে ক'সে—জোরে।



শ্রীকৃষ্ণের ভারবহন

আজ বেউড় বাঁশের বাঁকখানি মার তরুল পাটের শিকে
কৃষ্ণর কাঁধে ভার দিয়ে চল্‌ছেন রাধিকে।



পূতনা বধ

এক চুমুক, দুই চুমুক, তৃতীয় চুমুকের বেলায় পূতনা বধ হ'ল।
পূতনা ম'ল ভালই হ'ল শব্দ গেল দূরে—
পূতনা পড়ে রইল চৌদ্দ ভুবন পর্ব্বত সমান জুড়ে।

বড়াই বুড়ীর পসরাসজ্জা

আজ সাজ সাজ ব'লে নগরে দিল সাড়া
বড়াই বুড়ীর বাত্রা দিয়ে সাজল গোয়াল পাড়া।
দইএর পসরাগুলি সখীরা মস্তকেতে নিল
মস্তকেতে নিয়া সখীরা দরিয়ার ঘাটে গেল।
দরিয়ার ঘাটে যেয়ে সেদিন মাঝিকে ডাক দিল
আজ পার কর পার কর মাঝি বেলা পানে চেয়ে

দানখণ্ড বা নৌকাখণ্ড

দধি দুগ্ধ নষ্ট হ'ল সময় গেল ব'য়ে।
সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা
শ্রীরাধাকে পার করিতে আমি লিব কানের সোনা।
কানের সোনা লাও কড়ি লাও ঠাকুর তাও দিতে পারি
এই যে দরিয়ার মাঝে হেঁটে যেতে নারি।
আজ সব সখীকে পার করিতে লিব বুড়ি বুড়ি
বড়াই বুড়ী পার করিতে লিব পাটের শাড়ী।
পাটের শাড়ী চাও মাঝি তাও দিতে পারি
সমুদ্র দরিয়ার মাঝে আমি হেঁটে যেতে নারি।
আজ চেরো কড়ার মাঝি লও ঠাকুর আট কড়া দিব
তাই ব'লে কি তোমায় আমি পাটের শাড়ী দিব।
আজ কাঠের দেশে থাক মাঝি কাঠের কিবা দুঃখ
ভাঙ্গা লায়ে খেয়া দিতে কতই পেছ সুখ।
ভাঙ্গা লয় ভাঙ্গা লয় আমার বরজরিয়া কাঁড়ি
কত হস্তী ঘোড়া পার করেছি শ্রীরাধে কি এতই ভারী।
কতগুলিন রাখালগণ জল খেতে নেমেছিল কালীদহের কূলে
বিষ পান করিয়ে পড়ল কালীদহের জলে।

৩৫-৩৬—দ্রষ্টব্য—২ (২৫-২৬)।
৩৮ দরিয়ার—নদীর।
৪৬ বুড়ি বুড়ি—প্রত্যেকের জন্য এক বুড়ি বা ৫ করিয়া।
৫৩ লায়ে—নৌকায়।
৫৪ কাঁড়ি—তালগাছের নির্ম্মিত নৌকা।

কালীয়-দমন — কোথায় ছিলেন কৃষ্ণ কালীরদহে ঝাঁপ দিয়েছিলেন
কোথায় ছিলেন কালীর নাগ মস্তকে তুলে নিল।
নাগবতী কন্যারা সে দিন উৎপন্ন হল।
ফুল শুনে প্রাণ ধেরয্য ধর গো
আমার ফুল বিনে প্রাণ গেল।

(পাকুড়াহাঁস-নিবাসী দ্বিজপদ চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

(৪)

কৃষ্ণলীলা

জলে কৃষ্ণ স্থলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহীমণ্ডলে
একা কৃষ্ণ নাম ধরে জগতসংসারে।
যুগল-বিলাস — কালিয়া কদম্বমূলে নাগরিয়া থানা
বনের বনফুল দেখুন ঠাকুরের গলে।
কাচবেড়া কাঞ্চ নবেড়া আরও বেড়া ধরা
রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন নাই একই রঙ্গে যোড়া।
খোল বাজে করতাল বাজে মৃদঙ্গ বাজে হাতে
বাকুমুরারি বাজে সখীগণের মুখে।
চারি ধারে সখীগণ মধ্যে শ্যামরায়
ঢলে ঢলে পড়েন দেখুন রমণীদের গায়।
খেলারসে ছিলেন কানাই গোপীদের সনে
হেরিয়ে গোপিকার বস্ত্র প'ড়ে গেল মনে।
বস্ত্র-হরণ — পাহাড়ে বস্ত্র থুয়ে সখীগণ সিনানে নামিল
স্নান আহ্নিক করে সখীরা পাহাড় পানে চায়।
ঝড় নাই ঝঙ্কর নাই গোপীর বস্ত্র কেবা হরে
নন্দের বেটা চিকণ কালা গোপীর বস্ত্র ডালেতে বেঁধেছে।

১১-২৮—দ্রষ্টব্য—১ (৫২-৬৫), ২ (১১-২৪)।

বস্ত্র দাও বস্ত্র দাও ঠাকুর পরিধান করি
শুক্‌না বস্ত্র পেয়ে নাম রাখিব কালী।
কালী কালী বলিস্ না গো শুন গোয়ালার ঝি
বিধাতা করেছেন কালো আমার সাধ্য কি?
বস্ত্র যদি না দিবে ঠাকুর যাব কংস রাজার ঠাঁই
কংসের তাপে কানাইএর জাতি কুল নাই।
বারে বারে দিস্ না তোরা কংসের তুলনা
অবোধ কালে বধেছিলাম ভগিনী পূতনা।
গাছ হতে নাম কানাই পেড়ে দাও ফুল
ডাল ভেঙ্গে প'ড়ে মরবে শূন্য হয় গোকুল।
ডাল বেড়ি বস্ত্র পেড়ে দিল
দৌড়াদৌড়ি গোয়ালার কন্যা গৃহে চলে গেল।
সাজ সাজ বলে বিন্দা বড়াইবুড়ী নগরে দিল সাড়া — বেশ-বিন্যাস
বড়াইবুড়ীর বাত্রা পেয়ে সাজলো গোয়ালপাড়া।
ঘুচাওয়ে বেশ পেটারী সুবর্ণার চিরুণী
সুবর্ণার চিরুণীতে কেশগুলিকে করলে গোটা গোটা
তার মধ্যে তুলে নিলেন চন্দনের ফোঁটা।
সখীরা বলে আমরা যে মথুরা যাব ভার কে বাঁধিবে
জগদীশ্বর হরি আছেন তিনি ভার বোয়ান।
সুব সুবর্ণার বাঁক দিলেন বেলুল্ল পাটের শিকে — মথুরায়
কৃষ্ণের কাঁধে লয়ে ভার চলিল রাধিকে। — বিকিকিনি
ঠাকুর বলে আমি তো বওয়াই নাই ভার জগতেরি সার — সজ্জা
শ্রীরাধিকার প্রেমের জন্য স্কন্দে বই ভার।
বড়াই বলে খেয়েছেন রাধের মজুরী কানাই হয়েছেন বিগারী
এখন কেন বল কানাই ভার বইতে নারি।
যেথা দধি দুগ্ধ না বিকাবে কানাই
সেথা লয়ে যাব মনেরি খেয়ালে শ্যাম হে তোমাকে নগরে ফিরাব।

২৯-৩০—দ্রষ্টব্য—৩ (৩৫-৩৬)।
৩৬ সুবর্ণার বাঁক—স্বর্ণনির্ম্মিত বাঁক বা ভার।

আমরা বেচিব দই দুগ্ধ তুমি সধবা কড়ি
একটি কড়া কম হলে মারব চোঙ্গার বাড়ি।

দানলীলা বা নৌকাখণ্ড

লজ্জাতে লজ্জাতে হয়ে কানাই বসলেন দানের ঘাটে।
সব সখীকে পার করিতে আজ লিব আনা আনা
শ্রীরাধাকে পার করিতে লিব কর্ণের সোনা।
সোনা লাও সাড়ী লাও ঠাকুর সকল দিতে পারি
দুকূল যমুনা গঙ্গা হেঁটে যেতে নারি।
তিনখানা কাষ্ঠ দিয়ে তবে নৌকা নির্ম্মাণ করিল।
নৌকার গুমানে ব্রজ গোপিনী করেন পার।
ডরায় গোয়ালের কন্যা বুকে মারেন ঘা
কাজ নাই কানাইয়া তোমার ভাঙ্গা লা।
ভাঙ্গা লয় চুরা লয় আমার মজুরিয়া কাঁড়ি
হস্তী ঘোড়া পার করেছি রাধে কতই ভারী।
কাঠের দেশে থাক কানাই কাঠের কিবা দুখ
ভাঙ্গা লায়ে খেয়া দিতে কতই পেচ্ছেন সুখ।
এপারের নৌকা কানাই ওপারে নাগাইল
দৌড়াদৌড়ি গোয়ালের কন্যা মথুরা চলিল।
ভাগ্যবতী মা যশোদা নবনী চাটায়
দাদা বলরাম বাছুর ধরে রয়।
কালকৃষ্ণ ধবলমুখী গাই দোয়ায় মনের সুখে
চোঙ্গাতে না আঁটে দুগ্ধ ঢালেন চন্দ্রমুখে।

গোষ্ঠলীলা

চুড়া দিল ধড়া দিল পাঁচুনি দিলেন হাতে
গোধন চরাতে যাবেন দাদা বলরামের সাথে।
রামের হাতে শ্যামকে দিয়ে বলেন ইন্দ্ররাণী
আমার গোপাল গোষ্ঠে যাবে এনে দেবে তুমি।

---

৪৪ সাধবা কড়ি—মূল্য আদায় করিবে।
৪৬ দানের ঘাট—যে ঘাটে নৌকা পার হইবার শুল্ক বা মাশুল আদায় হয়।
৫২ গুমানে—অহঙ্কারে বা গর্ব্বে।
৪৭-৫৮—দ্রষ্টব্য—৩ (৪২-৫৫)।
৬৪ চোঙ্গা— গোদোহনের পাত্রবিশেষ। না আঁটে—সঙ্কুলান হয় না।
৬৫ ধড়া-পাঁচুনি—পরিধেয় বস্ত্র ও গরু চরাইবার লাঠি।



যমরাজা

রবির পুত্র যমরাজা যম নাম ধরে
বিনা অপরাধে যম কারু দণ্ড নাহি করে।

খাবার সময় খেতে দিও ক্ষীর সব নবনী
তরুর ছায়াতে রেখ গোপাল গুণমণি।
সাজ সাজ ব'লে রাখালগণ গোষ্ঠেতে সাজিল
তালবন তমালবন মধুবন নিকুঞ্জবন ঠাকুর সকলি নির্ম্মাণ করিল।
মধুবনে মধু খেয়ে দাদা বলরাম ঢলিয়া পড়িল।
সেইখানে ছিলেন গিরি গোবর্দ্ধন
মার মার ব'লে গিরিধর পড়িতে লাগিল।
দ্বাদশ রাখালগণ কড়ে আঙ্গুলের ঠেকা দিয়ে পবর্বত ধারণ করিল
সেইদিন হতে ঠাকুরের গিরিধর নাম যে রাখিল।
কালীদহের কূলে ছিল কেলিকদম্বের গাছ কালীয়-দমন
তাতে চ'ড়ে কৃষ্ণচন্দ্র দিয়েছিলেন ঝাঁপ।
কালীনাগ আজ আহার ব'লে সকলে ঘেরিল
নাগবতী দুইটি কন্যা উপস্থিত হইল।
নাগের মাথায় পদ দিয়ে দেখুন ঠাকুর নাচিতে লাগিল।
নাগ ব'লে দেখুন আমার যশোভাগ্য হল
কৃষ্ণের পাদপদ্ম বুঝি মস্তকে উঠিল।
জয় দিয়ে বন্দিলাম মা জয় বিষহরি
অষ্টনাগে ভর করেন পদ্মের কুমারী।
পদ্মফুলে জন্ম মা পদ্ম নাম কমলা
খয়রা খরসী মা তোর হৃদয়ের কাঁচুলী।
অজগর বোরাতে বসিলেন বিষহরি বিষহরি
ঊনকোটি নাগ মার কর্ণের মদন কড়ি।
রবির পুত্র যম রাজা যম নাম ধরে
বিনা অপরাধে যম কারু দণ্ড নাহি করে।
চিত্রগুপ্ত মহুরী তারা দিবারাত্র লেখে যমরাজ ও
যার যেমন কপালের লিখন বিধাতা লিখেছে। নরক-যন্ত্রণা

---

৮৯ অজগর বোরাতে—অজগর সর্পের মস্তকোপরি।
৯০ মদন-কড়ি—কর্ণের অলঙ্কার বিশেষ।

ভাল লোক হলে দেখুন কৃষ্ণদূতে যায়
মন্দ লোক হলে যমদূত সদ্য যান।
কেউ ধরে চুলের মুষ্টি কেউ ধরে পায়
পাপী লোক হলে শীঘ্র ক'রে যমালয় পাঠায়।
আপনার পতি ত্যাজ্য কোরে যে নারী পরপতি সেবা করে
তার মত পাপী দেখুন নাইকো সংসারে
খেজুর গাছে চড়ে নারীর যমদণ্ড করে।
ভাল জল থাকতে যে জন মন্দ জল দেয়
মৃত্যুকালে নরককুণ্ডের জল তাকে যমদূতে দেয়।
সত্য দ্বাপর ত্রেতা কলি চার যুগে পড়িল
কলির রাজা স্ত্রীকে ঘাড়ে লয়ে, বুড়া মার মাথায়
চাল ডালের টোপলা দিয়ে গঙ্গাস্থান চলিলেন।
ঢেঁকি পেতে যে জন ধান্য না ভানতে দেন
মৃত্যুকালে লোহার ঢেঁকি পেতে চিড়া কুটে খায়।
মিথ্যা কথা মিথ্যা প্রবঞ্চ না মিথ্যা সাক্ষী দেন
গুরু গোবিন্দ নাম যিনি না লেন
তপ্ত সাঁড়াশী ক'রে তার জিহ্বা টেনে লেয়।
হীরামুনি নাম বেশ্যা ছিল গহক পাপের পাপী
অন্নদান বস্ত্রদান সাধু সঙ্গে হরিনাম করে
প্রাণ পরিত্যাগ করিল কৃষ্ণদূতে পুষ্পরথে বৈকুণ্ঠে লয়ে গেল।
যা খাওয়াবেন যা বিলাবেন ঐ না রহিবে সার
কৃষ্ণ নামে দান কল্লে বৈকণ্ঠে ধরা রয়।
বড় ঘর বড় দুয়ার বড় কর আশা
সকল দ্রব্য পড়ে রইবে গঙ্গাতীরে বাসা।

(আয়াস-নিবাসী গোপাল চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

১০৬ টোপলা—পোঁটলা।
১১২ গহক পাপের পাপী ('গহক'—দেশজ শব্দ; নিরতিশয়)।



"বস্ত্র-হরণ" (পৃঃ ৩৬, ১৫-১৮)



"কালীয়-দমন" (পৃঃ ৩৩, ৭৮-৮২)

(৫)

কৃষ্ণ-অবতার

কানিয়া কদম্বমূলে নাগরিয়া থানা
বনফুল গাঁথিয়ে কৃষ্ণের গলে বনমালা।
হাত বাঁকা পায় বাঁকা বাঁকা মাজাখানি
চরণের নূপুর বাঁকা চূড়ার টানুনি। *শ্রীকৃষ্ণের*
চূড়া বাঁধে নানা ছাঁদে অলকা দুলালী *সজ্জা*
তাও দেখে ভোলে ব্রজের ষোল শ রমণী।
তার ধারে ধারে নাম লিখেছে রাধা বিনোদিনী
চার কড়ার বাঁশী নয় ঠাকুর পিতলের ছোঁয়ানি।
কোন কোন গোপী বলে, বাঁশ বাঁশিয়া নয় তরল বাঁশের ডগা
ডাকে নাম ধরে বাঁশী সদাই রাধা রাধা।
সেই বাঁশী দিবানিশি করে অপমান
সেই বাঁশীতে ভোলায় সকল ব্রজ-গোপীগণ।
পাড়ে বসন রেখে তবে জলখেলা করে
গোপীর বসন লয়ে কানাই সেদিন ডালে বন্ধন করে। *বস্ত্র হরণ*
জলখেলা করতে গোপী পাড় পানে চায়
শুকান বস্ত্রখানি দেখিতে না পায়।
ঝড় নাই ঝঙ্কর নাই বস্ত্র কেবা লয়
নন্দের বেটা চিকণ কালা গোপীর বসন ধরে লয়।
কে নিলে বস্ত্র সকল গোপীগণ কেঁকায়
বলে চল চল যাব আমরা কংস রাজার ঠাঁই
কৃষ্ণের অভিতাপে আর জাতি কুল নাই।
কৃষ্ণ বলে বারে বারে তোমরা দিওনা কংসের তুলনা
আমি শিশুকালে বধেছি কংসের ভগিনী পূতনা।

৮ পিতলের ছোঁয়ানি—পিতল দিয়া বাঁধানো।
১৮ কেঁকায়—চীৎকার করে।

বলে,পুরুষ বটে শ্যাম নাগর সব তোমার সাজে
আমরা যদি পুরুষ হতাম মরে যেতাম লাজে।
পরের নারীর বসন লয়ে কেবা ডালে বাঁধে।
জলখেলা সাঙ্গ হল, সকল গোপী গৃহে চলে যায়।
তখন সাজ সাজ বলে বড়াই নগরে দিল সাড়া
বড়াই বুড়ীর বাত্রায় সাজিল গোপের পাড়া।
কে কে যাবি গোপী সকল তোমরা মথুরার হাটে চল
তখন রাধে বলে ওগো দধির ভার লবে কে?
বলে নন্দের বেটা চিকণ কালা ওকে দধির ভার লয়ে দাও
সুভ সুবর্ণার বাঁকখানি বেল্ল পাটের শিকে
কৃষ্ণের কাঁধে ভার দিয়ে গো লয়ে চলিল রাধিকে।
আমাদের যেথায় না বিকাবে দধি সেথায় নিয়ে যাব
মনের সহিত তোমায় নগরে ঘুরাব।

ভারবহন

কৃষ্ণ বলছে আমরা তো বইনা ভার জগতেরি সার
রাধা-প্রেমের জন্য তাইতে কাঁধে বইছি ভার।
তখন দধি দুগ্ধ ছানা মাখন লয়ে চলিল
দানখণ্ডে গিয়ে তখন উপস্থিত হইল।

দানলীলা

শীঘ্রগতি পার কর কানাই তুমি বেলাপানে চেয়ে
দহি দুগ্ধর সময় যাচ্ছে ব'য়ে।
দুগ্ধের লব পণ পণ নবনীর লব বুড়ি
কড়া কম্‌তি হলে আমি মারব চোঙ্গার বাড়ি।
বড়াই ব'লে কাজ নাই কানাইয়া কৃষ্ণ তোমার ভাঙ্গা লা
ডরাইছে গোপের নারী কপালে মারে ঘা।
কৃষ্ণ বলে ভাঙ্গা লয় টুটা লয় ভক্তি-ভাবের তরী
হস্তী ঘোড়া পার করেছি ওগো শ্রীরাধা কত ভারী।

২৮-৫৪ দ্রষ্টব্য ৩ (৩৫-৫৫); ৪ (২৯-৫৬)।

৩৩ বেল্লপাটের সিকে—(বিল্ল = জলাভূমি) জলাভূমিতে উৎপন্ন একপ্রকার পাট হইতে প্রস্তুত শিকা দ্রষ্টব্য ১ (৭৬)।

৪৫ ভাঙ্গা লা—ভাঙ্গা নৌকা।

সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা
শ্রীরাধাকে পার করিতে লিব কানের সোনা।
সোনা লাও শাড়ী লাও সকল দিতে পারি
তবু তো দুকূল যমুনার জলে হেঁটে যেতে নারি।
এই ঘাটের নৌকাখানি ওঘাটে লাগাল
মথুরায় গমনে সকল গোপী চলিল।
মথুরাতে গিয়ে গোপী করে বেচা কেনা
দ্বারে বাজছে নহবতখানা প্রেম কাঙ্গালী যেতে মানা।
ডাকিলে উত্তর মেলে না বুঝি বিষয় পেল
এইখানে সকল খেলা সাঙ্গ হয়ে গেল।

(রুসুমযাত্রা-নিবাসী শশিভূষণ চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

(৬)

দানখণ্ড

নিত্য নিত্য যাও তুমি সকলে ভাঁড়াইয়া
বিরলে পেয়েছি তোমায় না দিব ছাড়িয়া।
নিত্যি নিত্যি যাই আমি করি বেচাকিনি
কভু তো শুনি নাই ঠাকুর ঘাটের মহাদানী।
ঘাটের ঘেটেল আমি পথের মহাদানী
আজ দানের সতো কেড়ে লোব তোদের রাধা বিনোদিনী।
দুগ্ধের লোব পণ পণ নবনীর লোব বুড়ি
কড়া কম্‌তি হলে মারব ঢোঙ্গার বাড়ি।
কাজ নাই কানাইয়া নাগর তোমার ভাঙ্গা লা

৫ গেটেল—ঘাটিয়াল; নদীর ঘাটের পথরক্ষক এবং শুল্ক বা মাশুল আদায়কারী। মহাদানী—মাশুল আদায়কারী সর্বোচ্চ পদস্থ ব্যক্তি। (দান = শুল্ক বা মাশুল)।
৬ সতো —সহিত, সঙ্গে।

ডরাইছে গোপের কন্যা কপালে মারেন ঘা।
সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা।
শ্রীরাধাকে পার করিতে লিব কর্ণের সোনা
বড়াইকে পার করিতে লিব পাটের শাড়ী।
সাড়ী লাও সোনা লাও সকলি দিতে পারি
তবু তো দুকুল যমুনা হেঁটে যেতে নারি।
এ ঘাটের নৌকা তখন ও ঘাটে লাগাইল
নৌকাতে পার হয়ে সখীরা মথুরায় চলিল।

(৭)

কৃষ্ণ-অবতার

কিরূপে জন্মিল হরি দৈবকীর উদরে
(ওগো) নানা রঙ্গে করেন খেলা কদম্বেরি তলে।
কানিয়া কদম্বমূলে নাগরিয়া থানা
বনফুলে গেঁথে কৃষ্ণের গলে মালা।
হাত বাঁকা পায় বাঁকা যার বাঁকা মাজাখানি
চরণে নূপুর বাঁকা চূড়ার টানুনি
চূড়া বাঁধে মন ছাঁদে ব্রজের অলকা দুলালী
তা দেখে সব ভুলে গেল ব্রজেরো গোপিনী।
কোন চূড়া শ্বেত লেত কোন চূড়া কালী
গঙ্গাজল নাম, চামরে আউটত বালী।
একেতে বিদুর বৈষ্ণম, কৃষ্ণপ্রেমে ভোলা
কৃষ্ণের হাতে দিয়ে চোঁকা ভূমে ফেলে কলা।

শ্রীকৃষ্ণ-বিদুর-সংবাদ

ভূমেতে পড়িল কলা বিদুর নয়নে হেরিল
কৃষ্ণের রাতুল চরণ ধরিয়া তখন কাঁদিতে লাগিল।

১১ ভোলা—বিভোর।
১২ চোঁকা—খোসা।

একে ত বিদুর বৈষ্ণম না কাঁদিয় তুমি।
ভূমেতে পড়ুক কলা কুড়িয়ে খাব আমি।
বিদুরকে চাইতে ভক্ত বিদুরের মা
নিরবধি বল রে বাপ কৃষ্ণ ভজ গো।
পাহাড়ে বসন রাখিয়ে গোপীগণ শেয়ানে নামিল — বস্ত্রহরণ
জলখেলা করিতে সখীগণ সব পাহাড় পানে চায়।
একে একে গোপীদের বসন কানাই ডালেতে বাঁধিল।
ঝড় নাই, ঝঙ্কর নাই, মোদের বস্ত্র কেবা হরে?
নন্দের বেটা চিকণ কালা বসন চুরি করে।
কেউ কাঁদে জলে ব'সে কেউ পাহাড়ে
কেউ কেউ কাঁদিছে কৃষ্ণের রাতুল চরণে ধরিয়ে,—
কাপড় দাও হে নির্লজ কানাই, বস্ত্র দাও হে পাড়িয়ে
আজ হইতে হব ঠাকুর তোমারই রমণী।
কাপড় না দিলে যাব কংস রাজার ঠাঁই
কংসের তাপিতে গোপীদের জাতবিচার নাই।
বারে বারে কি দিস্ রাধে কংসের তুলনা
শিশুকালে বধেছি কংসের ভগিনী পূতনা।
সাজ সাজ বলিয়ে বড়াই নগরে দিলেন সাড়া
বড়াই বুড়ীর যাত্রায় সাজিলেন গোয়ালপাড়া। — বড়াই বুড়ীর
বার করিলেন নাশ-পেটারী ঘুচাইলে ঢাকুনী। — যাত্রা
হস্তভরে বাহির করিলেন সুবর্ণার চিরুণী।
সুবর্ণার চিরুণী আনি নখকে চিরে নিল
মলঙ্গে মাথার কেশকে তেলেতে ভিজাইল।
কেশগুলি আঁচুড়ে রাধে করেন গোটা গোটা
তাহার মধ্যে সুবিধ করে চন্দনের ফোঁটা।
শ্বেত সুবর্ণার বাঁকখানি, ওগো বেলুন পাটে শিকে
কৃষ্ণের কাঁধে দিয়ে ভার চলেছেন রাধিকে।

১৯ শেয়ানে—সিনানে বা স্নানে।
৩৩ বাত্রায়—বার্ত্তায়, কথা বা আজ্ঞা পাইয়া।
৩৪ নাশ-পেটারী—বেশ-বিন্যাস কবিয়ার দ্রব্যাদি সম্বলিত পেটারী।

ভারবহন

ভার কভু বই নাই আমি জগতেরি হরি
দুরন্ত বেঁকের জ্বালায় কন্ধ জ্বলে মরি।
রাধিকে বলে ঠাকুর খেয়েচো রাধির কড়ি হয়েছ বিগারী
আজ কেন বলো দীননাথ ব্রজে ভার বইতে নারি।
ভারখানি নামিয়ে বসিল বনমালী
মুখে বসন দিয়ে হাসে চন্দ্রাবলী।

দানলীলা

ই ঘাটের দানী ঠাকুর কবে হলে দানী
দান দিয়ে নৌকায় চাপ রাধে বিনোদিনী।
সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা
শ্রীরাধিকে পার করিতে লিব কানের সোনা।
সোনা লাও সাড়ী লাও ঠাকুর আমি সব দিতে পারি
মধ্যে দরিয়ায় তবু হেঁটে যেতে নারি।
তা শুনিয়া পার করে দিল।
একে একে গোপীগণ সব মথুরায় চলিল।

(পানুরিয়া-নিবাসী পঞ্চানন চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

(৮)

কৃষ্ণ-অবতার

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, গোপেশ্বর, গোপকান্ত, রাধাকান্তং
নমস্তিতং পদে।
কৃষ্ণ ভাব, কৃষ্ণ চিন্তা, কৃষ্ণ কর সার
যে ধরিয়া না ভজিবে, নন্দেরি কুমার।
কদম্বতলাতে কৃষ্ণ মুরারি বাজায়
বাধামাধব তারা তম্বুলা জোগায়।

৪৩ বেঁকের—বাঁকের বা ভারের।
৪৮ দানী—মাশুল আদায়কারী (দান—শুল্ক বা মাশুল)।

রাধা জোগায় তম্বুলা, ব্রিমলা করে পাখা
ময়ূরের পশ্চাতে অনেকে করে শোভা।
বিন্দাবনের তরুলতায় এড়িবেড়ি যায়
ভ্রমরা ভ্রমরি তারা কৃষ্ণগুণ গায়।
বিন্দাবনের পক্ষগুলি বড় পূর্ণমান
দিবারাত্র তারা করে কৃষ্ণগুণগান।
কৃষ্ণনাম পরমপদ যেবা নরে পূজে
কৃষ্ণনাম করি ঢাল যে জন যমের সঙ্গে যোঝে।
অনন্তশয়নে হরি শয়ন করিল
লক্ষ্মী এসে পদসেবা করিতে লাগিল।
তেত্রিশ কোটী দেবতা করিয়ে যুকতি
বলে অসুর-মার, হে গদাধর রাখ হে সৃষ্টি।
দেবতাদের কথা প্রভু ঠিলিতে নারিল
জয়া বিজয়া দুই জন সঙ্গে করে লইল।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

জয় জয় বলে প্রভু মর্ত্তে দিলেন পা
প্রথমে দৈবকীর ঘরে কৃষ্ণ তোলেন গা।

দৈবকীর স্বপ্ন

খাট পেড়ে দৈবকী সুনিদ্রা যায়
শিয়রে থাকিয়ে হরি চৈতন্য জানায়
তোমার গর্ভেতে দাওগে কৃষ্ণেরে ঠাঁই।
দৈবকী স্বপনেতে কহিছেন কাহিনী
যে আমাব গর্ভেতে নাহি স্থলখানি।
সাতপুত্র স্থল দিলাম কংসে বধিল
তোমাপুত্রে স্থল দিলে কতই পাব সুখ।
আমাপুত্র স্থল দিলে বড়ই পাবে সুখ
বাধিব পাটের রাজা নরপতি কংসাসুর।
ক্ষত্রিয় মারিয়া আমি নিক্ষত্রি করিব
বলি রাজার ছলিতে পাতালপুরী যাব।

---

৯ পক্ষ—পক্ষী।
১২ কৃষ্ণনাম করি ঢাল—কৃষ্ণনামকে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া।

গর্ভবাস
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ স্থল নাহি পেল
শ্বেতমাছির রূপ ধরি গর্ভেতে পূজিল।
এক মাস, দুই মাস, শুনি কানাকানি
পঞ্চ মী গর্ভেতে মায়ের জোকে জানাজানি।
সপ্তমী গর্ভেতে তখন রাজারে শুনিল
নাগডণ্ড, কালডণ্ড পহরা রাখিল।
জগদ্দল পাথর বসুর বুকে চাপাইল
গর্ভপূজা করিতে নারদ মুনি এল।
গর্ভে হতে শ্রীহরি কহিছেন কাহিনী।
বলে ও নারদ ভাদুরী অষ্টমী দিনে কৃষ্ণের জনম
তামাম মথুরা সব শিলে বরিষণ।
মারিবে কংসের চর না পাইয়া চেতন
এতেক বলিয়া নারদ বিদায় হইল।
গর্ভে হতে শ্রীহরি ভূমিস্তে পড়িয়া চতুর্ভুজ হলেন।
আচম্বিতে বসুদেবের বন্ধন খুলে গেল।
বার হয়ে দেখ বসু বাধে কোন অনুবাদ
আজ আমারে লয়ে চলো নন্দালয়।
বসুদেব আসিয়া ছওয়াল কোলে লইল
যমুনা পার
যমুনার ধারে প্রভু আসি ভাবিতে লাগিল।
হেথা মাতা দুর্গা নবী অন্তরে জানিল
শৃগালের রূপ ধরি যমুনা পার হইল।
সেই অনুসারে বসু জলেতে নামিল
সপ্তত তালগাছ জল একুই হেঁটো হল।
হাত ফুঁকুলে কৃষ্ণচন্দ্র জলেতে পড়িল
পদ্মপুষ্পের উপরে কৃষ্ণ খেলিতে লাগিল।

৩৮ জগদ্দল—অত্যন্ত ভারী প্রস্তর।
৪১ ভাদুরী—ভাদ্রমাসের।
৪৭ অনুবাদ—প্রতিকূলতা (অনু = পশ্চাৎ, বাদ = বিবাদ)।
৫৪ একুই হেঁটো—এক হাঁটু পরিমাণ (অর্থাৎ জলের গভীরতা হাঁটু পর্য্যন্ত)।
৫৫ হাত ফুঁকুলে—হাত ফস্‌কাইয়া।

বসুদেব দেখে কাঁদিতে লাগিল
ব্রাহ্মণের কান্না প্রভু সহিতে নারিল।
লম্ফ দিয়ে কৃষ্ণ কোলেতে উঠিল
নিশিযোগে নন্দালয়ে ছওয়াল বদল করিল।
পুত্র বদল দিয়া বসু কন্যা বদল লিল
সেই কন্যা আসি দৈবকীর কোলে দিল।
দৈবকী বলে যে আমার ঘরের সোনার চাঁদ
কার ঘরে দিল, কার ঘরের পোড়ামুখী মোর কোলে দিল।
ছওয়াল ওঁয়া-চোঁয়া করে কাঁদিতে লাগিল
কুড়িটা অসুর এসে পুরীটা ঘেরিল।
দৈবকীর কোলের ছওয়াল কাড়িয়া লইল
ধোবার পাটে আছিরে মারিতে হুকুম হইল।
হাত ফুকুলে মহাময়ী স্বর্গবাহিনী হইল।
স্বর্গবাহিনী কহিয়ে যায়
আমারে মারিতে তোরা বীর জন্মিলি
তোদের রাজাকে যে মারিবে, সে গোকুলে জন্মিল।
তখন কাঁদে রাজা খাটে আর গা
বোন বোন পূতনা ক'রে ঘন ছাড়ে রা।
এসো বোন বসো বাটা স্তম্বুল খাবে
শিশুকালে গিয়ে কৃষ্ণরে বধিবে।
একে বোন পূতনা রাজা আজ্ঞা পেল
বিষের স্তন দুটি নির্ম্মাণ করিল।
সই সম্বা ক'রে গেল নন্দের বাড়ি।
বলে সই তোমার ঘরের কেমন ছওয়াল দাও মোর কোলে।
নির্বুদ্ধির গোয়ালার মেয়ে বুদ্ধি নাইকো ঘটে
শ্রীপুত্র লয়ে দিছে, পূতনারি কোলে।

৬৮ ধোবার পাটে ইত্যাদি—ধোপার কাপড় কাচিবার পাটাতে আছড়িয়া মারিবার।
৬৯ ফুকুলে—ফস্কাইয়া।
৭৫ স্তম্বূল—তাম্বূল, পান; বাটা—তাম্বূল রাখিবার পাত্র।
৭৯ সই সম্বা ক'রে—সই সম্বন্ধ পাতাইয়া।

কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান, অন্তরে জানিল
আমাকে মারিতে আজ পূতনা মাসী এল।
কর স্তনপান কৃষ্ণ কর স্তনপান
চুমকারির ঘায়ে পূতনার বধিল পরাণ।
পড়ল বিটী পূতনা আশাবদ্ধ গেল দূর
এমতে প্রকারে মরে দাতার শত্তুর।

(বনকাপাসী নিবাসী উপেন্দ্রচন্দ্র চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

(৯)

ব্রজলীলা

কানাইয় কদম্বমূলে নাগরিয় থানা
বনের বনফুল গেঁথে হরির গলে বনমালা।
হাত বাঁকা পায় বাঁকা বাঁকা মাজাখানি
চরণের নেপুর বাঁকা যেন চূড়ার সাজুনী।
বাঁধিল বিনোদের চূড়া ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে
নবরঙ্গ মালতীর মালা দিচ্ছেন চূড়াতে বেড়িয়ে।
পরের নারীর বসন ধরে সদাই বল বস
নিজের কড়ি ভেঙ্গে ঠাকুর বিয়ে নাইকো কর।
বিয়ে করব কি হে রাধে, তাই নাইকো দায়
তোমার মত রসবতী খুঁজলে কোথা পাই?
আমার মত রসবতী খুঁজলে কোথা পাবে
গলাতে কলসী বেঁধে যমুনায় ঝাঁপ দিবে।
চারি কড়ার বাঁশী নয় ঠাকুর পিতলের ছোঁয়ানী
ধারে ধারে লেখা নাম রাখে কলঙ্কিনী।

---

৮৬ চুমকারি—চুমকের টানে।
৮৭ বিটী—কন্যা, মেয়ে (এখানে অবজ্ঞাসূচক শব্দ)।
৮ নিজের কড়ি ভেঙ্গে—নিজের পয়সা খরচ করিয়া।
১৩ পিতলের ছোঁয়ানী—পিতল দিয়া বাঁধা।

বৃন্দাবন করিলেন হরি, বৃন্দাবন করিলেন।
বৃন্দাবনের তরুলতা এড়ি বেড়ি যায়
ভ্রমরা ভ্রমরী তারা কৃষ্ণগুণ গায়।
পাহাড়ে বস্ত্র থুয়ে গোপীকাগণ জলখেলা করে
কোথা ছিল চোরা কানাই, গোপীদের বস্ত্র চুরি করে।
স্নান করে গোপীকাগণ পাহাড় পানে চায়
শুখান বস্ত্রগুলি দেখিতে না পায়।
ঝড় নাই বাতাস নাই যে বস্ত্র উড়ে যাবে
নন্দের বেটা চিকণ কালা হরি ও বসন চুরি করে।
বস্ত্র বস্ত্র করে সখীরা করেগো চীৎকার
কদম গাছে চেপে হরি বাঁশরী বাজায়।
কেউ জলে বসে, কেউ কাঁদে পাহাড়ে।
বস্ত্র দাও হে নির্লট কানাই বস্ত্র দাও হে
কাপড় দাও হে পরি
শুখান বস্ত্রে যেন দেখো না মুছ কালী।
কাল কাল বলিস না ও গোয়ালার ঝি
বিধাতা করেছে কাল আমার সাধ্য কি?
বস্ত্র দাও ওহে ঠাকুর কাপড় দাও পরি
আজ হতে হলেম ঠাকুর আপনার চরণের দাসী।
বস্ত্র যদি না দেবে যাব কংস রাজাব বাড়ি।
বারে বারে কি দাও রাধে কংসেরি তুলনা
শিশুকালে বধ করেছি কংসের পূতনা ভগিনা।
কংসের বিচার সখীদের জাত-কুল নাশ।
ওই কথা বলে সখীদিকে কাপড় দিল পেড়ে
কার কোন বস্ত্র রাধে লাও হে চিনে।
সাজ সাজ বলে বড়াই নগরে দিছে সাড়া
বড়াই বুড়ীর বার্ত্তা শুনে সাজে গোয়ালপাড়া।

২৭ নির্লট— নির্লজ্জ, নিলাজ বা বেহায়া।

বার করিল নাশ-পেটারী খুলিল ঢাকুনী
হস্ত ভরে বাহির করে সুবর্ণার চিরুনী।
সুবর্ণার চিরুনী আনি নখে চিরে দিল
গঙ্গাজলি মাথার কেশ তেলেতে ভিজাইল।
কেশগুলো আঁচুড়ে রাধে করে গোটা গোটা
তাহার মধ্যে তুলে নিছে যেন সিন্দূরিয়া টোপা।
নাশ-বেশ করে সখীরা দধির পসরা নিচ্ছে মাথে
চলিল গোয়ালার কন্যে ওগো মথুরারি পথে।
শুভ সুবর্ণার বাঁকখানি বেলুল্যা পাটের শিকে
কৃষ্ণের স্কন্ধে দধির ভার চলিছে রাধিকে।
আগেতে সুন্দরী রাধে পেছুতে বড়াই
বাঁকখানি লয়ে যায় শ্রীনন্দের কানাই।
তরুতলে ভার নামাইয়া বলে হরি হরি
শ্রীরাধিকার প্রেমের ভার কন্ধ জ্বলে মরি।
ঠাকুর খেয়েছ রাধিকার কড়ি, হয়েছ বিগারী
আজ কেন বললে ছাড়বো ভার বইতে নারি।
দই-এর লোবো পণ পণ দুধের লোবো কড়ি
এক কড়া কমি হলে মারবো চোঙার বাড়ি।
যে-না দেশে বিকাবে সেই-না দেশে যাব
মনেরি উল্লাসে শ্যামকে নগরে ফিরাব।
পার কর কাণ্ডারী হরি আমার বেলা পানে চেয়ে
দধি দুগ্ধ নষ্ট হল সময় যাচ্ছে ব'য়ে।
নিত্য নিত্য যাও বড়াই দানীকে ভাঁড়িয়ে
পেয়েচি তোমার নাগাল বিরলে বসিয়ে।
আজ না দিব ছাড়িয়ে এ ঘাটের দানী ঠাকুর
কভু নাইকো শুনি
দান দিয়ে চেপে যাও রাধে বিনোদিনী।

---

৪২ নাশ-পেটারী—বেশ-বিন্যাসের দ্রব্যাদি সংরক্ষণের পেটরা।

৬০ না—'না'-শব্দ এখানে নিষেধার্থক নহে। উক্ত কথায় জোর দিবার জন্য এই ভাবে ব্যবহৃত হয়।

৬৮ দান—মাশুল বা শুল্ক।

যাবার বেলাতে দানের কড়ি পাতি নাই।
আসবার বেলাতে দানের যৌবন করব দান।
হাতে ধরে সখীদিকে নৌকাতে বসাইল।
কোথা রাখচে দধি কোথায় রাখচে পা।
ওগো ডরাইচে গোয়ালার কন্যে কপালে মারচে ঘা
লাজ নাই কানিয়া কৃষ্ণ তোমার ভাঙ্গা লা।
কাঠের দেশে থাক ঠাকুর কাঠের কিবা দুঃখ
ভাঙ্গা লায়ে খেয়া দিতে কতই পাচ্ছেন সুখ।
ভাঙ্গা লয় চুরা লয় অসুরিয়া কাঁড়ি
হস্তী ঘোড়া করেচি পার রাধে কতই ভারী।
সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা
ওগো শ্রীমতীকে পার করিতে কানের লিব সোনা।
সব সখীকে পার করিতে লিব বুড়ি বুড়ি
সাড়ী লাও সোনা লাও সকলি দিতে পারি
এ দরিয়ার মাঝে ঠাকুর হেঁটে যেতে নারি।
এ ঘাটের তরী উ ঘাটে লাগিল
মথুরায় যাবার বিলম্বে দধি উড়িয়া গেল।

---

৭৬ ভাঙ্গা লায়ে—ভাঙ্গা নৌকায়।
৭৮ অনুরূপ পদ—

দুকূলে বহিছে বায়া পিছে রাধার গায়
নন্দসুত নবীন কাণ্ডারী।
তরণী নবীন নয় ভার দিতে করি ভয়
ভাঙ্গা নায় বসিতে না পারি।।
হসি বলে গোবিন্দাই পার হবে ভয় নাই
অশ্বগজ কত করি পার।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কত পার করি শত শত
যুবতীর যৌবন কত ভার।। (বংশীদাস)

৮১ বুড়ি বুড়ি—প্রত্যেক সখীর জনপ্রতি ৫ করিয়া কড়ি।

কাল কৃষ্ণ ধলা গাভী দুইছে মনের সুখে
চোঙ্গাতে দধি নাহি আঁটে ঢালে চন্দ্রমুখে।
তালবন তমালবন মধুবনের মধু খেয়ে
রাখালগণ ঢলে ঢলে পড়ে।
শিঙ্গায় করে জল এনে ছিদামের মুখে দিল
এক লক্ষ গাভী দাদা বলরাম ঘুরাইল।
দে রে ভাই শিঙ্গায় শান
ঘরে আছে নন্দরাণী শুনে জুড়াক রে জীবন।
কালীদহে ঝাঁপ দিয়ে তুলিবে কখন
আহার বলে কালীনাগ ঘেরিল সকল।
নাগবতীর কন্যাগুলি উপস্থিত হ'ল
ওগো নাগেরি মস্তকে ঠাকুর নাচিতে লাগিল।
আমার কি ক্ষণে হইল দেখা
শ্যাম-বিনোদিনী রাধা কি ক্ষণে হইল দেখা।

(দাদপুর নিবাসী ভূপতি চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

---

(১০)

কৃষ্ণলীলা

বটপত্রে ভেসেছিলেন প্রভু নারায়ণ
চরণসেবা তাঁর করেছিলেন লক্ষ্মীঠাকরুণ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম চতুর্ভুজ ধরা
মকর কুণ্ডল প্রভুর গলে বনমালা।
হাতে বেড়ী পায়ে বেড়ী বুকেতে পাষাণ
বন্দীশালে কারাগারে কংসের আছে চিরকাল।
শিয়রে বসিয়ে নারায়ণ স্বপন দেখায়—
কত নিদ্রা যেছ মা দৈবকীর রায়।
তোমার গর্ভে আমাকে তিলেক মাত্র দিবে ঠাঁই।

৮৭-৮৮ দ্রষ্টব্য ৪ (৬৩-৬৪)।
৮৮ আঁটে—সঙ্কুলান হয়।

ছয় পুত্র হ'ল কংস মারিল কাছিরে
তোমাকে থল দিলে আমার কিবা লভ্য হবে।
আমাকে থল দিলে মা তুই বড়ই পাবি সুখ
পাছে রাজা বধ করিব নর কংসাসুর।
কোন মতে কৃষ্ণ থল নাহি পেল
শ্বেত মাছির রূপ ধ'রে গর্ভেতে প্রবেশিল।
হাতের বেড়ী পায়ের বেড়ী বুকের পাষাণ খসিয়া পড়িল
যতগুলি কংসের সেনা সুখে নিদ্রা গেল।
পঞ্চম মাসে লোকে সব করে কানাঘুষি
ছ-মাসে ন-মাসে গর্ভ হ'ল জানাজানি।
দশ মাস দশ দিনে পরিপূর্ণ হল
ভাদ্র অষ্টমীর দিনে কৃষ্ণ জন্ম হ'ল।
দৈবকীর কাঁদনে গাবিনী গাব ছাড়ে
হেরো হেরো গাছের পাতা সব খসে খসে পড়ে।
ফলে ফুলে যখন কৃষ্ণ ভূমিস্তে পড়িল
দাইরূপে বসুমতী হস্ত পেতে নিল।
সুবর্ণার চাকুতে কৃষ্ণের নাড়ি ছেদন করে
আঁওলে আঁওলে দিল ওগো বসুদেবের কোলে।
বসুদেব কংসের ভয়ে লুকাইতে যায়
নন্দালয়ে নন্দ ঘোষের ঘরে।
ছিপি ছিপি জল হয় ঘরে অন্ধকার
পাতালে নাগ বাসুকী ঠাকুরকে ছত্র ধরে যান।
যমুনার ধারে দেব দরশন দিল
ঠাকুরকে দেখে যমুনা উতলতে লাগিল।

---

১০ কাছিরে—কাছাড় বা আছাড় মারিয়া।
২২ গাবিনী গাব ছাড়ে—গর্ভিণীব গর্ভপাত হয়।
২৩ হেরো হেরো—তাজা তাজা।
২৪ ভূমিস্তে—ভূমিতে।
২৭ আঁওলে আঁওলে—১ (২১)।

বসুদেব দেখে যমুনা ভাবে মনে মনে
দশ মাস দশ দিন ছিলেন ঠাকুর দৈবকীর উদরে।
আমার গর্ভে স্নান কর ভাগ্যে হোক আমার
কোন মতে বসুদেব পার নাহি পেল।
শৃগালমূর্ত্তি হয়ে ভগবতী যমুনা পার হইল
শৃগালের নামা দেখে বসুদেব যমুনায় পা দিল।
হাত পিছুলে কৃষ্ণ যমুনায় পড়িল
মা যমুনা পুত্র বলে ঠাকুরকে কোলে কোরে নিল।
আঁকাবাঁকি করে বসুদেব হাতড়াতে লাগিল
যমুনাকে কোল দিয়ে দুই বাহু তুলে দিল।
বাহু তুলে কোলে কোরে নন্দালয়ে নন্দ ঘোষের ঘরে
দরশন দিল।

---

৪২ আঁকাবাঁকি করে—অতিশয় ব্যস্ত হইয়া।

৪২ হাতড়াতে—খুঁজিতে।

৪৫-৫৭ নন্দোৎসব উপলক্ষে শিবাই বা শিবানন্দ দাস রচিত একটি পদ ইতিপূর্ব্বে (৩ পৃঃ) উদ্ধৃত হইয়াছে; আর একটি পদ উদ্ধৃত হইল।

জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে।
উপনন্দ অভিনন্দ সনন্দ নন্দন নন্দ
পঞ্চ ভাই নাচে বাহু তুলিয়া রে।। ধ্রু।।
যশোধর যশোদেব সুদেবাদি গোপসব
নাচে নাচে আনন্দে ভুলিয়া রে
নাচে রে নাচে রে নন্দ সঙ্গে লৈয়া গোপবৃন্দ
হাতে লাঠি কান্ধে ভার করিয়া রে।।
খেলে নাচে খেলে গায় সুতিকাগৃহেতে ধায়
ফিরয়ে বালক মুখ হেরিযা রে।
দধি দুগ্ধ ভারে ভারে ঢালয়ে অবনী পরে
কেহ শিরে ঢালে দধি ভুলিয়া রে।।
লগুড় লইয়া করে আওল ধীরে ধীরে
নন্দের জননী নাচে বরিয়সী বুড়ী রে।।
যত বৃদ্ধ গোপনারী জয়কার ধ্বনি করি
আশিস্ করয়ে শিশু বেড়িয়া রে।।
নর্ত্তক বাদক কত নাচয়ে শত শত
ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া রে।
ভোর হইল গোপ সব অপরূপ নন্দোৎসব
এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া রে।।

কি আনন্দ হ'ল বড় ও গো কি আনন্দ হ'ল
গোয়ালার ঘরে গোবিন্দ জন্ম নিল।
এলো রে বড়াই বুড়ি হাতে নিয়ে লড়ি
নাতিনী হয়েছে বলে যায় গড়াগড়ি।
গোয়ালা এল ধেয়ে আরে গোয়ালিনী এল ধেয়ে
হাতে লড়ি কাঁধে ভার নাচে থেয়ে থেয়ে।
গোয়ালার ব্যবহার দই ঢালে ভারে ভার
কাদা হ'ল নন্দেরি আগনে রে ভাই।
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র
গোকুলে গোয়ালা নাচে পেয়ে রে গোবিন্দ
নন্দের দুলাল নাচে কোলে ক'রে কানু
ব্রাহ্মণের উপরে যায় নবলক্ষ ধেনু।

---

৫১ ব্যবহার—রীতি।
৫২ আগনে—আঙ্গিনায়।
৫২—

(ক)

গোপ গোপীগণ দধি ঘৃত মাখন
ঢালত ভারাহি ভার।
কহ শিবরাম সকল দুঃখ মিটন
আনন্দে কো করু পার।।

(খ)

দধি ঘৃত নবনী হরিদ্রা হৈয়ঙ্গব
ঢালত অঙ্গন মাঝে।
কহ শিবরাম দাস আনন্দে নাচত
গাওত ব্রজনব-রাজে।। (—শিবরাম)

৫৫-৫৬—

লক্ষ লক্ষ গাভীবৎস অলঙ্কৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান আপনা পাসরি।।
গায়ক ব্রাহ্মণ ভাট করে উতরোল।
দেহ দেহ নেহ নেহ শুনি এই রোল।। (—উদ্ধবদাস)

৫৬—অনুরূপ পদ

বিপ্রবৃন্দমভূদলঙ্কৃতিং গোধনৈরপি পূর্ণম্।
(বিপ্রবৃন্দ অলঙ্কার ও গোধনের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল)

নন্দরাণী দই ঢালে নন্দেরি শিরে
হেন সময়ে খবর দিল কংসেরি হুজুরে।
করণে-পুত্তুর জন্ম নিল রাজা দৈবকীর উদরে
করণে-পুত্তুর মার কাছিরে রজকের পাষাণে।
এক কাছাড় দুই কাছাড় তিন কাছাড় মেল
হাতের কায়া হাতেই থাকল, শঙ্খচিল হয়ে ভগবতী
উড়িতে লাগিল।
আমাকে মারবি রাজা তুমি বরাবর
তোকে যে মারবে তার গোকুলে হবে ঘর।
পূতনা পূতনা বলে ডাকিতে লাগিল
ঘরে ছিল পূতনা বাটীর বাহির হল।
এস গো পূতনা বাটার তম্বল খাবি
গোকুল বৃন্দাবনে জন্ম নিল তাকে বধ করে আসবি।
কংসের আজ্ঞা পেয়ে পূতনা বিষের স্তন নির্ম্মাণ করিল।
গোকুল বৃন্দাবনে পূতনা দরশন দিল।
নন্দ গেল বাতানে যশোদা গেল জলে
খালি ঘর পেয়ে কৃষ্ণ উঠিছে কাঁদিয়ে।
আঁকা বাঁকি করে কোলে করে নিল
মাসীমা মাসীমা বলে কোলে চেপে এল।
বিষেরি স্তন পূতনা ঠাকুরকে খাওয়াতে লাগিল।
এক চোঁয়ে পূতনা বধ হল।
পূতনা মল ছুতনা করে শব্দ গেল দূরে
হেন সময়ে খবর গেল কংসেরি হুজুরে।

---

৬০ করণে-পুত্তুর—কন্যা-সন্তান।
৭৬ চোঁয়ে—চুমুকে।
৭৭ ছুতনা—ওজর, অবলম্বন বা অছিলা।
৭৮ কংসের হুজুরে—কংসের নিকট।



গোষ্ঠ-লীলা

চূড়া দিল ধড়া দিল পাঁচুনি দিলেন হাতে গোধন চরাতে যাবেন দাদা বলরামের সাথে।

তর দিল বালা দিল পাচুনি দিল হাতে
ওগো সাজায়ে কুজায়ে দিচ্ছে দাদা বলরামের সাথে।

(দাদপুর-নিবাসী ভূপতি চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

(১১)

কৃষ্ণঠাকুর

রাধাকৃষ্ণ দর্শন কর কদম্ব কিশোরী — রাধাকৃষ্ণ
চাঁদমুখে মুরলী বাজান ধীরি ধীরি।
ললিতা বিশাখা রসের তম্বল যোগান
বিন্দাবনের তরুলতা অতি ভাগ্যবান্।
চূড়া বেঁধে দে গো ও মা মুরলী দে হাতে
গোধন চরায়ে আসি বলাই দাদার সাথে।
পরিপাটী নাই নাগরের চুড়াটী ডাগর — গোষ্ঠ-লীলা
ধেনু বাছুর লয়ে কৃষ্ণ গোষ্ঠেতে সাজিল।
সাজিল গো যত গোপী দিগাম্বরী হয়ে
জলখেলা করে গোপী আনন্দিত মনে।
কৃষ্ণ লয়ে গোপীর বসন চড়িল কদমে — জল-কেলি
ডালে ডালে গোপীর বসন রাখিল বাঁধিয়ে।
দাও হরি নারায়ণ বস্ত্রখানি বসন দিলে পরি — বস্ত্র-হরণ
বস্ত্র বিনা সব গোপী লজ্জাতে মরি।

---

৭৯ তর—তাড় (বাহুতে পরিবার বলয়-বিশেষ)।
পাঁচুনি—গরু চরাইবার ছোট লাঠি।
৩ তম্বল—তাম্বুল বা পান। ১১ কদমে—কদম্ববৃক্ষে।

যার যে গোপীর বসন কৃষ্ণ বাড়াইয়ে দিল
বসন পাইয়া গোপীর আনন্দিত মন।
পথ বুঝে বসেন কৃষ্ণ কেল-কদম্বের তলে
এই পথে গোয়ালিনী দধি বেচিতে যায়।
কিসের পসরা রাধা মস্তকের উপর
এক ভাঁড় দই দুগ্ধ এক ভাঁড় ঘিয়।

দান-লীলা বা নৌকা-খণ্ড

পথের পথিক নয় রাধিকা ঘাটের মহাদানী
ভাঁড় ভর্ত্তি করে লোব এই পঞ্চাশ কাহনে।
তখন কিবা বড়াই বুড়ি সম্বন্ধ জুড়িলেন।
তুমি আমার ভাগিনা ভাগিনী দুবরাজ।
ভাল সম্বন্ধ পাতাইলি বড়াই ভাগিনা মিলাইলি।
এত কথা শুনে কৃষ্ণের পাটার পারা বুক
রাধিকার লোভে কৃষ্ণ দধির নিল ভার।
আগুতে সুন্দর রাধা পেছাতে বড়াই।
তার মাঝে ভার লয়ে যায় নন্দের নন্দন।

ভারী শ্রীকৃষ্ণ

ভার বইতে নারি রাধা ভারের কিবা রঙ্গ।
তবে কেন খালি কৃষ্ণ দধিরি মঞ্জরী
এই ভার লয়ে চল মথুরার পুরী
লোকে যে শুধালে বলবে রাধিকার বিগারী।
রাধা বেচেন দধি দুগ্ধ কৃষ্ণ গুণে কড়ি।
নাউড়ে হয়ে কৃষ্ণ কিনারে নামিল
পাঁচখানি কাঠের নৌকা ঘাটে সৃজন করি।
সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা
শ্রীরাধাকে পার করিতে লিব কাণের সোণা।

---

২৬ পাটার পারা বুক— পাটার মত সুবিস্তৃত বা সুপ্রসারিত বক্ষ।
২৮ আগুতে—অগ্রে।
৩৩ বিগারী—বেগার (বিনা বেতনের মজুর)।
৩৫ নাউড়ে—নৌকা খেয়া দিবার মাঝি।

হাতে ধরে শ্রীরাধাকে নৌকাতে চাপাইল
খেয়া দিতে নৌকাখানি দরিয়াকে লিল।
দরিয়ার মাঝে নৌকা কাঁপিতে লাগিল।
শ্রীরাধিকা ভয় পেয়ে কৃষ্ণের গলে ধরে।
শ্যাম কোলে ক'রে প্রভু যমুনায় দিল ঝাঁপ। যমুনাজলে
ছি ছি হেন লজ্জা নাগর লজ্জা নাইকো বাসর যুগলমিলন
পরের রমণী দেখে জলে ডুবে মর।
কাল কৃষ্ণ ধল গাইটী দুহে মনের সুখে।
ভাঁড়ে না আঁটে দুগ্ধ ঢালে চন্দ্রমুখে। গোদোহন
বৃন্দাবনে রাসলীলা করে কোন জন রাসলীলা
যত কৃষ্ণ তত গোপী বলি পুণ্যবান্।
জয় ঠাকুর মহাপ্রভু করিবে কুশল
গারুস্থের মঙ্গল চিন্তিবে নারায়ণ।

[কুসমা-(দুমকা) নিবাসী কীর্ত্তি চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ]

---

(১২)

কৃষ্ণলীলা

লতান্য কদমের তলে ঠাকুর বাজাচ্ছেন মুরলী
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম মা বংশীতে দিলেন শ্যাম।
ছলনা করিয়া কৃষ্ণ মায়ের কোলে যায় গোষ্ঠ-সজ্জা
বলে চূড়া বেঁধে দাও গো মা মুরলী দেও মা হাতে
গোধন চরাতে যাব বলাই দাদার সাথে।

৪৬-৫১ দ্রষ্টব্য—২ (৪৫-৫১), ৪ (৬৩-৬৪), ৯ (৮৭-৮৮)।

৪৭ আঁটে—সঙ্কুলান হয়। ৫১ গারুস্থের—গৃহস্থের।

১ লতান্য—লতানীয়া গাছ।

চূড়া বেঁধে দিচ্ছে মায়ে লবগন্ধ দিয়ে
শ্রীদাম সুবল বলরাম গোধন চরায়
ভাণ্ডীর বনেতে যেয়ে গাভী যে উঠায়।
ষোল সখী গোপকন্যা না ধরে পরাণ
কাঁখে কলসী লিয়ে সখী যমুনাতে যায়।
হাতেতে তেলের বাটী কাঁখে কুম্ভ কলসী
যমুনার ছিনানে গোপী আনন্দিত মন।
ভূমেতে বসন রাখি যমুনায় দিল ঝাঁপ
কোথায় ছিলেন চোরা কানাই জানিবারে পায়।

বস্ত্র-হরণ

বসনখানি লয়ে কৃষ্ণ কদম্বে চড়িল
ডালে ডালে গোপীর বসন বাঁধিয়ে রাখিল।
এক সখী বলে দিদি জলের কিবা রঙ্গ
কানাই নিলেন গোপীর বসন চড়েছে কদম্ব।
দিবেন প্রভু নারায়ণ বস্ত্র দেওনা পরি
বসন বিনেতে লজ্জা গতে মরি।
বলে জোড় হস্ত কর রাধা কর পরণাম
তবেই আর গৌরাঙ্গী বস্ত্র দিব দান।
একে একে গোপীর বসন বাড়ায়ে ভাল দিল।
বসন পাইয়া গোপী আনন্দিত মন।
বলে পথ বুঝে বসেন কৃষ্ণ নন্দের কানাই
এই না পথে গোয়ালিনীরা দধি বেচতে যায়
বলে ভারের উপর পসরা দেখি রাই আর ভারে কি।
আর ভারে দই ও দুগ্ধ আর ভারে ঘি—

ভারী শ্রীকৃষ্ণ

পথের পথিক তুমি ওধাবার কি?
পথের পথিক লইগো ঘাটের মহাদানো
ভারগতি করিনিগো এবঞ্চ করনা।

---

৬ লবগন্ধ—নয় প্রকার গন্ধদ্রব্য।
২৯ ওধাবার—শুধাইবার বা জিজ্ঞাসা করিবার। তুমি সেকথা জিজ্ঞাসা করিবার কে?

মানন সুরথী লেব রত্ন-সিংহাসন।
এতক বলিয়া কৃষ্ণ ভার লইল কাঁধে
বলে আগুতে সুন্দর রাধা পিছেতে বড়াই
তার মধ্যেতে ভার লয়ে যায় নির্লজ্জ কানাই।
ভার বইতে নারে রাধা ভার বড় ভারী
কেনে কৃষ্ণ খেলে তুমি দধির মজুরী
এই ভার নিয়ে যাবে মথুরার পুরী।
ইন্দ্র ইন্দ্র বলি কৃষ্ণ স্মরণ করিল
ইন্দ্রে আনে জল, পবনে আনে ঝড়,
মায়ানদী সাঁতার দিয়ে ডাঙ্গালে উঠিল।
মাঝখানে কাঠের নৌকা কৃষ্ণ ঘাটে তেষ্ট করিল — দান-লীলা
লাউরে হইয়ে কৃষ্ণ কিনারে রহিল।
সব সখী পার করিতে লিব আনা আনা
রাধিকারে পার করিতে লিব কাণের সোণা।
বলে বৃন্দাবনে থাক্ কৃষ্ণ কাঠের কিবা দুঃখ
ভাঙ্গা নায়ে খেয়া দিতে কত পাবে সুখ।
ভাঙ্গা নৌকা নয়গো রাধে অসুরের কাঁড়ী
জগৎ সংসার পার করেছি তুমি কত ভারী।
মাঝ দরিয়ায় যাইয়ে কৃষ্ণ কাঁপাইয়ে দিল। — যমুনা-জলে
ভয় পাইয়ে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের গলে ধরে। — যুগলমিলন
ধরাধরি হয়ে কৃষ্ণ যমুনায় দিলেন ঝাঁপ
পদ্মপাতে গোলকমূর্ত্তি ডাঙ্গায় উঠিল।
খোল বাজে বেণু বাজে বাজে করতাল।
কালো কৃষ্ণ ধলো গাই দুহে মনের সুখে
ভারে না আঁটান দুগ্ধ ঢালেন চন্দ্রমুখে। — গো-দহন

---

৩৪ আগুতে—অগ্রে।
৩৭ তুমি কেন দধি বহিবার মজুরী গ্রহণ করিলে?
৪২ তেষ্ট করিল—তেষ্ঠ—তিষ্ঠ, অর্থাৎ স্থিত করিল বা নৌকা বাঁধিল।
৫৫ ধলো গাই—শ্বেত বর্ণের গাভী (ধলো = ধবল)।
৫৬ না আঁটান—সঙ্কুলান হয় না।

ভাগ্যবতী যশোদা মাই নবনী খাওয়ায়
সপ্তরাত সপ্তদিন গোকুলে বাদল।

গোবর্দ্ধন ধারণ

গিয়া পর্ব্বত ধারণ করেন প্রভু চক্রপাণি।
বৃন্দাবন যাইয়ে কৃষ্ণ রাস আরম্ভিল
কুঞ্জে কুঞ্জে কৃষ্ণ গোপী ঘেরিয়া রহিল।

[সাঁওতাল পটুয়ার (যাদু পটুয়া) গান হইতে লিপিবদ্ধ]

---

৫৮ বাদল—বর্ষা, ক্রমাগত বারিবর্ষণ।
৫৮-৫৯ অনুরূপ বৈষ্ণব পদ এই—

যত ব্রজবাসিগণ পূজা কৈল গোবর্দ্ধন
না করিল ইন্দ্রের অর্চ্চন।
করিল জেনের পূজা শুনি ইন্দ্র মহারাজা
ক্রোধ করি ডাকে মেঘগণ।।
মহাক্রোধে ইন্দ্রদেব প্রলয়-কালের মেঘ
চারি জনে ডাকিয়া আনিল।
অতি কোপ মন করি নন্দের গোকুল হরি
ডুবাইতে তারে আজ্ঞা দিল।
পবনে করিয়া ঝড় উড়াইল বৃক্ষ ঘর
মুষল ধারায় পড়ে জল।
ঝলকি তড়িত পাত মন হয় বজ্রাঘাত
জলে ছল হৈল উচ্চস্থল।।
কৃষ্ণের আদেশ পায়্যা গোধনাদি সব লৈয়া
গোবর্দ্ধনেব লইল শরণ!
কৃষ্ণচন্দ্র অতি ত্রস্ত প্রসারিয়া বাম হস্ত
ধরিলেন গিরি গোবর্দ্ধন।।

(১৩)

রাম-অবতার

ওগো রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পাবে আর নিপুত্রিকা।
(এই যে) অজ রাজার পুত্র রাজা নামে দশরথ
(এই যে) সভা করিয়া বসলেন রাজার যতেক প্রজাগণ।
রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পাবে
(এই যে) অপুত্রিকা বলছে রাজাকে অযোধ্যারি লোকে।
নারদ মুনি কয় কথা সব শোনেন মহাশয়
(এই যে) শনিকে জিনিতে পার তবে রাজার রথসজ্জা হয়।
(এই যে) রথ উড়ে স্বর্গ-পথে গগনমণ্ডলে
(ওগো) কোথায় ছিলেন জটায়পক্ষ, দেখ রথকে নামায় ভূমিতলে।
এই যে রথ রথী সারথি ঘোড়া সকলি নামাইল
এই যে নিজের গলায় পুষ্পমালা খুলে জটাইর গলে দিল।
তুমি আমার মৈত্র পাখী তোমার আমি মিতে
(এই যে) বিপদ্ সময়ে যেন মনে রেখো মিতে।
(এই যে) রথখানি বাঁধিলে রাজা শাল বিরিক্ষির তলে
(এই যে) শীঘ্র করে আসি আমি (বনের) মৃগ শীকার করে।
(এই যে) নিলে ঘোড়া খাসা জোড়া, (রাজার পায়েতে পা মুড়ি
(মোজা)
গলাতে তুলসীর মালা (যার) বিনন্দের পাগুড়ি।
(এই যে) বনের ভিতর একাদশী ব্রত করে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী

---

১ অনুরূপ উক্তি— রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট ভাল চাহ মনে।
স্ত্রীহু পাপে গ্রিহলক্ষ্মী পলাএ আপনে।
(মানিকচন্দ্রের গান—ভবানীপ্রসাদ)

৬-১৩—রামায়ণ (কৃত্তিবাস) আদি কাণ্ডে—(১) দশরথে শনির দৃষ্টি ও জটায়ুর সহিত মিত্রতা এবং (২) দশরথরাজ্যে শনির শুভবর-প্রসাদপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(এই যে) শীঘ্র করে জল আনো বাপ প্রাণের সিন্ধুক মনি।
(এই যে) আমি নিত্য আসি নিত্য যাই সরোবরের ঘাটে,
আজতো যাবনা পিতা, আমার প্রাণ কেঁদে উঠে।
(ওগো) ধর্ম্ম ক'রে মরে যদি পাণ্ডবের নন্দন
(ওগো) তবে লোকে ধর্ম্ম করে কিসেরি কারণ।
(এই যে) কাঁদিতে কাঁদিতে সিন্ধুক অমৃত নিল হাতে
(এই যে) জল পূরিতে যায় সিন্ধুক মনি সেই সরোবরের ঘাটে।
এ দিকে জলের শব্দ রাজার দেখ কর্ণগত হইল
(এই যে) বনের হরিণ বলে দেখ বাণ যে মারিল।
ওরে কে মেলিরে ব্রহ্মাস্ত্র বাণ আমার অঙ্গ গেল জ্বলে।
(এই যে) পিতা মাতা কান্দে দুই জন দেখ বনেরি ভিতরে।
(এই যে) অমৃত নয় জল দাও গো যাব পিতারি নিকটে
(এই যে) বাণে কাতর হয়ে সিন্দুক মনি পড়ে গেল যমুনারি জলে।
(এই যে) ঘোড়া পৃষ্ঠে নেমে রাজা মরা সিন্দুক করে কোলে।
মরা সিন্দুক করে রাজা ফেরে বনে বনে।
এখানে হাত পড়িয়ে ডাকে দেখেন ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে।
ওরে সিন্ধুক এলি না কে এলি বাপ আয় রে করি কোলে।
ওগো তোমার সিন্দুক নয় গো মণি নামে দশরথ
আমি না জানাতে বধ করেছি তোমারি নন্দন।
কি কথা শুনাইলি রাজা তোর কি বেরোইল মুখে
(এই যে) বজ্রাঘাত হইল দেখ যেন দ্বিজ অন্ধক মুনির বুকে।
এই যে পুত্র যদি আছে রাজার তু নিপুত্রিকা হবি
আর পুত্র যদি না আছে রাজার তু পুত্তুর বর পেলি।
ওগো সিন্দুক এলি না কে এলি বাপ আয়রে করি কোলে
একবার মা কথা বল রে বাপ জুড়াক রে জীবন।
তোমার সিন্দুক নয় গো মুনি আমার নাম দশরথ
আমি না জানাতে বধ করেছি তোমারি নন্দন।
হায় হায় করিয়া কপালে মারে ঘা

৩৮ বেরোইল—বাহির হইল।

কোথা গেলি প্রাণের সিন্দুক কেবা বলে মা।
সাত নয় পাঁচ নয় আমার একা সিন্ধুক মণি
কি অপরাধ করেছিল দণ্ড দিতাম আমি।
মৎস্য চিনে গহীর গমিন পক্ষ চিনে ডাল
মায়ে চিনে পুত্রের বেদন প্রাণে কাঁদে মার।
ওগো যে মাটীতে বৃক্ষ থাকে সেই তো মাঠের মাথা
একা মায়ের পুত্র মলে মা দাঁড়ায় বা কোথা।
তোর রাজ্যে যাবি না রাজা করি আশীর্ব্বাদ
ওগো বাউটে সন্তান বধো সাধো আপন বাদ।
চার পুত্তুর হবে রাজার রাজা যাবে বন
পড়ে রবে খাট পালঙ্গ ত্যাজিবে জীবন।
নিজে মুখে যে দিন বল্‌বি রাম যাবে বন।
এই কথা বলিয়া—দেখ একজনার সাথে মৃত্যুই তিনজনার হইল,
এই যে বনের ভিতর রাজা দেখন চিতা সাজাইল।
ঘড়ার ঘড়ার ঘৃত নয়ে ডাহন করিল
ডাহন করিয়ে রাজা অযোধ্যাকে গেল।
অযোধ্যাকে যেয়ে রাজা ভাণ্ডাব ভাঙ্গিয়া ব্রাহ্মণে করে দান।
ওগো শত শত মুনিতে বলে রামের হোক কল্যাণ।

৫০—গহীর—গহীন=দুস্তর বা গভীর। অনুরূপ উক্তি—

(১) বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ারি
এহাত কেমনে হইব পার।
—চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

(২) মন রসময় তনু অন্তর গহীন।
নিমগন কতহু রমনী-মন-মীন।।
—গোবিন্দদাস—পঃ কঃ তঃ, ৭০৪ পদ

৫০-৫১—অনুরূপ উক্তি—

মাছে চিনে গহিন গমিন পক্‌খী চিনে ডাল।
মাত্র চেনে পুতের দয়া জার বক্ষে শ্যাল।
গোপীচন্দ্রের গান, ৭১৬-১৭

(গাহিন গমিন—গভীর জমিন)

৬২ ডাহন- -দাহন।

বাপ যার বিভাণ্ড মুনি মা তার হরিণী
তাহার গর্ভে জন্ম নিলে নাম হৃর্য্যশৃঙ্গ মুনি।
রাম না জন্মাইতে ছিল যাইট হাজার বচ্ছর
(এই যে) বাল্মীক মুনি পুঁথি রচনা করেছে পেয়ে ব্রহ্মার বর।
এখানে যজ্ঞতে উঠিল চরু রাজা মেগে নিল।
কৈকেয়ী সুমিত্রা যার চরু ভক্ষণ করে।
(এই যে) অন্ধকের বরে অযোধ্যার রাম জন্ম নিলে।
(এই যে) দূর্ব্বদলশ্যাম যার কমল-লোচন
সভা করে বসিলে রামের ভাই যে চার জন।
যেমন রামের গাণ্ডীব বাণ তেমনি রামের ছটা।
নবীন বয়সে রামের মস্তকেতে জটা।
(এই যে) সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে দশরথ পিতা।
এখানে অশ্বমেধের যজ্ঞ করিতে মুনিদের গেল সাধ
এখানে শ্বেত কাগা পক্ষী এসে যজ্ঞে পাতিলে প্রমাদ।
(এই যে) শ্বেত কাগার ভয়ে মুনিরা পলায় দেশ দেশান্তরে
এমন কে বীর আছে যে রাম আনিতে পারে।
(এই যে) রাজার গুরু বিশ্বামিত্র মুনি রাম আনিতে পারে
(এই যে) দিব্য মালা চাঁপার কলি লয়ে রামের তরে।
(এই যে) ধীরে যাত্রা করে দেখ অযোধ্যানগরে।
ঘরে কয় রাণী বার্ত্তা দ্বারে গেল মুনি
বসিতে আসন দিলে পথের আগে জল।
কোথাকারে যাও মুনি কও দেখি বচন।
ছমাস হাঁটি এলাম আমি অযোধ্যা ভবন।
তোমার ঘরে জন্ম নিলেন শ্রীরামলক্ষ্মণ
দিতে হবে মুনিদের যজ্ঞেরি কারণ।
রাজা বলে প্রাণ চাও ধন চাও মুনি সব দিতে পারি
আমি আপনার জ্ঞানে রামকে কভু বনে দিতে নারি।

৬৭ হৃয্যশৃঙ্গ—ঋষ্যশৃঙ্গ।



তাড়কা-বধ

যত শত বাণ মারে ধরে ধরে খায়

এই রঘুনাথের গাণ্ডীব বাণে তাড়কা-বধ হয়।

মুনি বলে রাম পাঠাইতে পাপিষ্ঠ ওগো কান্দে জীবন
নিজ মুখে বলিবি যে দিন রাম যাবে বন।
রামলক্ষ্মণ লুকায়ে থুয়ে ভরত সঙ্গে লইল
(ওগো) বাড়ির বাহির হয়ে নাম জিজ্ঞাসা করিল।
তোর নাম কিরে বাপু তোরি বা নাম কি।
আমার নাম ভরত মুনি ভাই এর নাম শত্রুঘ্ন
ওগো ঘরে আছে মুনি মশায় শ্রীরামলক্ষ্মণ।
এই কথা শুনে মুনির অঙ্গ গেল জ্বলে
(ওগো) মুখে অগ্নি চোখে অগ্নি ছুটিতে লাগিল
(ওগো) সেই অগ্নিতে রাজার অযোধ্যা পুড়িল।
রাজা বলে কদ্‌দুর গেল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আনগা ফিরায়ে
শ্রীরামলক্ষ্মণ দিব চরণ ধরে।
রামলক্ষ্মণ মুনির আগে দিল
(ওগো) শ্যাখ দিল, ধানদূর্ব্বা আশীর্ব্বাদ করিল।
ছদিনের পথে যাবি না ছমাসের পথে যাবি
ছমাসের পথে যজ্ঞ দরশন
ছদিনের পথে আছে তাড়কা একজন।
উত্তর দক্ষিণা বীর সুখে নিদ্রা যায়
(ওগো) শাল গাছের আড়ে মুনি তাড়কাকে দেখায়।
তাড়কা দেখে মুনি কাঁপে থরে থরে
(ওগো) মুনিকে লুকায় লক্ষ্মণ শাল পাতের ভিতরে।
যত শত বাণ মারে ধরে ধরে খায়
এই রঘুনাথের গাণ্ডীব বাণে তারকা বধ হয়।
(ওগো) অহল্যা পাষাণ হয়েছিল গৌতম মুনির শাপে
(ওগো) তাহার দেহ মানব হইল রামের চরণের ধূলাতে।
পার কররে ধীবর মাঝি পার কররে মোরে
(ওগো) ওপার হইয়ে ধীরব বর দিব তোরে।

---

১০২ কদ্‌দুর—কতদুর।
১০৫ শ্যাখ—শাঁখ।

পার করি কি ঠাকুর মহাশয় প্রাণে লাগে ভয়
আমার কাষ্ঠের নৌকা যদি মনুষ্য কভু হয়।
নির্ব্বোধ বলিরে ধীবর নির্ব্বোধ বলি তোরে
(ওগো) কাষ্ঠের নৌকা কভু মনুষ্য হতে পারে।
কি দিব রাম নামেরি তুলনা
চরণের ধূলায় পাষাণ মানব ধীবরের নৌকা হোক সোণা।
ধেনুকভাঙ্গা পণ ছিল রাজার জনকেরি ঘরে
(ওগো) তেত্রিশ কোটি দেবতা এসে ধেনুক নড়াইতে না পারে।
রাজা বলে এই ধেনুক যে ভাঙ্গতে পারবে, সীতা কন্যা দিব দান।
নিজে রামচন্দ্র বলবান্ ধেনুকে দিল টান
ঐ গিটে গিটে, ধেনুক ভেঙ্গে করিলে সাতখান
ততক্ষণ জনক রাজা সীতা কন্যে দিলে দান।
সীতে কন্যে দান করে দিল
ওগো দুই ভেইয়ের বিয়ের কথা একত্রে হইল।
বশিষ্ঠ মুনি আদি রামকে ছয়নাতলায় নান্‌মুখো করালেন।
(ওগো) পালকী সারি কত সাজিয়ে রাখিল।
ঢোল বাজে, নাগ্‌রা বাজে, ওগো আর বাজে কাঁশী
তোলপাড় করে নয়ে যাইছে মিথিলার ঘাটি
পরশুরাম বলে রে ভাই আমার চেয়ে রাম কেবা আছে
আমার চেয়ে রাম যে আছে সে আমার সঙ্গে যুদ্ধু দিয়ে যাবে।
পরশুরাম রামচন্দ্র ঘোরতর যুদ্ধু আরম্ভিল
(ওগো) হাতে হাতে পরশুরামের বল হরে নিল।
অবির পুত্র যম রাজা যম নাম ধরে
বিনা অপরাধে জীবের দণ্ড নাহি করে।
চিত্রগুপ্ত মহুরী দুজন দিবারাত্র লেখা পড়া করে।
একজন বল্‌তে যমের দুইজন যায়
তোলাতুলি করে রাজার নিকটে দেয়।

১৩৩ ছয়নাতলা—ছান্দনাতলা (বিবাহের অধিবাসস্থান বা মণ্ডপ)।

ওগো লোহার ডাঙ্গুর বেড়িয়ে পাপীদের মস্তক ফাটায়।
পরের বাড়ির ধন কড়ি যে চুরি করে খায়, মিথ্যে কথা কয়
তপ্ত সাঁড়াশী করে জিহ্বা কেড়ে নেয়।
ভাল জল থাকতে যিনি মন্দ জল দেয়
উপবাসী তারে লয়ে যেয়ে খারানি জল খাওয়ায়।
হীরা নাম বেশ্যা ছিল মহাপাপের পাপী
অন্নদান বস্ত্রদান ব্রাহ্মণকে গরু দান করে ছিলেন
বিষ্ণুদূত আসিয়ে তারে পুষ্পরথে বৈকুণ্ঠে গমন করেন।
আপনার ঢেঁকি থাকতে যেজন ঢেঁকি নাহি দেয়
বক্ষস্থলে লয়ে তার ঢেঁকিতে পার দেয়।
কলির রাজা কলির প্রজা কলির হৈল শেষ
বৃদ্ধ মার চরকা দিয়ে আপনার স্ত্রীকে স্কন্ধে লয়ে
রাজা গঙ্গা-স্নানে করিলেন গমন।
আপনার পতি থাকতে পর-পতি হরণ করে
খাজুর গাছে লাগিয়ে তার উচিত প্রহার করে।

(ভক্তি পটুয়ার গান হইতে লিপিবদ্ধ)

(১৪)

রাম-লক্ষ্মণ

রামনাথ তারণ পতিতপাবন রাম ভুবনমোহন নীলে
আজ ডুবাইলি জানকীর তরী সেদিন জলে ভাসান শিলে।
ধেনুক ভাঙ্গা পণ আছে রাজা জনকেরি ঘরে
ত্রিশ কোটীর দেবতা ধেনুক নড়াইতে না পারে।

১৫০ খারানি জল—কাপড় সিদ্ধ জল।
১৫৫ পার—পাড় (= পাতন বা পাড়ন)।

হরের ধেনুক দেখে রাম সে দিন নিজে বলবান্
আজ হরের ধেনুক ভেঙ্গে সেদিন করিলে তিনখান।
হরের ধেনুক ভেঙ্গে সীতা করনা পেলে দান।
শুভদিন দেখিয়া রামের বিয়ে জুড়ে দিল
কাহার বেগার বরযাত্র সব একত্রে সাজাল।
অগড় দগড় বাজনা বাজে সেদিন তালে বাজে কাঁশী
তোলপাড় করে চলিল সব মিথিলার মাটী।
যাইতে যাইতে পরশুরামের সঙ্গে রাস্তায় দরশন হল
পরশুরামের সঙ্গে রাম সেদিন যুদ্ধ আরম্ভিল।
পরশুরামের পরাভব করে রাম সেদিন বিয়ে করে রযোধ্যাকে যায়
জলধারা দিয়ে রামের মা রামকে সেদিন বাড়ী লয়ে যায়।
বলে দুয়ারে ঢুকিতে রাম কপালের লিখন পায়
আজ লিখন পড়িয়ে বলে গুণের ভাইরে লক্ষ্মণ
রাত্র প্রভাত হলে বুঝি আমাদিগকে যেতে হবে বন।
কেড়ে নিচে তার বালা সেদিন কাণেরি কুণ্ডল।
সৎমা হয়ে পড়ায় রামকে গাছেরি বাকল।
বাকল পড়িয়ে তবে বনে বিদায় দিল।
চৈত্র বৈশাগ্য মাসে রাম হলেন বনচারী
উপরে রবির তাপে সেদিন নীচে খর বালি
(আজ) চলিতে না পারেন মা জানকী প্রাণেয়ো বিকুলি।

৭ করনা—কন্যা।
৯ কাহার বেগার—বাহক ও বেকার মজুর।
১৪ রযোধ্যাকে—অযোধ্যাকে।
১৯ তার বালা—তাড় বালা—(তাড়-বাহুর ভূষণবিশেষ)।
২১ পড়িয়ে—পরিয়ে, পরিধান করাইয়া।
২৩ খর—উত্তপ্ত।
২৪ বিকুলি—ব্যাকুলতা।

রাম ভাঙ্গে রশোকের ডাল লক্ষ্মণ ধরে সীতারো শিরে
তাহার ছাঁওয়াতে মা জানকী যান ধীরে ধীরে।
যাইতে যাইতে গুহক চণ্ডালের ঘরে যেঁয়ে দরশনো দিল।
স্তুতি ভক্তি করে গুহক চণ্ডাল সেদিন চরণে ধরিল।
লক্ষ্মণ বলে গুহক চণ্ডাল মদ খায় মাংস খায় দাদা যার নাকে
মদ্র গলে
মৃণাক্কার করেন না প্রভু চণ্ডালে করো কোলে।
ভাই লক্ষ্মণ তোরে বোধ নাই, চণ্ডাল আমার সিদ্ধু ভক্ত
চণ্ডালের আমি গুরু
(আজ) ভক্তে নাম রেখেছি, ভক্তের বাঞ্ছাকল্পতরু।
বলে এইখানে থাক চণ্ডাল, তুমি এইখানে থাক,
(আজ) আসিবার সুমই তোমায় মুক্তি করে যাব।
(আজ) পঞ্চ বটীর বনে কুঁড়ে নির্ম্মাণ করে ছিল।
(আজ) শালপত্রের কুঁড়েখানি (সেদিন) খড়কেরো টিপুনী,
বলে তাতে বসে পাশা খেলেন জানকী নন্দিনী।
তারা পাশা খেলেন সারাসারি
(বলে) লক্ষ্মণকে রাখিলেন দেখুন দ্বারেরো প্রহরী।
পাশা খেলিতে খেলিতে পাশা পড়লো ভূমিতলে
(আজ) রাবণের ভগ্নী সূর্পণখা যায় সেদিন পুষ্প তুলিবার সলে।
(আজ) সূর্পণখা নয়ন বাঁকা আড়নয়নে চায়
(আজ) বিয়ে কর বিয়ে কর বলে লক্ষ্মণের কাছে যায়।
লক্ষ্মণ বলে আমি চৌদ্দ বছর খেদা রাখবো না কি নিদ্রা যাব না
পোড়ামুখী আমার সম্মুখ থেকে বিদায় হ।
ওই কথা শুনে সেদিন একটা দুবর্বাক্য বলিল
ক্রোধ করে, বিমুখ হয়ে রাবণের ভগ্নীর সেদিন নাসিকা কাটিল।

---

২৫ রশোক—অশোক।
২৮ নাকে মদ্র গলে—নাক দিয়া মদ নির্গত হয়।
৩১ সিদ্ধু ভক্ত—সিদ্ধ ভক্ত।
৩৪ সুমই—সময়কালে।
৪৩ খেদা—ক্ষুধা।

রাবণের ভগ্নী সূর্পণখা সেদিন লঙ্কাপানে ধায়
(আজ) রাবণের কাছে যেঁয়ে জানাইবারে যায়।
রাবণ বলে ভগ্নী তোর নাক চুল কোথা যায় কেবা নেয়?
বলে পঞ্চ বটী বনে দুজনে রামা লখা বলে বালক এসেচে
রাণী মন্দোদরী হইতে তারা একটা নারী এনেচে।
(আজ) তারা আমার নাক চুল কেটে নিল।
ঐ কথা শুনে রাবণ মায়া মারীচ ডাকিল।
একা ছিলেন মারীচ সেদিন দুজো আজ্ঞ পেল
স্বর্ণমৃগ হয়ে কুঁড়ের দ্বারে সেদিন নাচিতে লাগিল।
ঐ মৃগ দেখে সীতার মন পাগল হল।
ঐ মৃগ ধর ঠাকুর আমরা পুষিব পালিব
বলে চৌদ্দ বছর বন ভববন হলে আমরা দেশে চিহ্নিত লয়ে যাব।
নারীর কথা শুনে সেদিন মৃগ ধরতে যায়
দুরন্ত মায়া মৃগের সেদিন নাগাল নায়কো পায়।
বাণের চোটে মৃগ কেটে সেদিন দুখান হয়ে গেল
মৃগ কাটিয়ে দেখুন মারীচ বেরোইল।
মারীচের সঙ্গে রাম সেদিন যুদ্ধ আরম্ভিল।
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ করে মারীচ প্রাণ পরিত্যাগ করেছিল
লক্ষ্মণের কথা সীতার কর্ণগত হলো।
সীতা বলে হ্যাদে হে দেবর লক্ষ্মণ তোমার দাদা গিয়াছে মায়ামৃগ শিকার করতে
তার কোন বনের মধ্যে ব্যাঘাত হয়েছে, তোমায় খনে খনে ডাকছে, তুমি শীঘ্র যাও।
বলে সীতা গো, আমার দাদা তিনি সেনা ব্রহ্মতন দূর্ব্বাদলশ্যাম
আমার দাদাকে জিনিবে এমন বীর কেহ নাই।

৪৯ যেঁয়ে—যাইয়া।
৫২ রাণী মন্দোদরী হইতে—রাণী মন্দোদরী হইতে সুন্দরী।
৫৯ ভববন—ভ্রমণ; চিহ্নিত—নির্দশন।

বলে জানিলাম, জানিলাম, লক্ষ্মণ তোদের ভেইএর ঠারাঠারি
(আজ) ভরত নিলে রাজ্যপাঠ বনে তুই কি হরবি নারী।
ঐ কথা শুনে লক্ষ্মণের সেদিন রঙ্গ জ্বলে গেল
কুঁড়ের বাহির হয়ে, ধেনুকের ফলি করে তিনটি অঙ্কু দিল।
সীতা গো অঙ্কুর ভিতর থাকলে, তোমার বিপদ্ নাশ হবে।
অঙ্কু পার হইলে সীতা তোমার বিপদ্ ঘটবে।
দশমুণ্ড লুকায়ে রাবণ সেদিন যোগীর বেশে গেল
ভিক্ষা দাও গো মা জানকী ভিক্ষা দাও গো মোরে।
ভিক্ষা দাও গো মোরে
তোমার ভিক্ষা নোব নিয়ে বেড়াব নগরে।
বলে কি ভিক্ষা দোব যোগিবর, কি দিব তোমারে।
আসবে আমার দেবর লক্ষ্মণ ভিক্ষা দোব গো তোমারে।
বলে সীতা গো তোমার সেই দেবর লক্ষ্মণের গণ্ডীবাণ দেখে
আমার পরাণে বড় ভয় হয়।
ভিক্ষা দাও চলে যাই।
অতিথ বৈমুখ হবে বলে সেদিন ভিক্ষা দিতে গেল
এক অঙ্কু, দুই অঙ্কু, সীতা সেদিন তিন অঙ্কু পার হইল।
রাবণের কাছে ছিলেন মায়ারথ
রামের সেদিন সীতা হরে নিল।
মৃগ শীকার করে রাম তবে কুঁড়ের দ্বারে গেল।
শূন্য কুঁড়ে দেখে রাম সেদিন অচৈতন্য হল।।
ভাই লক্ষ্মণ আমাদিগ্‌গে বনে দিয়ে আমাদের মল পিতা
(আজ) হলাম দুভাই বনচারী বনে হারাইলাম সীতা।
(আজ) রাম কাঁদে স্থির না বান্দে পড়ল ভূমিতলে
হাতের গাণ্ডিবাণ ফেলে ভাই লক্ষ্মণ করে কোলে।
উঠ দাদা উঠ রঘুমণি আজ সকলের সকলো আছে
আমার কেবল তুমি।

---

৭২ ঠারাঠারি—পরস্পর ইসারা।
৭৪ রঙ্গ—অঙ্গ, দেহ।
৭৫ ফালি—ফলা; অঙ্কু—দাগ বা চিহ্ন।

বলে সীতা মলে পাব আমরা কোটারো কামিনী
দাদা মলে অনাথ হব, কোথায় পাব আমি।
বলে এইখানে রাম লক্ষ্মণের কথা সাঙ্গ হয়ে গেল।
(আজ) যমকে জবাব দিতে হবে, মুখে একবার
হরি হরি বল। ১০০
বলে অবির পুত্র যমরাজা যম নাম ধরে
(আজ) বিনা অপরাধে জীবের দণ্ড নাইকো করে।
চিত্রগুপ্ত মহুরী তারা দিবারাত্র লিখছে
কালদূত আর বিষ্ণুদূত যমের পাহারাতে আছে।
একজনা বলতে তারা দুজনা যায় ১০৫
কেউ ধরে চুলের মুষ্টি কেউ ধরে পায়
তোলাতুলি কোরে তাকে যমপুরী পাঠায়। ১০৭

(দ্বারকা-নিবাসী গুণমণি পটুয়ার গান হইতে লিপিবদ্ধ)

(১৫)

রাম-অবতার

রাম রাম পিভু রাম কমললোচন
দিব্যাদলে শ্যাম রাম জানকীই জীবন।
রথের উপরি রঘুনাথ কিঞ্চিৎ ভূমিস্তলে
হৃদয় পেসন্ন নাম, মধুর বাক্য বলে।
বামে সীতা, বন্দিব ডাইনে লক্ষ্মণ
রত্ন সিংহাসনে বসে প্রভু নারায়ণ।

৯৭-৯৮—লক্ষ্মণের শক্তিশেল-প্রসঙ্গে রামচন্দ্রের উক্তি—
দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তন্তু দ্বেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ।। (রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড)

১ পিভু—প্রভু।
২ দিব্যাদল—দূর্বাদল।

যাহার নাম লইলে খণ্ডিবে দেহের পাপ।
পুরাণে ছিলেন বাল্মীক মনি জানিলেন আপনি
ছিরাম জন্মিবে প্রভু জানিছে আপনি।
পিতা হবে দশরথ অজির নন্দন।
রামের কথা কিবা কব বাখান
যাহার গুণে বনের বন্দী পাষাণ ভাসে জলে।
শীকার করিতে রাজা করিলেন সাজন
অন্ধমনির স্তপবনে রাজা দিব দরশন।
সিন্ধুমনিকে বাণ মেরে সুরয নদীর কোলে
রাম নামের ধন্যি ক'রে সিন্ধু জলেতে পড়িল।
রাম নামের ধন্যি রাজা কর্ণেতে শুনিল
হাতের ধেনুক বাণ রাজা ভূমিস্তে রাখিল।
পাতালি কোলে কোরে আসি সিন্ধুমুনির নিকটে আসিল।
নেপুরের উনুঝুনু প্রভু শুনিতে পাইল।
এসো এসো বলে সিন্ধু বলে সম্ভাষা করিল।
এক নিবেদন করি গো, মনি মহাশয়
তোমার সিন্ধু মারা গেছে সুরয নদীর কূলে।
আরে কি কার্য্য করিলি রাজা কি কার্য্য করিলি
আমার অন্ধের নড়ি রাজা তু কেন ভাঙ্গিলি।
আমি যেমন পুত্রশোক পাইলাম আচম্বিতে
এমনি পুত্রশোক রাজা পাবি অযোধ্যানগরে।
অপুত্রবর ছিল রাজার পুত্রবর হইল
সহস্তি সহস্তি করে নাচতে লাগিল।
মিথিলা নগরে আসি যজ্ঞ আরম্ভিল
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এসে যজ্ঞ পূর্ণ দিল
যজ্ঞ থেকে দুইটী তরু জুটিল।

---

৯ ছিরাম—শ্রীরাম। ১০ অজির—অজের। ১৪ স্তপবনে—তপোবনে।
১৫ সুরয—সরযু। ১৭ ধন্যি—ধ্বনি। ১৯ পাতালি কোলে— কোলে শায়িত করিয়া।
২১ সম্ভাষা—সম্ভাষণ। ২৬ আচম্বিতে—হঠাৎ।
২৯ সহস্তি—স্বস্তি। ৩২ তরু—চরু।

মিথিলা, কৈকেয়, কৌশল্যা, বাঁটিয়া খাইল।
রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন চার ভাই জন্মিল।
কত বাদ্য বাজনা বাজিতে লাগিল।
আনন্দেতে দশরথ পুত্র লয়ে কোলে
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনকমলে।
রামলক্ষ্মণের কথা বিশ্বামিত্র শুনিতে পাইল
শ্রীরাম লইতে প্রভু যাত্রা করিল।
রামলক্ষ্মণ চাইতে দশরথ,
রামলক্ষ্মণ লুকায়ে থুয়ে ভরতশত্রুঘ্ন দিল।
ভরতশত্রুঘ্ন লইয়া প্রভু যাত্রা করিল
তেমাথা রাস্তায় এসে বাত্রা শুধাইল।
ছদিনের পথে যাবে না ছমাসের পথে যাবে?
ছদিনের পথে প্রভু কিবা ভয় আছে?
তাড়কা রাক্ষস বধে হে পরাণে।
তাড়কার নাম যখন ভরতশত্রুঘ্ন শুনিল
ডরে ডরে কম্পমান কাঁপিতে লাগিল।
বিশ্বামিত্র মনি তখন অভিসম্প করিল
অযোধ্যানগরে মনির শাঁপেতে অগ্নিবৃষ্টি হল।
রামলক্ষ্মণ তাহা জানিতে পারিল
বিশ্বামিত্র মনি পুনরায় আসি রামলক্ষ্মণে লইল
আচম্বিতে মেঘবৃষ্টি হয়ে অগ্নিনিবর্বাণ হইল।
তেমাথার রাস্তায় এসে বাত্রা শুধায়
ছদিনের পথে যাবে না বাপু ছমাসের পথে যাবে?
ছদিনের পথে প্রভু কিবা ভয় আছে?
তাড়কা রাক্ষস বধে হে পরাণে।
তাড়কা বধিতে রাম চলিল বনেতে
তাড়কার সঙ্গে যুদ্ধ হইল বহুতর।

---

৪৩ বাত্রা—বার্ত্তা।
৪৯ অভিসম্প—অভিসম্পাত।

তরুণীর ঘাটেতে রামচন্দ্র খেয়ায় পার হইল
কাষ্ঠের তরুণী রামের বেণু ঠেকাইতে স্বর্ণময় হইল।
পঞ্চ বটীর বনে এসে রাম দিল দরশন
তাড়কা রাক্ষস বধিল পরাণে।
পড়ল বিটী তাড়কা শব্দ গেল দূর
এমত প্রকারে মরে দাতার শত্তুর।
শ্বেত কাগ বধে রাম বধে উদয়গিরি
কুল ছেড়ে বিবাহ হচ্ছে জানকী সুন্দরী।
হরের ধেনুক ভেঙ্গে রাম সীতা পেলেন দান
বিয়ে কোরে রাম দোলায় চড়ে যান।
ঘরের দুয়ারে অক্ষর দেখিবারে পায়
চৌদ্দ বৎসর রামের বনবাস।
পিতার সত্য পালিতে রাম চলিল বনবাস।
রাজপোষাকে ত্যাগ করিল রাম
জটা বাকল পরিধান।

(বনকাপাসী-নিবাসী উপেন্দ্রচন্দ্র চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

(১৬)

রাম-অবতার

ওগো রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পাবে
অপুত্রিকা বলছে রাজাকে সব রযোধ্যার লোকে।
নারদ মুনি কহে বচন শুন মহাশয়
শনিরে জিনিতে পারলে রাজার রথশয্যা হয়।

---

৬০ তরুণী—তরণী।
৬৪ বিটী—কন্যা (এখানে অবজ্ঞাসূচক)।

নীলে গোঁড়া খাসা জোড়া ওগো পায়েতে পাম্বরী
গলাতে তুলসীর মালা বিনন্দে পাগুরী।
যতশত বাণ মারে শনিরি উপরে
শনির দৃষ্টিতে রথ ওড়ে স্বর্গ বনে।
রাজা বলে রথ রথী সারথি ঘোড়া
ওড়ে স্বর্গবনে, কোথা ছিল জটায়ু পক্ষ
রথকে নামায় ভূমিতলে।
প্রাণদান দিলি জটা আমায় বনমাঝারে
নিজ গলের ফুলের মালা দিয়ে জটা পেখের গলে।
গলেতে দিয়ে মালা যার মত্যতা করিল
তুমি আমার মিতে পক্ষ, আমি তোমার মিতে,
বিপদ সময়ে যেন মনে রেখ মিতে।
বনে থাকি বনজন্তু আমি মত্যতার কি জানি
তোমার সঙ্গে ধর্ম্ম মত্যতা রাজা, মনে রেখো তুমি।
এইখানে থাক মিতা আমার রথ আগুলিয়া
শীঘ্র আসি কানন হতে মৃগ শীকার করে।
একাদশী করে দুই জন অন্ধক ব্রাহ্মণী
পারণের জল আনতে যাবে প্রাণের সিন্ধুমণি।
সিন্ধু বলে নিত্য যাই নিত্য আসি পিতা সরোবরের ঘাটে
আজতো যাব না পিতা প্রাণ কেঁদে উঠে।
মনি বলে ধর্ম্ম কোরে মরে যদি পাণ্ডবের নন্দন
তবে লোকে ধর্ম্ম করে কিসেরি কারণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে অমিত্য নিল হাতে
অমিত্য মুখে জল পড়ে সরোবরের ঘাটে
ঘোড়াপৃষ্ঠে মহারাজ শীকারে সাজিল
চৌকসী বনে ঘুরে রাজা শীকার নাহিক পেল।

---

৬ পাগুরী—পাগুড়ী—মাথার পাগ বা সজ্জাবিশেষ।
১৪ মত্যতা—মিত্রতা।
৩০ চৌকসী—চারিক্রোশ পরিধিযুক্ত বন (চৌক্রোশী)।

জলের শব্দ রাজা কর্ণে যে শুনিল
শব্দভেদী বাণ তখন রাজা যে জুড়িল
বনের মৃগ জল খেচে বলে সিন্ধুকে বধিল।
কে মেলিরে ব্রহ্মাস্ত্র বাণ, অঙ্গ গেল জ্বলে
পিতা মাতা কাঁদচে দুজনে বনেরি ভিতরে।
শীঘ্র করে জল দাওগো আমার পিতারি নিকটে
ঘোড়া হইতে নেমে রাজা সিন্ধুকে নিল কোলে।
মরা সিন্ধুকে কোলে করে ফেরে তপোবনে
কি করিলাম, কোথায় এলাম, আমার এই ছিল কপালে।
ব্রহ্মহত্যা করলাম এসে বনেরি ভিতরে
স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, আর করি সুরাপান
চারি পাপের পাপী যারা লেবে রামের নাম।
ক্ষুধাতে, তৃষ্ণাতে মনি ওগো ডাকে বাহু তুলে
সিন্দুক এলি না কে এলিরে, আয়রে করি কোলে।
একবার মা কথা বলরে, আজ জুড়াবে জীবন
তোমার সিন্ধুক নয় আমার নাম দশরথ
না জানাতে বধ করেছি তোমারি নন্দন।
হায় হায় করিয়ে কপালে মারে ঘা
কোথা গেলি প্রাণের সিন্ধুক কেবা বলে মা।
সাত নাই পাঁচ নাই, আমার ওগো একা সিন্ধুক মুনি
কি অপরাধ করেছিল দণ্ড দিতাম আমি।
মৎস্য চেনে গহীর গম্ভীর পক্ষ চেনে ডাল
মায়ে চেনে পুত্রের বেদন, প্রাণে কাঁদে যার।
যে মাঠেতে বৃক্ষ থাকে, সেইতো মাঠের মাতা
ওগো একা মায়ের পুত্র মলে মা দাঁড়ায় কোথা।
মনি বলে তোর রাজ্যে থাকি না রাজা আমি করি আশীবর্বাদ
কিবা উঠে সন্তান বধ, সাধ আপন বাদ।

৫২-৫৩ ১ (৫০-৫১) দ্রষ্টব্য।

পুত্র যদি আছে রাজার নিপুত্রকা হবি
পুত্র যদি না আছে পুত্তুর বর পেলি।
চার পুত্র হবে তোমার ওগো রাম যাবে বন
পরে রবে খাট পালঙ্গ তেজিবি জীবন।
শাপ দিয়ে মুনি প্রাণ তেজিল
তিন জনের চিতা রাজা একস্তে সাজাইল।
চুয়া চন্দন কাষ্ঠ কিবা বনে কিনেছিল
কলসীতে ঘৃত যার অগ্নিতে ঢালিল।
শতকার্য্য করে রাজা ভাণ্ডার চলে যায়
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়ে ব্রাহ্মণে করে দান।
এই সকল মুনিতে বলে রাজার হোক কল্যাণ।
বাপ তো তবে বিভাণ্ড মুনি মাতার হরিণী
যার গর্ভে জন্ম নিল নামে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।
এই সকল মুনি আসিয়ে যজ্ঞ আরম্ভিল
যজ্ঞে উঠিল চরু রাজা মেগে নিল।
কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী রাণী ওগো চরু ভক্ষণ করে
অন্ধকের বরে রযোধ্যায় রাম জন্ম নিলে।
দিব্যদলশ্যামে রামে কমল-লোচন
সভা করে বসিল রামের ভাই যে চারি জন।
যেমন রামের গাণ্ডীবন, তের্মা॰, রামের ছটা
নবীন বয়সেতে যার মস্তকেতে জটা।
সম্মুখেতে দাঁড়িয়ে আছে আপনার দশরথ পিতা
বিমুখে রাখিলে যার ভরত শত্রুঘন।
সম্মুখেতে আছে আপনার গুণের ভাই যে লক্ষ্মণ
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে মুনিদের গেছে সাধ
হেরম্বনে রাক্ষস এসে যজ্ঞে পাতিল প্রমাদ।

---

৬৩ একস্তে—একত্র, একসঙ্গে।
৭৪ রযোধ্যায়—অযোধ্যায়।
৭৫ দিব্যদলশ্যাম—দুর্ব্বাদলশ্যাম।
৮২-১২৯ ১ (৭৫-১৪১):

রাক্ষসী দেখে মুনিরা পলায় দেশ দেশান্তরে।
পালায়ো না ভাই উপায় বলে দিই।
রাম যদি আনতে পার যজ্ঞ রক্ষা হয়।
ছমাসের পথ কেবা যেতে পারে
রাজার গুরু বিশ্বামিত্র তিনি রাম আনিতে পারে।
দিব্যমালা চাঁপার কলি রামের তরে লয়ে
ধীরে ধীর যাত্রা করে মুনি রযোধ্যানগরে।
ঘরে কয় বাণীবার্ত্তা, দ্বারে গেলেন মুনি
বসিতে আসন দিলে ওগো পদ্মের আগে জল।
কোথাকার যাও মনি কও দেখি বচন
ছমাস হাঁটিয়া এলাম আমি রযোধ্যা ভুবন।
তোমার ঘরে জন্ম নিল শ্রীরামলক্ষ্মণ
ওগো দিতে হবে মনিদের আজ যজ্ঞেরি কারণ।
প্রাণ চাও ধন চাও মনি আমি সব দিতে পারি
আপনার জ্ঞানে রামকে কভু বনে দিতে নারি।
রাম পাঠাইতে পাপিষ্ঠ তোমার কাতর জীবন
ওগো নিজে মুখে বলবি যেদিন রাম যাওগো বন।
রামলক্ষ্মণ লুকায়ে রেখে ভরত সঙ্গে দিল,
ওগো বাড়ীর বাহির হয়ে নাম জিজ্ঞাসা করিল।
তোর নাম কিরে বাপু, তোরি বা নাম কি?
আমর নাম ভরত, মনি, ভেয়ের নাম শত্রুঘ্ন।
মুখে অগ্নি চোখে অগ্নি ছুটিতে লাগিল
সেই অগ্নিতে রাজার রযোধ্যা পুড়িল।
কতদূর গেল বৃদ্ধ ব্রাম্মণ তাকে আনগা ফিরায়ে
আমি শ্রীরামলক্ষ্মণ দিব মনির চরণ ধরিয়ে।
রাম লক্ষ্মণ মনির আগে দিল
সেঁকে ছিল ধান দুর্ব্বো আশীর্ব্বাদ করিল।

---

৯৪ রযোধ্যা—অযোধ্যা।

ছ'দিনের পথে যাবি না ছ'মাসের পথে যাবি
ছ'মাসের পথে যজ্ঞ দরশন
ছ'দিনকার পথে আছে তাড়কা একজন।
উত্তর দক্ষিণা বীর সুখে নিদ্রা যায়
ওগো শাল গাছের আড়ে মুনি তাড়কা দেখায়।
তাড়কা দেখে মনি কাঁপে থরে থরে
মনিকে লুকায় লক্ষ্মণ শাল পাতার ভিতরে
যত শত বাণ মারে ধরে ধরে খায়
এই রঘুনাথের গাণ্ডীবাণে তাড়কা বধ হয়।
তাড়কা মলো ভালই হলো শব্দ গেল দূরে
পড়ে রইল তাড়কা বীর চৌদ্দ ভুবন জুড়ে।
অহল্যা পাষাণ হয়েছিলেন, গৌতক মুনির শাপে
তাহার দেহ মানব হল, রামের চরণের ধূলাতে।।
পার কররে ধীবর মাঝি আজ পার কর মোরে
উপার হয়ে, ধীবর বর দিব তোরে।
পার করি কি ঠাকুর মহাশয়, আমার প্রাণে লাগে ভয়—
কাষ্টের নৌকা যদি মনুষ্য কভু হয়।
নির্ব্বোধ বলিরে ধীবর, আমি নির্ব্বোধ বলি তোরে
কাষ্টের নৌকা কভু মনুষ্য হতে পারে।
কি দিবি রাম নামেরি তুলনা
চরণের ধূলায় পাষাণ মানব, ধীবরের নৌকা হোক সোনা।
প্রভু নারায়ণ রামচন্দ্র যারে দেবেন বর
লক্ষ্মী রাখিবেন তার যুগ যুগান্তর।
ধেনুক ভাঙ্গা পণ ছিল রাজা জনকেরি ঘরে;
ওগো তেত্রিশ কোটী দেবতা এসে, ধেনুক নড়াইতে না পারে।

১২২ গৌতক—গৌতম

রাজা বলে এই ধেনুক যে ভাঙ্গতে পারবে
সীতে করণে দিব দান।
নিজে রামচন্দ্র বলবান, ধেনুকে দিল টান
গিঁটে গিঁটে, ধেনুক ভেঙ্গে করিলে সাত খান।
ততক্ষণে জনক রাজা, সীতে কন্যে দিল দান
সীতা কন্যে দান পেয়েছিল।
দুই ভেয়ের বিয়ের কথা একত্রে হইল
বশিষ্ঠ মুনি আসিয়ে ছরলা তলায় রামকে নানমুখো করাইল।
পালকী সোয়ারী কত সাজিয়ে রাখিল।
ঢোল বাজে নাগরা বাজে আর বাজে কাঁসি
তোলপাড় করে নয়ে যেচে মিথিলার মাটী।
পুরুষরাম বলেরে ভাই, আমার চেয়ে রাম কেবা আছে।
আমার চেয়ে রাম যে হবে, সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ দিয়ে যাবে।
পুরুষরাম রামচন্দ্র ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভিল
হাতে হাতে পুরুষরামের বল হরে নিল।
অবির পুত্র যম রাম যম নাম ধরে
বিনা অপরাধে জীবের ডণ্ড নাহি করে।
যমদূত আর কালদূত, দুই জনে পেয়াদা পহরা আছে।
চিত্রগুপ্ত মহুরী তারা দিবারাত্র লেখাপড়া করছে
একজন বলতে যমের দুই জনা যায়
তোলাতুলি করে রাজার নিকটে দেয়।
লোহার ডাঙ্গুরে বেড়িয়ে পাপীদের মস্তক ফাটায়
পরের বাড়ী ধন কড়ি যে চুরি করে খায়।

---

১৪৩ নানমুখো—নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি।
১৪৭ পুরুষরাম—পরশুরাম।
১৫১ অবির—রবির।
১৫১—১৭০ (১) ১ (১৪২—'৬১) দ্রষ্টব্য।
১৫২ ডণ্ড—দণ্ড।
১৫৭ ডাঙ্গুর—দণ্ড।

দরবারে মিথ্যা কথা কয়
তপ্ত সাঁড়াশী দিয়ে তাহার জিহ্বা কেড়ে নেয়
ভাল জল থাকতে যে জন মন্দ জল দেয়
উপুরীকে নিয়ে যেয়ে চামের পরোতে করে খারানী জল খাওয়ায়।
আপনার ঢেঁকি থাকতে যেজন ঢেঁকি নাহি দেয়
বক্ষস্থল লয়ে তার ঢেঁকিতে পার দেয়।
কলির রাজা কলির প্রজা কলির হল শেষ
বৃদ্ধ মার মাতাতে চরখা দিয়ে পরিবারকে কন্ধে লয়ে
কলি রাজা গঙ্গাস্থানে করিলেন গমন।
হীরানামে বেশ্যা মহাপাপের পাপী ছিল
অন্নদান বস্ত্রদান, ব্রাহ্মণকে গরুদান করিল।
সাধু প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, বিষ্ণুদূত আসিয়া
পুষ্পরথে কোরে লয়ে, বৈকুণ্ঠে গমন করে।

(পানুড়িয়া-নিবাসী পঞ্চানন চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

(১৭)

সিন্ধুবধ

রজ রাজার পুত্র রাজা নামে দশরথ
শোভা করে বসে রাজা যত প্রজাগণ।
অপত্রিকা বলে রাজা দেশে নাহি রহিব
আজ হতে রযোধ্যা মোরা পরিত্যাগ করিব।

---

১৬২ উপুরী—যমপুরী; পরো—থলে।
১৬৪ পার—পাড়—(পাতন বা পাড়ন)।
পূর্ব্ববর্ত্তী ৪টী গানের সহিত এই প্রসঙ্গের অনেক মিল আছে।
১ রজ রাজা—অজ রাজা। ২ শোভা—সভা।
৩ অপত্রিকা—অপুত্রক। ৪ রযোধ্যা—অযোধ্যা।

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়
গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট লক্ষ্মী উড়ে যায়।
নারদ মুনি বলে, কথা শুন মহাশয়,
শনিকে জিনিতে পারলে রথশয্যা হয়।
নারদের কথা রাজা কর্ণেতে শুনিল
শনিকে জিনিবার জন্য রথ সাজাইল।
জামাজোড়া নিল ঘোড়া পায়েতে পামরী
গলাতে তুলসীর মালা বিনন্দে পাগুরী।
শনি রাজা বসে আছেন ধর্ম্ম-সিংহাসনে
শনিরি রিষ্টিতে রথ ওড়ে স্বর্গ পানে।
রথ রথী সারথি ঘোড়া উড়িতে লাগিল
কোথায় ছিল জটায় পক্ষ, রাজ ধরে নামাইল।
আপনার গলের পুষ্পমালা রাজা জটায়ুর গলে দিল
জনমে জনমে রাজা মত্যতা পাতাইল।
আমার মিতে জটা তোমার আমি মিতে
ওগো বিপদে সম্পদে যেন মনে রেখো মিতে।
বনে থাকি বনের পশু রাজা মত্যতার কিবা জানি
আমার সঙ্গে মত্যতা রাজা পাতায়েছ আপনি।
এইখানে থাক মত্য রথ আগুলিয়া
আজ মৃগ শিকার করে আনি বনল কাননে।

৫-৬ অনুরূপ উক্তি—রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট ভাবি চাহ মনে।
স্ত্রীর পাপে গৃহলক্ষ্মী পলায় আপনে। ('ময়নামতীর গান'—ভবানীপ্রসাদ)।
১১ পামরী—পায়জামা বা মোজার মূল্যবান বস্ত্রবিশেষ।
১২ পাগুরী—পাগড়ি (শিরোভূষণ)।
১৪ রিষ্টিতে—পাপে বা অকল্যাণে।
১৬ জটায় পক্ষ—জটায়ু পক্ষী।
১৮ মত্যতা—মিত্রতা বা মৈত্রী।
১৯ জটা—জটায়ু।
২১ মত্যতার—মিত্রতার।

বত একাদশী করেছিল বনের অন্ধক ব্রাহ্মণ।
পারণের জল আনরে বাপ গুণের সিন্ধুমনি।
নিত্য নিত্য যাই পিতা সরোবরের ঘাটে
আজতো যাব না পিতা কি আছে কপালে।
কাল গেছে বাপ একাদশী আজ ব্রাহ্মণ ভুজন
শিগির করে জল আন বাপ করিব পারণ।
ওই কথা শুনে সিন্ধু কমুণ্ডল লিল হাতে
কাঁদিতে কাঁদিতে জল আনিতে যায় সরোবরের ঘাটে।
সরোবরে জল পোরে আনন্দিত মনে
জলের ভুকভুকি রাজা কর্ণেতে শুনিল।
বনের মৃগয়া হরিণ বলে বাণেতে বধিল।
কে মেলি ব্রহ্মাস্ত্র বাণ আমার দেহ গেল জ্বলে।
মাতাপিতা কাঁদচে আমার ওগো বণেরি ভিতরে
কাল গেছে বত একাদশী আজ ব্রাহ্মণ ভুজন
শিগির করে জল লয়ে যাও করবে পারণ।
এই কথা বলে সিন্ধু প্রাণ পরিত্যাগ করিল
সরোবরের ঘাটে সিন্ধু ভাসিতে লাগিল।
সিন্ধুকের কথা শুনে রাজা ওগো ঘোড়া হতে নামিল
আজ মরা সিন্ধুকে রাজা কোলেতে করিল।
স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিলাম সুরাপান
চার পাপের পাপী হলাম মুখে আনে রাম নাম।
মরা সিন্ধুক কোলে কোরে রাজা বেঁড়ায় বনে বনে
খিদাতে তৃষ্ণাতে মুনিরা ওগো ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
মুনির ডাকে যখন রাজা কর্ণেতে শুনিল
মরা সিন্ধুক কোলে কোরে মুনির দ্বারে গেল।
পাতার মচমচি মুনি কর্ণেতে শুনিল।

---

২৫ বত—ব্রত;
২৯ ভুজন—ভোজন।
৩০ শিগির শীঘ্র।

কে এলি বাপ সিন্ধুক এলি বলরে বচন
মা বলিয়ে ডাকরে বাপ জুড়াক রে জীবন।
তোমার পুত্র নয় মুনি করি নিবেদন
না জানাতে বধ করেছি তোমার নন্দন।
কি বেরোইল মহারাজা তোমার কি বেরাইল মুখে
আকাশ পাতাল ভেঙ্গে পড়ে অন্ধক মুনির বুকে।
হায় হায় বলে অন্ধকিনী কপালে মারছে ঘা
কোথায় গেলি গুণের সিন্ধুক একবার মা বলে যা।
পাঁচ নয় ছয় নয় আমার একা সিন্ধুক মনি
কি অপরাধ করেছিলি আনলে ডণ্ড দিতাম আমি।
একা সিন্ধুক মেলি না রাজা মেলি রে তিন জন
রাজার যদি না আছিস পুত্তুর পুত্তুর বর পেলি।
অপুত্র মহারাজা ওগো পুত্তুর বর পেল
মরা সিন্ধুক কোলে কোরে নাচিতে লাগিল।
চার পুত্র পাবি রাজা রামকে দিবি বন
খাট পালঙ্গ পেরে সেদিন আমার মতন তেজিবি জীবন।
রাম না জন্মাইতে ছিল ষাট হাজার বৎসর
বাল্মীক মুনি ছিল পুঁথি পেয়ে ব্রহ্মার বর।
ব্রহ্মাশাপে অন্ধকমুনি দশরথকে দিল
সিন্ধু সিন্ধু বলে প্রাণ পরিত্যাগ করিল।
তিন জনের সতকার্য্য একস্তে করিল
নিমকাষ্ঠ দিয়ে চিতা সাজাইতে লাগাইল।
চুয়া চন্দন ঘৃত ঢালিতে লাগিল
তিন জনের সতকার্য্য করে রাজা অযোধ্যাকে গেল
রামচন্দ্র জন্ম লোবো বলে মুনিগণ যজ্ঞ আরম্ভিল।

(দাদপুর-নিবাসী ভূপতি চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

---

৬০ ডণ্ড—দণ্ড।
৭১ সতকার্য্য—সৎকার; একস্তে-একত্রে।
৭৫ লোবো বলে—লইবে বলিয়া।

(১৮)

বধ

রজ রাজার পুত্র রাজা যার নাম দশরথ
সভা করে বসে আছে লয়ে প্রজাগণ।
রাজার পাপে রাজ্যনষ্ট প্রজা কষ্ট পায়
গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট যার লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।
প্রজায় বলছে, শুন দেখিন রাজা মহাশয়
শনিকে জিনিতে পারলে রথ যাত্রা হয়।
শনিকে জিনিতে মহারাজ রথ সাজাইল
ধেনুকা টঙ্কার শনি চেতন পাইল।
যত শত বাণ মারে শনি ভক্ষণ করিল
শনি জিনিতে মহারাজা রথ উড়ে গেল।
রথ রথী সারথি ঘোড়া উড়িতে লাগিল
কোথায় ছিল জটায়ুপক্ষে রথ ধরে চৌকুশী বনের
মধ্যে নামাইল।
রাজা নিজ গলার পুষ্পমালা জটার গলে দিল।
তুমি আমার মিতে জটা তোমার আমি মিতে
ব্রিপদ কালে এসব কথা যেন মনে রেখো মিতে।
এইখানে থাক জটায় বলে বনে পুষ্পরথ আগুলে
আমি আসি তোমার জন্য বনে মৃগশীকার করে।
চৌকুসী বনের মধ্যে রাজা শিকার নাই পায়
তাঁবু টাঙ্গিয়া রাজা বনের পাশে রয়।
সেই চৌকুশী বনের মধ্যে আছে অন্ধক আর অন্ধকী
একাদশী আছে কোরে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী।
পারণের জল আনতে পাঠায় গুণের সিন্ধুমুনি

---

১৫ ব্রিপদ—বিপদ্।
১৮ চৌকুসী—চারিক্রোশ জুড়িয়া।



কদম্বমূলে শ্রীকৃষ্ণ

কানিয়া কদম্বমূলে নাগরিয়া থানা
বনফুল গাঁথিয়ে কৃষ্ণের গলে বনমালা।
হাত বাঁকা পায় বাঁকা বাঁকা মাজাখানি
চরণের নূপুর বাঁকা চূড়ার টানুনি।



সিন্ধুবধ

কে মেলি রে দুরন্ত বাণ অঙ্গ গেল জ্বলে।
শীঘ্র কোরে লয়ে চল মা বাপের কোলে।
ঘোড়ার পৃষ্ঠে মহারাজ নামিতে হইল
মরা সিন্ধু কোলে কোরে রাজা চলিতে লাগিল।

নিত্য নিত্য যাই পিতা সরোবরের ঘাটে
আজতো যাবনা পিতা আমার কি আছে কপালে।
দশ নাই পাঁচ নাই, একা সিন্ধুমনি
শীঘ্র কোরে পারণের জল আন সিন্ধুমনি।
কাঁদিতে কাঁদিতে সিন্ধু কুম্ভ নিল হাতে
জল আনিতে যায় সিন্ধু সরোবরের ঘাটে।
সিন্ধু জল পোরে রাজা কর্ণেতে শুনিল
শব্দভেদী বাণ রাজা ধেনুকে জুড়ে দিল।
বনের মৃগ বলে সিন্ধুকে বধ করিল।
বাপরে বলে পড়ে গেল সিন্ধু সরোবরের জলে
কে মেলি রে দুরন্ত বাণ অঙ্গ গেল জলে।
শীঘ্র কোরে লয়ে চল মা বাপের কোলে।
ঘোড়ার পৃষ্ঠে মহারাজ নামিতে হইল
মরা সিন্ধু কোলে কোরে রাজা চলিতে লাগিল।
পাতার মচমচানি কর্ণেতে শুনিল
সিন্ধু সিন্ধু রব কোরে ডাকিতে লাগিল।
কে এলিরে বাপ সিন্ধু এলি এস করি কোলে।
সিন্ধু নয় রন্ধক মুনি রাজা নামে দশরথ
না জানাতে বধেছি বাপ তোমারি নন্দন।
কি বেরোইল রাজা দশরথের মুখ
বজ্রাঘাত ভেঙ্গে পড়ুক অন্ধক মনির বুকে।
কি অপরাধ করেছিল আমার সিন্ধুমনি
ধরে কেন আন নাই তার ডণ্ড দিতাম আমি।
ওই কথা শুনে মায়ে কপালে মেরেছিল ঘা
আমার পুত্র মেরে রাজা আমার প্রাণ কাঁদাইলি
পুত্রশোকে দাবানলে তুই তোর জীবন পরিত্যাগ করিবি।
পুত্রের বাপ হোস রাজা নিপুত্রি হবি
পুত্রের বাপ না হোস রাজা চার পুত্র পাবি।

৪০ রন্ধক মুনি—অন্ধমুনি।

পুত্রের বর পেয়ে রাজা আনন্দিত হল
মরা সিন্ধুক কোলে কোরে রাজা নাচিতে লাগিল।
একা তুই মারিস নাই সিন্ধু মেরেছিস তিন জন
এই তিনজনার সৎকার্য্য করিবি এখন।
মায়ের পিতার পুত্রের একুই ঝিলে সাজাইল
কলসী কলসী ঘৃত ঢালিতে লাগিল।
সৎকার্য্য করে রাজা গঙ্গাস্নানে গেল
গঙ্গাস্নান কোরে রাজা রযোধ্যাকে গেল।
কৈকয়ী রাণী কৌশল্যা সুমিত্রা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন
তোমার মতন অধার্ম্মিক রাজা নাইকো কোন জন।
এই কথা বলে রাণী কান্দিতে লাগিল
চরু খেয়ে রাম জন্মাইল।
রবির পুত্র যম রাজা যম নাম ধরে
মিনি অপরাধে কারও ডণ্ড নাই করে।
কৃষ্ণদূত আর বিষ্ণুদূত তারা পহরাতে থাকে
যাকে যখন হুকুম করে, এরাই তখন ছোটে।
যার যেমন কর্ম্মের ফল এই যমপুরীতে আছে।
ভাল জল থাকতে যেজন মন্দ জল দেবে
যমের কাছে সে জন খারানি জল পাবে।
ধানভানারিকে যে জন চাল কম দিয়েছিল
লোহার ঢেঁকিতে কোরে তার যমপুরীতে হাড় পিষে লিল।
পতি নিন্দা শাস্ত্রমতন নয়
তাহার শাস্তি যমপুরীতে খাজুর গাছে হয়।
হীরামুনি বেশ্যা ছিল মহাপাপের পাপী
অন্নদান বস্ত্রদান ফলদান বহুত করেছিল
সেইজন্য কৃষ্ণদূত পুষ্পরথে মাথায় করে বৈকুণ্ঠে গেল।

(পাকুড়হাঁস-নিবাসী শশীপটুয়ার গান হইতে লিপিবদ্ধ)

৫৫ একুই ঝিলে—একই চিতায়।
৭০ ধানভানারি—যাহারা ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করে।

(১৯)

শঙ্খ-পরান পালা

ব্যাঘ্র ছাল বিছিয়ে বসেন শিব দুর্গাপতি
হরের বামে বসলো চণ্ডিকা পাৰ্ব্বতী।
বাম করে বসে দুর্গা কহিছে বচন
এক বাক্য বলি দেখ দেব ত্রিলোচন।
আমার বাইএর শঙ্খ নাই তোমার নাইকো লাজ
একে বাই শঙ্খ দিবে স্বামী দেবরাজ।
রূপা সোনা পর গৌরী আকালে বিচে খাবি
আঙ্গা উলি শঙ্খ পরে কোন সরগে যাবি।
রূপা সোনা পরতে আমার গতর বেদনা করে
আঙ্গা উলি শঙ্গ পরতে বড় সাধ লাগে।
মর মর ভাঙ্গড় বুড়ো চক্ষে পড়ুক ছানি
চোকে না দেখতে পাবি হীরে লাল কুচনী।
চোক খাক তোর মাতাপিতা চোক খাগা তোর খুড়ো
জেনে শুনে বিয়ে দিলে লাঠি ধরা বুড়ো।
ঘর থেকে বেরোইতে গৌরীর মস্তকে ঠেকিল চাল
বামে গেল কাল সাপিনী ডাহিনে শৃগাল।
আজ মায়ের মাথার উপর ডেকে গেল কালবরণের পেঁচা।
বিনা মেঘে বরষণ হচে রক্ত নেচা-নেচা।

৩ বাম করে—বাম দিকে।
৫ বাইএর—বাহুর।
৬ বাই—শাঁখা, চুড়ি প্রভৃতির গুচ্ছ বা গাছা।
৮ আঙ্গা উলি—রাঙ্গা রুলি।
৯ গতর—দেহ বা শরীর।
১২ কুচনী—বেশ্যা (কুচ বা শোভা যাহাদের অবলম্বন)।
১৬ বামে গেল কাল সাপিনী ইত্যাদি—অনুরূপ উক্তি—"বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে।" (কৃত্তিবাস)।
১৮ নেচা-নেচা—চাপ-চাপ বা থোকা-থোকা।

ঢেঁকির বাহন নারদ গেছে ব্রহ্মারি ভুবন
রাস্তার মাঝে মামীর সঙ্গে হল দরশন।
আজ কেন দেখি মামী তোর বিরস বদন?
তোর মামাকে চেয়েছিলাম দু বাই
দিতে পারে নাই গোসা করে যাচ্ছি বাপের বাড়ি।
কুচনী-পাড়ায় থাকে মহাদেব কুচনীর মাথা খেয়ে
আমি চললাম কার্ত্তিক গণেশ দুই ছেলে লয়ে।
কোলে নিলে কার্ত্তিক হাঁটিয়ে লম্বোদর
গোসা করে চললো গৌরী মাতাপিতার ঘর।
আজ আমি শুভ যাত্রা নাহি দেখি
কেন ঘরে থেকে বাহির করলাম কার্ত্তিক গণপতি।
একা বসে আছে মামা রত্ন সিংহাসনে—
কার্ত্তিক গণেশ ভাই না দেখি কৈলাস ভুবনে?
তোর মামী চেয়েছিল দু বাই শঙ্খের কড়ি
দিতে পারি নাই গোসা করে গেল বাপের বাড়ী।
কতদূর গেল তোমার মামা আনগে ফিরায়ে
কাল শঙ্খ কিনে দিব নগরে ভিক্ষা কোরে।
দু কোটি বাজিয়ে নারদ করিলেন গমন
মামীর দ্বারেতে নারদ দিলে দরশন।
পালাবি তো পালা মামী প্রাণ জীবন লয়ে
ভাঙ্গড় মামা দেখতে পেলে বধিবে পরাণে।
তোমার পিতা দক্ষ রাজা ধনের অধিকারী
শঙ্খ পরিবার সাধ থাকে তো যাওনা বাপের বাড়ী।
দু কাটি বাজিয়ে নারদ করিলে গমন
মামার দ্বারেতে নারদ করিলে গমন
মামার দ্বারেতে নারদ দিলে দরশন।
আমার কিরে দিলাম মামা দিলাম শত শতবার
কার্ত্তিক ভেয়ের কিরে দিলাম পঞ্চবার।

২৩ গোসা—রাগ।
৪৪ কিরে—শপথ বা দিব্য।

তবু গুণের মামী না এলো গো ঘর।
উপায় দে রে নারদ ভাগ্নে বুদ্ধি দেরে মোরে
তোর মামী কৈলাসে আসিবে কি প্রকারে।
মামী হলো বাগ্দীনী তুমি হওগা বাগা
বড়বনের বাঘ সেজে পথে দাওগা দেখা।
ঠিক বলেচিস্ নারদ ভাগিনা যুক্তি বড় নয়।
বড়বনের বাঘ সেজে পথে দাঁড়াইল
কার্ত্তিক গণেশ দুটি ভাই ডরিয়ে উঠিল।
ভয় কি আছে কার্ত্তিক গণেশ ভয় কি মোরে আছে
বাপের বাড়ী যাব আমি বাহন পেলাম কাছে।
কাছ মেরে কাপড় পরে চড়িবার যায়
বোম বোম বলিয়া বাঘ বন দিয়ে পালায়।
যাহক রে নারদ ভাগনা তোর বুদ্ধি হতভাগা ধরেছিলাম কবে
তোর মামী চাপে নাই আমারি ঘাড়ে।
তোর বুদ্ধি হতভাগা জলে ডুবতে হয়
সাতবার গঙ্গাস্নান না করলে দেহের পাপ না যায়।
উপায় দে রে নারদ ভাগ্নে বুদ্ধি দে রে মোরে
তোর মামী কৈলাসে আসিবে কি প্রকারে।
যদি মামা সাজতে পার শেখারী বরণ
রূপে গুণে মামীর সঙ্গে হবে দরশন।
এই কথা শুনে মহাদেবের মনেতে লাগিল
গরুড় পক্ষী বলে মহাদেব ডাকিতে লাগিল।
স্বর্গে ছিল গরুড় পক্ষী মর্ত্তে নেমে এল।
আয় দেখিরে গরুর বীর বাটার তাম্বুল খাবি
এক বাই শঙ্খ এনে আমার হাতে দিবি।

৫৩ ডরিয়ে—ভীত হইঁয়া।
৫৬ কাছ মেরে—মালকোঁচা মারিয়া।
৬৪ শেখারী বরণ—শাখারীর রূপ।

কতকগুলি গরুড় পক্ষী চরিবারে গেল
চরিবারে যেয়ে গরুড় বীর ভাবিতে লাগিল।
এক ডেনাতে বাঁধে সমুদ্র এক ডেনাতে ছেঁচে
কতগুলি শঙ্খ পারে তুলে দিচে।
শঙ্খগুলি নিয়ে মহাদেবের কাছেতে দিল
বিশ্বকর্ম্মা ব'লে মহাদেব তিন ডাক দিল।
আয়রে দেখি বিশ্বকর্ম্মা বাটারি তাম্বুল খাবি
নিজহাতে শঙ্খগুলি নির্ম্মাণ করে দিবি।
কারিকরের হাতে শঙ্খ তৈয়ার করে দিল
শেখার গুঁড়িগুলো মহাদেব গায়েতে মাখিল।
শেখাঘষা লড়িখানা ডান বগলে লিল।
সিদ্ধির ঝোলা গাঁজার কলকে বাঁ বগলে লিল।
শঙ্খের পসরা মহাদেব মাথায় তুলে নিল
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল
শিবের খুড় শাশুড়ী ঘরের বাহির হল।
শঙ্খ পরাবার লেগে শিবের খুড় শাশুড়ী করে তাড়াতাড়ি
মাথায় বসন দেয় না তারা করচে হুড়াহুড়ি।
ওই কথা শুনে গৌরীর মনেতে লাগিল।
সোনার খাটে বসে গৌরী রূপার খাটে পা
শঙ্খ পরতে বসল কার্ত্তিক গণেশের মা।
গাছি গাছি শঙ্খ পরার মন্ত্র করে সার
যাবার সময় যাবি শঙ্খ নড়িয়ে চড়িয়ে
আসবার সময় আসবি না শঙ্খ বজ্রঘাতে পড়িলে।

---

৭৩ ডেনাতে—ডানাতে; বাঁধে—আটকায়; ছেঁচে—সেচন করে।
৭৪ পারে—পাহাড়ে, তীরে; দিচে—দিতেছে।
৮১ শেখাঘষা লড়িখানি—শাঁখা ঘষিবার প্রস্তরময় ক্ষুদ্র দণ্ড।
৮৩ পসরা—বিক্রয়ের বস্তুর বোঝা।
৯২-৯৩ শঙ্খ পরিবার সময় যেন ধীরে ধীরে মুষ্টির ভাগ অতিক্রম করে; কিন্তু বজ্রাঘাত হইলেও যেন শঙ্খ আর বাহির না হয়, অর্থাৎ যেন কখন শঙ্খ হস্তচ্যুত না হয়।

কোথায় তোমার বাড়ী শাখারী কোথায় তোমার ঘর?
সূর্য্যপুরে থাকি আমি ইন্দ্রপুরী ঘর
আমার নাম দেব শাখারী পিতা সদাগর।
বড়ঘরে দা আছে আনগা পাড়িয়ে
হাত কাটিয়ে শঙ্খ দিব বাহির করিয়ে।
হাত ও যাব তাকেও পারি
শঙ্খর রক্ত না লাগিবে নগরে বিক্রী করতে গেলে ডাকাতি বলিবে।
কৌটী ভাবে চায় গৌরী ক্রোধ ভাবে চায়
তবু যে দেব শাখারী ভস্ম নাহি হয়।
ওইখানে গৌরীর ক্রোধ ক্ষান্ত হল
শিবদুর্গার যুগল মিলন কৈলাসেতে হল।
অবির পুত্র যম রাজা যম নাম ধরে
চিত্রগুপ্ত মহুরী তারা দিবানিশি লেখে
যার যেমন কপালের ফল ইহারা দুজনে লেখে
কালদূত আর বিষ্ণুদূত যমের পহরাতে থাকে।
একজনা বলতে এরা দুই জন দড়ে
কেরু ধরে চুলের মুষ্টি কেরু ধরে ঘাড়ে।
লোহার ডাঙ্গসে পাপীর মস্তক ছেদন করে।
কলিকালে কল্কি অবতার
রুগী পড়ে আছে, ডাকতারে হাত ধরে বসে আছে।
মাথার উপর দাঁড়কাক ডাকছে, যমে মানুষে টানাটানি করছে,
বুকে পাষাণ চাপাইয়াছে।
চুলের মুটী ধরে তুলছে আর বসাইতেছে।
কাউকে গুলি দিয়াছে।

---

১০৫ অবির—রবির (সূর্য্যপুত্র যম)।
১০৯ দড়ে—দৌড়ায়।
১১০ কেরু—কাহারও।
১১১ ডাঙ্গস—অঙ্কুস (হস্তী চালাইবার দণ্ড-বিশেষ)।

হীরামণি বেশ্যা অন্নদান বস্ত্রদান দান-ধ্যান বহুত করেছিল।
কৃষ্ণদূত পুষ্পরথে স্বর্গে নিয়ে গেল।
আপন পতি নিন্দা করে পরপতি ধরে
খাজুর গাছে তুলে উচিত সাজা দেয়।
খেয়ে বলে খাই নাই নিয়ে বলে নিই নাই—
জিহ্বা সাঁড়াশী দ্বারা টেনে বার করে।
হামান দিস্তাতে ফেলিয়ে পাক দিচ্ছে।

(২০)

মহাদেবের শঙ্খদান

নম নম দুর্গা নম নারায়ণী
ওগো কৃপা কর দুষ্কহর বিপদতারিণী।
বিপদে পড়িয়ে মা করিলে স্মরণ
আপনি তরাবেন আজ দুঃখনিবারণ।
ব্যাঘ্রছাল আসনে বসিলেন যুগপতি
হরের বামে বসিলেন চণ্ডিকে পাবর্বতী।
বাম করে বসে গৌরী বলিছেন বচন
একা বাক্য বলি শুন দেব ত্রিলোচন।
আমার বাই শঙ্খ নাই তোমার নাইকো লাজ
দুইটী বাই শঙ্খ দাও সোয়ামী দেবরাজ।
কোথায় নাচে নীল শঙ্খ কোথায় খুঁজে এলি
কি বুঝিয়ে দান শঙ্খ আমারে মাগিলি।
ওই যে আছে বীর বসোয়া
আমার এই সিদ্ধির ঝুলি

১০ বাই—শাঁখা বা চুড়ির গুচ্ছ বা গাছা।

উয়োকে বেচিলে হব জনমকার ভিখারী
কড়ারি ভিখারী দুর্গা কড়ার জন্যে মরি।
কোথায় গেলে পাব আজি দু'বাই শঙ্খের কড়ি
আমার ঠিঁয়ে লে গৌরী দিব্যি গেঁটের সোনা
উয়োই ভেঙ্গে পর আজ নাকেরই নাকচোনা।
রূপোসোনা পর যা আকালে বিচে খাবি
রাঙ্গা উলি শাঁক পরে কোন্ স্বর্গে যাবি?
রূপো সোনা পরতে আমার অঙ্গ বেথা করে
রাঙ্গা উলির শঙ্খ পর্‌তে বড় সাধ লাগে।
তোমার পিতা দক্ষ রাজা তিনি ধনের সদাগর
শঙ্খ পরার সাধ থাকেতো যাওনা পিতার ঘর।
শুনিলি শুনিলি পদ্মা ভাঙ্গড়ের বচন
সদাই কি মা-বাপের ঘরে পরে আভরণ।
ভাঙ্গড় ভাঙ্গড় বলে আজ না দিও গাল
হাতে ধরে বলেন মহাদেব শঙ্খ দিব কাল।
দুর্গা বলে এইখানে থাক ভাঙ্গড় বুড়ো,
কুচানীর মাথা খেয়ে—
আমি চললাম পিতার বাড়ী কার্ত্তিক গণেশ লয়ে।
কোলে নিলেন কার্ত্তিক হাঁটিয়ে লম্বোদর
ক্রোধ করে যাত্রা করে মাতা-পিতার ঘর।
ঘরে থেকে বেরোইতে মস্তকে ঠেকে চাল;
ডানে যায় শৃগাল রূপ বামে কাল সাপ।
মিনি মেঘে বরষণ জলে রক্ত নেচা নেচা—
মাথার উপর ডেকে যায় কালবরণী পেঁচা।

---

১৬ কড়ারি—কড়ার (এক কড়াও ভিক্ষা করিতে হয়)।
১৮ ঠিয়েঁ—ঠাঁই বা নিকটে।
১৯ উয়োই—উহাই; নাচচোনা—নাসিকার অলঙ্কার বিশেষ।
৩০ কুচানী—বেশ্যা।

এমন কেউ থাকে গো বিবুরী এসে লিতে
লাজলজ্জা খেয়ে মহাদেবের আজ থাকিতাম এক ভিতে।
ঢেঁকি চেপে গিয়াছে নারদ ব্রহ্মারি ভুবন
আসিতে মামীর সঙ্গে পথে দরশন।
কেন দেখি মামী গো তোমার বিরস বদন
মামাতে মামীতে কোঁদল কিসেরি কারণ।
ভাগনে রে তোর মামাকে চেয়েছিলাম আমি দু'বাই
শঙ্খের কড়ি;
মিছে কোঁদল করে পাঠাইলে বাপের বাড়ী।
এইখানে থাক মামী তিলেক বসিয়ে
মামাকে আসিয়ে জিজ্ঞাস তোমায় নোব সিঁয়ে।
খিড়কী দুয়োরে নারদ ওগো ঢেঁকিটী বাঁধিল
সদর দুয়োর যেয়ে দরশন দিল।
একা কেন বসে মামা, মামী কোথা যায়?
কার্ত্তিক গণেশ ভাই বিনা কৈলাস আঁধার হয়।
কতদূর গেল নারদ ভাগ্‌না
আনগা ফিরায়ে দুটি বাই শঙ্খ দিব নগর মাগিয়ে।
আলকুশীর গুঁড়ি নারদ কতকগুলো সঙ্গে কোরে নিল
কুন্দুলের পড়ো নারদ বগলে ডাবিল।
দু'কাটি বাজিয়ে নারদ গমন করিল।
সেখান হইতে হইল নারদের গমন
মামীর কাছেতে নারদ দিলে দরশন
মামী বলে—ধেয়োনা ধেয়োনা নারদ তুমি ওইখানে দাঁড়াও
কি বলেছে তোমার মামা সত্যি কথা কও।
পালাবি তো পালা মামী প্রাণ জীবন লয়ে
মামা বসেছে দুয়ারে ত্রিশূল হাতে ক'রে;

---

৩৮ লিতে—লইতে।
৪৭ নোব সিঁয়ে—আসিয়া লইয়া যাইব।
৫৪ আলকুশী—যন্ত্রণাদায়ক লোমযুক্ত ফল বিশেষ।
৫৫ পড়ো—পড়ুয়া বা অভিজ্ঞ।

ধরতে পেলে বধিবে আজ তোমারে পরাণে।
দুর্গা বলে গাল দেয় ভবানী নারদের মাথা খেয়ে
কতই ছলা জানিস নারদ চক্ষের মাথা খেয়ে।
সেখান হইতে হল গো নারদের গমন
মামার কাছেতে যেয়ে দিল দরশন।
আপনার মাথার কিরে আমি দিলাম বারংবার
কার্ত্তিক গণেশ ভেইএর কিরে দিলাম গো আবার।
কুঁদুলের ঝি বটে মামা যেদিন কুঁদুল নাইকো পাই;
বেনাগাছে চুল জড়িয়ে গড়াগড়ি যায়।
কুঁদুলের ঝি বটে মামা কুঁদুলকে কেবা পারে
দেবতার বধূ জলকে যায় না তার কুঁদুলের ডরে।
কেন তখনি বলিলাম মামা বিয়ে নাইক কর
সহুরে নহুরে মামী অনবড়ো নাগর।
বুদ্ধি বল নারদ ভাগিনা, বুদ্ধি বল মোরে
তোর মামী ঘরকে আসে কেমন প্রকারে।
সাজতে যদি পার মামা বাঘেরি বরণ
রূপে গুণে মামীর সঙ্গে হইবে দরশন।
বাঘমূর্ত্তি সেজে মহাদেব ডিঙ্গে লিল পথে
গর্জ্জাইল গণেশের মা বাহন পেল পথে।
লম্ফ দিয়ে চাপতে যায় বাহনের ঘাড়ে
জয় রাম শ্রীরাম বলে বুড়ো গমন আজকে করে।
কি বুদ্ধি দিলিরে নারদ ভাগ্‌না কি দিলিরে মোরে
ধরতে পেলে তোর মামী পুরুষ বধ করিত কেমনে।
মামা গো এই কি তোমাদের হাত
ভেয়ে ভেয়ে কাঁধে চাপা ছিল কিছু সাধ।
বুদ্ধি বল নারদ ভাগনা বুদ্ধি বল মোরে
তোর মামী ঘরকে এসে কেমন প্রকারে।
সাজতে যদি পার মামা শাখারীর বরণ
রূপে গুণে মামীর সঙ্গে হবে দরশন।
গরুড় গরুড় বলে মহাদেব ডাকিতে লাগিল
কোথায় ছিল গরুড় পক্ষ মৃত্তিকায় নামিল।

আয় গরুড় বাটার তম্বুল খা
শীঘ্র করে সমুদ্রর শঙ্খ মেরে আনগা।
একেত গরুড় জাত দ্বিজ আজ্ঞ পেল
উড়িতে উড়িয়ে গরুড় গমন করিল।
সেখান হইতে হল গরুড়ের গমন
সমুদ্রের ধারে গরুড় দিল দরশন।
সমুদ্রের ধারে গরুড় ভাবে মনে মনে
এমন সমুদ্র আজি মরিবে কেমনে।
এক ডেনাতে বন্ধন করে এক ডেনাতে হেঁচে
বেলা দুপুরে সময় শঙ্খ মেরে আনে।
সেই শঙ্খ হেতেরে কাটিয়ে নির্ম্মাণ করিল
শঙ্খের গুড়ি কিবা গায়েতে মাখিল।
শঙ্খ মাজা লড়ি খানি বগলে ডাবিল
শঙ্খের পসরা কিবা মস্তকেতে নিল।
শঙ্খ নেবা নেবা বলে গো নগরে হাঁক দিল
দুর্গা বলে আয় পদ্মা বাটার তাম্বুল খা।
কোন গাঁয়ের শাখারী বটে ওকে দুয়োরে বসাগা।
কোথাকার শাখারি ঠাকুর পদ্মা বলে কোন্ নগরে ঘর
তোমার শঙ্খ পরিবে অভয়া মঙ্গল।
এক দুয়োর দুই দুয়োর পেরিয়ে মহাদেব ভাবে মনে মনে
আমি না জানি শঙ্খ পরাইতে পরাব কেমনে।
শঙ্খ দেখতে এল শিবের খুড়শেষ শাশুড়ী
গায়ে বস্ত্র নেয়না তারা করে হুড়াহুড়ি।

---

১০২ হেঁচে—জল সেঁচিয়া ফেলে।
১০৪ হেতেরে—অস্ত্র দ্বারা।
১০৬ লড়ি—ছড়ি; শঙ্খ মাজিবার ছড়ি।
ডাবিল—দাবাইয়া রাখিল।
১০৯ অনুরূপ উক্তি—'বৈস বৈস আহে বাপু বাটরে পান খাও'—গোবিন্দচন্দ্রের পাঁচালী।
১১০ বসাগা—বসাওগা বা বসিতে দাও।

মহাদেব বলে কে কে পরবে শঙ্খ কিনে কিনে পর
আমার শঙ্খের মূল্য তোমরা কেবা দিতে পার।
তেল জল লয়ে গো শাখারীর আগে দিল।
সোনার খাটে বসে দুর্গা রূপার খাটে পা
শঙ্খ পরতে বসিল কার্ত্তিক গণেশের মা।
গাছে গাছে পরায় শঙ্খ মন্ত্র করে সার
যাবার বেলা যাবি শঙ্খ না বেরোবি আর।
ওরে শঙ্খ করাতে না যাবি কাটা
শিলনোড়াতে ওরে শঙ্খ না যাবি ভাঙ্গা।
ধন ধান লয়ে কিছু শাখারীর আগে দিল
তা দেখে শাখারীর হরি ভক্তি উড়ে গেল।
ধন ধান নিব না মাণিক মুক্তা কত আমার তালাইয়ে শুকায়—
তা কুড়াইতে দাসী বাঁদীর অঙ্গে বেথা হয়।
সোনার কুমড়া কত গড়াগড়ি যায়।
পদ্মা বলে ধন ধান মাণিক মুক্তো
যদি তোমার তলাইয়ে শুকায়
তবে দারুণ শঙ্খের পসরা কেন মস্তকেতে বও।
জাতিহীন নই পদ্মা বিত্তিহীন হই—
সেই কারণে দারুণ শঙ্খের পসরা মস্তকেতে বই।
ধন ধান লিব না বঞ্চি ব বাসুঃ।
কি করিলাম কোথা এলাম আপনার মাথা খেলাম—
নালা কাটিয়ে জল ঘরকে আনিলাম।

---

১২০ অনুরূপ উক্তি—

সোনার খাটে বৈসে মৈনা রূপার খাটে পাও।
দণ্ডকে দণ্ডকে পড়ে শ্বেত চাওয়ের বাও।।
— গোবিন্দচন্দ্রের পাঁচালী

১২৮ মাণিক মুক্তা ....তালাইয়ে শুকায়—অনুরূপ উক্তি—'হীরা মণিমাণিক্য লোকে তলিতে (ত্যনাইএ) শুখাইত'—ময়নামতীর গান—ভবানীপ্রসাদ।

১৩৪ বিত্তিহীন—বৃত্তিহীন।

মনের ক্রোধ করি শঙ্খ ভাঙ্গিতে গেল
নোড়া চূর্ণ হল, শঙ্খের গায় ঘা নাইক লাগিল।
উঁচু পিড়ে দেখে ঠাকুর গর্জ্জিয়ে বসিল।
শিব ভগবতী বাসরে মিলন হইল
শিবদুর্গা নাম একবার বদনে বল।

(পানুড়িয়া-নিবাসী পঞ্চানন পটুয়ার গান হইতে লিপিবদ্ধ)

(২১)

ভগবতীর শঙ্খ-পরান পালা

ব্যাঘ্র ছাল বিচিয়ে বসিল শিবদুর্গাপতি
হরের বামে বসিল চণ্ডিকা পাবর্বতী।
বাঁ দিকে থেকে গৌরী বলিছে বচন
একা বাক্য বলি প্রভু, দেব ত্রিলোচন।
শিব নিন্দা করো না শিবের করো সেবা
দিতে পারি ইন্দিপদ ধনে করিবে রাজা।
আমার বাই এর শঙ্খ নাই. তোমার নাইক লাজ
দুইটী বাই শঙ্খ দিবে, স্বামী দেবরাজ।
কড়ার ভিখারী গৌরী কড়ার জন্যে মরি
কোথায় গেলে পাব আমি দু'বাই শঙ্খের কড়ি।
যতক্ষণে মাগি ভিক্ষা ততক্ষণে খাই
বুঝে সুঝে শঙ্খ চেও মোর ঠাঁই।
এ আমার বসোয়া এ সিদ্ধির ঝুলি
এই বেচিলে হব নাচের ভিখারী।
তোমার পিতা দক্ষরাজা ধনে সদাগর
শঙ্খ পরতে সাধ থাকে তো যাওনা পিতার ঘর।

---

১৪০ নোড়া—প্রস্তর-খণ্ড (শিল-নোড়া)।
১ বিচিয়ে—বিছায়ে, বিস্তার করিয়া।

শুনিলি শুনিলি পদ্মা ভাঙ্গড়ের বচন
সদাই কি মা-বাপের ঘরে পরে আভরণ।
চোখ খাক মোর মা বাপ পিতা চোখ খাগ মোর পরে
দেখে শুনে বিয়ে দিয়েছে ওগো আমায় ভিখারীর ঘরে।
চোখ খাগ মোর মা বাপ পিতা চোখ খাগ মোর খুড়ো
জেনে শুনে বিয়ে দিয়েছে লাঠি ধরা বুড়ো।
থাক থাক ভাঙ্গড় বুড়ো, কুচনীর মাথা খেয়ে—
চলিলাম পিতার বাড়ী কার্ত্তিক গণেশ লয়ে।
কোলে নিল কার্ত্তিক, হাঁটিয়ে লম্বোদর
ক্রোধ মুখে যাত্রা করে গৌরী মাতা পিতার ঘর।
ঘর হইতে বেরিয়ে মস্তকে ঠেকিল চাল
ডাইনে শৃগাল গেল, বাঁয়ে কাল সাপ।
বিনি মেঘে জল হয় রক্ত নেচা নেচা
মাথার উপরে ডেকে গেল লক্ষ্মীর কালপেঁচা।
আজি কি আমার যাবার যাত্রা লক্ষণ ত নাই
কেন আমি বার করিলাম কার্ত্তিক গণেশ দুইটী ভাই।
যদি থাকত নারদ ভাগিনা আমায় যেত লয়ে
ওগো যাব না যাব না করে, যেতাম নারদ ভাগ্নের সঙ্গে।
ঢেঁকির বাহনে নারদ করিছে গমন
ব্রহ্মার ভুবনে গিয়ে ওগো দিলে দরশন।
আসতে মামীর সঙ্গে হল দরশন।
কোথাকার যাও মামী, কোথায় গো গমন?
আজ কেন দেখি মামীর মলিন বদন
মামাতে মামীতে কোন্দল কিসের কারণ?
তোমার মামাকে চেয়েছিলাম দুবাই শখের কড়ি
শঙ্খ দিতে পারে না যাচ্ছি পিতার বাড়ী।
এইখানে থাক মামী, মোর বিলম্ব চেয়ে
মামাকে জিজ্ঞাস করে তোমায় যাব লয়ে।

---

১৭ ভাঙ্গড়—সিদ্ধিখোর; ২৩ কুচনী—বেশ্যা; ২৯ নেচা—ঘন, জমাট;
৪১ দুবাই শঙ্খের কড়ি—দুই বাহুতে পরিবার জন্য শাঁখার মূল্য।

মামীকে বসিয়ে নারদ করিলেন গমন
কৈলাস ভবনেতে গিয়ে দিলে দরশন।
একা কেন বসে মামা কৈলাস ভুবনে
মামীতে মামাতে কোন্দল কিসেরি কারণে।
তোমার মামী চেয়েছিল বাপ দুবাই শঙ্খের কড়ি
শঙ্খ দিতে পারি নাইরে তাই গেল পিতার বাড়ী।
যে দিন হেমন্তর বিটী কোন্দল নাই পায়
ওগো বেনাগাছে চুল জড়িয়ে গড়াগড়ি যায়।
যেদিন হেমন্তর বিটী মায়ের ঘর গেল
ওগো কৈলাস ভবনে আমার কোন্দল ঘুচিল।
নারদ ভাগ্নে বাপরে কোন্দলকে কে বা পারে
ওগো দেবতা পশু জলকে যায় না তার কোন্দলের ডরে।
কত দূর গেল তোর মামীকে আনগে ঘুরাইয়ে
দুইটী বাই শঙ্খ দিব নগরে মাগিয়ে।
এই কথা নারদ কর্ণেতে শুনিল
কোন্দল ধুকুড়ী নারদ বগলে ডাবিল।
মামীর কাছে যেয়ে নারদ দরশন দিল
পালাবি ত পালা মামী প্রাণ জীবন লয়ে।
ওগো দুয়ারে বসেছে মামা ত্রিশূল ঘাড়ে কোরে
ওই আসচে মামা বেটা ভাঙ্গ ধুতরো খেয়ে।
মরুক মরুক তোর মামা চক্ষে পড়ুক ছানি
ওগো দুটি চোখে দেখতে না পাই হীরে নাম কুচানী।
মামীকে বিদায় দিয়ে নারদের গমন
কৈলাস ভবনে নারদ দিলে দরশন।
মামাগো কার্ত্তিক গণেশের ভেয়ের কিরে দিলাম বাবস্থার
তবু ত মামী এল না কৈলাস ভুবন।

---

৬০ ধুকুড়ী—ঝুলি বা কাঁথা; কোন্দল-ধুকড়ী-কোন্দল পটু। যথা—
'দেবী বলে দূর বেটা কোন্দল-ধুকুড়ী'—ঘনরাম—ধর্ম্মমঙ্গল
রাখিয়া বাহন ঢেকী কোন্দল-ধুকুড়ী'—ঐ।

বুদ্ধি দে রে নারদ ভাগ্নে উপায় দেরে মোরে
তোমার মামী কৈলাস আসিবে কেমন প্রকারে।
আমার বুদ্ধি সাজতে পার মামা ওগো বাঘেরি বরণ
রূপে গুণে মামীর সঙ্গে হবে দরশন।
ওই কথা যখন শিবের মনেতে লাগিল
বাঘবরণ শিব সাজিতে লাগিল।
নেঙ্গুড় টেঙ্গুড় নিয়ে বাঘ চৌদ্দ হাত হল
বড় বনের বাঘ হয়ে পথে আগুলিল।
কোলে ছিল কার্ত্তিক-গণেশ ডরিয়া উঠিল
কেঁদো না কেঁদো না বাপ কপালে কিবা আছে
ভালই হল কার্ত্তিক গণেশ বাহন পেলাম কাছে।
কাঁছ মেরে কাপড় পরে দুর্গা চড়িবারে যায়
বোম বোম বলে বাঘ বন দিয়ে পালায়।
তোর বুদ্ধি হতভাগা নারদ ধরেছিলাম আমি
লাফ দিয়ে আমার ঘাড়ে চড়ে নাই তোর মামী।
ঐ কথাটী মামা তুমি বলো না কারু কাছে
তোমাদের সব ভেয়ে ভেয়ে কাঁধাকাঁধি আছে।
দেখ মামা রাসলীলা করেছিল ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে
রাসলীলা করেছিল সব গোপিনীদের সনে।
রাসলীলা করে রাধা বলে আমি হেঁটে যেতে নারি
দয়াল প্রভু বলে এসো রাধে আমি স্কন্ধে করি।
তবে বুদ্ধি বল নারদ ভাগনা উপায় বল মোরে
তোমার মামী কৈলাসে আসবে কেমন প্রকারে।
যদি সাজাতে পার মামা শেখারী বরণ
তবে রূপে গুণে মামীর সঙ্গে হবে দরশন।
এই কথা মহাদেবের মনেতে লাগিল
শেখারী বরণ মহাদেব সাজিতে লাগিল।

---

৮২ কাছ—কাছা। ৮৭ কাঁধাকাধি—কাঁধে করার অভ্যাস।
৯৪ শেখারী—শাঁখারী।

সেদিন বিশ্বকর্ম্মা বলে তখন ডাকিতে লাগিল
আসিয়ে সে বিশ্বকর্ম্মা চরণ বন্দিল।
এসো রে বাপ বিশ্বকর্ম্মা বাটার তাম্বুল খাবি
শীঘ্র কোরে দুবাই শঙ্খ আমার নির্ম্মাণ করে দিবি।
একেতে সে বিশ্বকর্ম্মা তখন শিবের আজ্ঞা পেল
জয় জয় বলে শঙ্খ বানাইতে লাগিল।
দুই বাই শঙ্খ ঠাকুর নির্ম্মাণ করিল
শঙ্খ দেখে মহাদেব আনন্দিত হল।
শেখারী বরণ শিব সাজিতে লাগিল
শেখারী পসরা ঠাকুর আকিনেতে সাজিল।
শেখারীর গুঁড়ি ঠাকুর গায়েতে মাখিল
শেখা মাজা লড়িখানি বাম বগলে ডাবিল।
জয় জয় বলে শিব কৈলাস বাহির হল
হেমলা নগরে গিয়ে দরশন দিল।
শেখা নেবা বলে তখন তিন ডাক দিল
ঘরে ছিল পদ্মাবতী শুনিতে পাইল।
আনগো শেখারী আমাদেরি বাড়ী
তোমার শেখা পরিবে অভয়া মঙ্গলি।
বড়লোকের ঘরকে যেতে বড় লাগে ভয়
কেউ মারিবে লাথ গোড়ালি কেউ মারিবে চড়।
এক ঘর দেখাইতে যখন ফিরে ঘর দেখাইল
শেখারীর পসরা ঠাকুর ঘরেতে নামাইল।
সুবর্ণের পাটীখানি শেখারীর থানে দিল।
ঘরে ছিল শিবের খুড়শেষ শাশুড়ী।
গায়ের কাপড় নেয় না তারা করে হুড়াহুড়ি।
বাঁদিকে বসিল শিবের মেনকা ঠাকরুণ
কোথাকার থাক শেখারী কোথা তোমার ঘর।
সূর্য্যপুরে থাকি আমি আমার ইন্দ্রপুরে ঘর

---

১০৪ দুই বাই শঙ্খ—দুই বাহুতে পরিবার শাঁখ। ১০৯ ডাবিল—চাপিয়া ধরিল।
১১২ শেখা নেবা—শাঁখা লইবে।

নামটী আমার দেব শেখারী গো পিতা সদাগর
শঙ্খ বেচিতে এসেছি মা তোমাদের নগর।
গ্রাম সম্বন্ধে হল আমাদের জামাই।
শেখারী বলেন মা ঐ সম্বন্ধ চাই।
জয় জয় বলে শেখারী কাগজ খুলিল
ধান দূর্ব্বা লয়ে শেখারীকে আশীর্ব্বাদ করিল।
তেল জল লয়ে ওগো যায় হাতেতে মাখাইল
ওগো জয় জয় জয় বলে শঙ্খ পরাইতে লাগিল।
সোনার খাটে বসিলেন দুর্গে, রূপোর খাটে পা
শঙ্খ পরতে বসিলেন কার্ত্তিক গণেশের মা।
গাছি গাছি শঙ্খ পরায়ে মন্ত্র করে সার।
যাবার বেলাতে শঙ্খ নড়ে চড়ে যাবি
আসিবার বেলাতে শঙ্খ নাহি বেরোবি।
দুই বাই শঙ্খ যার পরিধান করিল
ধন ধান লয়ে গো শেখারীর আগে দিল।
ধন ধান দেখে শেখারীর রঙ্গ জ্বলে গেল
কোটীক নয়নে দুর্গে চাহিতে লাগিল।
তবু তো দেব শেখারী ভস্ম নাহি হল
ওগো হাতের অঙ্গরী খুলে দেখাইতে লাগিল।
শ্বেত মাছির রূপ ধরে গায়েতে বসিল
এইখানে শিবদুর্গার মিলন হইল।
শিব জপরে মন, হেলনে তরি বেদন,
বদন ভরিয়ে মুখে বল বোম বোম, শিব জপরে মন।

(কাঁতুরহাট-নিবাসী পূর্ণচন্দ্র চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

১৪১ রঙ্গ—অঙ্গ।

(২২)

শঙ্খ-পরান

এক দিবসে বসে রে হর কৈলাস পর্ব্বতে
গৌরী বিনে ব্যাকুল হয়েছেন ভোলানাথে।
এরা ত চিন্তিত হর গায় ভর্স্ম মেখে
কি মত প্রকারে আজ দেখিব অমৃতে।
নাইয়েরে গিয়েছেন গৌরী তাতে নাইকো দায়
কার্ত্তিক গণেশ পুত্র আমার অন্নেতে নালায়।
হেথা থেকে কাজ নাহি যাব সেই দেশে
বুজিব গৌরীর মন আজ শাখারির ব্যাশে।
বিশ্বকর্ম্মা বলে রে শিব ডাকেন ঘন ঘন,
অস্ত্র হাতে বিশ্বকর্ম্মা দিলেন দরশন।
অস্ত্র হাতে বিশ্বকর্ম্মা হেঁট করিলেন মাথা
কি জন্য ডেকেছেন আজ দেবের দেবতা।
আইস বটে বিশ্বকর্ম্মা বাটার তাম্বুল খাও
গৌরীর হস্তে দু'বাও শঙ্খ আমার গটে দেও।
আজ্ঞে পেয়ে বিশ্বকর্ম্মা শঙ্খ নেলেন কাটি
গটিলেন দু'বাও শঙ্খ দেখতে পরিপাটি।
আপতাপ মহাতাপ লক্ষ্মী গড় জলে
বিচিত্র করিলেন আজ হিম্বুল হরিতালে।
লতাপাতা ফুলপাতা তাহে আশ্বি কাটা
জমন, নবমেঘ একত্র হইয়ে দিব্য করে ছাটা।
শঙ্খেতে দিয়েছেন লেখে শিবদুর্গা নাম
চতুর্দ্দশ লিখিলেন কত অষ্টদশ পুরাণ।
শঙ্খ পেয়ে তুষ্ট হইলেন দেব শূলপাণি
ভর্স্ম ভূষণ ত্যাজ্য করি সাজিলেন শাখারু।

---

৫ নাইয়েরে--হিন্দি 'নৈহর' = পিত্রালয় (বা জ্ঞাতিগৃহ)। নাই + হর (জ্ঞাতি নাতি নাই?) হর—গৃহ (সর যেমন বাসর > হর বা বাসর)।

১৪ গটে দেও—গড়িয়া দাও ১৮ হিম্বুল—হিঙ্গুল ২০ জমন—যেমন।

শিবের বাম স্কন্দেতে সির্দ্দির ঝোলা, শঙ্খ থোয় তাতে
জয় শ্রীদুর্গা বলে চললেন ভোলানাথে।
শিবের দক্ষিণ হস্তে নিমির ছটা চললেন ধীরি ধীরি
উপনীত হলেন আজ হেমন্ত রাজার পুরী।
তবে শঙ্খ নেবা নেবা বলে ডাকেন ঘনে ঘন
অন্তস্পুরে থেকে গৌরী করিলেন শ্রবণ।
দ্বারেরো বাহির হলেন দেবী চন্দ্রমুখী
কে এনেছ কেমন শাঁখা এদিক আন দেখি।
ঐ কথা শুনিয়ে শিবের বাড়িলেন আনন্দ
পুরীর মদ্দি চলে গেলেন হয়ে পেরমানন্দ।
তবে পিড়ের উপর বসে রে শিব শঙ্খ দিলেন খুলি
জ্বলিত করিল আজ হেমন্ত রাজার পুরী
জমন পেরভাত কালে পূবর্বদিকে উদয় ভানূকর
তমন মত শঙ্খেতে আজ করছে দীপ্তকার।
শঙ্খ দেখি তুষ্ট হলেন দেবী চন্দ্রামুখী,
জমন মধুর লোভে মাত হয়ে উরে ফেরে অলি।
শঙ্খ বেছতে আইছ তুমি শঙ্খের ব্যাপারী
কোন্ বা দেশে ঘর তোমার কি নাম শাখারী।
তবে শঙ্খ বেছতে আইচি আমি শঙ্খের ব্যাপারী
বঙ্গদেশে ঘর আমার নাম জয় শিব শাখারী।
তবে পাবর্বতী বলেন গো তত বিধাতারি কাম
তোমার নামের নাম কি আমার বাড়ীর মান্ষির নাম
তুমি মিতে আমি মিতিন কেউ না কারো পর
আমার হাতে দিবা শঙ্খ কত নিবা দর?
তুমি মিতিন আমি মিতে কেউ না কারো পর
তোমার হাতে দিব শঙ্খ আর কি নিব দর?
তবে পাবর্বতী বলেন মাগো বলি যে তোমাকে
নগর মাঝে আইছে শঙ্খ কিনে দাও আমাকে।

---

৩৪ মদ্দি—মধ্যে। ৪০ মাত—মত্ত।

তবে রাজা নাইকো বাড়ী দ্বারে নাইকো ধন
মিছি মিছি কেন গৌরী করেছেন রোদন।
তবে পার্ব্বতী বলেন মাগো এই শঙ্খ রাখিব
শঙ্খের বদলে কাঁকন শাখারুকে দিব।
তবে তৈল জল দিয়ে হস্তের উঠালেন মলা,
শঙ্খ পরিতে বসিলেন গৌরী ষোল কলা।
টানিলে না খসে শঙ্খ বাড়ালি না ভাঙ্গে
আশীর্ব্বাদ করিলেন আজ জয় জগদীশে।
পার্ব্বতী বলেন দিলে বটে সাহা
সত্য করি কওদি মূল্য দিব কত টাহা।
তবে তুমি মিতিন আমি মিতে কেউনা কারো পর
তুমি আমি দু'জনেতে থাকিব এক ঘর।
ব্যাঙ্গের কি সাধ্য আছে লঙ্ঘে সমুদ্দুর
বানরের কপালে তবুও শোভে কামসিন্দুর।
বাপে যদি শোনে তোমার এই সকলে কথা
জট গাছি কাটিয়ে তোমার নাড়া করবে মাথা।
তবে মেনকা বলে বেটা এমন কথা কয়
এখনি খুলে দেই শঙ্খ গৌরী হেতা আয়।
টানিলে না খসে শঙ্খ বাড়লি না ভাঙ্গে
গৌরীর হস্তে শঙ্খ যেন বজ্র হয়ে আছে।
পাটার উপর থুয়ে নোড়া দিয়ে মারলো বাড়ি
নোড়া ভাঙ্গো দুখান হইয়ে দুদিক্ গেল পড়ি।
শব্দ শুনেছি গৌরী তুমি বড় সতী
চিনিতে না পাব তুমি আপনার পতি।
পঞ্চবাত ব্যান্নুন করিলেন রন্ধন,
শিবদুর্গা দুজনাতে করিলেন ভোজন।
তবে এই পর্য্যন্ত কবিতা সাঙ্গ হইয়ে গেল
শিবদুর্গা মিলন হ'লো শিবর ধ্বনি বল।।

---

৬১ সাহা—শাঁখা। ৬২ টাহা—টাকা।

(২৩)

গৌরাঙ্গ-অবতার

নবদ্বীপ অবতারে নিতাই গৌর দেখুন নাচিতে
দিনে দিনে দুগ্ধ খায় নিমাই দোলেন মায়ের কোলে।
দিন ক্ষণ করে দিল পণ্ডিত পাঠশালে।
পড় রে বাপ প্রাণের নিমাই কৃষ্ণ গুণমণি
পড়তে না পারে নিমাই পণ্ডিত মেলেন ছড়ির বাড়ি।
সদাই পড়ছে নিমাই দেখুন গৌর-গুণমণি।
ক্রোধ হয়ে গদাধর পণ্ডিত তবে নিমাইকে মারিল
কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাই চন্দনতলা গেল।
চন্দনতলায় নিমাই দেখুন ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিল
রামরূপে ধেনুকধারী কৃষ্ণরূপে আসি অচৈতন্য রূপে নবীন সন্ন্যাসী।
ডোর নিলে, কৌপীন নিলে নিমাই করঙ্গু নিল হাতে
চলিল গো শচীর দুলাল পাতকী তরাতে।
পড়ে রইল খাট-পালঙ্গ বাঁধ বন্ধন বালা
নিমাই বিনে তোলা রইল কেশরীর মালা।
খাট পালঙ্গ পেড়ে দেখুন শচী মাতা সুখে নিদ্রা যায়
যমের ভগ্নী কালনিদ্রা শচীমাতাকে নিদ্রাতে চাপায়।
এক ডাক দুই ডাক নিমাই তৃতীয় ডাক দিল
তৃতীয় ডাক দিয়ে নিমাই সন্ন্যাস ধর্ম্মে গেল।
কেশবী ভারতী এসে কিবা মন্ত্র দিল
সেই দিন হইতে প্রাণের নিমাই উদাসীন হইল।
রাত্রি প্রভাত হইল কোকিলে করে রা
শয়নে মন্দিরে ছিলেন শচী মাতা ঝেড়ে তোলেন গা।

---

৫ মেলেন—মারিলেন।
১১ করঙ্গু—করঙ্গ।
১৪ কেশরীর—কিশোরীর।
২১ করে রা—রা কাড়ে, বা রব করে।

কেন জন্ম নিলিরে বাপ নিমবৃক্ষে মূলে
হয়ে যদি মরিতি না করিতাম কোলে।
কাল তোরে দিলাম বিয়া কুলীনের ঝি
ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া তার উপায় হবে কি?
বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতা দেখুন কাঁদিতে লাগিল।
দেখ রে নদীয়ার লোক বাড়ীর বাহির হ'য়ে
নিমাই গেছেন সন্ন্যাস ধর্ম্মে কেউ রাখ বলে ক'য়ে।
কেউ বলে প্রাণের নিমাই গাঙ্গে ডুবে মল
কেউ বলে প্রাণের নিমাই সন্ন্যাস ধর্ম্মে গেল।
মধুপুর মধুপুর বলে দেখুন নিমাই যেতে যে লাগিল
মধুপুরের মধু দেখুন নাপিতকে ডাকিতে লাগিল।
কাটোয়ার ঘাটে প্রভু মস্তক মুড়াইল।
রঘুনাথ ভট্টদাস মুকুন্দমুরারী মুখে বলেন হরি
ভাবে পড়ে খাটদাস খেছেন গড়াগড়ি।
বড় ঘর বড় দুয়ার বড় কর আশা
সকল দ্রব্য রইবে পড়ে গঙ্গার তীরে বাসা।

(আয়াস-নিবাসী গোপালচন্দ্র চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

(২৪)

জগন্নাথ ও গৌরাঙ্গের গান

জয় জয় মহাপ্রভু জয় নিত্যানন্দ জয় আদ্যচন্দ্র জয়।
গৌর ভক্ত বৃন্দ হরিনামে বল ঠাকুর প্রভু জগন্নাথ
যাহার নাম লইলে খণ্ডিবে দেহের পাপ।
সুপর্ণের জয় হস্ত কপালে মাণিক

১ জয় আদ্যচন্দ্র—অদ্বৈত চন্দ্র (জয়াদ্বৈত চন্দ্র)।

প্রভুর গলেতে দোলে মালা দেখিতে সুন্দর
ডাইনে আছেন বলরাম মধ্যে ভগ্নি
তার বামে নীলা চন্দ্র আছেন আপনি।
ঠাকুরের দুয়ারে অন্ন প্রসাদ বিকায়
শূদ্রে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণেতে পায়।
চরা কড়া কড়ি দিয়ে হাড়ির ঝাঁটা খায়।
হাতাহাতি কোলাকুলি ভকতে বলে হরি
কেউ কেউ তুলিয়া লইছে চরণেরই ধূলি।
এই হরিনাম ভাই যেবা নরে পূজে
হেলায় বৈকুণ্ঠে যাবে জনম যাবে সুখে।
পুণ্যের শরীরে পাপ নাই।
খোলের শব্দ শুনে খোল কত্তাল বাদ্য বাজে
গোরা নাচে আপন মনে
ধরে হরির নাম দিচ্ছেন বালকগণের কানে।
নবদ্বীপে চাঁদ বন্ধন শচীর নন্দন প্রেমানন্দে
করিলেন পূর্ণ শচীর নন্দন।
ভাই নিত্যানন্দ জীবন দিব দাম ভীতে অবতার
করিলে প্রভু নদীয়ার মাঝার।
কলি যুগের অবতার করিলেন দুইটী ভাই
কৌতুকে ধরিল নাম চৈতন্য নিতাই।
রাধামাধব বন্ধন মনের কৌতুকে ভাই
নিত্যানন্দ জীবন দিব ডান ভীতে রামরূপে ধনুকারি।
কৃষ্ণরূপে বাঁশী তিনমূর্ত্তি নয়ে গৌরাং
হলেন সন্ন্যাসী নিমাই যাবেন সন্ন্যাসে
তাহা নাইক দায় তোমার বিষ্ণুপ্রিয়ের
বধূনারী কি হবে উপায়, বিষ্ণুপ্রিয়ের বধূ নয় মা

---

৪ সুপর্ণের—সুবর্ণের।

৯ পায়—খায় বা ভক্ষণ করে।

১০ জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতে 'হাঁড়ির ঝাঁটা' সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ

১৬ কত্তাল—করতাল।

জ্বলন্ত অগ্নি কি দিয়ে রাখিব দিয়ে মুখের বাণী সুরধনী।
তীরে নিমাই দণ্ডেক দাঁড়িও তোমার চাঁদ মুখে নিরখিয়ে
তবে মায়ে ছেড়ে শচী মায়ের বাক্য নিমাই দুরেতে রাখিল।
কণ্টকনগরে আসি দিল দরশন
কণ্টকনগরে যখন বেলা সাত ঘড়ি
খেউরী করিতে বসিল কেশব ভারতী।
গোরা কেমন রে নাপিত তুই কেমন রে, তোর হিয়ে
কি দেখে মুড়াইলে মাথা।
নবীন দেখিয়ে সুচাঁদ শোচো গঙ্গা
মৃত্তিকার ফোটা কোথা থুলে
বেণুবাঁশী কোথায় থুলে লোটা
কোথায় তোমার চিকাপুচ্ছ কোথা গোপীনারী
কি অখিলের নাথ হলেন দণ্ডিধারী।
হাতে লইলেন কোমণ্ডল দণ্ডে ধরিলেন ছাতি
প্রভু জীবের লাগিয়ে ফেরে অখিলার পতি।
আর চিন্ন বাই রূপনাথ সনাতন শ্রীনরহরিদাস
ভুবনমোহন চূড়া পড়ে ভূমিতলে
গদাধর পণ্ডিত কাঁদে চূড়া লয়ে কোলে।
ওপথে দেখেছ আমার নিমাইকে যাইতে?
গলার তুলসীর মালা অল্প বয়সে
জগাই মাধাই তারা দুই ভাই অসুর হরি দিয়ে
তাদের দর্প করলেন চুর হরিনামে দুই ভাই।
বৈরাগ্য হইল, আনন্দেতে দুই ভাই নাচিতে লাগিল,
দাতা লয়ে মহাপ্রভু তুমি দেবেন বর
গৃহস্থের মন বাঞ্ছা করিবে কুশল।

(সোনাকান্দি-নিবাসী কিশোরীমোহন চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

---

৪২ চিকাপুচ্ছ—শিখিপুচ্ছ।
৪৪ কোমণ্ডল—কমণ্ডলু। ৪৫ অখিলার—অখিলের।

(২৫)

গোপালন

গরুরি পালন কর, গরু বড় ধন
যার গোয়ালে গরু নাই তার বৃথাই জীবন।
ইন্দ্র আদি দেবগণ সকলি দেবতা
কপিলার সঙ্গে মা কহে কোন কথা।
কপিলা বলে চল যাব অবনীমণ্ডলে
দধি-দুগ্ধ লইলে দেবগণ পূজিবে কেমনে।
সরগে ছিলেন কপিলা মর্ত্ত্যপুরে এল
নরলোকের ঘরে ঘরে ফিরিতে লাগিল।
গরু নাড় গরু চাড় গরু বড় ধন
যার গোয়ালে নাই তার বৃথাই জীবন।
পৃথিবীর মধ্যে মা গরু বড় ধন
তার সেবা করেছেন প্রভু নারায়ণ।
চালভাজা কড়কড়ে ভাজা যে জন গোহালেতে খায়
গুটি গুটি বসন্ত তার গরুর গায়ে হয়।
ভাদ্রমাসে গোয়ালে যে জন মাটী দেয়
বছর বছর পাল তার মাটী হয়ে যায়।
পান খাইয়া যে জন গোহালিকে যায়
রক্ত পিনাস হয়ে গেয়ের বাছুর মরে যায়।
ভাদ্র মাসে তাল গোলানি গরুকে খাওয়ায়
তালে বেতাল হয়ে গরু মরে যায়।
রবিবারে গোহালে যে মৎস্য ভাজা খায়
এঁটুলি উকুন তার গরুর গায়ে হয়।
অনুদয়ে যে জন গোহালিকে যায়
গঙ্গাস্থানের ফল গোহালে বসে পায়।

---

৯ গরু নাড় গরু চাঁড়—গরু নাড়াচাড়া কর।
১৬ পাল—গরুর পাল।
১৯ তাল গোলানি—পাকা তালের মাড়ি (মণ্ড)।

প্রাতঃকালে ছনছড় সন্ধ্যে দিও বাতি
তাহার ঘরে বিরাজ করে লক্ষ্মী ভগবতী
সাত বউকে ডাক দিয়ে কহে নীলবতী
গরু বাছুরের সেবা কর মা তোমরা নিত্যি নিত্যি।
সাত দিন সাত বউএর পালি বেঁটে দিল
প্রথম গোয়ালকাড়া বড় বৌটীর হল।
প্রথম বড় বউ কুলেরি নন্দন
তোমা হতে হবে মা গরুরি পালন।
গরু নাড় গরু চাড় গরু বড় ধন
তার সেবা করেচেন প্রভু নারায়ণ।
সাত দিনে সাত বউএর পালি বেঁটে দিল।
ছোট বউ ছিল মা আলার ঘরে দুলো
গোয়াল কাড়িবার নাম শুনিলে বৌ গায়ে মাখে ধূলো।
নবউটী ছিল মা তাহার নাম নিত্য
গোয়াল কাড়িবার নাম শুনিলে তাহার নিত্য মাথা ধরত।
আর একটি বউ ছিল নামে চন্দ্রকলা
গোয়াল কাড়িতে যায় বৌ ঠিক দুপুরবেলা।
মধ্যম বউ বলে দিদি জ্বালার উপর জ্বালা
ভেবে গুণে দেখ গা ফুলবউটীর পালা।
ফুলবউটী বলে দিবি গায়ে এল জ্বর
গোয়াল কাড়িতে পারব না বোন নিকিয়ে দিব ঘর।
পঞ্চবউএর পালি গেল বড় বউটী এল।
এস এস বড় বৌ কুলের নন্দন
তোমা হতে হবে বউ গরুরি পালন।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়ে দিল নানা অলঙ্কার
হাঁসুলী দিল বউকে গলাতে মাদুলী
ওগো উমুরি ঝুমুরি সোনার সীতেপাটি।

৩০ গোয়ালকাড়া—গোয়ালের আবর্জ্জনা মুক্ত করা।
৩৬ আলার ঘরের দুলো—আলালের ঘরের দুলাল।

পরিধান করিতে দিল দিব্য পাটের সাড়ি
গোয়াল কাড়িতে দিল নবউকে সুবর্ণের ঝুড়ি।
রম-ঝম করে বউ গোয়ালে দিছে পা
খিঁচ গোবর দেখে বউ কপালে মারে ঘা।
মর মর মুনিশ খাটার ঘরে বিয়ে হত
আত্র দিন খাটিতাম তারা গরু কোথা পেত।
সাধের শঙ্খতে যদি গোবর লাগাব
ঘরে যেয়ে বাড়া ভাত কেমনে খাইব।
সুবুদ্ধির বিটী তাকে কুবুদ্ধি ধরিল
তুলিয়া ঝাঁটার বাড়ি গরুকে মারিল।
মর মর বলে গাভীকে গাল দিল
অঝরণে গাভী গরু কাঁদিতে লাগিল।
কাঁদিতে কাঁদিতে গাভী ঘরের বাহির হইল।
ছোট বউটী বলে দিদি, মজা হয়ে গেল
ছোঁচ মারুলী সাঁজসলতে জঞ্জাল ঘুচিল।
ভাল হইল শ্বশুড়বাড়ীর পাট ঘুচে গেল
শন্যো গোয়ালে বউ নাচিতে লাগিল।
দধি-দুগ্ধ বেচি আসেন নীলবতী
তাহার কাছে বিদায় মাগে লক্ষ্মী ভগবতী।
এস ভগবতী ছেড়ে যাবে কতি
কোথায় রে কপিলার পাল, কোথা রে গমন
আজ কেন দেখি মা তোমার বিরস বদন।
অঝরণে গাভী কাঁদিতে লাগিল।
তোমাদের বউগুলি অনবরণা গো

---

৫৫ খিঁচ গোবর— গোমূত্র ও গোমর।
৫৭ আত্র দিন—রাত্রিদিন।
৬৩ অঝরণে—অঝোর নয়নে।
৬৬ ছোঁচ মারুলী—ছুড় মাতুলী।
৬৭ পাট—শ্বশুড়বাটী বা শ্বশুরের স্থান।
৭১ কতি— কোথায়।
৭৫ অনবরণা—অদ্ভুত প্রকৃতি।

মেরেছে ঝাঁটার বাড়ি মা ভেঙ্গেছে পাঁজর
গলায় বস্ত্র দিয়ে কপিলের পায়েতে পড়িল।
একলক্ষ গাভী গরু ঘুরে নাহি এল
বউ বউ বলে তখন বাড়ীতে ডাকিতে লাগিল।
ঘরের ছিল বউগুলি ঘরের বাহির হল
নাপিত ডাকিয়ে বউদের কেশ মুড়াইল।
পেটের ভুঁটী কেটে সার কুঁড়ে পুতিল।
গায়ের রক্ত কেটে আলিপনি দিল।
ব্যতের জিহ্ব লয়ে কলার পাতে থুল
হেঁটোর চাকি কেটে গো পিদীম গড়াইল।
হাতের আঙ্গুল কেটে সলতে বানাইল।
মাথার ঘৃত লয়ে গোয়ালে বাতি জ্বেলে দিল।
মাথার খুলি নিয়ে ধুপসী বানাইল
হাড়চূর গুঁড়া নিয়ে ধুপসীতে দিল।
ধূপ-ধুনা সাঁজ-সলতে গোয়ালেতে দিল
এক লক্ষ গাভী গরু ঘুরে আসিল
এক লক্ষ ছিল গাভী ছয় লক্ষ ছিল
বছ্ব বছ্র পাল বাড়িতে লাগিল।
সংসারের মধ্যে মা গরু বড় ধন
তার সেবা করেছেন প্রভু নারায়ণ।
আদ্যাশক্তি ভগবতী আছে যার ঘরে
পরম সুন্দর গোয়াল যম কাঁপে ডরে।

(দাদপুর-নিবাসী ভূপতি চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

৮৪ ব্যাতের—মুখের।

(২৬)

ভগবতী মঙ্গল

গরু নাড় গরু চাড় গরু বড় ধন
যার ঘরে গরু নাই তার বৃথাই জীবন।
গরুর সেবা করেছিলেন প্রভু নারায়ণ।
ইন্দ্ররাজা দেবগণ বসিয়া আকনে
কপিলার পৃষ্ঠে কথা কহেন সেখানে।
কপিলা ডাকিয়া তবে বলিছে বচন
তোমায় যেতে হবে মা রবণী মণ্ডল।
আমি তো যাব না মা রবণী মণ্ডলে
আমার মহিমা নরলোকে কিবা জানে।
গোদানড়ী দেবে মা নারিব বাহিতে
দুচক্ষে ঠুলি দিয়ে ঘুরাবে বক্র
বিনা অপরাধে বিধি লাগাবেন চক্র।
মনে মনে জনে জনে বোঝা চাপাইবেন পৃষ্ঠে
চলিতে না পারিলে পাঁচুনি মারয়ে পিঠে।
দুটি পা ছন্দন করে দুগ্ধ নেবে ছেঁকে
আমার দুধের বালকরা বেড়াব সব কেঁদে।
আমি তো যাব না মা রবণী মণ্ডলে
তুমি যদি না যাও মা রবনী মণ্ডলে
নরলোকে পবিত্র হইবে গো কেমনে।
তোমার দুগ্ধ ছেঁকে নয়ে দেবগণের সেবা হবে।
এই কথা কপিলা কর্ণেতে শুনিল।
নির্ম্মল ব্রাহ্মণের ঘরে অধিষ্ঠান হইল
কপিলাকে দেখে ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিল।
মুরারি ঘোষ বলে সেদিন মনে পড়ে গেল।

---

৭ রবণী মণ্ডল—অবনী মণ্ডল।

বাবা মুরারি ঘোষ আজ থেকে গরুর সেবা কর বাপু তুমি
গরুর সেবা করলে পরে ভাগ্য হবে ম'রে
গঙ্গাস্নানের ফল কিছু দুয়ারে বসে পাবে।
সাত দিন সাত বৌ-এর পালিত করে দিল
প্রথম পালিতে মাতার বড় বৌএর হল।
পরিধান করিতে দিল বউকে দিব্য পাটের সাড়ি
গোহাল কাড়িতে দিল সুবর্ণার ঝুড়ি।
রনুঝুনু শব্দে গোয়ালে দিলেন পা
খিঁচ-গোবর দেখে বউ কপালে মারে ঘা।
বউ বলে নিগরুর ঘরে যদি মোর বিবাহ হইত
তবে কেন সোনার শঙ্খায় গোবর লাগিত।
সুবুদ্ধি বউ ছিল কুবুদ্ধি ধরিল
উলটা ঝাঁটার বাড়ি গরুকে মারিল।
ঝাঁটার বাড়িতে গরুর পাঁজর ভেঙ্গে গেল
পঞ্চ মাসের গর্ভ সেদিন খসিয়া পড়িল।
কাঁদিতে কাঁদিতে গরু অন্য পালে গেল
অন্য পালে গেল গরু ঘুরে নাইক এল।
চালের বাতা ধরে বউ নাচিতে লাগিল
ভাল হল শ্বশুর-বাড়ির পাল ঘুচে গেল।
আজ থেকে গোয়াল কাড়া জঞ্জাল ঘুচিল।
দই-দুগ্ধ বিচিয়া আসিছেন নীলবতী
তার কাছে বিদায় মাগিছেন ভগবতী।
বলে তোমার বড়বৌ আনবরনা বড়
মেরেছে ঝাঁটার বাড়ি ভেঙ্গেছে পাঁজর।
পান খায় পিকি ফেলে গোহালের ভিতর।
রাত্রে প্রভাত হলে পরে দেয় না ছড় ঝাঁটি
সন্ধ্যে লাগিলে পরে দেখায় না বাতি।

---

৩১ সুবর্ণার—সুবর্ণের বা সোনার। ৩৩ খিঁচ—গোমূত্র।

বাড়া ভাত মৎস্য রাঁধা গোহালে বসে খায়
রক্ত পিনাসি মাতার গরুর নাকে হয়।
ভাদ্র মাসের দিনে যে জন গোয়ালে মাটি দেয়
ডাংরা পিলুই হয়ে তাহার গরু মরে যায়।
রবিবারের দিনে যে জন মৎস্য ভেজে খায়
উকুন এঁটুলি মাতার গরুর গায়ে হয়।
শনি-মঙ্গল বারের দিন গোবর বিলায়
দিনে দিনে গেরস্থালী মেটিয়ে যায়।
এই সকল পালন যদি পালিতে মা পায়
ওবে গিয়ে নবলক্ষ্মীর পাল ঘুরে যায়।
তোমার সাক্ষাতে বউকে নর-বলি দেব।
নাপিত ডাকিয়ে বৌএর মস্তক মুড়াইল
জিহ্বা কাটিয়া বউএর কলার পাতে থুইল।
হাতের দশটি আঙ্গুল লয়ে পলিতা পাকাইল
হেঁটোর মালুই চাকি লয়ে প্রদীপ গড়িল।
মস্তকের খাপুরি লয়ে ধুপসী করিল
ধুপ-ধুনা দিয়ে কপিলা ঘরে নিল।
এক লক্ষ ছিল গাভী সওয়া লক্ষ হইল
বছর বছর পাল বাড়িতে লাগিল।
আদ্যাশক্তি ভগবতী আছেন যার ঘরে
গোহালে পরমসুখে তার যম কাঁপে ডরে।
শিবনিন্দা করো না শিবের করো সেবা
শিব দিতে পারে ইন্দ্রপদ ধনে করে রাজা।

(দ্বারকা-নিবাসী গুণমণি পটুয়ার গান হইতে লিপিবদ্ধ)

(২৭)

পাঁচ কল্যাণী

অযুগ্রব রাতি মা বসে আছেন বিষহরি
পদ্মপুষ্পে জন্ম মায়ের নামটী কমলা।
সকল দেবতা থাকতে মা মনসার সঙ্গে বাদ।
ছয় পুত্র ডংশিল ছয় বধূ করলে আড়ি
তবু না বাদ ছাড়ে দেখ চন্দ্র অধিকারী।
কওহে কালী কাত্যায়নী অম্বিকা ভবানী
চণ্ডমুণ্ড বধ করো মা অসুরনাশিনী।
পাতালেতে মহীরাবণ কালীপূজা করে
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি মায়ের খণ্ড-খড়গ হাতে।
বামহাতে খড়গ মায়ের গলে মুণ্ডমালা
হের নয়নে চেয়ে দেখ মা পদতলে ভোলা।
এ ভোলা নয় পতি মা আর এক ভোলা আছে
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে চরণ পাবার আশে।
মারাখাকী গঙ্গা লো তোর বুকে জেবরহনী
শৃগালে কুকুরে মায়ের যেন করে আনাগোনা।
শিব শিব বলে ইন্দ্র পাটে হল রাজা
চতুরমুখী ব্রহ্মাগুণ করিবে শিবের সেবা।
দয়াল শিব বিশ্বনাথ দেবী ত্রিপুরারি
সকল ধন দিয়ে প্রভু আপনি ভিখারী।
ঘোষণ ঘোষা হাড়ের মালা সব মেখেছেন গায়
জটের ভিতর যুবতী গঙ্গা তরঙ্গ বয়ে যায়।
ভাঙ্গ খায় ধুতরা খায় ভাঙ্গের খায় গুঁড়ি।
কেউকে ধন দেন ঠাকুর আড়িতে গাপিয়ে
কেউর দিন যায় মা গো ভাবিতে গুণিতে।

১ অযুগ্রব—দীর্ঘ গ্রীব। ৪ ডংশিল—দংশন করিল ৪ আড়ি—ঝগড়া।
২৩ আড়িতে গাপিয়ে—আড়ি (ধান্যাদি মাপিবার ঝুড়ি-বিশেষ) দ্বারা মাপিয়া।

নির্দ্ধনাকে ধন দেন নিপুত্রিয়াকে পুত্র
অন্ধ লোকে চক্ষু দেন দেব ত্রিলোচন।
নমঃ নমঃ নমঃ দুর্গা নমঃ নারায়ণী
কৃপা কর দুঃখ হর বিপদ্‌তাড়িণী।
দুঃখে পড়ে মা গো করিবে স্মরণ
তুমি না তরাইলে সে তরায় কোন জন।
বামে লক্ষ্মী-সরস্বতী ডাইনে লক্ষ্মী-ভগবতী
সিংহপৃষ্ঠে ভগবতী অসুরনাশিনী।
নগরদীপ বন্দে মাতা শচী ঠাকুরাণী।
তার গর্ভে জন্মে নিলে গুণের গৌরাঙ্গ আপনি।
দিনে দিনে দোলে মাতা শচীমাতার কোলে
দিনখ্যান করিয়া দিলেন নিমাইকে পণ্ডিত পাঠশালে।
লিখিতে না পারে নিমাই পড়িতে যে নারে
ক্রোধিত হয়ে পণ্ডিত ঠাকুর মেলে ছড়ির বাড়ি
কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাই চন্দন-তলায় গেল
সুরভূজ মূর্ত্তি ধারণ করে পণ্ডিতকে দেখাল।
জোড়হস্ত করে পণ্ডিত ভাবেন বিশ্বাস।
না বুঝে মেরেছি প্রভু ক্ষম অপরাধ
ডোর নিলে কপনি নিলে করঙ্গ নিলে হাতে
চলিল শচীর দুলাল কলির জীব তরাইতে।
সভা করে বসল দেখ ভাই চারিজন
বামদিকে রাখিল সীতা ডাইনে লক্ষ্মণ।
আটদিন নেব হনু রামেরি চরণ।
রামনাম লেবে পাপী এড়াবে এবার
মরিলে মনুষ্য-জন্ম না হইবে আর।
হরি হরি বলে ভাই ঠাকুর জগন্নাথ
যার নাম লিলে পরে খণ্ডন হবে পাপ।

৩৩ নগরদীপ—নবদ্বীপ।
৩৬ দিনখ্যান—দিনক্ষণ (শুভক্ষণ নির্ণয় করিয়া)।
৪০ সুরভূজ—ষড়্‌ভূজ।
৪৩ কপনি—কৌপীন।

জগন্নাথ যে মহাপ্রভু শুনিবার কাহিনী
ডানদিকে বলরাম মধ্যে সুভদ্রা ভগিনী।
জগন্নাথের পথ যাত্রী বড় লাগে দুখ
জনম সফল হবে দেখলে চাঁদমুখ।

(কলিথা-নিবাসী ত্রিলোকতারিণী চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

(২৮)

চাষপালা

দেহতে সুখ নাই গৌরী ভিক্ষাতে না যাব
তোমা হতে অন্ন আজ আর ঘরে বসে খাব।
ভাল বুদ্ধি বলেছ হে দেব ত্রিপুরারি
আজ পাইলা পাতে যা দেব তাই নাইকো ঘরে দেখি।
কাল ভিক্ষা করিলাম দুর্গা কুচনি নগরে
কি বুঝে বল গৌরী অন্ন নাইকো ঘরে।
হাতেখড়ি নাওনা ঠাকুর নাওনা কেন লেখা
উচিত কথা বলতে গেলে মুখ করো না বেঁকা।
কাল ভিক্ষা করিলেন ঠাকুর ছ পুরুষা চাল
কোন কালকার ধারতে ঠাকুর ধন কুবিরের ধার।
পাঁচপুরুষা দিয়ে তার লেঠা চুকাইলাম
পুরুষা খানেক চাল থাকে অন্ধন করিলাম।
অন্ধন করিয়া তোমাদের তিন বাপবেটাকে দিলাম
তোমাদিগে বেবসিয়ে অন্ন আমি উপবাসী।

---

৫৫ চাঁদমুখ—জগন্নাথদেবের চন্দ্রবদন।

৪ পাইলা পাত ইত্যাদি—খাইবার সময় প্রথম যাহা দেওয়া হয় (অর্থাৎ ঘরে অন্ন বা চাউলের সংস্থান নাই)। ৭ লেখা—হিসাব। ৮ বেঁকা—বাঁকা।

৯ পুরুষা—পশুরী—পাঁচসের পরিমাণ মাপ-বিশেষ। ১১ লেঠা—ঝঞ্ঝাট, গোলযোগ।

১২ অন্ধন—রন্ধন। ১৪ বেবসিয়ে—পরিবেষন করিয়া।

চালের লেখা পেলাম দুর্গা কালকের ধন্য কোথায় যায়।
তিনটি পো ধানের লেখা শুনহে গোঁসাই।
পো খানেকের চিঁড়ে-সন্দেশ খেয়েছে তোমার ছেলে
পো খানেকের ধানের তোমার সিদ্ধির নকুল ভাজা গেল।
পো খানেক ধন্য থাকে মেজেতে পড়িয়া
কার্ত্তিক গণেশের বাহন জলপান করেছে।
ধানের লেখা পেলাম দুর্গা কালকের কড়ি কোথাই যায়।
তিনটি পণ কড়ির লেখা শুনহে গোঁসাই
দেড় বুড়ি আর ভাঙ্গা ফুটো দেড় বুড়ি তার ভাল।
কড়া দশেকের চিঁড়ে-সন্দেশ মেরেছে তোমার ছেলে
কড়া দশেক কড়ির তোমার সিদ্ধি কেনা গেল।
কড়া দশেক ক্রোধ করে দিয়িছি টেনে ফেলে।
কড়ার লেখা পেলাম দুর্গা কালকের বড়ি কোথা যায়?
হেই গো মাতা হেই গো পিতা এই কি নাজের কথা
ইন্দুরে খেয়েছে বড়ি কতই দেবো লেখা।
তোমার কালে তোমার মাথায় নাই কেন মাথা।
ওই কথা শুনে মহাদেব ইন্দুর মারিতে যায়
লুটিয়ে লুটিয়ে ইন্দুর শিবের সদাই ধরে পায়।
বলে মেরো না মেরো না ইন্দুর গণেশেরি ঘোড়া
যার ঘরে ইন্দুর নাই সেই যে লক্ষ্মীছাড়া।
কোলে নিল কার্ত্তিক হাঁটায়ে লম্বোদর
ক্রোধ করে যাত্রা করে ধন-কুবিরের ঘর।
কুবিরা দেখিয়ে সেদিন বুদ্ধি করিল
মুটো খানেক ধন্য নিয়ে উঠানে ছড়াইল।

১৬ পো—পোয়া।

১৮ নকুল—চাট (মাদক দ্রব্য সেবনের পর যে মুখরোচক খাদ্য ব্যবহৃত হয়)।

১৯ কার্ত্তিক গণেশের বাহন—ময়ূর ও মুষিক।

২৪ মেরেছে—খেয়েছে।

আটাকাটি দিয়ে ধন্য কুড়াইতে লাগিল
বলে কোথাকার যাও দুর্গা কও দেখি বচন।
বলে ভিক্ষাতে যায় নাই হে আজ দেব ত্রিপুরারি
পরশু খানেক চাল দাও যে উপস রক্ষা করি।
লেবার সময় লাও দুর্গা খাবার সময় খাও
শুধবার বেলা হলে কুন্দলী পাকাও।
ওই কথা শুনে দুর্গা কৈলাসকে গেল।
ধ্যান-যজ্ঞে বসে আছেন ভোলা মহেশ্বর।
নির্ব্বোধ বলি তোরে দুর্গা নির্ব্বোধ বলি মোরে
বাড়ীতে আছে সিদ্ধির ঝোলা আন বাহির করে।
তিন কোণ ধরিয়ে মহাদেব এক কোণ ঝাড়িল
মাণিক-মুক্তাতে কত বাখার বেধে দিল।
দুর্গা বলে ভিক্ষার মায়া ছাড় ঠাকুর চাষে দাও গো মন
চাষ যে দুর্ল্লভ জিনিস এ তিন ভুবন।
ভুঁইএ লাগাও মুগ-মুশুরী পগারে লাগাও কলা
নৈবেদ্য বাড়াবে ঠাকুর ধর্ম্ম-সেবার বেলা।
বয়স হলো বৃদ্ধ আমি গণেশের মা খাটিতে নারি চাষে।
কার্ত্তিক-গণেশকে চেয়ে বয়েস তোমার বুড়ো
কার্ত্তিক গণেশ সঙ্গে দেব ঝাড়বে ক্ষেতের হুরো।
চাষ কৃষাণ কর মহাদেব সুখে অন্ন খাবে
বড় বড় মণিলাগ দুয়ারে বসে পাবে।
কোথা পাব হাল জোয়ান লাঙ্গলের ইসে
চাষের সামগ্রী লইলে চাষ করিব কিসে।
চাষ চাষ ক'য়ে দুর্গা না কর জঞ্জাল
কোথায় পাব হাল বলদ কোথায় পাব ফাল।
হাতের ত্রিশূল ভাঙ্গ ঠাকুর গড়াও কোদাল-ফাল
আমার বাঘ তোমার বসোয়া মর্ত্ত্যে জোড় হাল।

৩৯ আটাকাটি—আঠাযুক্ত কাঠি (পাখী ধরিবার জন্য আঠালিপ্ত কাঠি বা শিক)।
৫০ বাখার—ধান্যের মরাই বা গোলা। ৫০ পগার—বৃহৎ উঁচু আইল।
৫৯ মণিলাগ—মুনির নাগাল অর্থাৎ বড় বড় মুনি তোমার অয়ত্তের মধ্যে আসিবে।

শিব বলে বাঘে বসোয়াতে হাল দুর্গা কভু নাইকো শুনি।
ক্ষুধা-তৃষ্ণাতে বাঘ সেদিন করবে টানাটানি।
বলে হাল যদি জুড়বো দুর্গা বীচন পাব কতি।
বীচনের কারণে তবে ভীম পাঠিয়ে দিছি।
হেদে বলে ভীমরে বাটার তাম্বুল খাবি
শীঘ্র করে লক্ষ্মীর ঘরে বীচন আনিবি।
একা ছিলেন ভীম সেদিন দ্বিজ আজ্ঞা পেল
লক্ষ্মীর ঘরে যেয়ে ভীম দরশন দিল।
লক্ষ্মী দেখে ভীমকে শুধাইতে লাগিল।
বলে কৈলাস থেকে এলে বাপ ভীম গদাধর
কও দেখিনি কেমন আছেন ভোলা মহেশ্বর।
চাষ-কর্ষণ করবে তোমার ভোলা মহেশ্বর
বীচনের কারণে পাঠাইলে তোমারি নগর।
অন্য লোককে ধন্য দিলে ধন্যর বারি পায়
মহেশ্বরকে ধন্য দিলে মূলে চুলে যায়।
বীচন যদি লিবি ভীম জামিন ঠাওর কর।
পৃথিবী খুঁজে ভীম জামিন নাইকো পেল
চাঁদ-সূরয দুইটী ভাইকে ডাকিয়া আনিল।
চাঁদ-সূরয দুইটী ভেয়ে তোমরা থেক সাক্ষী।
শামুক খানেক বীচন ভীমকে দিলাম নাপন করে দিচি।
ক্ষেতে হলে দু'শামুক ভীম দিয়ে যাবেন আমারে।

৬৬ 'বসোয়া'—শিবের বাহন ষণ্ড। ৬৮ কতি— কোথায়।

৭৯ বারি—বাড়ি বা বৃদ্ধি; ঋণ-স্বরূপ ধান্য দিলে, পরিশোধের সময়, তাহার সুদ-স্বরূপ চতুর্থাংশ বা তদ্রূপ কিছু অতিরিক্ত ধান্য দিবার রীতি প্রচলিত আছে। অনুরূপ উক্তি—

দশতঙ্কার বাড়ি খাইত দেড়বুড়ি জিত।
বারমাস ভরিয়া বছরের খাজনা নিত।। —মাণিকচন্দ্রের গান।

৮০ মূলে চুলে—মূল ধান্যই পরিশোধ হয় না বাড়ি পাওয়া ত দূরের কথা।

৮১ ঠাওর—ঠাহর বা ঠিক কর, স্থির কর

৮৫ শামুক খানেক—একটি শামুখের খোলায় যে পরিমাণ ধান্য ধরিতে পারে।
নাপন করে—পরিমাপ করিয়া। দিচি—দিতেছি।

বীচন যদি লিবি ভীম ভোজন করে যাবি
এই দুটো ধানের লেগে দুজন জামিন লিলি।
পেটে খেতে মাগো আমি জামিন কোথা পাব।
বলে যত খাও তত ভীম পেটে খেতে দিব
পেটে খাবার দিতে জামিন নাইক নোব।
ওই কথা শুনে ভীম কুদিয়ে বসিল।
নখের টঙ্কারে ভাঙ্গে লোহার পঞ্চ বেল
সইসে নিচুড়ে সেদিন গায়ে মাখে তেল।
বাহান্ন পৌটী চাল খেতে বাহান্ন পৌটী ডাল
শত হাঁড়া ঘৃত দিলে নব মণ চাল।
সেই সকল সমান ভীমকে নাপন করে দিল
হাঁড়ার কানা ধরে ভীম যমুনাকে গেল।
ভীমকে দেখে যমুনা পলাইতে লাগিল।
পালাইওনা যমুনা হে তুমি আমার দাদা
কিম্বা তোমার আমি ভাই।
একটু জায়গা দাও যে রসুই করে খাই।
ভীমের গদাতে সেদিন তিউড়ী খেঁচিল
আড়াই নুড়োতে সেদিন পাক নির্ম্মাণ হইল।
হাঁড়ার কানা ধরে সেদিন মাড় গড়াইল
ঘাড় জোলা বলে একটা নদী নির্ম্মাণ হল।
ষোল ক্রোশ জুড়ে কলার আঙ্গোট ফেলিল
পর্ব্বত সমান অন্ন সাজাইতে লাগাইল।
গরম অন্নতে ভীম ঘৃত ছিটাইয়া দিল
নুণের ছড়া দিয়ে সেদিন ভোজনে বসিল।
সেই সকল সামনে ভীমের আড়াই গেরস হল
চৌষট্টী পণ আমের আঁটী চুষে চুষে খেল।

৯২ কুদিয়ে—কুদিয়া, কুর্দ্দন করিয়া বা লম্ফ দিয়া, স্ফূর্ত্তি করিয়া।
৯৪ নিচুড়ে—ছিঁড়িয়া ও মর্দ্দিত করিয়া।
৯৫ পৌটী —১৬ বিশ পরিমাণ।
১০৩ তিউড়ী খেঁচিল—আখা প্রস্তুত করিল।
১০৪ নুড়ো—উলু-খড়ের নুড়ো।
১০৭ আঙ্গোট — অখণ্ড কদলিপত্র।
১১১ গেরস—গ্রাস।

নোট ধরে জল খেতে যমুনা শুকাইল
মা দুর্গার বর ছিল যমুনা উথলে উঠিল।
লক্ষ্মী এসে শুধায় বাবার অন্নেতে কুলাইল
বলে জলে থলে মাগো আমার পণ পেটী হল।
বলে বীচন বাঁধিয়ে তবে কৈলাসকে গেল
বাঘ-বসোয়াতে হাল মর্ত্তে জুড়ে দিল।
এক চাষ দু'চাষ ভীম তিন চাষ করিল
তিন চাষ করে সেদিন বীচন ছড়াইল।
জয় হরি শ্রীহরি বলে মই জুড়ে দিল
পূর্ব্বেতে জুড়িয়া মই পশ্চিতে তুলিল।
মই ঝাড়া বলে একটা পবর্বত নির্ম্মাণ হল
আদ্যাশক্তি ভগবতী কোন বুদ্ধি করিল।

(দ্বারকা-নিবাসী গুণমণি পটুয়ার গান হইতে লিপিবদ্ধ)

(২৯)

শিবের মাছ-ধরা

ব্যাঘ্রছাল আসনে বসিলেন যুগপতি
নারদে ডাকিয়া দুর্গা বলিছে বচন।
অন্য লোকে চাষ ক'রে ঘুরে আসে ঘর
চাষ করতে গেছে আমার ভোলা মহেশ্বর।
উপায় বল নারদ বাছা বুদ্ধি বল মোরে
তোমার মামা ঘরকে আসে কেমন প্রকারে।
নারদ বলে যদি মামী ধরতে পার বাগ্দিণী বরণ
রূপেগুণে মামার সঙ্গে হবে দরশন।

---

১১৩ নোট—অঞ্জলি।
১১৬ পণ পেটী—পৌণে পেট—পেট চতুর্থাংশ অপূর্ণ রহিয়া গেল।
১২২ পশ্চিতে—পশ্চিমে।

নারদের কথাটি দুর্গার মনেতে লাগিল
স্বর্গের কামিলা বলে ডাকিতে লাগিল।
স্বর্গে ছিলেন কামিলা সেদিন মর্ত্ত্যে আসিল।
হেদে বলি কামিলা বাটার তাম্বুল খাবি
শীঘ্র করে জাল দড়ি নির্ম্মাণ করিবি।
একা ছিলেন কামিলা ঠাকুর দ্বিজ আজ্ঞা পেল
আড়াই দিবসের মধ্যে জাল নির্ম্মাণ হইল।
ঘন ঘন পাশ ফেলাই গিয়ে লেখা নাই
জালিখানটি নির্ম্মাণ করিলেন কামিলা গোঁসাই।
জাল-দড়ি নির্ম্মাণ করে দুর্গার আগে দিল
জাল-দড়ি দেখে দুর্গা হাস্য-বদন হল।
যাও বাছা কামিলা তোমারে দিলাম বর
মৃত্তিকাতে দেউল দালান দেবতা লোকের ঘর।
দন্ত করে পাড়িলেন দুর্গা নাশের পেটারী
হস্তভরে বার করিলেন সুবর্ণার চিরুনী।
সুবর্ণার চিরুনীখানি নখে আঁজি দিল
ডালঙ্গে মাথার কেশ তেলেতে ভিজাইল।
কেশগুলি আচুড়ে দুর্গা করেন গোটা গোটা
তার মধ্যে তুলে নিলেন সিন্দূরিয়া ফোঁটা।
আগুরু চন্দন কত তিলক ধরিল
মাণিকমুক্তা সিঁথায় তুলে নিল।
কানে নিল কর্ণ-ভূষণ নিলেন কর্ণ-বালা
মুখখানিকে সাঁজালেন মা পূর্ণিমার আলা।
জাল নিলে দড়ি নিলে নিশে দিয়া নড়ি
বিলঙ্গে বাঁধিলেন খোঁপা কাঁকে মৎসর হাড়ি।
জয় জয় বলে দুর্গা গমন করিল
স্বরূপপুরের মাঠে গিয়ে দরশন দিল।

---

১০ কামিলা—কারিগর বা শিল্পী।
২২ নাশের পেটারী—বেশ-বিন্যাসোপযোগী দ্রব্যাদি রাখিবার পেটরা।
৩২ নড়ি—লাঠি। ৩৩ কাঁকে—কক্ষে।

স্বরূপপুরের মাঠে দুর্গা চতুর্পানে চায়
ধান বই ঘাস মাঠে দেখিতে না পায়।
ধন্য দেখে ধন্যবতী ধন্য ধন্য বলে
বাহবা শিবের চাষ হরের শঙ্করে।
ভাল কৃষক করেছিলেন ভোলা মহেশ্বর
এতদিন কার্ত্তিক গণেশ সুখে খাবেন ভাত।
কোন ধান ভাঙ্গিব শিবের কোন ধান রাখিব।
গঙ্গাজলি ধান লয়ে ধর্ম্মসেবা করে
এই ধান ভাঙ্গিলে তোর প্রতি কান্ত হবে।
গঙ্গাজলি ধান ভেঙ্গে পাতিলেন অবতার
চারিদিকে বাঁধ বেঁধে মধ্যে রাখেন বায়।
এলো জাল ফেললে ঠিকনে দিলেন খুটো
হস্তে টিপনে জলে ছেঁচেন মুঠো-মুঠো।
হস্তে জল ছেঁচেন দুর্গা মুখে গীত গায়
জলের ঝপঝপানিতে লক্ষ যোজন ধেয়।
যেখানে না পায় মৎস্য তুলে মারে বাড়ি
ভাঙ্গে না শিবের ধান ছিঁটে করেন গুঁড়ি।
কাদা পড়িয়া ধন্য ছাড়েন ভুরভুরি।
কাদা পড়িয়া ধন্য জপিয়া খেলেন জল
বসিবার আসন শিবের করে টলমল।
শিব বলে দেখরে নারদ মুখেরি বচন
কোন দেবতা ঠেলে দিলে বসিবার আসন।
নিত্যি বসে থাকি আমি রত্নসিংহাসনে
আজ কেন মোর প্রাণ ব্যাকুল করে।
খড়ি নাড়ে খড়ি চাড়ে খড়ি দিলে রেখে
বাগ্দীর কন্যা নামে খড়ি জল প্রহর ট্যাক।
আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে রোদে ঝলমল
না জানি কোন ধান ভুঁয়ের মরে গিয়েছে জল।

৫২ ছিঁটে—ছিঁড়িয়া।

৬০ খড়ি নাড়ে খড়ি চাড়ে—নাড়া-চাড়া করে।

হেদে বলি ভীম রে বাটারি তম্বুল খাবি
শীঘ্র করে ধান ভুঁইএর সংবাদ আনিবি।
একা ছিলেন ভীম ক্ষেত্রে সেদিন শিবের আজ্ঞা পেল
শ্বেত ক্ষেত নেতের ধরা বেড় দিয়ে পড়িল
চৌদ্দ মণ লোহার নেপুর পায়ে তুলে নিল।
আশি মণ লোহার গদা বাম কাঁধে চাপাল
সাজন-কোজন করে ভীম যান রোষে রোষে।
একে একে ছে ফেলেন ভীম বার বারকোশে।
স্বরূপপুরের মাঠে গিয়ে ব্রহ্মডাক ছাড়ে
ভীমের শব্দতে আকাশ পাতাল নড়ে।
তিন কোণ ভিঁড়িয়ে ভীম ঈশান কোণে চায়
দিব্যি বা বাগ্‌দীর কন্যা দেখিবারে পায়।
কোথায় গো রূপের বাগ্‌দিণী কোথায় তোমার ঘর
ধন্য ভেঙ্গে মৎস্য মার বুকে নাইকো ডর।
মর্ত্ত্যপুরে থাকি আমি স্বর্গপুরে ঘর
আজ মৎস্য ধরতে এলাম শিবের নগর।
পালাবি তো পালা গো রূপের বাগ্‌দিণী।
কেড়ে নিব জাল দড়ি নেথিয়ে ভাঙ্গব হাঁড়ি।
ধরে লয়ে যাব তোরে মামার বরাবরি
যতগুলি ধান ভেঙ্গেছে গুণে নিব কড়ি।
দুর্গা বলে জানিরে জানিরে ভীম তোর মামাকে জানি
ডেকে দেরে তোর মামাকে ছিচে দেকরে পানি।
শিবের হয়ে কোন্দল করিস আয় বেটা বসো
শিবের হয়ে কস কথা শিব হয় তোর মেসো।
ভীম বলে মেসো লয় ও বাগ্‌দিণী মামা বটে মোর
তার ভুঁয়ে ধন্য ভাঙ্গ স্বামী হয় কি তোর।
ওই কথা শুনে দুর্গার ব্রহ্ম জ্বলে গেল
মহা ক্রোধে করে বচন বলিতে লাগিল।

৬৭ নেতের ধরা—সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র; ধরা=ধড়া=ছোট বস্ত্র। ৬৮ নেপুর—নুপূর। ৭১ ছে—পদক্ষেপ। ৮১ নেথিয়ে—লাথি মারিয়া। ৮২ বরাবরি—নিকট।

কি বোল বলিলি ভীম আগিয়ে কহ কথা
খোলার চোটেতে তোর কেটে দেব মাথা।
ছোট জাতের মেয়ে পেয়ে গাল পাড়িছ মুখে
অমনি ঠেলে ফেলে দিয়ে দাঁড়াইব বুকে।
গর্দ্দানেতে ধরে তোমায় পুতে যাব পাঁকে।
ওই কথা শুনে ভীমের নাহি সরে রা
কলাগাছের মতন তরাসে হালে গা।
দম্ভ করে পড়ল ভীমের পাবর্বতীয়া চূড়ো
আর দিকে বার কোশ ধন করেছে গুঁড়ো।
দম্ভ করে পড়ে ভীম দন্তে নিচে কুটো
পরাণে না মার বাগ্দিণী লাথি মার দুটো।
যেই বা বাগ্দীর কন্যা আনমন হইল
হাতের গদা ভূমে ফেলে গুঁড়ি গুঁড়ি পলাইল।
গুঁড়ি গুঁড়ি পালাইতে ভীমের হেঁটোয় গেল ছড়
মায়া করে দুর্গা সেদিন বলে ধর ধর।
দড়ে যেয়ে খেলেন ভীম তিন সরোবর
ধ্যান যজ্ঞে বসেছিলেন ভোলা মহেশ্বরী।
চরণে ধরিয়ে ভীম কাঁদেন শ্রীমতী
উপারে ছিল ভীম মামা বুদ্ধি ছিল মোরে
ভাগ্যে পূর্ণে বেঁচে এলাম বাগ্দীর কন্যার হাতে।
শিব বলে কেমন রূপের বাগ্দিণী কেমন চরিত
মেয়ে হয়ে পুরুষ বধ শুনি বিপরীত।
ভীম বলে কাল নয় গোর নয় মামা মধুর বরণখানি
দূরে হতে দৃষ্টি করলাম ঘরে যেমন মামী।

৯৬ গর্দ্দানেতে—মস্তকে।
৯৭ নাহি সারে রা—কথা বাহির হয় না।
১০৩ আনমনস্ক—অন্যমন। ১০৫ হেঁটোর—হাঁটুতে।
১০৭—দড়ে—দৌড়িয়া।
খেলেন ভীম তিন সরোবর—পিপাসায় তিন সরোবর জল পান করিল।

রৌদ্রতে মিলায় বাগ্দিণী ছেঁয়াতে জুড়াই
মুঠে কাঁকাল পাওয়া যায় কোমরে ভাঙ্গের কেশ।
বাগ্দিণী বলে বাগ্দিণী নয় চৌদ্দ রাজার ঠাট
ধান বাড়িতে হতে বাগ্দিণী বলে কাট কাট।
বাগ্দিণীর গায়ে আছে অষ্ট আভরণ
বাগ্দিণীকে হরলে পাবে চৌদ্দ রাজার ধন।
হ্যাদে বলি ভীমরে বাটার তম্বুল খাবি
শীঘ্র কোরে মোর বসোয়া সাজোয়া করিবি।
একা ছিলেন ভীম সেদিন শিবের আজ্ঞা পেল
ডোরে ধরে শিবের বসোয়া বাহিরে আনিল।
যাবে গো শিবের বসোয়া যাবেন অনেক দূর
চার পায়ে তুলি দিলেন বাজন্ত নূপুর।
রঁয়ে রঁয়ে বেঁধে দিলে মাণিক মুক্তার ঝাড়া
বসোয়াটি দেখে হলো নয়নেরি তারা।
বসোয়া সাজন্য করি শিবের আগে দিল
বসোয়াটি দেখে ঠাকুর হাস্য-বদন হল।
আমার কিছু দে রে ভীম অষ্ট আভরণ
আর ধন দিলে শিবকে ধান ধরিবার নড়ি।
বসোয়ার পৃষ্ঠের উপর তুলে দিলেন গাঁজার ধুকরী
বসোয়ার পৃষ্ঠের উপর তুলে দিলে মাণিক-মুক্তার থলে
পরিধান করিলে শিব ব্যাঘ্র-ছাল।
ভাঙ্গ ধুতুরা খেয়ে ঠাকুর বসোয়ায় চাপিল
শিঙ্গে ডম্বুর নিয়ে তখন ঢুলিতে লাগিল।
জয় জয় বলে ঠাকুর গমন করিলেন
স্বরূপপুরের মাঠে গিয়ে দরশন দিল।

১১৬ ছেঁয়াতে— ছায়াতে। ১১৭ মুঠে—মুষ্টিতে।
১২০ অষ্ট আভরণ—অষ্ট ঐশ্বর্য্য (অনিমা লঘিমা ইত্যাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য) বা অলঙ্কার।
১২৩ সাজোয়া—সজ্জা।
১২৮ রঁয়ে রঁয়ে—প্রতি রোমে। ১৩০ সাজন্য—সজ্জা করিয়া।

স্বরূপপুরের মাঠে ঠাকুর চতুর্পানে চায়
দিব্যি বা বাগ্‌দীর কন্যা দেখিবারে পায়।
কোথায় গো রূপের বাগ্‌দিণী, কোথায় তোমার ঘর
ধন্য ভেঙ্গে মৎস্য মার বুকে নাইকো ডর।
দুর্গা বলে সরগপুরে থাকি আমি মত্তপুরে ঘর
আজ মৎস্য ধরতে এলাম তোমারি নগর।
জালমাছ্ খলিসা ধরি, গোদা যার ব্যাঙ
কাঁকুড়ি না এড়াই তার ভাঙ্গি দশটী ঠ্যাং।
পালাবি তো পালাগো রূপের বাগ্‌দিণী
আমার ঘরে ভীম আছে দুরন্তর তিনি।
দুর্গা বলে জানিহে জানিহে তোমার ভীম যত মরদ
আমার ভয়ে তোমার ভীম পালিয়ে গেল ঘর।
তোমার শিঙ্গা-ডম্বুর কেড়ে নিব তোমাকে কিবা ডর।
ওই কথা শুনে ঠাকুর লজ্জাতে পড়িল
এক পা দুই পা করে পেছুতে লাগিল।
বাবুই ঝাঁটিতে বসোয়া বন্ধন করিল
ত্রিশূল গাদিয়ে শিব শিঙ্গা ডম্বুর থুইল।
মাথার বাসুকী নাগ আদাড়ে ফেলাইল
হাসিয়ে হাসিয়ে বচন বলিতে লাগিল।
বাপ কুল মা কুল তোর শ্বশুর কুল শুনি।
দুর্গা বলে শ্বশুরের নামের আমি কি দিব তুলনা
পাঁচটী দেবতা আছেন তারাও একজনা।
বড় ভাসুরের নাম শোন ব্রহ্মা জল-মাঝি

১৪৫ সরগপুরে—স্বর্গপুরে।
১৪৭ জালমাছ—চিংড়িমাছ।
যার ব্যাং—জাড় (বড়) বেঙ।
১৪৮ কাঁকুড়ি না এড়াই—কাঁকড়াও বাদ দিই না।
১৫০ দুরন্তর—দুরন্ত। ১৫১ মরদ—সাহসী পুরুষ।
১৫৬ বাবুই ঝাঁটিতে—বাবুই নির্ম্মিত রজ্জুতে।
১৫৮ আদাড়ে—ক্ষুদ্রবন বা জঙ্গল, জঞ্জাল ফেলিবার স্থান।

ঘর স্বামীর নাম শোন মহেশ বাগ্দীয়া
ছেলে দুটীর নাম শোন কার্ত্তিক গণপতি।
শিব বলে ছেলে দুটীর সম্বন্ধে তুমি আমার সই বাগ্দিণী
তোমার আমি সয়া এলে গেলে বুড়োকে করিতে চেও দয়া।
সই হাতের খোলা পেলে আমি খানেক ছেঁচি।
দুর্গা বলে আমার সঙ্গে জল ছিঁচলে জাতি নাশ হবে।
শিব বলে যে না জাত হও বাগ্দিণী ওই জাতি হব
তোমার রূপে গুণে এ জাতি মজাব।
পৃথিবীর মধ্যে এত নব জাতি ছিল
সকলকে বঞ্চি ত করে কি তোমাকেই রূপ দিল।
এক দিককার পাটে তোকে রাজা করে থোব
মাণিক-মুক্তোতে গো বাকার বেঁধে দোব।
ঘরে আছে দুর্গা তোমার দাসী রেখে দিব।
দুর্গা বলেন মাণিক-মুক্তো যা দেবে সকলি পেটে খাব।
অঙ্গুরী দাওনা তোমার নিশানা রাখিব।
শিব বলে অঙ্গুরীটা চাওনা লো রূপের বাগ্দিণী
বলে বুঝিলাম বুঝিলাম তোমার আনুলো বড়াই।
লক্ষ টাকার জয়বণ্ট সঁপতে পারছি আমি
কড়া দশেকের অঙ্গুরী দিতে নারছ তুমি।
ওই কথা শুনে ঠাকুর লজ্জাতে পড়িল
আপনার হাতের অঙ্গুরীটী বাগ্দিণীকে দিল।
শিব যে জল ছেঁচিবি ওহ ডোবার নাই জল
সব নদীর নাম করে মেলেন স্মরণ।
উপায় নদী কোপায় নদী লল্ল দমোদর

১৬৮ খোলা—জল-সেচনের জন্য ভগ্নাংশ মৃন্ময়পাত্র।
১৭৫ বাকার—বাখার বা ধান্যের গোলা।
দোব—দিব।
১৭৮ নিশানা—চিহ্ন।
১৮০ আনুলো বড়াই—মিছামিছি বড়াই বা নিরর্থক বাহাদুরী।
১৮৭ উপায় নদী ইত্যাদি—এই সব নদীর মধ্যে কয়েকটি নদী বীরভূম জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

পশ্চিম হতে এলো নদী চিলে ঘাড়মোরা
আর নদী এলেন কত অমলা কমলা।
আর নদী এলেন কত তরঙ্গেরি মাতি
মাড়জোলা ভাসিয়ে এল এলেন পদ্মাবতী।
সব নদীর জল দুর্গা খামিক্ষে আনিল
বাঁ করের আঙ্গুল কোরে সুলঙ্গ কাটিল
সুলঙ্গে সুলঙ্গে কোরে জল উঠিতে লাগিল।
খোলা করে জল ছিঁচে কোমরে দিলেন হাত
বুঝিলাম বুঝিলাম ঠাকুর জল ছেঁচিবার সাধ
এই মুখে খাবে ঠাকুর তুমি বাগ্দিণীর ভাত।
পালাবে তো পালাও ঠাকুর শিঙ্গে ডম্বুর লয়ে
ওই আসছে মহেশ বাগ্দী ভাঙ্গ ধুতরো খেয়ে।
বার মণ সিদ্ধি খায় তের মণ ভাঙ্গ
জল ছেঁচিবার নাম করলে সমুদ্রে ধরে টান।
গোটা গোটা বাঁশ টানে তিনটী কাটি সার
আমার কাছে দেখিলে পাঠাবে যমের ঘর।
উঁচুপারা আইল দেখে দুর্গা লাফ দিয়ে চলিল
ধনাগোদার বাপ বলে মিথ্যা ডাক দিল।
হাতের খোলা ডোবায় ফেলে ঠাকুর ভুঁয়ে লুকাল।
একবার উঠে একবার বসে ভোলা মহেশ্বর
একলা বাগ্দিণী বই মনিষ্যি দেখিতে না পায়।
দুর্গা বলে এইখানে থাক ঠাকুর দণ্ডেক বসিয়ে
আমি আসি মা গঙ্গায় স্নান করিবারে।
স্নান করিতে গিয়ে দুর্গা কুশ পড়ে গেল
আহুবাণ মেরে তারে জীবন দান দিল।
কুশমিটে বাগ্দী বলে তাই সৃজন হল
জালদড়ি দুর্গা সে দিন তারে সঁপে দিল।

১৯৩ সুলঙ্গ—সুড়ঙ্গ, ছিদ্র।
২০৬ ভুঁয়ে—ভূমিতে।
২০৮ বই—ভিন্ন।
২১২ আহুবাণ—আয়ুর্ব্বাণ।

জয় জয় বলে দুর্গা সে দিন কৈলাসেতে গেল
এই বেলাতে কই রে নারদ এই বেলাতে কই
তুলে থোরে হাল জোয়াজ তুলে থোরে মই।
তোর বাগ্দী মামা ঘর এল তোর বাগ্দী মামী কই
অঙ্গুরীটী দেখি না হে অঙ্গুলের উপর।
শিব বলে না দিও গাল দুর্গা না দিও গাল
ভাঙ্গ ধুতরো সিদ্ধি গুলো খেয়েছিলাম কাল।
ভুঁই নিড়াইতে বসেছিলাম বড় ধানের ভুঁয়ে
অঙ্গুরীটী গিয়েছে পড়ে তাও নাইকো মনে।
দুর্গা বলে ইন্দ্রপুরের বাগ্দিণী এসেছিল মৎস্য বেচিবারে
অঙ্গুরীটী বন্ধক দিবে ফিরচে ঘরে ঘরে।
পুরুষখানেক চাল দিলাম কাহন পাঁচ ছয় কড়ি
চিনে বান্দ রেখেছি হে মাণিক অঙ্গুরী।
অঙ্গুরীটী ফেললে যখন শিবের বরাবরে
অঙ্গুরীটী দেখে ঠাকুর পড়িলেন ফাঁপরে।
শিব বলে বাগ্দিণী নয় ওগো দুর্গা অভয়ামঙ্গল
ওই প্রকারে বোঝ তুমি পরপুরুষের মন।
জয় জয় দুর্গা তুমি দিও বর
ধনে পুতে সুখে রাখবেন ভোলা মহেশ্বর।

(দ্বারকা-নিবাসী যতীন চিত্রকরের গান হইতে লিপিবদ্ধ)

---

২২৭ পুরুষ—পসুরী (পাঁচ সের পরিমাণ)।

বাংলার লোকশিল্প

প্রবন্ধাবলি

পটুয়া কবিতা

পটুয়া

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

খ্যাত এরা পটুয়া নামে
পেশায় চিত্রকর;
শীর্ণ এদের শরীরগুলি
জীর্ণ এদের ঘর।
গ্রামের সকল দরিদ্রদের
চেয়েও এরা দীন;
এদের পাড়া গ্রামের ভিতর
সব চেয়ে মলিন।
হয় না এদের আহার যোগাড়
ভিক্ষা-বৃত্তি বিনা;
মুসলমান ও হিন্দু দুয়েই
এদের করে ঘৃণা।
মুসলমান কি হিন্দু এরা—
সেটাও বুঝা ভার;
এদের কাছে দুয়েই করে
চিত্র আঁকার কাজ;
করে পূজার মূর্ত্তি রচা
রুদ্ধ তাদের দ্বার;
শিল্প শাস্ত্রে সুদক্ষতায়
পণ্ডিতে দেয় লাজ।
নমাজ পড়ে মুসলমানের
নাম ধরে হিঁদুর;
পুরুষ গড়ে দেবদেবী, আর
স্ত্রী পরে সিঁদুর।
মুসলমান্ আর হিন্দু দুয়েই
খায় না এদের হাতে;
নেয় দুয়েরই প্রসাদ এরা—
এম্নি ছোট জাতে।

—২—

এরাই ছিল প্রাচীন যুগে
বিশ্বকর্ম্মার জাত;
রাজার চিত্রশালায় ছিল
এদের শুধু হাত।
ময় দানবের পুরীর ছবি
এরাই দিত এঁকে;

অজন্তাতে দেয়াল রঙ্গে
এরাই দিত মেখে'।
জ্ঞানীর গুণীর কীর্ত্তি এঁকে
রচ্‌ত এরা ছবি;
এরাই ছিল জ্ঞানের গুণের
কীর্ত্তি-গাথার কবি।
তত্ত্বকথা সরল ভাষায়
সহজ সুরে গে'য়ে;
জ্ঞানের আলোর ছটায় এরা
দেশটা দিত ছে'য়ে।
গানের সুরে পুরাণ শ্রুতি
ইতিহাসের বাণী;
দেশের নরনারীর ঘরে
এরাই দিত আনি'।

—৩—

এদের রচা দেবদেবীদের
হিন্দু করে পূজা;
তবুও এদের ছোঁয় না তারা—
যায় না সেটি বুঝা।
তবুও ঠেলে সরিয়ে রাখে
হিন্দুয়ানীর ছলে;
বিশ্বকর্ম্মা-সন্ততিদের
বিধর্ম্মীদের দলে।
এদের গাওয়া পুরাণ-গাথায়
পরাণ হিঁদুর কাঁদে;
এদের ছোঁয়া জল খেতে তার
তবুও জাতে বাধে।
নেয় প্রতিমা এদের গড়া,
দেয় না গুণের দাম;
হায়! ভারতের হিন্দুয়ানীর
এমনি পরিণাম।

—৪—

অনাদৃত হয়ে এরা
আজ এ বাংলা দেশে;
পেটের দায়ে বেড়ায় পথে
জন মজুরের বেশে।
হিন্দু এদের ছোঁয় না তবু
এরা দেখায় প্রীতি;
শাস্ত্র বিধান মেনে পালে
চিত্রকলার নীতি।
ভক্তি, সতীশ, গুণমণি,
যতীন, ঘন-শ্যাম—
যত্নে রাখে আজও এ সব
হিন্দুয়ানী নাম।
শুকুরুদ্দি নাম যদি বা
নিয়েই থাকে কেহ,
ছাড়তে পারে নি সে তবু
চিত্র-লেখার স্নেহ।
আজও এদের মা-বোনেরা
ষষ্ঠী-পূজা করে;
মন-মোহিনী যশোদা নাম
আজও তারা ধরে।
হিন্দুর অধিক হিন্দু আরো
আজও এদের প্রাণ;
এদের ছুঁতে হিন্দু তবু
করে হেয় জ্ঞান।

—৫—

আজও এদের তুলির টানে
ইন্দ্র-ধনু লাজে,
অদ্বিতীয় আজও এরা
চিত্রকরের কাজে।

আজব্ তাই এ দৃশ্য—এরা
বাংলাদেশের মাঝে;
অনশনে বেড়ায় পথে
অকিঞ্চনের সাঁঝে।
দেশ-বাসীরা বিদেশ-কলার
অনুকরণ-রত;
দেশের যারা কলা-রসিক
ভিক্ষা তাদের ব্রত।

—৬—

শীর্ণ এদের শরীরগুলি
জীর্ণ এদের ঘর;
মুসলমানে করে ঘৃণা
হিন্দু ভাবে পর;
ধিক্ সে দেশের এদের যেথায়
আদর নাহি আজ;
ধিক্ সে দেশের এমন গুণীর
নাইরে যেথায় কাজ!
ইচ্ছে করে আমার এদের
কোলে টেনে ল'য়ে।
ক্ষমা মাগি আমার মূঢ়
জাতির পক্ষ হ'য়ে।
আসবে কবে সেদিন যবে
খুলবে মোদের চোখ;
হে ভগবান, সেই প্রভাতের
অরুণোদয় হোক্!



গুরুসদয় দত্ত ও মাতারু চিত্রকর

বাংলার রসকলা-সম্পদ

"আত্মানং বিদ্ধি"—"আপনার আত্মাকে চিনিয়া লও"—এই সারগর্ভ অনুশাসনের অন্তর্নিহিত গভীর সত্যটি ব্যক্তি ও জাতি উভয়ের পক্ষেই সমান ভাবে প্রযোজ্য; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন এক একটি স্বতন্ত্র আত্মা আছে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরও আপনার একটি স্বতন্ত্র আত্মা আছে। যে-ব্যক্তি নিজের আত্মার প্রকৃতির সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় স্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে সমন্বয় রাখিয়া জীবন গঠন না করে, সে জীবনে কখনও চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। তেমনি আবার যে-জাতি আপনার নিজস্ব আত্মার সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় স্থাপন করিয়া ও তাহার সহিত অবিরত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বজায় রাখিয়া চলিতে না পারে, সেই জাতীয় জীবন যে কেবল ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় এবং বিশ্ব-মানবের সংকৃষ্টির ভাণ্ডারে সেই জাতি যে বিশেষ কোন মূল্যবান দান করিতে পারে না তাহা নহে, সেই দুর্ভাগ্য জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিসমূহের জীবনও মানুষের আত্মার চরম পরিণতির দিক দিয়া ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় এবং তাহারা শুধু অন্য কোন সুসংকৃষ্ট জাতির আধ্যাত্মিক দাস-মাত্র হইয়া কালাতিপাত করে।

ব্যক্তির এবং জাতির তাহাদের স্বকীয় আত্মার সঙ্গে এই যে পরিচয় ও সমন্বয়ের কথা বলা হইল, ইহা শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের মানসিক যুক্তির প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া সম্ভব হয় না। জাতীয় দর্শন-শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক গবেষণার ভিতর দিয়া ইহা কতকটা সম্ভবপর হয় বটে; কিন্তু ইহার প্রকৃষ্ট পথ জাতীয় রসকলার ভিতর দিয়া। ব্যক্তির ও জাতির আত্মা আত্মপ্রকাশ করে সব চেয়ে সহজ সরল ও স্পষ্টভাবে—তাহার রসকলা (Art) পদ্ধতির ভিতর দিয়া। প্রত্যেক জাতির রসকলা সেই জাতির আত্মার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের ভাষাস্বরূপ।

জাতীয় রসকলা একদিকে যেমন জাতির আত্মার অভিব্যক্তি-স্বরূপ, তেমনি আবার এই জাতির প্রতিভা এবং শক্তির প্রতিনিয়ত পুনরুজ্জীবন ও পূর্ণবিকাশের প্রেরণা জাগাইয়া

▶▶ *প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৯*

দেয়। নানা যুগে যে-সকল ব্যক্তি মহাপুরুষের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অমরতা লাভ করিয়া গিয়াছেন এবং বিশ্বমানবের প্রাণে নব-প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা তাহা করিতে পারিয়াছেন— তাঁহাদের আপন আপন জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ধারার সহায়তায় আত্মার বিকাশ ও শক্তি-বর্দ্ধন করিয়া। বিশ্বের নানা দেশ হইতে প্রেরণার আহরণ যে জীবনের পূর্ণবিকাশের বিশেষ সহায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাও নিঃসন্দেহ যে, বৃক্ষ যেমন আপন উৎপত্তি-ভূমির সুগভীর তলদেশে শিকড় প্রোথিত করিয়া তথা হইতে প্রতিনিয়ত জীবনী-রস আহরণ ব্যতীত স্বাস্থ্যবান, শক্তিমান ও ফুলে-ফলে সুশোভিত বিশাল মহীরূহে পরিণত হইতে পারে না, তেমনি যে-ব্যক্তির বা জাতির চরিত্র ও মনোবৃত্তি আপন দেশের ও জাতির আত্মার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, অথবা সেই বৈশিষ্ট্যধারা কর্তৃক অনুপ্রাণিত নয়, সেই ব্যক্তি ও জাতি কখনও জীবনে চরম উৎকর্ষ ও আনন্দ লাভ করিতে পারে না; পরন্তু তাহারা অন্যান্য জাতির আধাত্মিক দাস হইয়া আত্মনিকৃষ্টতা বিশ্বাসের গভীর লজ্জায় অবনত-মস্তক ও বিশ্বমানবের কৃপার পাত্র স্বরূপ হইয়া থাকে।

মানুষের পরিকল্পিত যাবতীয় রসকলায় প্রতিভাগৌরবে বাঙালী জাতির স্থান যে বিশ্বমানবের আসরে কত দূর উচ্চে তাহার উপলব্ধি বাংলার বাহিরের লোকের কথা দূরে থাকুক, আধুনিক শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত শহুরে বাঙালীরও নাই।

এই ত গেল আধুনিক শহুরে ও শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাব ও অবস্থা। অপরদিকে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, যাহারা প্রাচীন বাংলার সংকৃষ্টিপ্রসূত সমুজ্জ্বল রসকলা-প্রতিভার ধারা যুগের পর যুগ সন্তর্পণে চর্চ্চা করিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহারা আধুনিক শহুরে শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালীর কাছে অবজ্ঞাত, নির্য্যাতিত ও পদ-দলিত হইয়া এত কষ্টে অর্দ্ধাশনে জীবন যাপন করিতেছে, অথবা অনশনে প্রতি বৎসর এত দ্রুত গতিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে যে, বাংলার যে গৌরবময় অমূল্য জাতীয় সম্পদের তাহারা বাহক, তাহার সহিত যদি আধুনিক ভ্রান্তশিক্ষা-বিমূঢ় বাঙালী অবিলম্বে শ্রদ্ধানত মস্তকে পরিচয় স্থাপন না করিয়া ও এই সম্পদের বাহক অপূর্ব্ব প্রতিভাবান জাতীয় রসশিল্পীদের সামাজিক ও আর্থিক দুঃখদৈন্য দূর করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষকের আসনে বরণ করিয়া জাতির আত্মার সঙ্গে পুনরায় ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন না করে, তাহা হইলে বাঙালী জাতিকে তাহার আপন আত্মার সহিত চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবনযাপন করিতে হইবে।

কাব্যরসকলার ক্ষেত্রে চণ্ডীদাস ও বৈষ্ণবকবিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রতিভাশালী রসশিল্পীদের গৌরবের বলে বাঙালী আজ কতকটা মাথা তুলিয়া চলিতে আরাম্ভ করিয়াছে। কিন্তু কি স্থপতিকলায়, কি ভাস্কর্য্যে, কি চিত্রকলায়, কি

সঙ্গীতে, বাংলার নিজস্ব প্রতিভা-প্রসূত রসসম্পদ কিছু আছে বলিয়া শিক্ষিত বাঙালী আজকাল স্বপ্নেও ভাবে না।

অথচ ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই সকল ক্ষেত্রে, বাঙালী প্রাচীন যুগে যে কেবল উচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহা নহে, আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী যাহাদের নিকট হইতে 'ভারতীয় রসকলা' অথবা 'প্রাচ্য-রসকলা' শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত, তাহাদের অনেকেই প্রাচীন যুগে বাঙালীর কাছে এই সকল রসকলার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বহু শত বৎসরের উপেক্ষা ও অবজ্ঞাসত্ত্বেও আজ পর্য্যন্তও এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের দীনদরিদ্র পল্লীশিল্পিগণ সেই গৌরবময় জাতীয় প্রতিভার ধারা অল্পাধিকাভাবে বহন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু অবশেষে আজ বর্ত্তমান বাংলার শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালীর কাছে উপযুক্ত আদর ও উৎসাহের অভাবে অনেকস্থলেই নির্ম্মলপ্রায় হইয়া যাইতেছে।

আধুনিক শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালী যদি আপন জাতির আত্মার সহিত চিরদিনের জন্য বিযুক্ত হইয়া বেড়াইতে না চায়, তবে এখন এই জাতীয় প্রতিভাসম্পদকে ও তাহার দীনদরিদ্র বাহকদিগকে অবিলম্বে চিনিয়া লইয়া সামাজিক ও আর্থিক লাঞ্ছনা হইতে তাহাদিগকে মুক্তিদান করুক ও জাতির শিল্পশিক্ষকের পদে বরণ করুক। নতুবা চিরদিনের জন্য বাঙালীর আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা ও আত্মবৈশিষ্ট্য-হীনতা স্থিরনিশ্চয়।

বাঙালীকে ইহা বুঝিতে হইবে যে যদিও বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অন্যতম একটি অঙ্গ এবং যদিও বাংলার সংকৃষ্টি ও সভ্যতা ভারতের যুক্ত সংকৃষ্টি ও সভ্যতার একটি অংশ স্বরূপ এবং অন্যতম উপাদান ও শাখা স্বরূপ, তথাপি ইহা নিঃসন্দেহ যে, বাংলার একটি নিজস্ব সংকৃষ্টি আছে যাহা সে ভারতের যুক্ত সংকৃষ্টিতে দান করিয়াছে ও করিতেছে, যাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সংকৃষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অথচ তাহাদের থেকে পৃথক এবং যাহা বাংলার জাতীয় আত্মার প্রকৃতির বিশিষ্ট অভিব্যক্তি স্বরূপ ও পরিচায়ক; ইহাও নিঃসন্দেহ যে, বাংলার নিজের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের, চরিত্রের ও জীবনের বিকাশের দিক হইতে এবং ভারতের সংকৃষ্টির পূর্ণবিকাশের দিক হইতে বাংলাকে তাহায় স্বকীয় আত্মার এই নিজস্ব প্রতিভা-বৈশিষ্ট্যকে সযত্নে এবং সগর্ব্বে মানিয়া ও চিনিয়া লইতে হইবে এবং বাঙালীকে ইহা হইতে তাহার প্রাথমিক ও প্রধান অনুপ্রাণনা আহরণ করিতে হইবে। তবেই বাঙালীর আপন সৃজনী-শক্তির বিকাশ হইবে। তবেই বাঙালী আপন-জীবনের ও চরিত্রের পূর্ণবিকাশ সাধন করিতে পারিবে এবং ভারতের



বাংলার দারুশিল্প—মাহুত ও হাতী

উদার যুক্ত সংকৃষ্টিতে ও বিশ্বমানবের বিশাল সংকৃষ্টিতে আপনার বিশিষ্ট দান দিয়া সার্থক ও ধন্য হইতে পারিবে।

প্রথমে স্থপতিকলার কথা ধরা হউক।

অশোক-যুগের সাঁচি ও ভারহুতের, মুসলমান-যুগে দক্ষিণ-ভারতে বিজাপুরের ও উত্তর-ভারতে দিল্লী ও আগরার মোগল-প্রাসাদশ্রেণীর এবং বর্ত্তমান যুগে সুদূর রাজপুতানার বাস্তুগৃহের স্থপতিগণের যে সৌন্দর্য্যময় নির্ম্মাণ-কলা আজ আমাদের প্রশংসা অর্জ্জন করে, সেই স্থপতিগণ যে প্রাচীন-যুগে আমাদের বাংলারই কুটীর শিল্পের উদ্ভাবিত সুমধুর স্থপতিকলা হইতে প্রচুর অনুপ্রাণনা ও নির্ম্মাণক্ষেত্রে রূপকল্পনাব আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। *তথাপি আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ফলে আজ বাংলার বনিয়াদী কুটীর-নির্ম্মাণ-পদ্ধতিকুশল স্থপতিগণ ও তাহাদের অপূর্ব্ব শিল্প-নিপুণতা বাংলা দেশ হইতে দ্রুত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।


বাংলার দারুশিল্প- দোলনায় নারী

লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আমরা কি দেখিতে পাই? যে-রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের অনুপম প্রতিভাগৌরবে ও সৌন্দর্য্যে আজ জগৎবাসী ও বঙ্গবাসী মুগ্ধ, তাঁহার সেই গীতিকাব্যের অনুপ্রাণনার মূল উৎস যে আমাদের বাংলার শতসহস্র লোক-সঙ্গীত-বিশারদ পল্লীবাসিগণ, তাহাদিগের কাছে শিক্ষিত বাঙালী তাহার অনুপ্রাণনা গ্রহণ করিতে যাওয়া লজ্জাজনক ও হেয় জ্ঞান করে; তাহাদের অনুপম লোক-সঙ্গীত-কলা প্রতিভা রীতিমত ভাবে শিক্ষা করিবার ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কোন চেষ্টা অথবা তাহাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার দীনতা দূর করিবার জন্য কোন চেষ্টা শিক্ষিত বাঙালী করে না এবং ইহার ফলে এই অনুপম জাতীয় সম্পদও দেশ হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে।

বৎসরেক কাল পূর্ব্বে বাংলার প্রাচীন গৌরবময় রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বংশধরগণের উন্মাদনাময় রণতাণ্ডব রায়বেঁশে-নৃত্যের আবিষ্কার না-হওয়া পর্য্যন্ত শিক্ষিত বাঙালী বিশ্বাস করিত যে, নৃত্যকলার ক্ষেত্রে বাংলার নিজস্ব কোন পদ্ধতি বা দান নাই।

বিগত বৎসরেক কালমধ্যে আমাদের ইহা প্রমাণ করিবার সুযোগ হইয়াছে যে, বাংলার নিজস্ব রায়বেঁশে বীর-নৃত্য, কাঠি-নৃত্য, জারি-নৃত্য, বাউল-নৃত্য, কীর্ত্তন-নৃত্য ও ধূপ-নৃত্য ইত্যাদিতে তাণ্ডব ও মধুর উভয় প্রকার নৃত্যের আদর্শেরই এমন সুন্দর ভাণ্ডার

* *Indian Architecture* by E. B. Havell, pp. 92, 121; *Handbook of Indian Art*, by Havell 613.


বাংলার দারুশিল্প—পরী ও হাতী

রহিয়াছে যে, নৃত্যকলা-ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও প্রধান অনুপ্রাণনার জন্য বাঙালীর আর অন্যত্র যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। মেয়েলী ব্রত-নৃত্য ও লাস্য-নৃত্যেরও নানাবিধ সুন্দর এবং বিশুদ্ধ পদ্ধতি বাংলা দেশের পল্লীতে এখনও জীবন্ত রহিয়াছে। সুতরাং কি পুরুষদের কি মেয়েদের নৃত্য বিষয়ে প্রাথমিক ও প্রধান অনুপ্রাণনার জন্য বাঙালীর বাংলার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন ত নাই-ই; পরন্তু ইহাদিগের বিশুদ্ধ ও সুন্দর পদ্ধতিগুলি অন্যত্র হইতে আমদানী নৃত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ভেজাল হইয়া না দাঁড়ায় এবং তাহাদের নিজস্ব সরল সুন্দর ও বিশুদ্ধ প্রকৃতি না হারায়, তৎসম্বন্ধে সকল বাঙালীর সবিশেষ সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ভাস্কর্য্য কলায় বাংলার পল্লীভাস্করদের স্থান যে অতি উচ্চে তাহা মাত্র কয়েকটি উদাহরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারিব। এখানে প্রথমে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। বাংলা দেশের নৈসর্গিক অবস্থানমূলক কারণ বশতঃ পাথরের অপেক্ষাকৃত অভাবে বাংলার ভাস্করগণ যে, বেশীর ভাগ পাথরের পরিবর্ত্তে কাঠের ও মাটির উপরে তাহাদের শিল্পকৌশল প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহাতে তাহাদের ভাস্কর্য্য কলা-কৌশলের বিন্দুমাত্রও গৌরবহানি বর্ত্তায় না। পরন্তু ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত যে, কাষ্ঠ-ভাস্কর্য্যে সুনিপুণ ভাস্কর যদি পাথরের কাজ করিবার সুযোগ লাভ করেন তাহা হইলে তাহাতেও তিনি তাঁহার শিল্পকৌশল ষোল আনা মাত্রায় প্রদর্শন করিতে পারেন এবং ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, সুদূর অতীতে অশোকযুগে সাঁচি ও ভারহুতের ভাস্কর্য্য শিল্পিগণ প্রথমে কাঠের কাজেই তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। *পাথরের কাজেও বাংলার ভাস্করগণ পাল-যুগের সুবিখ্যাত ভাস্কর্য্যে অনুপম কলা-কৌশল প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে শহুরে ও সমৃদ্ধ বাঙালীর কাছে উৎসাহের অভাবে বাংলার জাতীয় ভাস্করগণ পল্লীর কুটীরে স্থপতিকলার আনুষঙ্গিক কাষ্ঠ-ভাস্কর্য্যেই প্রধানতঃ তাহাদের শিল্পকৌশল প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। শহুরে, শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ আধুনিক বাঙালীর কাছে এ-সব


বাংলার দারুশিল্প—বাঘ ও হাতী

* *Introduction to Indian Art* by Ananda K. Coomarawamy's p 24.

কাজ প্রায়ই অজ্ঞাত থাকিলেও পশ্চিমবাংলার পল্লীগ্রামে বনিয়াদী কুটীরগুলিতে ইহাদের অনিন্দ্যসুন্দর ও সুনিপুণ কলাকৌশলের যথেষ্ট নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়, এবং আমার বিশ্বাস যে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ভাস্কর্য্যনিপুণতাও বাংলার প্রাচীন যুগের স্থপতিদের স্থাপত্যশিল্প-নিপুণতার ন্যায়, অশোক-যুগে সাঁচি ও ভারহুতের ভাস্করদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

বাংলার এই বর্ত্তমান পল্লীভাস্কর্য্য-কলা বাংলার সাধারণ পল্লীজীবনের সঙ্গে রসকলার ঘনিষ্ঠ সংযোগের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহার উদাহরণ প্রধানতঃ পাওয়া যায় তিন প্রকার কাজে ঃ—

(১) কার্ণিশের ব্র্যাকেট বা "শুঁড়ো"গুলিতে (বেশীর ভাগ ব্র্যাকেটগুলি হাতীর শুঁড়ের পরিকল্পনায় নির্ম্মিত বলিয়া এইগুলিকে সাধারণতঃ "শুঁড়ো" বলিয়া অভিহিত করা হয়)

(২) চালার বরগা ইত্যাদির উপরে "বোঠে" নামক আলঙ্কারিক কাষ্ঠনির্ম্মিত আকৃতিগুলিতে; এবং

(৩) দরজার চৌকাঠের পাটায়।

ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর অনেকগুলি চমৎকার উদাহরণ আমি বীরভূম জেলা হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এইগুলির শিল্পকৌশল এত সুনিপূণ ও মনোমুগ্ধকর যে, পৃথিবীর কোন



বাংলার দারুশিল্প—নাপিত ও নাপিতানী

দেশের ভাস্কর্য্যের সঙ্গে নিপুণতার তুলনায় ইহাদের হার হইবে না বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এই উদাহরণগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, যে-সকল চীনদেশীয় মিস্ত্রীর দল আজকাল কলিকাতা শহরে কাঠের কাজে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে ও যাহারা আমাদের দেশের ধনকুবেরদের কাছে লম্বা লম্বা মাহিনা পাইতেছে, তাহাদের চেয়ে আমাদের বাংলার পল্লীভাস্করগণ শিল্পনিপুণতার দিক দিয়া এবং ভাস্কর্য্য-রসকলায় প্রতিভার দিক দিয়া কোন অংশে ন্যূন ত নহেই, বরং শ্রেষ্ঠ। উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি কাঠের 'শুঁড়ো'র কয়েকটি 'কাঠের পরী' প্রতিকৃতি যুক্ত ব্র্যাকেটের এবং কয়েকটি আলঙ্কারিক 'বোঠের' ছবি এখানে দেওয়া হইল। পরিকল্পনার নিখুঁত নির্ম্মলতায় ও গৌরবে, ভাবের ও রসের নিবিড় অভিব্যঞ্জনায় কারুকার্য্যের সুনিপুণ ছন্দে এবং স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিবর্শেষে মানবদেহের

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্য ও লালিত্যের রূপসৃষ্টিতে এইগুলি জগতের ভাস্কর্য্যশিল্পে যে অতি উচ্চ স্থান অর্জ্জন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই; গ্রাম্য নাপিত কর্ত্তৃক ভুঁড়িওয়ালা পণ্ডিত-মহাশয়ের ক্ষৌরকর্ম্ম ও নাপিতানী কর্ত্তৃক শুচিবাইগ্রস্তা পণ্ডিতজায়ার পায়ে আলতা-পরানোর ভাস্কর্য্যটি অনুপম রসাভিব্যঞ্জনায় ও শিল্পনিপুণতায় পৃথিবীর মধ্যে একটি অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। প্রয়োজনীয় অংশগুলির কারুকার্য্য সম্পূর্ণরূপে করিবার ও নিষ্প্রয়োজনীয় গুটিকয়েক অংশ ইচ্ছাপূর্ব্বক অসম্পূর্ণ রাখিবার যে প্রণালী রদ্যাঁ (Rodin) প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্করের নিপুণতার চূড়ান্ত লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়, বাংলার দীনদরিদ্র পল্লীভাস্করগণের কাজে এই উচ্চপ্রতিভা-মূলক লক্ষণের স্বভাবজাত অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই অনুপম কৌশলসম্পন্ন পল্লীভাস্করগণ ও তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ কলাকৌশল বাঙালীর একটি অমূল্য জাতীয় সম্পদ। কিন্তু বর্ত্তমানকালে উৎসাহের অভাবে ইহারা এবং ইহাদের শিল্পকৌশল অতি শীঘ্রই বাংলা দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতে চালিয়াছে। এখনও চেষ্টা করিলে ইহাদিগকে অবলুপ্তি হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু আর বিন্দুমাত্রও বিলম্ব করিলে তাহা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

সর্ব্বশেষে এখন চিত্রশিল্পের কথা বলি। বাংলার নিভৃত পল্লীগ্রামের দৈনন্দিন জীবনে চিত্রকলার যে-সকল ব্যবহার সাধারণতঃ পাওয়া যায়, তাহা তিন-ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ—প্রথমতঃ, 'পটুয়া' জাতীয় লোকের পুরুষানুক্রমিক প্রথানুসারে অঙ্কিত লম্বা লম্বা চিত্রপট; দ্বিতীয়তঃ পল্লীগ্রামের মেয়েদের অঙ্কিত আলিম্পনা ও প্রাচীরচিত্র; এবং তৃতীয়তঃ, মাটির ঘড়া ও পুতুল এবং কাঠের পুতুল ইত্যাদির উপর চিত্রাঙ্কন।

এই তিন প্রকার চিত্রের দৈনন্দিন অজস্র ব্যবহারে বাংলার পল্লীজীবন এককালে কি অতুল সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, এবং বর্ত্তমান বাংলার শহরের ভ্রান্তশিক্ষা প্রসূত কৃত্রিম ও প্রাণহীন আদর্শ এখনও যে-সকল সুদূর পল্লীতে পৌঁছিতে পারে নাই, সেখানে পল্লীজীবন এখনও যে কি অতুল সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ আছে, তাহা শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত শহুরে বাঙালীর অভিজ্ঞতা ও ধারণার অতীত। বাংলার নিরক্ষর সরল পল্লীবাসী স্ত্রীপুরুষগণের অন্তরে বিশ্বের সৃষ্টির আনন্দরসের নিবিড় দৈনন্দিন অনুভূতি ও তাহাদের অন্তরে অনুভূত পরব্রহ্মের সেই সহজ নির্ম্মল আনন্দের সহজ সরল অভিব্যক্তি এই বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ বর্ণ-সন্নিবেশরূপে বাংলার সুদূর নিভৃত পল্লীতে পল্লীতে এখনও যে-পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে সেরূপটি নাই বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। 'বর্ণ-সঙ্গীতে'র (colour music) এই অসাধারণ প্রতিভা বাংলার পল্লীর স্ত্রীপুরুষের চরিত্রকে যুগের পর যুগ সুমার্জ্জিত করিয়া বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতিকে একটি অতুলনীয় মধুর ও গৌরবময় রূপ দিতে সহায়তা করিয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান শহরের ভ্রান্তশিক্ষা ও বর্ব্বরতামূলক আদর্শের প্রাণহীন প্রভাবের ক্রমবিস্তারের ফলে

বাঙালীর এই অতুল ও অবলীলাময় রসানুভূতির এবং রসাভি স্বভাব-জাত প্রতিভাস্বরূপ অমূল্য জাতীয় সম্পদ একেবারে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

মাটিতে ও পিঁড়ি ইত্যাদিতে হাতের আঙুল দিয়া আলিম্পন দিবার যে সুন্দর প্রথা বাংলার পল্লীগ্রামের মেয়েদের মধ্যে এখনও আছে, তাহার কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু পশ্চিম-বাংলার মেয়েদের তুলিকার লীলাময় ব্যবহার দ্বারা নানাবর্ণে শোভিত প্রাচীর-চিত্র অঙ্কিত করিয়া আপন আপন বাড়ি-ঘরকে প্রতি বৎসর সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া রাখিবার যে অতুলনীয় প্রথা এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা আবিষ্কার করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য এক বৎসরকাল পূর্ব্বে আমার হইয়াছিল। ঘরে ঘরে মেয়েদের হস্তান্তরিত এই প্রাচীর-চিত্রকলার সৌন্দর্য্যের গৌরবের ফলে পশ্চিম-বাংলার সুদূর নিভৃত প্রদেশের এক একটি গ্রামকে এখনও এক একটি ছোটখাটো রকমের 'জীবন্ত অজন্তা' বলিয়া অভিহিত করিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বাংলার পল্লীচিত্র-শিল্পের যে তিন প্রকার পদ্ধতির কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে গ্রাম্য 'পটুয়া'দের অঙ্কিত লম্বা চিত্রপটগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উচ্চাঙ্গের চিত্র-রসকলা। বাংলার সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রীতিনীতির পরিবর্ত্তনে এবং বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে ইহা এখন বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায়ও ইহা যে এখনও বাংলার জাতীয় জীবনের একটি শ্রেষ্ঠতম ও গৌরবময় সম্পদ, তাহা নিঃসন্দেহভাবে বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানকালে বাংলাদেশে কলিকাতার কালীঘাট অঞ্চলের পটুয়াদের অঙ্কিত চিত্রকলা সাধারণের কাছে পরিচিত। কালীঘাটের পটুয়াগণ শহুরে ও বিজাতীয় আবহাওয়ায় পড়িয়া তাহাদের প্রাচীন বিশুদ্ধ ও সুন্দর পটাঙ্কন-কৌশল প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু বাংলার সুদূর পল্লীতে পল্লীতে দীনদরিদ্র গ্রাম্য পটুয়া শ্রেণীর মধ্যে এখনও সেই প্রাচীন ধারা ন্যূনাধিকভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের অঙ্কিত পটের যে-কয়েকটি নিদর্শন সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে তাহাতে বাংলার এই পল্লীবাসী পটুয়া শ্রেণীর চিত্রশিল্পে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া অবাক হইতে হয়। বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহারা এই সকল পট বাড়িতে বাড়িতে দেখাইয়া এবং তৎসঙ্গে রামলীলাপটের, কৃষ্ণলীলাপটের, শক্তি পটের ও যমপটের কাহিনী স্বরচিত গীতি-



প্রাচীন পট —দশরথের মৃত্যু

কবিতায় সহজ ও সরলভাবে বিবৃত করিয়া এবং সুললিত সুরে তাহা আবৃত্তি করিয়া গাহিয়া গাহিয়া বিস্তর রোজগার করিয়া বেড়াইত। সম্প্রতি আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার ও শহুরে শিক্ষার প্রভাব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাহিদা এবং ইহার গুণগ্রাহিতা বাংলার গ্রাম হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুপম শিল্পকলা-নিপুণ এই গ্রাম্য পটুয়াদের অন্নসংস্থান হওয়াও দায় হইয়া পড়িয়াছে। চাহিদার অভাবে বাধ্য হইয়া ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোককেই পট-আঁকা ও পট-দেখান ব্যবসা ছাড়িয়া জনমজুরের ব্যবসা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভারত-ইতিহাসের ও বাংলার ইতিহাসের প্রহেলিকাময় আবর্ত্তনে হিন্দুর শিল্পশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন এই সুনিপুণ চিত্রকরগণ এখনও হিন্দুদের পূজার জন্য দেবদেবীর ছবি আঁকার ও মাটির প্রতিমা গড়িবার কাজ করায় ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের গণ্ডী হইতে বিতাড়িত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং এই দুই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সীমান্তপ্রদেশে অনশনে ও অর্দ্ধাশনে অতি দুর্ভাগ্যময় ও দীনতাময় জীবন যাপন করিতেছে।

সামাজিক নিদারুণ নিপীড়ন সত্ত্বেও ইহারা ইহাদের যে পুরুষানুক্রমিক রসকলা-সম্পদ সযত্নে চর্চা ও বহন করিয়া আনিয়া বর্ত্তমান বাংলাকে দান করিয়াছে, তাহা অমূল্য ও অতুলনীয় এবং জগতের রসকলার আসরে ইহা যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। ইহাও নিঃসন্দেহ যে, ইহাদের রসকলা-পদ্ধতি অতি প্রাচীন ভারতের প্রাগ-বৌদ্ধ-যুগের আদিম রসকলা-পদ্ধতির অবিকল-প্রবাহিত বিশুদ্ধ পরস্পরার অভ্রষ্ট ও অপরিবর্ত্তিত রূপ-ধারা। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সেই অতি প্রাচীন প্রাগ-বৌদ্ধ যুগের চিত্রকলা পরস্পরা তাহার আদিম ধারার বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এখনও বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু বাংলার প্রতিভা যে সেই অসাধ্য-সাধনে সক্ষম হইয়াছে, বাংলার দীন-দুঃখী পটুয়াগণের চিত্রকলা তাহার জীবন্ত প্রমাণ।

'মুদ্রারাক্ষস' প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে যে 'চিত্রকলা' গুলির ও যমপট ইত্যাদি চিত্রপটের ও তাহাদিগের 'চিত্রকর' ও প্রদর্শনদিগের ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই চিত্রকরগণ যে ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন এবং সেই সকল চিত্রলেখা ও চিত্রপট যে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদেরই তুলিকাসৃষ্ট অতুল রূপ-সমৃদ্ধিতে বিভূষিত ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না এবং পাল-যুগে বিখ্যাত 'নাগ' পদ্ধতি-পন্থী চিত্রকর ধীমান ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বলিয়া অনুমানও যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কারণ এখনও ইহারা পটে নাগচিত্র সুশোভিত মনসাদেবীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করিতে অভ্যস্ত। আজকাল সাধারণ লোকে ইহাদিগকে "পটুয়া" নামে অভিহিত করিলেও ইহারা আপনাদিগকে প্রাচীন সংস্কৃত 'চিত্রকর' নামেই অভিহিত করিয়া থাকে এবং ইহারা যে প্রাচীন ভারতের 'চিত্রলেখা' অঙ্কনকারী চিত্রকরদের বংশসম্ভূত, ইহার একটি আশ্চর্য্য প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেও চিত্র আঁকার প্রক্রিয়াকে

"লেখা" নামে অভিহিত করিবার প্রথা যদিও সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া গিয়াছে তথাপি এই চিত্রকরগণ এই সূত্রে কখনও 'অঙ্কন' অথবা 'আঁকা' কথা ব্যবহার করে না। পরন্তু সর্ব্বদাই সেই অতি প্রাচীন 'লেখা' কথাটিই আজ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। চিত্রশিল্প-কুশলতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ব্যবহৃত পরিভাষাগুলিও ইহারা যুগের পর যুগ সযত্নে বহন করিয়া আসিতেছে।

এতদিন আমরা অজন্তার সুবিখ্যাত চিত্রকলা-পদ্ধতিকেই ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন চিত্রকলা-পদ্ধতির একমাত্র অবশিষ্ট উদাহরণ বলিয়া ধরিয়া লইতাম; কিন্তু এখন হইতে বাংলার এই নিজস্ব চিত্রকলাই সেই গৌরবময় স্থান অধিকার করিবে। ইহা ছাড়া বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলা-পদ্ধতির আরও যে-কয়েকটি গৌরবময় বিশেষত্ব আছে তাহা ইহাকে বিশ্বের চিত্রকলার সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

দেশবিদেশের অন্যান্য বিখ্যাত অতিমার্জ্জিত চিত্রপদ্ধতির ন্যায় বাংলার এই নিজস্ব চিত্রপদ্ধতি বিশ্বমানবের আদিম যুগের সহজ সরল ভাব, পৌরুষের ভাব, অকৃত্রিমতার ভাব এবং সজীবতা, সরলতা ও তেজস্বিতার ভাব হারায় নাই। একদিকে যেমন এই সকল গুণ ইহাতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে তেমনি আবার এই মুক্ত ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহা অন্যান্য আধুনিক মার্জ্জিত চিত্রকলা-পদ্ধতির সমতুল অথবা ততোধিক ভাবে লাবণ্য ও লালিত্য যোজনা করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহাতে অতি-বিলাসিতার, অতি-আলঙ্কারিকতার ও অতি-সাম্প্রদায়িকতার মুদ্রাদোষের অথবা কোনরূপ আড়ষ্টতা দোষের ছাপ পড়ে নাই। বাংলার এই অপূর্ব্ব চিত্রকলা একদিকে যেমন চিরপ্রাচীন তেমনি অপরদিকে আবার ইহা চিরনূতন। এই চিত্রকলার ভাষার অক্ষর-প্রকরণ অতি স্বল্প ও সহজ। ইহা কেবল রেখার সতেজ, সুনিপুণ, প্রখর ও ভাবব্যঞ্জক প্রয়োগ এবং অল্প কয়েকটি প্রাথমিক বর্ণের অমিশ্র ব্যবহারের উপর নির্ভর স্থাপন করে। ইহার ভাষার ব্যাকরণ অতি সহজ ও অতি প্রাঞ্জল। পারিপ্রেক্ষিতের মাপকাঠির খুঁটিনাটি ও আলোছায়ার খেলাধূলার চতুরতা ও বাহুল্য মিশাইয়া ইহা কখনও আপনার ব্যাকরণকে অযথা জটিল করিয়া তুলিবার প্রয়াস করে নাই। ইহার আকার-বিন্যাস ও বর্ণসমাবেশ ও সমন্বয় অতি শোভন ও অনিন্দ্যসুন্দর। আলঙ্কারিকতার চূড়ান্ত কৌশলও যে এই চিত্রকরগণ প্রদর্শন করিতে পারে তাহারও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই সকল প্রাচীন পট হইতে পাওয়া যায়।

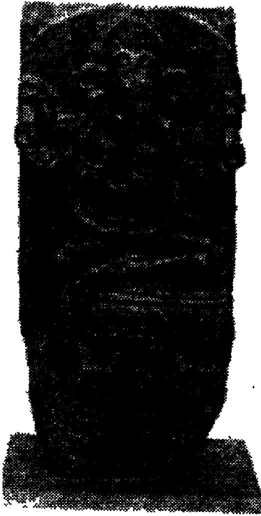


প্রাচীন পট—ভারবহন

কিন্তু বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলায় কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে রূপ-কল্পনার বিলাসিতার অযথা বাড়াবাড়ি নাই, অথচ ইহা রস-প্রাচুর্য্যে ভরপুর। ইহাতে অঙ্কিত মনুষ্যগণের আকৃতি ও হাবভাব সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিমতা ও মুদ্রাদোষবিহীন এবং সাধারণ মানুষের সহজ ও জীবন্ত ভাবে পরিপূর্ণ। একদিকে বাংলার এই পল্লীশিল্পীদের জীবজন্তু অঙ্কনের ক্ষমতা যেমন অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক, তেমনি অপরদিকে মানুষের অন্তরতম মনোভাবের অবিকল ব্যঞ্জনা একমাত্র তুলির অবলীলাময় টানে ফুটাইয়া তুলিতে ইহাদের ক্ষমতাও জগতে অদ্বিতীয়। বৃক্ষলতাদির পত্রের অঙ্কনের অতি চমৎকার ও মনোহর আলঙ্কারিক রীতিও এই চিত্রপটগুলির ও এই চিত্রকরদের একটি অন্যতম বিশেষত্ব। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলায় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিন্যাসের ও ভাব-ব্যঞ্জনার আদর্শে যে অস্বাভাবিকতা, দুর্ব্বলতা, কৃত্রিমতা ও অতি-কচিভাব লক্ষিত হয়, বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলা-পদ্ধতিতে সেই সকল দুর্ব্বলতা ও দোষ নেই। এই সকল চিত্রপটে একদিকে পুরুষদেহের বীরোচিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও ভাব-ভঙ্গীর অঙ্কন-প্রণালী ও অপরদিকে নারীদেহের লীলায়িত রূপলাবণ্য-মাধুরীর বিচিত্র অঙ্কন-কৌশলের স্বভাবজাত সমাবেশ দেখিয়া অবাক হইতে হয়। অনুকরণ মূলক অঙ্কনবাহুল্য বর্জ্জন করিয়া ইঙ্গিতে ভাবের ও রসের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনাশক্তি এই সকল চিত্রপটের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার একটি চিত্রেও কোন রকম ভাবের অপরিস্ফুটভাবে অথবা ধোঁয়াটে ধরণ নাই। চিত্রে অতি-পরিস্ফুটভাবে কাহিনী বিবৃত করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই চিত্রকলা-পদ্ধতি ভারতের আদিম যুগ হইতে পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে। রামপটে অঙ্কিত কর্ম্মযোগমূলক পৌরুষকাহিনীর ইতিহাস ও প্রাচীন ভারতের পারিবারিক জীবন-প্রণালী, শক্তিপটে অঙ্কিত গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানমূলক দার্শনিক সত্য, এবং কৃষ্ণপটের আধ্যাত্মিক প্রেমমূলক 'রমন্তিকতা' (romanticism)-র ভাব-তরঙ্গ বাংলার এই সকল প্রাচীন শিল্পিগণ অতি সরল ও সহজভাবে সাধারণের বোধগম্য করিয়া চিত্রপটে তাহাদিগকে অসাধারণ ভাবব্যঞ্জক ও অনিন্দসুন্দর রূপ প্রদান করিয়া তাহাদের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি বাংলার পল্লীগ্রামের সরল প্রকৃতির স্ত্রী-পুরুষগণের চরিত্রের এই অনির্ব্বচনীয় ও অতুলনীয় নিজস্ব মাধুর্য্যরসে এই সকল চিত্রপটের রেখা, বর্ণ ও রূপকল্পনা ওতপ্রোতভাবে পরিপ্লাবিত।

বাংলার এই প্রাচীন চিত্রশিল্পিগণ রসকলার সঙ্গে ধর্ম্মের যে ঘনিষ্ঠ ও অটুট সম্বন্ধে তাহা কখনও ভুলিয়া যান নাই এবং তাহা মানুষের মনে অবিরত জাগাইয়া দিবার জন্য প্রত্যেক চিত্রপটের শেষভাগে যমরাজার সভায় চিত্রগুপ্তের অভ্রান্ত খাতায় চিত্র ফুটাইয়া—তুলিয়া এবং যমরাজার অনুশাসনে ধর্ম্মের অন্তিম জয় ও অধর্ম্মের অন্তিম পরাজয়ের কাহিনী অতি জ্বলন্তভাবে বিবৃত করিয়া সমাজে ধর্ম্মভাবের প্রচলন বজায় রাখিবার অমূল্য সহায়তা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জগতের চিত্রকলা-রূপসীর আত্মা আজ তাহার বহুযুগের পুঞ্জীভূত বিলাসবেশভূষার জটিলতার ভারে প্রপীড়িত হইয়া পরিপ্রেক্ষিতের ভেল্কিবাজী ও আলোছায়াপাতের মরীচিকাময় বেড়াজালের আবেষ্টনের পীড়নে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া সহজ সরল আত্মপ্রকাশের আগ্রহে তাহার বিলাস হর্ম্ম্যরাজি পরিত্যাগ করিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকার বনজঙ্গলে মানবজাতির আদিম লালিত্যহীন সরলতার মধ্যে সহজ সরল আত্মপ্রকাশের উপযোগী যে-চিত্রভাষার অনুসন্ধানে ব্যর্থপ্রয়াসে উন্মাদের ন্যায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, বাংলার পল্লীর সুমধুর চিত্রলেখা-লক্ষ্মী আজ তাঁহার সলজ্জ অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করিয়া সেই অতি-বাঞ্ছিত অনুপম ও একাধারে প্রাঞ্জল অথচ শক্তিময়, লাবণ্যময়, প্রাণময়, কৃত্রিমতাবিহীন এবং ভাবব্যঞ্জনায় ও রসব্যঞ্জনায় ভরপুর চিত্রভাষার সন্ধান বিশ্বমানবকে মিলাইয়া দিবে।



গণেশ

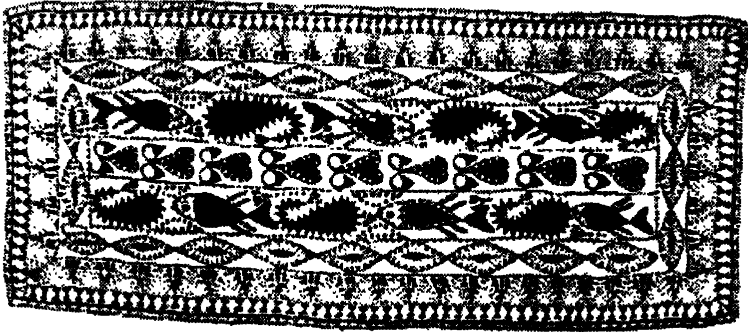


দুর্গা

দারু-ভাস্কর্য ফরিদপুর (বাংলাদেশ)
অষ্টাদশ শতাব্দী

বাংলার রসকলা-প্রতিভা

স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙালি জাতিকে 'একটি আত্মবিস্মৃত জাতি' আখ্যা দিয়েছিলেন। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আর এই আত্মবিস্মৃতির ফলে বাঙালি জাতি যে আজ পর্য্যন্ত একটা উৎকট আত্ম-হেয়তা-বিশ্বাস ব্যাধিতে প্রপীড়িত ও অবসন্ন তাহাও নিঃসন্দেহ। বাঙলা দেশের যে কোনো মানুষ অথবা যে কোন জিনিস যত দিন না বাঙলার বাহির থেকে প্রশংসা বা প্রতিষ্ঠার ছাপ পেয়েছে ততদিন আধুনিক বাঙালির তাকে প্রশংসা বা প্রতিষ্ঠা দিবার কথাই মনে হয় না। কিন্তু কোন জিনিস যখনই বাইরের আদর বা প্রশংসা পায় অথবা যা কিছু বাইরে থেকে আসে তাকে নিয়ে হৈ চৈ করা আমাদের জাতিগত অভ্যাস হয়ে পড়েছে।



কাঁথা শিল্প

আমাদের নাটক নভেলগুলি বাঙলার বাইরের রাজপুতনা মারাঠা ইত্যাদি দেশের লোকের বীরপণার কাহিনীতে ভরপুর; কিন্তু বাঙলার নিজস্ব ইতিহাসের খবর আমরা

কমই রাখি এবং বাঙলার ইতিহাস খুঁজলেও যে শৌর্য বীর্য্যের কাহিনী ঢের পাওয়া যায়। তার উপলব্ধি আমাদের এক সময়ে ত ছিলই না, —এখনও যা কিছু হয়েছে তাও অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ বললে অত্যুক্তি হবে না। দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডার পুরুরাজকে পরাস্ত করার পর তৎকালীন প্রচণ্ড বাঙালি জাতির শৌর্য্যের বিবরণ শুনিয়া যে পূর্ব্ব-ভারতবর্ষ, জয় করবার আশা ত্যাগ করে পুনরায় নিজের দেশের অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন আর তখনকার এই 'গঙ্গা-রাঢ়ীয়' বাঙালিদের সমরে বীর্যবত্তার কথা যে রোমক কবি ভার্জিল পর্যন্ত তাঁর কবিতায় গেয়ে গিয়েছেন তা আজকাল কয়জন বাঙালি বা বাঙলার স্কুলের কয়জন ছেলেমেয়ে, কি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা জানে? ইহার পরবর্তী পাল যুগে, সেন যুগে ও মুসলমান যুগে সমর-কৌশলে, সাহসিকতায়, বাণিজ্যে ও শিল্পপ্রতিভায় বাঙালির ও বাঙলার স্থান যে কোথায় ছিল তার খবরও আমরা খুব কমই রাখি। সাহিত্যে দর্শনে ও কলাবিদ্যায় বাঙলার প্রকৃত স্থান যে কোথায় তাব প্রকৃত ধারণাও আমাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক টড যেমন রাজস্থানের ইতিহাস লিখে যে দেশের কীর্তিকে জগতের সামনে সমুজ্জ্বল করে ধরেছিলেন, বাঙলার সত্যরূপের সে রকম ইতিহাস যেদিন কেউ লিখতে পারবে তখনই বাঙালীর আত্মা ও প্রাণ প্রকৃতি আবার তার পরিপূর্ণ শক্তির সন্ধান ও অনুভূতি পেয়ে সম্যক্ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সার্থকতা লাভ করতে পারবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙলা দেশের নৈসর্গিক আবহাওয়ার ফলে বাঙলার প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান যথেষ্ট ভাবে রক্ষিত হয়নি; কিন্তু যা কিছু রক্ষিত হয়েছে তাকেও যতদিন তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতের রূপদান করে প্রকটিত করা না হবে ততদিন বাঙলার আত্মশক্তি দীর্ঘকালের নিরুদ্ধতা পরিহার করে মুক্তিলাভ করতে পারবে না।



কাঁথার মধ্যে পদ্ম

অতীত ইতিহাসের লুপ্ত স্মৃতির কথা ছেড়ে দিলেও এখনও বাঙলার গ্রামে গ্রামে বাঙলার প্রাচীন সংকৃষ্টির ধ্বংসাবশিষ্ট যে কত সম্পদ রয়েছে তাকে চিনবার শক্তি বা প্রবৃত্তি আমাদের নাই। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লেখককে কিছুদিন আগে একখানা চিঠিতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখে বাঙলার আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মনোবৃত্তির বর্ণনা করেছিলেন ঃ "আমরা গ্রন্থকীট; দেশের গভীর প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ নাই। আমরা ইংরাজী স্কুলের 'স্কুল বয়'—সেইজন্য পুঁথির নজির অনুসরণ করে বিদেশীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে পণ্ডিতী করতে আমাদের উৎসাহ; কিন্তু সেই রসবোধ নেই যাতে ঘরের কাছে সাধারণের মধ্যে যে সব সৌন্দর্য্য প্রকাশের উপকরণ আছে তার যথাযোগ্য মূল্য নিরূপণ করতে পারি।"

বাঙলার প্রাচীন রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বীর বংশধরগণ যে আমাদের মূঢ়তা বশত ছদ্মবেশে ভিখারীর রূপে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিল তা আমরা এতদিন চিনতে পারিনি—এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ উক্ত কথাটি লিখেছিলেন। জীবনের অন্যান্য বিভাগের কথা ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে রসবোধের কথা উল্লেখ করেছেন সেদিক দিয়েই আমরা এখন আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার একটু পর্য্যালোচনা করব। বাঙলাদেশ থেকে যে জিনিস বেরিয়েছে অথবা বাঙলায় এখনও যে জিনিস আছে, ললিতকলার দিক থেকে তার মূল্য কম, আর বাইরে থেকে যা আসে তার মূল্য বেশি, এরূপ ধারণা আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের মনে এখনও বদ্ধমূল। এর একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ আবার রায়বেঁশের কথাটাই একটু উল্লেখ করব। বাঙলার নিজস্ব এই রায়বেঁশে নৃত্য, এই সম্বন্ধে একটি উচ্চশিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন আমার আলাপ হয়। তিনি রায়বেঁশে নৃত্যের প্রশংসা করার পর বললেন ঃ "এই জিনিসটি বেশ, এবং সামরিক প্রকৃতির ও সাহসিকতার ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে এ খুবই চমৎকার, কিন্তু আর্ট ('ললিতকলা') হিসাবে মালাবারের অভিনয় নৃত্য আরও উঁচুদরের।" বাউল ও কীর্তন নৃত্যের ত কথাই নাই। নৃত্য অথবা রসকলা হিসাবে এগুলির যে কোন মূল্য আছে তা কয়েক মাস আগে আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের ধারণাও ছিল না। এমন কি বাঙলাদেশে যে উল্লেখযোগ্য কোন নৃত্য নাই কয়েক মাস পূর্ব্ব পর্যান্ত মাসিক পত্রিকায় এরকম মতামতসূচক প্রবন্ধের ছড়াছড়ি দেখা গিয়েছে। মেয়েদের নৃত্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ। অসভ্য সাঁওতাল মেয়েদের নৃত্য ছাড়া বাঙলাদেশে যে কোন মেয়েলি নৃত্য ছিল অথবা আছে অথবা ললিতকলা হিসাবে তার কোন মূল্য আছে এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজে খুব কম লোকেরই জ্ঞান ছিল এবং এই নিয়ে অনেক উচ্চশিক্ষিত বাঙালি বন্ধুর সঙ্গে আমাকে অনেক তর্ক বিতর্ক করতে হয়েছে। গুজরাটি গরবা নৃত্য ইত্যাদির প্রচলন করবার প্রবল ধুয়া কয়েকমাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙলাদেশে চল ছিল। ইতিমধ্যে আমার প্রমাণ করার সৌভাগ্য হয়েছে যে বাঙলার পল্লীতে ভদ্রপরিবারের মেয়েদের মধ্যেও যে সকল ব্রত-নৃত্য ও উৎসব নৃত্যের প্রথা

এখনও কোথাও কোথাও বেঁচে থাকতে সমর্থ হয়েছে সেগুলি ললিতকলার দিক দিয়ে খুব উঁচুদরের জিনিস।

আসল কথা 'আর্ট' অথবা রসকলার (ললিতকলার) বাস্তবিক প্রকৃতি যে কি সে সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোকের মনে একটা শোচনীয় আদর্শ-বিকৃতি ঘটেছে এবং তার ফলে বাঙলাদেশে যে সকল উচ্চাঙ্গের রসকলা এখনও পল্লীগ্রামের কোথাও কোথাও ধ্বংসাবশিষ্ট ভাবে বেঁচে থাকতে সমর্থ হয়েছে তাকে চিনবার অথবা তাঁর যথাযোগ্য মূল্য নির্দ্ধারণ করবার মত অনুভূতি বা ক্ষমতা আমাদের নাই। 'আর্ট' অথবা রসকলা বলতে আমরা আজকাল বুঝে থাকি এমন একটা জিনিস যাতে আছে বিলাসিতার ইঙ্গিত ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিদায়ক রূপের সমাবেশ, যাতে আছে রং চং-এর বাহার অথবা যাতে আছে আভিজাত্যের আদব-কায়দার ও ভঙ্গিমার ছাপ অথবা যা প্রাচীন মন্দিরে খোদিত মূর্ত্তির বা গুহায় অঙ্কিত অথবা প্রাচীন পুঁথিতে বর্ণিত রূপাবলীর অনুকরণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথায়ই আবার বলি যে আমাদের 'সেই রসবোধ নেই যাতে ঘরের কাছে সাধারণের মধ্যে যে সব সৌন্দর্য্য প্রকাশের উপকরণ আছে তার যথাযোগ্য মূল্য নিরূপণ করতে পারি।' অর্থাৎ বাঙলার পল্লীগ্রামের নরনারীর জীবন-যাত্রার সঙ্গে যে সকল উচ্চাঙ্গের রসকলা প্রণালী এখনও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে সেগুলিকে আমরা চিনতেই পারি না।

বিগত ২৫।৩০ বৎসর থেকে বাঙলাদেশের বড় বড় সহুরে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে রসকলা চর্চার যে একটা প্রচেষ্টা এসেছে তা নিয়ে আমরা খুব বড়াই করি;এবং তাতে যে বাঙালির হাত দিয়ে সৌন্দর্য্যের প্রভূত রূপাবলীর পরিকল্পনা ফুটে উঠেছে তাও ঠিক। কিন্তু এই যে একটা নবজীবনের পুলকময় সঞ্চারন বাঙলাদেশের নাগরিক শিল্পীদের মধ্যে এসেছে তার অনুপ্রেরণা প্রথমে এসেছিল ইউরোপ থেকে; আর এখন আসছে—হয় প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিতে নিবদ্ধ রূপাবলীর বিধান থেকে অথবা অজন্তা ও ইলোরার গুহার এবং রাজপুত ও মোগল রাজসভার ধ্বংসাবশেষ থেকে; মোট কথা, ললিতকলার আদর্শ নাগরিক বাঙালি বর্ত্তমান বাঙলার বাইরে থেকেই নিতেছে। বাঙলার ভিতরে ললিতকলার যা কিছু ক্রম-চর্য্যা [tradition] এখনও বেঁচে আছে তার দিকে তারা হয় চেয়েও দেখেনি নয় তাকে অতিতুচ্ছ ও নগণ্য বলে অবজ্ঞা করেই এসেছে।


পোড়ামাটির চিত্রিত লক্ষ্মীর সরা (ত্রিপুরা)

ইহা যে কত বড় মূঢ়তা তা আমরা টের পাব যখন বুঝতে পারব যে যতদিন বাঙালি বাঙলার নিজস্ব সংকৃষ্টি প্রসূত রসকলার ধারা থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত না হবে ততদিন বাঙলাদেশের রসকলা প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব।

সর্ব্বব্যাপী পরিবর্ত্তনের ঘূর্ণিপাকে মোহান্ধ হয়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজ আজকাল বাঙলাদেশের যা কিছু প্রাচীন ক্রমচর্যা [tradition] তাকেই ভেঙ্গে চুরে বাইরে থেকে তার জায়গায় নূতন জিনিস এনে বসাবার চেষ্টা করছে; কিন্তু ললিতকলার ক্ষেত্রে জাতির প্রাচীন ক্রম-চর্য্যার, বিশেষত জীবন্ত ক্রমচর্য্যার মূল্য যে কত বড় তা আমাদের আধুনিক শিক্ষাজনিত মূঢ়তা বশত আমরা এখনও বুঝতে পারি নি।

আমাদের আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীতে এবং আমাদের বর্ত্তমান নাগরিক বস্তুতান্ত্রিক ও পণ্যতান্ত্রিক সভ্যতায় এই মূঢ়তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এই মূঢ়তাপ্রসূত অবজ্ঞার ফলে বাঙলার জীবন্ত রসকলার ধারাগুলি লোপ পেতে বসেছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি যদি অবিলম্বে এই দিকে আকৃষ্ট না হয় তা হলে এগুলি ৫।৭ বৎসরের মধ্যেই একেবারে লোপ পেয়ে যাবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির রসকলা প্রতিভাক্ষেত্রে পুনর্জ্জীবনের আশাও যে খালি লোপ পাবে তা নয়, বাঙালির জাতীয় বৈশিষ্ট্য জাতীয় ধর্ম্মভাব ও জাতীয় সৃজনী প্রতিভাও লোপ পেয়ে জাতিকে দেউলিয়া করে তুলবে।

তাই এখন জোর গলায় ঘোষণা করবার সময় হয়েছে যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আলো হাওয়া আহরণ করবার আগে আধুনিক বাঙালিকে তার আত্মার ও প্রকৃতির শিকড় প্রোথিত করতে হবে—বাঙলার নিজস্ব সংকৃষ্টির গভীর তলদেশে এবং সেখান থেকে প্রতিনিয়ত রস আহরণ করে জাতীয় জীবনের প্রতিভার অঙ্কুরকে সংগঠন করে তোলার পর অন্যান্য প্রদেশ ও দেশ থেকে অনুপ্রেরণা আহরণ করবার সময় হবে।

আমাদের নাগরিক শিল্পীগণ বাঙালির জাতীয় কলাপ্রতিভাক্ষেত্রের তলদেশে তাদের প্রতিভার শিকড় প্রোথিত করেন নি বলেই আমাদের বাঙলার শিল্প আজকাল শিকড়বিহীন ও বেখাপ্পা হয়ে পড়েছে এবং জাতির নাড়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নাই। এই বাইরের অনুকরণমূলক কলাশিল্প জাতির প্রতিভাকে এবং চরিত্রকে পথভ্রষ্ট ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিয়ে জাতীর জীবনকে একটা কৃত্রিমতার দিকে বিলাসিতার দিকে ও আধ্যাত্মিক অন্তঃসারহীনতা ও অধঃপাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।



পোড়ামাটির চিত্রিত
বিবাহের মঙ্গলঘট (বীরভূম)

রসকলার ক্ষেত্রে আমাদের আত্ম-হেয়তা-বিশ্বাস দূর করতে এটা শুধু একটা ফাঁকা ভাবোচ্ছ্বাসতার কথা নয়; বাস্তবিক পক্ষে আজকাল পাশ্চাত্যজগতের সর্ব্বাপেক্ষা রস-শিল্পবিৎ পণ্ডিতগণ রসকলার সত্যপ্রকৃতির যে রূপ নির্দ্ধারণ করেছেন বা করছেন সেই বিচারপদ্ধতির দিক দিয়েও বাঙলার পল্লীতে বাঙলার প্রাচীন রসকলা প্রতিভার যে সকল জীবন্ত নিদর্শন ও ক্রমচর্য্যা এখনও অবশিষ্ট আছে সেগুলির মূল্য যে খুব বড় এটা আমাদের এখন চিনে নিতে হবে।

আমাদের সহুরে মনোভাবের ফলে আমরা আজকাল বাঙলার পল্লীগ্রামের যে সকল সহজাত শিল্পধারাকে অবজ্ঞা করে থাকি সেগুলি যে আমাদের নাগরিকশিল্পের চেয়েও উঁচুদরের এই অনুভূতি আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে।

জাতির স্বাভাবিক জীবনের এবং তার আত্মার উচ্চ আশা আকাঙক্ষা ও লক্ষ্যের যে আত্মপ্রকাশ রেখা, রং, আকার, সুর ও ছন্দের ভিতর দিয়া স্বতঃস্ফূরিত হয়ে উঠে, তার নামই 'আর্ট' অথবা রসকলা। রসকলার আরও একটি সত্যলক্ষণ এই যে ইহা মানুষের প্রাণকে অতীন্দ্রিয় লোকের দিকে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। যে শিল্প বা কলায় মানুষের কোন বাহ্যেন্দ্রিয়ের উত্তেজনার বিন্দুমাত্রও ভাব জাগায় সেটা যে বাস্তবিক Fine Art অথবা রসকলা নয়। এটা আজকাল পাশ্চাত্যদেশের জ্ঞানীদের মধ্যে একটা স্বতঃসিদ্ধের মতই স্বীকার্য্য হয়ে পড়েছে,—অথচ আমাদের দেশে এখনও নাগরিক শিল্পীদের সৃষ্ট রূপাবলীতে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনামূলক রূপ-সৃষ্টির প্রচলনই বেশি এবং এগুলিই দেশে 'আর্ট' অথবা ললিতকলার আখ্যা লাভ করেছে; প্রকৃত রসকলার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার সহরের studio অথবা কারখানাগুলিতে তৈরি হয় না ইহার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হয় জাতির ও ব্যক্তির গভীর আধ্যাত্মিক জীবন প্রণালীর ভিতর থেকে।



পোড়ামাটির মনসারঘট
(বাগেরহাট, খুলনা)

যে জাতি দুই চারিটি নামজাদা রসশিল্পী তৈরি করে তার বড়াই করে বা তাতেই তৃপ্তি পায় সে জাত বাস্তবিকই অনুকম্পার পাত্র; কিন্তু যে জাতির সাধারণ নরনারীর মধ্যে রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির প্রতিভা বহুব্যাপকভাবে বিস্তৃত সেই জাতির সভ্যতা ও সংকৃষ্টিই বাস্তবিক প্রশস্ত ও উৎকৃষ্ট।

উপরোক্ত মাপকাঠির দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঙলার গ্রামে গ্রামে এখনও যে সকল রসকলাচর্য্যার ধারা আজও বর্ত্তমান, সেগুলি যে আমাদের সহুরে শিল্পীদের রসকলা থেকে বাস্তবিকই উচ্চস্তরের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চিত্রকলা ও বর্ণবিন্যাসের দিক থেকে আমরা এর আলোচনা বিশেষ করে করব।

চিত্রকলা ও বর্ণবিন্যাসের প্রতিভা বাঙলা দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে এখন পর্যন্তও এত বহুব্যাপকভাবে বর্ত্তমান আছে যে তাহা ভেবে দেখলে অবাক হতে হয়। যদিও অনেক দেশেই পল্লীশিল্পের জীবন্ত উজ্জ্বল ধারা কোন এককালে বর্ত্তমান ছিল অথবা এখনও কোথাও কোথাও বর্ত্তমান আছে, তবু এটা জোর করে বলা যেতে পারে যে চিত্রকলার ও বর্ণবিন্যাসের প্রতিভা বাঙলার পল্লীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারীর মধ্যে এখনও যে রকম ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান আছে—এবং শুধু ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান নয়—এই প্রতিভা এত উচ্চস্তরের—যে এ রকম বোধ হয় আজকাল এই পণ্যতন্ত্রতার দিনে খুব কম দেশেই আছে। বাঙলার পল্লীপ্রতিভার এই বিভাগে প্রথম স্থানের অধিকারী পশ্চিম বাঙলার পল্লীগ্রামের চিত্রশিল্পী পটুয়াগণ। আমাদের নাগরিক শিল্পীদের মধ্যে অনেকেরই পশ্চিমবাঙলার পাটশিল্পের সঙ্গে পরিচয় নাই বলেই তাঁরা এখনও একে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে থাকেন অথবা এই পটশিল্পের কথা অবজ্ঞার সঙ্গে উল্লেখ করেন। কিন্তু বিগত মার্চ মাসে পশ্চিম বাঙলার পটুয়াদের অঙ্কিত বহু সংখ্যক জড়ানো পটের যে প্রদর্শনী কলিকাতায় Indian Society of Oriental Art-এর ভবনে আমি করেছিলাম তা দেখাবার সুযোগ যাঁদের হয়েছে তাঁদের অনেকেরই আশা করি এখন বুঝতে পেরেছেন যে এগুলি কত উঁচুদরের চিত্রকলা। রেখারূপের বর্ণরূপের ও পরিকল্পনা—সমষ্টির সৃষ্টির রসবত্তাগৌরবে এগুলি আজকালকার অতি-আধুনিক পাশ্চাত্য রসকলার বিচারপদ্ধতির দিক দিয়েও খুব উচ্চ স্থান পাবার যোগ্য। বাঙলার পল্লীর সহজ সরল ধর্ম্মজীবনের উৎস থেকেই এগুলি স্বতঃউৎসারিত হয়েছে বলে এগুলিতে ভাবের এমন একটি আদিম তেজস্বিতা, সারল্য ও আধ্যাত্মিক এমন একটি রসগর্ভতা ও রসব্যঞ্জনশীলতা আছে যে আমাদের আধুনিক সহরের কৃত্রিম অনুকরণ ও বিলাসিতামূলক কলাশিল্পে সেটি খুব কমই দেখা যায়। বাঙলার নিজস্ব সংকৃষ্টির ধ্বংসাবশিষ্ট যে সকল রূপসৃষ্টির নিদর্শন আমাদের মাঝে এখনও বিদ্যমান রয়েছে এইগুলিকে দিয়ে আধুনিক বাঙলার আবালবৃদ্ধ বনিতার মন প্রাণকে আমাদের অভিসিঞ্চিত করে দিতে হবে। এবং তা করতে পারলেই আজকালকার বাঙালির প্রাণের ভিতর দিয়ে বাঙলার আসল ও আপন রূপ ফুটে উঠবে, যা অন্য প্রদেশের অথবা অন্য দেশের সৃষ্ট রূপবালীর অনুকরণ করে ফুটা অসম্ভব। বাঙলার এই নিজস্ব চিত্রশিল্পের পদ্ধতি কোন নাগরিক শিল্পীসঙেঘর সোসাইটিতে অথবা কলাভবনে আবদ্ধ ছিল না এবং আধুনিক বণিকতন্ত্র সভ্যতা-প্রণালীর অনুকরণে এগুলি জাতীয় জীবন থেকে বিশ্লিষ্ট ছিল না। কেবল এক পটুয়া জাতির সংখ্যাই বাঙলার গ্রামে গ্রামে ছিল অজস্র এবং চিত্রশিল্পের স্বাভাবিক চর্চ্চা তাতে করে জাতির মধ্যে অনির্বচনীয় ব্যাপকতা লাভ করতে পেরেছিল। জাতির গভীর প্রাণ-প্রকৃতির ও চিন্তাধারার এবং দৈনন্দিন জীবন প্রণালীর সঙ্গে ছিল এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেই জাতীয় প্রাণপ্রকৃতির ও চিন্তাধারার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যকে তাই এরা অতি সহজ ও সত্যরূপ তাদের চিত্রকলায় ফুটিয়ে

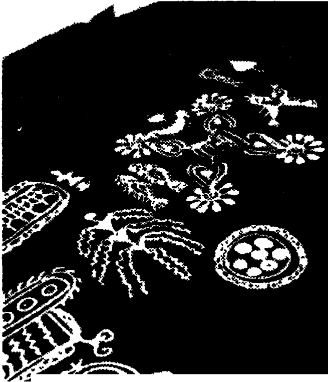
তুলতে পেরেছিল। এই পটুয়ারা ছিল পেশাদার চিত্রশিল্পী। কিন্তু এই সহস্র সহস্র পেশাদার পটুয়াশিল্পী ছাড়া বাঙলার পল্লীর অন্যান্য জাতির মধ্যেও নরনারী নির্বিশেষে চিত্রশিল্পের প্রতিভা ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান ছিল এবং এখনও আছে। এই সম্পর্কে পূর্ব্ববঙ্গের আচার্য এবং কুম্ভকার, পশ্চিমবঙ্গের সূত্রধর এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মালাকার জাতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল জাতির কি পুরুষ কি মেয়েদের মধ্যে চিত্রকলার একটি উচ্চাঙ্গের সহজাত প্রতিভা বর্ত্তমান আছে। আমাদের সহুরে শিক্ষিত লোক এবং নাগরিক শিল্পিগণ এদের দিকে অবজ্ঞার ভরে যে চেয়েও দেখেন না এটা সত্য; কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে যারা শ্রেষ্ঠ কলারসিক তাদের বিবেচনায় এগুলি যে আমাদের নাগরিক শিল্পের চেয়েও উচ্চ স্থান পাবার যোগ্য তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। এদের মধ্যে আছে রেখার ও রংএর ছন্দ বিন্যাসের সহজাত প্রতিভা, ভাবের শুচিতা ও গভীরতা, আদিম সারল্য ও তেজস্বিতা এবং কারিকরের ও মাল-মসলা প্রয়োগের সহজ প্রাঞ্জলতা। এ-সব গুণ আজকাল পাশ্চাত্য দেশের অতি আধুনিক রসকলাপদ্ধতির বিচারের দিক দিয়া নাগরিক শিল্পের কৃত্রিম অনুকরণমূলক রেখা বিন্যাসের ও রং-এর চাকচিক্য ও বিলাসিতাব্যঞ্জক প্রয়োগ কৌশলের চেয়েও বড় জিনিস।

পূর্ব্ববঙ্গের আচার্য্যগণ এখনও পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে যে সকল চালচিত্র এঁকে থাকেন সেগুলিতে পল্লী কলাপদ্ধতির উল্লিখিত গুণগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। পূর্বে এরা পূর্ব বাঙালার অশিক্ষিত মুসলমানদের জন্য 'গাজীর পট' নামে এক রকম জড়ানো পটও আঁকতেন। তাতে সুন্দর রংয়ের ও রেখার বিন্যাসে সাধারণ জনপ্রবাদমূলক ব্যাঘ্রের দেবতা বড়েখাঁ গাজীর নানাপ্রকার কীর্ত্তির ছবি আঁকা থাকত। রেখার অবলীলায়িত জোরাল বিন্যাসের ও বিশুদ্ধ উজ্জ্বল রং-এর ছন্দোবদ্ধ প্রয়োগের সবিশেষ কৌশল এগুলিতে পাওয়া যায়। আজকাল পূর্ব্ববাঙলার মেলা ইত্যাদিতে সাধারণত যে সকল গাজীর পট পাওয়া যায় সেগুলিতে আচার্য্যদের আঁকা পুরানো পটের মত চিত্রকলাকৌশল নেই। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মালাকাররা বিবাহ ইত্যাদি পর্ব্বের জন্য ঘড়া ও সরার উপরে যে সকল চিত্র এঁকে থাকে তাতেও রেখা ও রংএর প্রয়োগের এমন একটা সহজাত কৌশল লক্ষিত হয় যা সহুরে চিত্রকলায় দুর্লভ।

বাঙলার পল্লীবাসী ও পল্লীবাসিনীদের চিত্রকলা প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণে এবং নানা উৎসবাদি উপলক্ষে ব্যবহৃত সব জিনিসই তাঁদের এই সহজাত প্রতিভা অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে তাঁর তুচ্ছ জিনিসগুলিকেও সৌন্দর্য্যের গৌরবে পরিপূর্ণ করে তোলেন। রঙ্গপুরের মালাকারগণ সামান্য সোলার রঙ্গিন চালচিত্র এঁকেও সোলার কাঠামো তৈরি করে তাতে মনসার ছবি ইত্যাদি রঙ দিয়ে এঁকে যেরকম সুন্দর রূপসৃষ্টি করে যে তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম বাঙলার কুম্ভকারদের যে কেবল মাটির ভাস্কর্য্যে পারদর্শিতা আছে তা নয়; চিত্রকলার

প্রতিভাও ইহাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এখনো রয়েছে। আর কেবল কুম্ভকারজাতীয় পুরুষদের মধ্যে নয় মেয়েদের মধ্যেও। যশোর জেলায় চালচিত্রের জন্য কুম্ভকারগণ যে সকল রঙিন ছবি এঁকে থাকে সেগুলি বড়ই সুন্দর এবং লক্ষ্মীর সরা, লক্ষ্মীর ঘড়া ও বিবাহ ইত্যাদিতে সুচিত্রিত রঙিন সরা প্রস্তুত করতে এদের মধ্যে কি পুরুষ কি মেয়ে সকলেই বিশেষ পারদর্শী।

বাঙলার পল্লীর সর্ব্বশ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে চিত্র শিল্পের প্রতিভার বহুব্যাপকতার ও উৎকর্ষের প্রমাণ আমরা পাই মাটিতে, পিঁড়িতে ও ঘড়া ইত্যাদিতে সাদা এবং রঙিন আলপনা এবং দেয়ালে রঙিন চালচিত্র ও পদ্ম ইত্যাদির পরিকল্পনা আঁকার ভিতর দিয়ে। আমাদের সহুরে শিক্ষার ফলে আলপনা আঁকার প্রবৃত্তি ও কৌশল শিক্ষিতা মেয়েরা হারিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু এটা যে কত বড় একটা জাতীয় সম্পদ তা উপলব্ধি করবার ক্ষমতা আমাদের একবার হলে আলপনা আঁকার বহুব্যাপক চর্চ্চা শিক্ষাক্ষেত্রে, সামাজিক জীবনে ও পারিবারিক জীবনে আমাদের দেশে আবার জেগে উঠবে বলে আমি আশা করি। লীলায়িত রেখার অঙ্কন কৌশলের ও রসব্যঞ্জনাময় ছন্দোবদ্ধ বিন্যাসের দিক দিয়া এগুলি একটি অতি উঁচুদরের কলাসম্পদ।



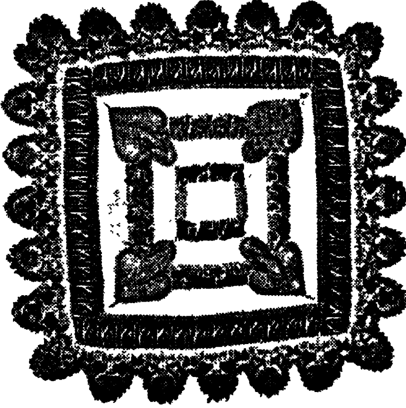
আলপনা (বীরভূম)

বিবাহ ইত্যাদি পর্ব্বে বরণ-কুলা ব্যবহারের প্রথা বাঙলার পল্লীজীবনে একটি অতি মনোরম জিনিস; যদিও আমাদের দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রথাটি আজকাল প্রায় লোপ পেতে বসেছে। এই তুচ্ছ বাঁশের তৈরি বরণ-কুলাগুলিকে বাঙলার পল্লীর মেয়েদের অসাধারণ কলা প্রতিভা যে কি অপরূপ সৌন্দর্যের আধার করে তোলে তা বাস্তবিকই একটি বিস্ময়ের জিনিস। যশোবের মিকসিমিল গ্রামের সত্তর বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা শ্রীমতী ক্ষীরোদকামিনী মিত্রের চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে আঁকা একটি অতি পুরাণো রঙিন বরণ-কুলা পাওয়া গেল। লীলায়িত রেখা ও বিচিত্র রঙ-এর নক্সার মনোরম ও নয়নাভিরাম পরিকল্পনার রসাত্মক সমন্বয় ও পূর্ণ বিন্যাসের দিক দিয়ে এটা একটি অপূর্ব্ব বস্তু। মেয়েরা কুলার ভিতরের দিকটায় একটা কাপড় লাগিয়ে তাতে মাটির একটা পাতলা প্রলেপ দিয়ে তার উপরে চিত্র এঁকে থাকেন।

বাঙলার পল্লীগ্রামের মেয়েদের কাঁথাশিল্পেও আমরা রেখাবিন্যাস ও বর্ণ প্রয়োগ কৌশলের অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাই। নিত্য ব্যবহার্য্য সামান্য জিনিসগুলিকে মানুষ আপন অন্তরের সহজাত রসানুভূতি ও রসব্যঞ্জনা প্রতিভার বলে যে কি চমৎকার সৌন্দর্য্যের

আধার করে তুলতে পারে, পল্লী মেয়েদের তৈরি কাঁথাগুলি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কাঁথাগুলির পাড়ে, কলকায়, পদ্মে ও কাঁথার গায়ে সন্নিবিষ্ট নানাপ্রকার কাহিনীব্যঞ্জক আকৃতিগুলির পরিকল্পনায় ও সমন্বয়পূর্ণ বিন্যাসে একটা শ্রেষ্ঠ সহজাত জাতীয় কলাপ্রতিভার পরিচয় আমরা পাই। পশ্চিম বাঙলার পটুয়াদের ও পূবর্ব বাঙলার আচার্য্য ও গণকদের প্রতিমা শিল্পের ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায় একটা উচ্চাঙ্গের কলাকৌশল এখনও বর্ত্তমান আছে। পল্লীর মেয়েদের নিজের হাতে পাথরের উপর খোদাই করা ক্ষীরের ছাঁচে ও আমসত্ত্বের ছাঁচেও আমরা বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ ও রসব্যঞ্জনামূলক পরিকল্পনার সহজাত প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় পাই।

এই যে বাঙলার পল্লীতে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের কৌশলের ব্যাপক নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে এটা একটা বহুমূল্য জাতীয় সম্পদ। এটা যে কেবল শিল্পের দিক দিয়ে একটা বহুমূল্য জাতীয় সম্পদ তা নয়, এটা আমাদের প্রাচীন জাতীয় সংকৃষ্টির আদিম তেজস্বিতার, সরলতার ও আধ্যাত্মিক রসগর্ভতা ও রসব্যঞ্জনাশীলতার একটি বিশিষ্ট পরিচায়ক। বাঙলার পল্লীর রসকলার প্রতিভাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই কারণ উপরোক্ত গুণাবলীর দিক দিয়া ইহা আধুনিক শিল্পকলার চেয়েও মূল্যবান ও জাতির পক্ষে সবিশেষ কল্যাণকর। এই পল্লী শিল্পকলাকেই করতে হবে আমাদের দেশের প্রত্যেক স্কুলে শিক্ষার সোপান ও ভিত্তি এবং তা করতে পারলেই আমাদের জাতীয় প্রতিভা এবং জাতীয় চরিত্রের বিশুদ্ধ ও শক্তিময় বিকাশ আবার সম্ভবপর হবে; এবং আমাদের আধুনিক সহুরে জীবনে যে কৃত্রিমতার, বিলাসিতার, রুচিবিকৃতির এবং ধর্মহীনতার ও নীতিহীনতার বিকট মূর্ত্তি মাথা তুলে উঠছে তার নিরাকরণ করে জাতির জীবন ও চরিত্রকে আবার সহজ সরল তেজীয়ান ও বিশুদ্ধ করে আমরা তুলতে পারব। আর কেবল তা নয় একমাত্র এই জাতীয় পল্লী-শিল্প প্রতিভার বিকাশের ভিতর দিয়েই আমাদের পণ্যশিল্পের সম্পূর্ণ ও সুন্দর বিকাশ সম্ভব হবে এবং সেই পণ্যশিল্পকৌশলের বিকাশের ভিতর দিয়ে আমাদের দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হবে।


বেতন কাঁথা (রাজসাহী)

বাঙলার পল্লীর শিল্পকলার এই যে উচ্চস্থান নির্দ্ধারণ করবার জন্য আমি কিছুকাল থেকে নানা রকম চেষ্টা করছি তার দিকে আমাদের দেশের অনেক নাগরিক শিল্পী এবং কলারসিক ও শিক্ষিত লোকেই অবিশ্বাস ও তাচ্ছিল্যের ভাব ব্যক্ত করেছেন। সম্প্রতি

আমি বর্ত্তমান ভারতীয় নাগরিক শিল্পের প্রথম এবং প্রধান প্রবর্ত্তক এবং ভারতীয় নাগরিক কলা-শিল্পীদের গুরুস্থানীয় শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ শ্রীযুক্ত ই. বি. হ্যাভেল মহাশয়ের নিকট হইতে এই সম্পর্কে যে পত্র পেয়েছি তা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম (শ্রীযুক্ত হ্যাভেলের পত্র) ঃ

'প্রিয় দত্ত মহাশয়,

'আপনার ২৫শে মে তারিখের চিঠি এবং তৎসহ প্রেরিত আপনার লোকশিল্প-প্রদর্শনীর বিবরণী ও অন্যান্য পুস্তিকাগুলি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

'বাঙলার নিজস্ব শিল্পকলার পুনরভ্যুত্থানের জন্য আপনি যে কাজ করিতেছেন, তাহাতে আপনাকে আমরা সম্পূর্ণ সহানুভূতি জানাইতেছি। আপনি এই বিষয়ে যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন ও যে সকল কার্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়া আমি মনে করি। রস-শিল্প-শিক্ষার ভিত্তিসংগঠন কার্য্যে লোক-শিল্পের জীবন্ত পদ্ধতির মূল্য অপরিসীম। আপনি এই বিষয়টির একেবারে গোড়ায় হাত দিয়াছেন। আমি জানি, এই কাজে সফলতা লাভ বহু সময়-সাপেক্ষ ও বহু কষ্টসাধ্য; কিন্তু ইহা যে একান্ত কর্ত্তব্য কাজ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

'বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রসকলা-পদ্ধতির সংমিশ্রণ করিয়া যাঁরা এক একটা মিশ্র পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিতে চান বা করেন, তাঁদের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যের ছোঁয়াচ থাকে। আমি এই মিশ্র পদ্ধতির কিছুমাত্র সমর্থন করি না; কারণ ইহাতে উন্নতির নামে বাস্তবিক পক্ষে রসকলার মূল উৎসমুখটিই শুকাইয়া দেওয়া হয়। যে সকল রসকলা পণ্ডিত আপন আপন স্বার্থ-সিদ্ধির অনুসরণে ব্যস্ত তাঁরা হয়ত আপনার এই নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার যথেষ্ট সমাদর প্রদান না-ও করিতে পারেন, কিন্তু আপনি এই কাজের মধ্যেই আপনার সম্যক্ পুরস্কার পাইবেন।'

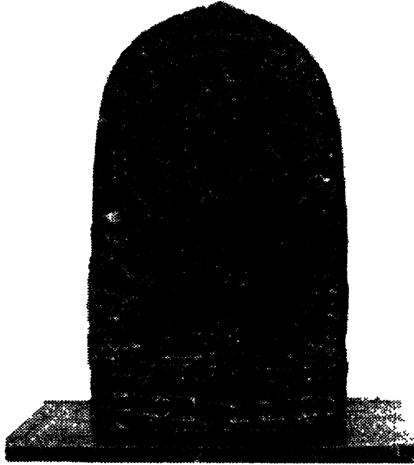
'ভারতের পল্লীর শিল্প-ধারাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিলেই ভারত আবার ধনে, স্বাস্থ্যে ও আনন্দে ভরিয়া উঠিবে।'

'পুনরায় ভারতবর্ষে আসা আমার আর সম্ভবত ঘটিয়া উঠিবে না। তবে হয়ত আপনি আবার কোনদিন ইউরোপে বেড়াইতে আসিবেন এবং ততদিন যদি আমি বাঁচিয়া থাকি তবে তখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ ও ভাব বিনিময় করিয়া আনন্দ লাভ করিব। যতদিন তা না হয় ততদিন আপনি নিশ্চিত জানিবেন, যে যাহাতে আপনার কাজের সর্ব্বদা সংবাদ রাখিতে পারি এবং প্রতিনিয়তই ইহার উত্তরোত্তর সাফল্যের খবর শুনিতে পাই, এই আশায় থাকিব।'

অক্সফোর্ড
২৯শে জুন, ১৯৩২

ভবদীয়—
ই. বি. হ্যাভেল

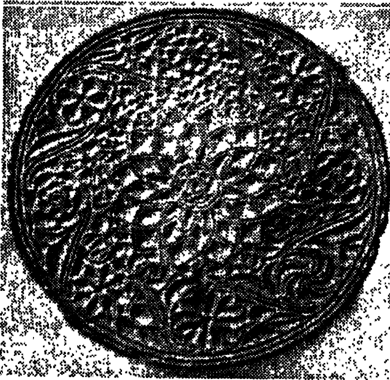
বাঙলার পল্লীর রসকলা পদ্ধতির জীবন্ত ক্রমচর্য্যাগুলিকে যাঁরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখে থাকেন শ্রীযুক্ত হ্যাভেলের উপরোক্ত মত পাঠ করে তাঁদের মনোভাবের পরিবর্তন হবে বলে আমি আশা করি। মোট কথা, বাঙলার প্রতিভার পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টায় আমাদের দৃষ্টি বিন্যস্ত করতে হবে—প্রথমত এবং প্রধানত বাইরের বিশ্বের দিকে নয়—বাঙলার নিভৃত পল্লীর কোলে এখনও যে কলাসম্পদ্ লুক্কায়িত আছে তার দিকে। বাঙালিকে মনে প্রাণে চরিত্রে এবং কলাপদ্ধতিতে প্রথমে আবার হতে হবে খাঁটি বাঙালি। বিশ্বের দশদিক থেকে আলো হাওয়ার ও অনুপ্রেরণা আহরণ করবার সময় হবে তারপর।



মারিচী, স্তূপ গর্ভ, পাথর, দশম শতাব্দী
রাজনগর, বীরভূম

বাংলার গণ-শিল্প

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা যেমন বাঙালী জাতির স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশের ভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তেমনি শিল্পের ক্ষেত্রেও ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য আছে, স্বকীয় ধারা আছে এবং সেই ঐতিহ্যের বাহন স্বতন্ত্র শিল্প-ভাষারও সৃষ্টি হইয়াছে। বহির্জ্জগতের সঙ্গে জাতির যোগাযোগের ফলে, এই শিল্প-ভাষারও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধিত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা দল-বিশেষের স্বেচ্ছানুশাসনের বলে, এই স্বতন্ত্র শিল্প-ভাষাকে উন্মুলিত করিয়া ফেলিয়া তাহার স্থলে দেশের ঐতিহ্যের নিঃসম্পর্কিত বিভিন্ন বৈদেশিক শিল্পধারার একটা প্রাণহীন যান্ত্রিক সমাবেশ-রীতিকে বসাইয়া দেওয়া চলিবে না, বা প্রাচীন শিল্প-রীতির পুনঃপ্রবর্ত্তন দ্বারাও এই জীবন্ত শিল্প-ভাষার স্থান পূরণ করা চলিবে না।

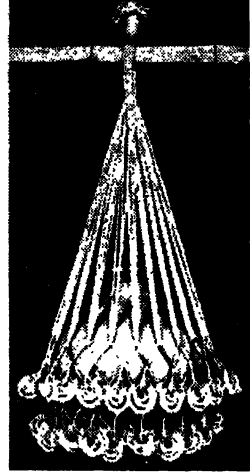


পাথরের আমসত্ত্বের ছাঁচ (যশোহর)

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা, বাঙ্গালী, মারাঠী, গুজরাটী—আজ যেমন স্ব স্ব সাহিত্যভাষার চর্চ্চা করিতেছে তেমনি স্ব স্ব শিল্প ভাষারও সন্ধান ও চর্চ্চা আজ তাহাদের করিতে হইবে। তাহাদের এই স্বকীয় শিল্প-ভাষা পল্লীপ্রান্তে জনসাধারণের মধ্যে এখনও আত্মগোপন করিয়া আছে, সেই ভাষাকে আবিষ্কার করিয়া, অবজ্ঞা হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহার মধ্য দিয়া আপন শিল্প-প্রতিভাকে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে প্রকাশ করিতে হইবে। মাতৃস্তন্যের সহিত

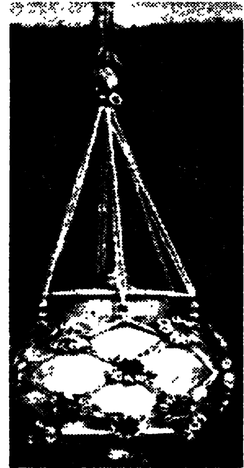
▸▸ *বাংলার শক্তি, আশ্বিন ১৩৪৬*

আপন শিল্পভাষার স্বাদও যেন সে গ্রহণ করিতে শিখে—এইভাবেই বাঙ্গালী প্রকৃত বাঙ্গালী তথা প্রকৃত ভারতীয়, গুজরাটী প্রকৃত গুজরাটী তথা প্রকৃত ভারতীয়; মারাঠী প্রকৃত মারাঠী তথা প্রকৃত ভারতীয় হইয়া উঠিবে এবং এই ভাবে তাহারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিবে। বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে পরস্পরের বা প্রাচীন যুগের শিল্প ভঙ্গিমা নির্বির্বচারে অনুসরণ করিয়া শিল্প সংকলনের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা যে কেবল বিভিন্ন প্রদেশের স্বকীয় শিল্পসৃষ্টি-প্রতিভাকে ব্যাহত করিতেছে, তাহা নয়, জাতীয় চরিত্রকেও ক্ষুণ্ণ করিতেছে। শিল্পকলা অতি সূক্ষ্মভাবে জাতীয় চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করে, শিল্প-কলায় যদি কৃত্রিমতা স্থান পায়, তবে সেই কৃত্রিমতা ক্রমে জাতীয় চরিত্রেও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। সেক্সপীয়ার ইউরোপের সকল দেশ হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু একথা কি কল্পনাও করা যায় তিনি নিজের মাতৃভাষা ইংরেজী ছাড়িয়া ইটালীয়ান, নরওয়েজীয়ান, গ্রীক বা লাটিনে আপনার প্রতিভার প্রকাশ করিতেছেন? তাঁহার সাহিত্য বিশ্বকে বিমোহিত করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার আত্মপ্রকাশের বাহন ছিল তাঁহার নিজস্ব ও স্বজাতির ভাষাই। আধুনিক ভারতের শিল্পীরাও যদি তাঁহাদের স্বদেশের ভাষা গ্রহণ না করেন, তবে শ্রেষ্ঠ শিল্প-সৃষ্টি কখনও তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব হইবে না। রবীন্দ্রনাথ যদি বৈষ্ণব কবিদের ভাষাকে অগ্রাহ্য করিতেন, বাউল, ভাটিয়াল প্রভৃতি পল্লীসঙ্গীতের সুর ও ভাষায় আপনার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া না লইতেন, তবে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনার সহিত আজ আমাদের পরিচয় ঘটিত না। তিনি যদি আপন বাংলা ভাষা ত্যাগ করিয়া মণিপুরী, মালাবারী ও গুজরাটী বা সংস্কৃত, পালি ও ফরাসী মিশ্রিত কোন ভাষায় নিজের ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি সম্ভব হইত কি? অথচ শিল্প-কলার ক্ষেত্রে আজ এই ব্যাপারই চলিতেছে। মালাবার, মণিপুরী, লক্ষ্ণৌ, গুজরাট, জাভা, বালী হইতে নৃত্যপদ্ধতি সংকলন করিয়া বাঙ্গালায় চালানোর চেষ্টা হইতেছে, প্রাচীন গুহা হইতে এবং রাজপূত ও মোগল দরবারী চিত্র হইতে চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি, মাদুরা, মহাবলীপুরম, এলোরা, আগ্রা ও দিল্লী হইতে বাস্তুবিদ্যা বাংলায় আমদানী করা হইতেছে। ইহার ফলে চিত্র ও নৃত্যকলাকে আমরা প্রত্নতত্ত্বে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছি লাস্যলীলা ও কমনীয়তাই শিল্পের একমাত্র অঙ্গ হইয়াছে, কৃত্রিমতা, অতিলালিত্য ও অতীন্দ্রিয়তার এক অদ্ভুত সম্মিলন সাধন করিয়া আমরা এক বিচিত্র "প্রাচ্য" কলার সৃষ্টি করিতেছি। বাংলার পল্লীতে নৃত্যকলার যে প্রাণবন্ত ধারা আজও প্রবাহমান, তাহাতে



পাটের শিকা
(পূবর্ববঙ্গ)

কথাকলি-নৃত্যের দুর্বোধ্য মুদ্রা ও মণিপুরী-নৃত্যের অতি কোমলতা নাই। তাই বাংলার স্বকীয় নৃত্যধারা বর্জ্জন করিয়া কথাকলি ও মণিপুরী নৃত্যধারা গ্রহণের চেষ্টা চলিয়াছে। তার ফলে, এক নিরর্থক শিল্প-সমন্বয়ের সৃষ্টি হইতেছে, প্রদেশে প্রদেশে যে সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহার ভিত্তিভূমি ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছে এবং আমাদের স্বকীয় প্রতিভা ও সৃজনক্ষমতা বিনাশের পথে চলিয়াছে। আমি বলি, যদি এই বিচিত্র প্রাচ্যকলা সংকলনের ধারা ইউরোপ আমেরিকার স্তুতি ও অর্থ অর্জ্জন করার লক্ষ্য হয়, তবে তাহা যত ইচ্ছা করুন, ক্ষতি নেই, কিন্তু ইহাকেই ভারতীয় শিল্পকলার আদর্শ বলিয়া যুবসমাজের নিকট তুলিয়া ধরিয়া ও ঐ ধারা অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া জাতির আত্মাকে, সৃষ্টি-প্রতিভাকে বিনাশের পথে লইয়া যাওয়া দেশের পক্ষে ঘোর অমঙ্গলকর।



এই প্রত্নতত্ত্বানুসারী, কৃত্রিম কমনীয় শিল্পধারার সহিত ভারতের গণ-শিল্পের কোন যোগ নাই। বাংলা দেশের কথা বলিতে পারি বাংলার স্বকীয় শিল্পধারার মধ্যে পাই একটা স্বতঃস্ফূর্ত্তি, সহজ কাব্যময়তার সরল প্রকাশ, এবং ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে নিবিড় যোগ—তাহার চিহ্নও আমাদের পুঁথিপড়া অর্থহীন নাগরিক শিল্পধারার মধ্যে নাই। অজ্ঞানে হউক বা অবজ্ঞায় হউক বাংলার স্বকীয় শিল্পভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচর্য্যার অভাবে আমাদের নাগরিক শিল্পধারা মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রয়োজনে লাগিতে পারে, কিন্তু তাহা শিল্পসৃষ্টির বাহন হইতে পারে না, তাহার মধ্য দিয়া জাতির আত্মার প্রতিভা আপনার বিকাশপথের সন্ধান পাইতে পারে না।

শিক্ষিত সমাজের অবজ্ঞায় ও অনাদরে আমাদের স্বকীয় শিল্পধারা ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, মহামূল্য শিল্প-নিদর্শনাবলী প্রায় লোপ পাইয়া আসিতেছে। জাতির প্রতিভার বিকাশের এই পথচিহ্নগুলি একবার সম্পূর্ণ লোপ পাইলে ভবিষ্যতে জাতিগঠনের, জাতীয় আদর্শ ও চরিত্র গঠনের, জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি বিস্তারের সমস্ত উপাদানই বিনষ্ট হইবে; শত বৎসরেও সেই লুপ্ত পথ আমরা আর সন্ধান করিয়া পাইব না—যেমন করিয়া ভারতের গ্রাম-সংস্কার লোপের ফলে আজ আমরা দিশাহারা হইয়াছি, সমাজ-গঠনের কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমি বাংলার যে স্বতন্ত্র শিল্পভাষার কথা বলিয়াছি, আমার এই প্রবন্ধাবলীর সহিত প্রকাশিত চিত্রগুলির দ্বারা তাহা আশা করি স্পষ্টতর হইয়াছে। এগুলি এতদিন অবজ্ঞাত হইয়া ছিল, কিন্তু আমি আশা করি, বাংলা ভাষার দাবী যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে, তেমনি বাংলার শিল্প-কলার দাবীও ক্রমশঃ গৃহীত হইবে এবং শিক্ষিত সমাজ এই শিল্পনিদর্শনগুলিকে বিনাশের হাত হইতে

উদ্ধার করিবেন। এই শিল্পধারার ভিত্তির উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় শিল্প-কলা গঠিত হইবে, তাই শিল্পধারার মধ্যেই বাংলার স্বকীয় প্রতিভা স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। বাংলার এই শিল্পধারার মধ্যে ভারতের প্রাক-বৌদ্ধ, এমন কি প্রাক্-আর্য্য শিল্পের ধারাই প্রবাহমান হইয়া আসিতেছে—ইহা বাহিরের ভাবধারামিশ্র প্রভাব হইতে মুক্ত—ইহার মধ্যে যেমন আছে আদিম শিল্পধারার অকৃত্রিমতা, সহজ বলিষ্ঠতা, তেমনি আছে স্বকীয় সৌন্দর্য্য, বলিষ্ঠ-রেখা, বর্ণ ও গতির অনুরূপ সামঞ্জস্য—অনাবশ্যক অলঙ্কার ইহার মধ্যে নাই। এই শিল্পধারা সীমাবদ্ধ একটা অভিজাত শিল্পী-গোষ্ঠীর বিলাস মাত্র নহে, ইহা বাংলার সকল নরন র সম্পত্তি, বাংলার গণ-জীবনের অনাবিল প্রাণধারার ইহা সহজ সাবলীল, আনন্দময় প্রকাশ।



ওয়ার কাঁথা, উনবিংশ শতাব্দী (যশোহর)

ভারতের সংস্কৃতিতে গণ-শিল্পের স্থান

[গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ বাঙলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বাঙলার সংস্কৃতির ও শিল্পের যথার্থ রূপের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ আমার হইয়াছে এবং তাহার ফলে বাঙলার শিল্পের যথার্থ প্রকৃতি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে তাহার যথার্থ স্থান সম্বন্ধে আমি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা বিশেষ করিয়া কলিকাতা ইউনির্ভাসিটিতে প্রদত্ত দুইটি বক্তৃতায় এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলাবিষয়ক পত্রিকাগুলির স্তম্ভে কলা-রসিকদের নিকট বুঝাইবার জন্য গত দশ বৎসর কাল চেষ্টা করিতেছি।

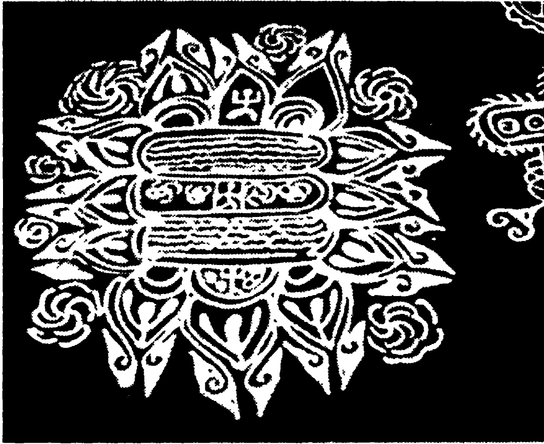


মাটির পুতুল

সংস্কৃতি ও শিল্পের যথার্থ প্রকৃতি এবং বিশেষ করিয়া বাঙলা সংস্কৃতি ও শিল্পের বিশেষ স্থান সম্বন্ধে আমার উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিকে আজ বাঙলা ভাষায় বাঙলার সমগ্র জাগ্রত গণ-জাতির মনোরাজ্যে উপস্থাপিত করিবার সময় আসিয়াছে এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধ-ধারায় ইহারই চেষ্টা করা হইবে।]

একথা এখন সর্ব্ববাদি-স্বীকৃত যে, চরিত্রবৈশিষ্ট্যে প্রত্যেক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি হইতে স্বতন্ত্র—এই সব চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যুগযুগাগত বংশধারার বিভিন্নতা ও পরিমণ্ডলের বিচিত্রতারই ফল। একথাও সকলে মানিয়া লইয়াছেন যে, স্বতন্ত্র ও বিচিত্র ব্যক্তিসত্তাকে একই ছাঁচে ঢালিয়া একটা প্রাণহীন পুনরাবৃত্তির সৃষ্টি করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে জ্ঞানার্জ্জনের সম্যক সুযোগ দানের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যে আত্মিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে, তাহার সন্ধান লইয়া তাহাকে জাগবিত ও বিকশিত করিয়া তোলাই শিক্ষা বিধির

প্রকৃত লক্ষ্য। এই আত্মিক বৈশিষ্ট্য, এই চরিত্র-স্বাতন্ত্র্য যেমন বিভিন্ন মানুষে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে, বিভিন্ন জাতি মহাজাতির বেলাতেও সেইরূপ স্বতন্ত্র আত্মিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন বিশিষ্ট জাতি "ভগবানের মনোনীত জাতি" এই মর্ম্মে এক প্রকার মতবাদ এক সময়ে প্রচলিত ছিল। এই মতবাদীরা বিশ্বাস করিতেন যে, কোনও একটা বিশেষ জাতির মধ্যেই মানবীয় সকল গুণাবলীর একত্র সমাবেশ ঘটিয়াছে এবং এই তথাকথিত শ্রেষ্ঠতার বলে তাহাদের অভিপ্রায় ও আদর্শ অন্য সকল জাতির স্কন্ধে আরোপ করিতে তাহারা অধিকারী। এই মতবাদ এখন আর কেহ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়। পক্ষান্তরে হাবর্বার্ট স্পেন্সরের মতবাদই আজ গৃহীত হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, একান্ত স্বাতন্ত্র্যের



আলপনা (দক্ষিণবঙ্গ)

সহিত পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ নির্ভরতা ও মিলন ঘটানই হওয়া উচিত মানবীয় সভ্যতার মূল লক্ষ্য—একই সময়ে চরম স্বাতন্ত্র্যের ও পরম ঐক্যের পথে চলাই সভ্যতার প্রকৃত বিবর্ত্তন-ধারা। এই মতবাদই যে সত্য, তাহা আজ ক্রমশঃ স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ, বিভিন্ন জাতি ও মহাজাতিকে বৈচিত্র্যহীন প্রাণহীন একটা ঐক্য-ধারার প্রবর্ত্তিত করাই মানবসংস্কৃতির প্রকৃত লক্ষ্য নহে; প্রত্যেক জাতি তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত ও সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবে, ইহাই মানব-সংস্কৃতির লক্ষ্য।

প্রত্যেক জাতির এই যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছি, সে বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাইব কোথায়? মানুষের বিভিন্ন কর্ম্ম ও প্রচেষ্টাকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখিতে পারি—যুক্তি, কল্পনা ও অনুভূতি (Reason, Imagination and Intuitional experience) এই তিন ভাগের মধ্যে যুক্তির অর্থাৎ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন কিছুকে আমরা কোন

জাতির বিশিষ্টতা বলিয়া মানিতে পারি না। কিন্তু কল্পনা-ভাবনার ক্ষেত্রে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির পার্থক্য অনেক এবং অনুভূতির ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ রূপ-কল্পনার ক্ষেত্রে এই পার্থক্য প্রভূত। এই জন্যই দেখি, কোন জাতিবিশেষের স্বকীয় সম্পত্তিমূলক কোন বিশিষ্ট বিজ্ঞানধারা নাই, বিজ্ঞান-জগতে সকল জাতিই সমান সুযোগ পাইলে সমান দান করিতে পারে। পক্ষান্তরে, দর্শনের ক্ষেত্রে দেখি, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। বেকন ও হার্বার্ট স্পেন্সার, কোঁৎ ও হেগেল বিভিন্ন দেশের স্বতন্ত্র জাতীয় প্রতিভার পরিচায়ক, সেইরূপ বেদান্ত-দর্শনও ভারতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য-দ্যোতক। প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র সত্তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় অনুভূতির ক্ষেত্রে এবং রূপ-কল্পনার ক্ষেত্রে। এই জন্যই অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা রস-কলার মধ্যেই এক একটা জাতি তাহার আত্মার সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারে, আত্ম-প্রকাশের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র পায় এবং বিশেষ করিয়া তাহার মধ্য দিয়াই বিশ্ব-সংস্কৃতিগত আপনার স্বকীয় অর্ঘ্য নিবেদন করিতে পারে।

আমাদের আলোচনায় ইহা সম্যক প্রতীয়মান হইয়া থাকিবে যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতিতে জাতিতে কোন পার্থক্য না করা গেলেও স্বকীয় জীবন-দর্শন ও বিশিষ্ট রস-কলার মধ্য দিয়া জাতি তাহার স্বকীয়তার প্রকাশ করিতে পারে। এবং বিশ্ব-সংস্কৃতিতে জাতির দান পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্যই প্রত্যেক জাতির কর্ত্তব্য, স্বকীয় জীবন-দর্শন ও রস-কলার চর্চা ও পূর্ণতা সাধন করা।

একথার অর্থ এ নয় যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতিতে জাতিতে কোন যোগাযোগ-সাধনের প্রয়োজন নাই বা একের প্রভাব অন্যের উপর পড়িবার, একের নিকট অন্যের শিখিবার কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু ব্যষ্টির ক্ষেত্রে যেমন, সমষ্টির ক্ষেত্রেও সেইরূপ—এক জাতি যদি অন্য জাতির প্রভাবে পড়িয়া নিজের জাতীয় সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ হারাইয়া বসে, তবে তাহার অস্তিত্বের আর কোনও সার্থকতা থাকে না, জগতের দৃষ্টিতে সে হীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু যে জাতি বীর্য্যবান, সে পরকীয় সংস্কৃতির কাছে নিজেকে হারাইয়া ফেলে না, তাহা হইতে রস গ্রহণ করিয়া নিজের স্বকীয় সত্তাকেই পরিপুষ্ট ও মহত্তর করিয়া তোলে।

বর্ত্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতার বিস্তার ও যানবাহনযোগে বিভিন্ন জাতির পরস্পর যোগাযোগের ফলে জীবনে বস্তুতন্ত্রের দিকেই আমরা বেশি জোর দিতেছি, আত্মার সম্পদের কথা বিস্মৃত হইতেছি;তাহার ফলে জাতীয় আত্মার বৈশিষ্ট্যের কথা চাপা পড়িয়া যাইতেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ইহার ফলে বিশ্বমানবেরই ক্ষতি। এই যান্ত্রিক, ব্যবসায়াত্মক, বস্তুপ্রধান মনোবৃত্তির ফলে আমাদের সংস্কৃতি কৃত্রিম হইয়া পড়িতেছে, সহজ সরসতা হারাইয়া ফেলিতেছে—যন্ত্র-পূর্ব্ব যুগের সংস্কৃতিকে যে সরল সহজ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বীর্য্যের দেখা পাই, তাহা লোপ পাইতেছে। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই দেখি, যান্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতা যখন চরমে পৌঁছায়, তখন তাহার পূর্বতন সহজ

সরলতা ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশের যুগে ফিরিয়া যাইবার জন্য ও তাহার যুগযুগাগত জাতীয় বৈশিষ্ট্য পুনরায় লাভ করিবার জন্য একটা আকুতি আসে।

জাতীয় সত্তার এই নব উদ্বোধনেই গণ-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা। জাতির বিশিষ্ট আশা-আকাঙক্ষার ও বিশিষ্ট জীবনদর্শনের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ গণশিল্পের মধ্যেই দেখিতে পাই। একটা বিশিষ্ট পরিমণ্ডলের ও চিরাগত সংস্কৃতি-ধারার মধ্য দিয়া বিকশিত জাতির যে ছন্দ ও রস, ভাষা ও কল্পনা ভাব ও ঐশ্বর্য্য—তাহা রস-কলার ভাষায় পরিপূর্ণ প্রকাশ লাভ করে সেই জাতির স্বকীয় গণ-শিল্পের মধ্যে। ঐতিহাসিক কোন কারণে বা যান্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতার প্রসারে, বা ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি র একান্ত প্রভাবে যখন জাতির স্বকীয় সংস্কৃতির ধারা বিশুষ্ক হইয়া পড়ে, আপন সত্তার সহিত জাতির যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়, তখন এই গণ-শিল্পের পুনশ্চর্চ্চার দ্বারাই জাতি আপন সত্তা ও সংস্কৃতিকে পুনরায় লাভ করে।

প্রত্যেক জাতির একান্ত কর্ত্তব্য, তাহার জাতীয় সত্তার ও বৈশিষ্ট্যের সন্ধান লইয়া শিক্ষা ও সমাজবিধির মধ্য দিয়া সেই বিশিষ্টতার সম্পূর্ণ বিকাশসাধন করা। গণ-শিল্পের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান লাভ করা সম্ভব।

এ পর্য্যন্ত রস-কলাকে আমরা জাতীয় সত্তার আত্ম-প্রকাশের ভাষা হিসাবেই বিচার করিলাম। আর এক দিক দিয়াও জাতীয় রস-কলার বিচার চলিতে পারে। আপন জাতির সত্তার বহিঃপ্রকাশের উৎস-পথ এই রস-কলার ছন্দ-তরঙ্গের মধ্যেই জাতি আবিষ্কার করে। স্বকীয় রস-কলার পথেই জাতির সৃজন-কল্পনা ও সৃজন-প্রতিভার স্ফূর্ত্তি। অন্য জাতির রস-কলার অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া কোন জাতির সৃষ্টি-প্রতিভা কখনও বিকাশলাভ করিতে পারে না।

গণ-শিল্পের মধ্যেই জাতির স্বকীয় সৃষ্টি-প্রতিভার উজ্জীবন-শক্তির উৎস নিহিত হইয়া আছে। কারণ এই গণ-শিল্প জাতির একান্ত নিজস্ব বস্তু। বাহিরের প্রভাব হইতে মুক্ত জাতির আত্মবিকাশের প্রয়াস হইতেই এই গণ-শিল্পের ধারার উদ্ভব। সুতরাং জাতির সৃষ্টি-প্রতিভার নবোন্মেষ সাধন করিতে হইলে আমাদের এই গণ-শিল্পের অসীম প্রাণধারারই সন্ধান লইতে হইবে। এই পবিত্র উৎসেই আমরা জীবন-রসের সন্ধান লাভ করিব।

অপর একদিক দিয়াও রস-কলার বিচার চলিতে পারে। যে আনন্দ-রসের অভাবে মানুষের সত্তা স্থির থাকিতে পারে না, সমস্ত প্রাণশক্তির উৎস যে আনন্দ—কৃত্রিমতার ও আত্ম-ভাবনার (Self-consciousness) প্রভাবে বিকৃত শিক্ষার প্রভাবে বা ধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার বিকারের ফলে সেই আনন্দের স্পর্শ অনেক সময় আধুনিক শিক্ষিত শিল্পীর রচনায় পাওয়া যায় না। আধুনিক বাংলার শিক্ষিত সমাজেও তাই সহজ সরল আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশের অভাব ঘটিয়াছে দেখিতে পাই। কিন্তু সর্ব্বদেশেই নিরক্ষর অথবা অপেক্ষাকৃত নিরক্ষর জনসমাজের মধ্যে দেখি, এই কৃত্রিমতা প্রবেশলাভ করে নাই এবং

তাহার ফলে দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব অভিযোগের মধ্যেও তাহাদের জীবনে ও শিল্পরচনার সহজ শিশুসুলভ আনন্দের পরিচয় পাই। একটা জাতি যখন তাহার সহজ আনন্দধারা হারাইয়া ফেলে, তখন তাহা ফিরিয়া পাইতে পারে এই গণ-শিল্পের মধ্য দিয়া।

অভিসংস্কৃত সমাজের শিল্পে সকল দেশেই লক্ষ্য করি একটা অতি-সৌকুমার্য্যের ভাব, একটা কৃত্রিমতা, আত্মভঙ্গিমা ও নিয়ম-বন্ধনের একান্ত দাসত্ব। কিন্তু গণ-শিল্পের মধ্যে সর্ব্বত্রই দেখি সহজ পবিত্রতা, বীর্য্য ও প্রাণের সাড়া—একটা সহজ সরল গতি। এই গণ-শিল্প যুগে যুগে জাতির জীবন ও শিল্পকে নবযৌবন ও নবপ্রাণের সন্ধান দিয়া আসিতেছে।



বরিশালের মাটির মনসা ঘট

ভারতের সংস্কৃতিতে বাংলার গণ-শিল্পের স্থান

লোকশিল্পের স্থান ও শিল্পের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে প্রকাশিত দুইটি প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা একজন ভাববিলাসী বাঙালীর ভাবালুতা বলিয়া অন্যের নিকট মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহারা ইংরেজ জাতিকে তো স্বপ্ন-বিলাসী বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারবেন না—তাই একজন সেই প্রখ্যাতনামা ইংরেজপুরুষের উক্তি এখানে আমার মতের স্বপক্ষে উদ্ধৃত করিতেছি।

৩০ বৎসর পূর্বে সেসিল শার্প (Cecil Sharp) ইংল্যণ্ড ও তাহার শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে কি বলিতেছেন শোনা যাক ঃ—

"আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি বর্ত্তমানে অত্যন্তই বিশ্বমুখীন; এই পদ্ধতিতে মানুষ ইংরেজ হইয়া গড়িয়া উঠে না, হয় বিশ্বমানব। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন ইংরেজের। এ অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে ইংরেজ জাতির যাহা একান্ত ও বিশিষ্ট সম্পদ প্রত্যেক ইংরেজ জনক-জননীর সন্তানকে তাহার অধিকার দিতে হইবে, তাহার ধারায় বাড়িতে দিতে হইবে, ইহার মধ্যে প্রধান সম্পদ মাতৃভাষা। ইহার বাক্যসম্পদ, ইহার ব্যাকরণরীতি, ইহার গঠন—সবই জাতির বিশিষ্টতায় মণ্ডিত, জাতির বিশিষ্ট ভাবধারার ধারক ও বাহক এই ভাষা। ইংরেজ যেমন ফরাসী ও জার্ম্মান হইতে স্বতন্ত্র—ইংরেজের ভাষাও তেমনি ফরাসীর বা জার্ম্মানের ভাষা হইতে পৃথক। আয়র্লণ্ডের দেশপ্রেমিকগণ এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন। এইজন্য তাহারা আইরিস ভাষার পুনশ্চর্চ্চা সম্বন্ধে এত উদ্যোগী।



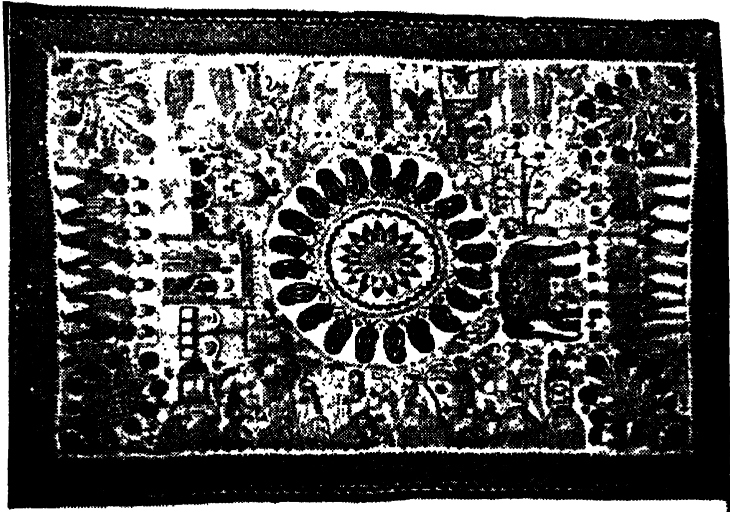
কাঁচামাটির পুতুল (ফরিদপুর)

▸▸ *বাংলার শক্তি, ভাদ্র ১৩৪৬*

"তার পরে আছে ইংরেজ জাতির বিশিষ্ট উপকথা, লোককাহিনী, প্রবাদবাক্য আছে তাহার স্বতন্ত্র ক্রীড়াকৌতুক ও নৃত্য। এই সকলের উপরে ইংরেজ সন্তানের জন্মগত অধিকার এবং এই জাতীয় সম্পদের প্রভাব হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখা কেবল অন্যায়ই নয়, অসঙ্গতও বটে। "ইহা ছাড়া আছে আমাদের জাতির নিজস্ব লোকসঙ্গীত অরণ্যপুষ্পের ন্যায় যে সঙ্গীত আমাদের দেশবাসীর অন্তর হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক ইংরেজ সন্তান যদি তাহার ওই সকল জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সহিত শৈশব হইতে পরিচয় সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার দেশ ও দেশবাসীর সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইবে, প্রীতির যোগ বৃদ্ধি পাইবে, দেশ ও দেশবাসীর সহিত তাহার যে নিগূঢ় আত্মীয়তার সম্পর্ক, তাহা সে অনুভব করিতে শিখিবে এবং প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক হইয়া উঠিবে।

ইংল্যাণ্ডের লোকসঙ্গীতের পুনরাবিষ্কারের ফলে ইহার ভিতর দিয়া দেশকর্ম্মী ও শিক্ষাব্রতীগণ তাঁহাদের কর্ম্মধারার সহায়ক নূতন পথ পাইবেন। বিদ্যালয়ে লোকসঙ্গীতের প্রবর্ত্তনা দ্বারা যে শুধু ইংলণ্ডের নিজস্ব জাতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রই প্রভাবিত হইবে, তাহা নয়—যে দেশপ্রেম ও জাতিগৌরব বোধের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া আমরা এখন চিন্তিত হইতেছি, তাহাও পুনর্জাগরিত হইবে।"

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সেসিল শার্প ইংলণ্ড সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, আজ বাংলার লোকশিল্প, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য সম্বন্ধে তাহা অক্ষরে অক্ষরে খাটে। বাংলার



সুজনী কাঁথা—শিল্পী মানদাসুন্দরী দাসী (খুলনা)

সন্তানদেরও শৈশব হইতে বাংলার নিজস্ব জাতীয় শিল্পকলার সহিত পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন—তাহার ফলে সেও তাহার দেশ ও দেশবাসীর সহিত একান্ত আত্মীয়তার যোগ সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারিবে এবং সত্যকার স্বদেশসেবী হইয়া গড়িয়া উঠিবে।

কয়েক বৎসর হইতে আমি বাংলার লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের পুনঃপ্রবর্ত্তনার জন্য যে প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়া আসিতেছি, বাংলার দেশপ্রেমিক ও শিক্ষাব্রতীর কর্ম্মধারার পক্ষে তাহা অসাধারণভাবে সহায় হইবে। তদ্দ্বারা যে শুধু—বাংলায় সঙ্গীতে নূতন প্রভাব পড়িবে তাহা নয়, যে দেশপ্রেম ও জাতিগৌরববোধের অভাব আমাদের দেশে এখন লক্ষ্য করি, তাহাও স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে। বাংলার চিত্র মূর্ত্তিকলা ও বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধেও এই কথাগুলি প্রযোজ্য।

বাংলার সম্বন্ধে আমি যে কথা বলিয়াছি, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের পক্ষে, অন্ততঃ যে সকল প্রদেশের এক একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র শিল্পধারা আছে এবং যে সকল স্বতন্ত্র ধারার সমবায়ে ভারতের সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের পক্ষেও উহা সমভাবেই প্রযোজ্য। রসকলার পুনরভ্যুদয় (artistic renaissance) বলিয়া সাধারণভাবে যাহা বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়, তাহা আসলে রসকলার ভাষায় জাতি-আত্মার পুনরভ্যুদয়। নবপ্রেরণা সঞ্চারের ফলে দেশ-আত্মার নব অভ্যুদয় হয়, সেই অভ্যুদয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিশেষতঃ ভাষার মধ্য দিয়া—আত্মপ্রকাশ করে আত্মপ্রকাশের সে ভাষা সাহিত্যের হইতে পারে শিল্পেরও হইতে পারে। শিল্পও তো মানবাত্মা একটি সূক্ষ্ম ভাষা ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

ভাষার অন্যতম রূপ এই রসকলা, জাতির আত্ম প্রকাশের একটি ক্ষেত্র মাত্র। প্রত্যেক জাতি আপনার আত্মপ্রকাশের উপযোগী এক একটি নির্দ্দিষ্ট শিল্প-ভাষা সৃষ্টি করে ও তাহার মধ্য দিয়া আপন প্রতিভাকে, স্বকীয় রসধারায় রূপ দান করে। এই স্বকীয় শিল্প-ভাষার মধ্য দিয়া এক একটি জাতি বিশ্বসংস্কৃতির বেদীমূলে আপন অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া শ্রেষ্ঠ রসানুভূতিকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারে।

"সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ কথা আজ স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু শিল্পকলার ক্ষেত্রে এখনও এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধ ও স্বীকৃত হয় নাই। এখনও এমন লোক অনেক আছেন এবং তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট ভারতীয়ও অনেকে রহিয়াছেন—যাঁহারা মনে করেন শিল্পের ভাষা কোনও জাতির বিশিষ্ট ভাষা নহে, সে ভাষা বিশ্বের সকলের পক্ষেই এক। তাই ভারতবর্ষে আজ দেখিতেছি, বিশ্বপন্থা অনুসরণের ফলে উদ্ভূত, সংকলনের ভিত্তিতে গঠিত শিল্পকলার আত্মকল্পিত চর্চ্চা—তাহার সহিত জাতির বিশিষ্ট ঐতিহ্যের ধারার কোনও সম্পর্কমাত্র নাই। ইহারই আজকাল আখ্যা হইয়াছে—"আধুনিকতা"। আবার অন্য একটি শিল্পধারা আছে, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের রূপ ও নীতির পুনরাবর্ত্তনই যাহার লক্ষ্য—ইহাকে প্রত্নতাত্ত্বিক কলা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। আধুনিক ভারতের ভাবনা-বেদনাকে এই শিল্পধারা রূপ দিতে চাহিয়াছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের শিল্পভাষাকে অনুকরণ করিয়া। আধুনিক

ভারতের শিল্পকলার নব অভ্যুদয় বলিয়া আমরা যাহাকে আখ্যা দিয়াছি, এই দুইটি অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা ছাড়া তাহা আর কিছুই নয়। দেশের মাটির সহিত দেশের বর্ত্তমান কালের জনসাধারণের জীবনযাত্রার ও ভাবজগতের সহিত ইহার প্রাণের যোগ নাই, ইহা প্রান্তপথে চালিত অবাস্তব অস্বাভাবিক। স্বাভাবিক পরিবৃত্তির যে নিয়ম, উপরিউক্ত এই শিল্পধারা তাহা মানে না, সমসাময়িক জীবনধারার সহিত ইহাদের গভীর কোন সম্পর্ক নাই; তাই তাহার সৃষ্টিও কৃত্রিম, নিবীর্য্য, প্রাণশক্তিহীন। শিল্পীর স্বজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত তাহার স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত্ত শিল্পভাষার সহিত উপরিউক্ত শিল্পকলার কোন যোগ নাই।

ইহার ফলে এক বিচিত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে—অর্থাৎ একদিকে সাহিত্য ভাষার বেলায় দেখি একথা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন যে, ভারতের অখণ্ড সাধারণ কোনও আধুনিক ভাষা বা সাহিত্য নাই, আছে বিভিন্ন জাতিগত প্রদেশে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য, যাহা ঐ জাতির বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ভাবের বাহন; অন্যদিকে কিন্তু শিল্পভাষার বেলায় দেখি, বিভিন্ন প্রদেশে স্বীয় ভাবগত ও ভৌগোলিক পরিবেষ্টনীর ফলে উদ্ভূত যে বিশিষ্ট শিল্প-ভাষা ও ঐতিহ্য, যে ভাষা বিভিন্ন প্রদেশে নিখিল ভারতের সাধারণ বেদীতে নিজ নিজ অর্ঘ্যোপচার আনিয়া মিলিত করিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করিয়া একটা নবতন তথাকথিত ভারতীয় শিল্প-ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে। আজ একথা বলিবার সময় আসিয়াছে যে, প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের ভিত্তিতে, প্রাচীন মূর্ত্তিকলার এক বিশেষ ভঙ্গীতে নব্যভারতীয় রসকলার উদ্বোধন করা চলিবে না; সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন, শিল্পের ক্ষেত্রে তেমনি ভারত মহাভূমির অঙ্গীভূত বিশেষ বিশেষ এক একটি ভূমির লোকসমষ্টির বিভিন্ন স্বতন্ত্র শিল্প ভাষার সমবায়েই আধুনিক ভারত-শিল্প সত্যভাবে গড়িয়া উঠিবে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর যোগ ও সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তার কথা, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কথা, আপন আপন প্রতিভার কথা, বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এমন দিন হয়ত কখনো আসিতে পারে, এই সব স্বতন্ত্র ভাষাবিশিষ্ট স্বতন্ত্র জাতির মিলনে একভাষাবিশিষ্ট এক অখণ্ড জাতি ও জাতি সত্তার সৃষ্টি হইবে, কিন্তু এখনো তাহার সময় হয় নাই, এখনো সেদিন দূরে। ইতিমধ্যে, সমগ্র ভারতের এক সাহিত্য ভাষার কথা বলা যেমন মূঢ়তা, সমগ্র ভারতের এক শিল্প-ভাষার কথা বলাও তেমনই মূঢ়তা।

চিত্রকলায় বাংলার স্থান

মানুষের পরিকল্পিত যাবতীয় রসকলায় প্রতিভা-গৌরবে বাঙ্গালী জাতির স্থান জগতে যে অদ্বিতীয় ইহার উপলব্ধি আধুনিক শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায়ে বাঙ্গালীর নাই। তাই যে আজ বিশ্বের সভ্যতার আসরে তার কল্পিত আত্মনিকৃষ্টতা-লজ্জায় অবনতমস্তক ও সঙ্কুচিত। অথচ বাঙ্গালীর জাতিগত সেই মহিমময় প্রতিভার প্রতিনিয়ত-প্রবাহিত ফল্গুধারা আজও ইতিহাসের দুর্ভাগ্যময় পরিবর্ত্তনে লাঞ্ছিত ও দীনতাপন্ন বাঙ্গালীর সমাজের গভীরতম অন্তস্থলে মন্দাকিনীর অনুপম লীলাময় শাখার ন্যায় আধুনিক শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালী সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে বহিয়া চলিয়াছে।

চিত্র-রসকলায় বাঙ্গালী প্রাচীনযুগে যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষকে নয়, সমগ্র এশিয়াকে অনুপ্রাণনা বিতরণ করিয়াছে, তাহার উপলব্ধি আজকালকার শিক্ষিত বাঙ্গালীর নাই। নিজস্ব সম্পদ-বিহীনতার ভ্রান্ত বিশ্বাসের দৈন্যে প্রপীড়িত শিক্ষিত বাঙ্গালী আজ বিশ্বের চিত্র রসকলার হাটে, দীন ভিখারীর বেশে—অজন্তার ভগ্ন গুহাদ্বারে—মোগল ও রাজপুত প্রসাদ-প্রাঙ্গনে, চীন, জাপান ইত্যাদি ও ফ্রান্সের বস্তু-বেরঙের বিপণির দ্বারদেশে—ভিক্ষুক।

বাংলার নিজস্ব রসকলা-প্রবাহিনীর যে গৌরবময় মন্দাকিনী-শাখা হইতে এই সকল দেশ প্রাচীনযুগে অনুপ্রাণনা সংগ্রহ করিয়াছিল, বর্ত্তমান বাংলার পল্লীর অবজ্ঞাত ধূলাবালি-স্তরের গভীর নিম্নদেশে সেই মন্দাকিনী-শাখার বিচিত্র লীলাময় ফল্গুধারা যে এখনও অফুরন্ত অনুপ্রাণনাময় মাধুরী-হিল্লোলে প্রবাহিত, তাহা আজকালকার শিক্ষিত বাঙ্গালী জানে না।

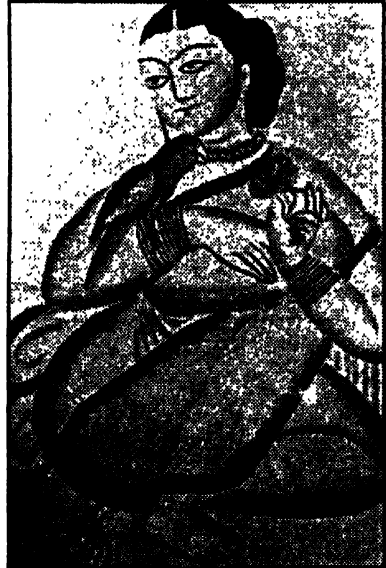
সেই ফল্গুধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে—বর্ত্তমান বাংলার অবজ্ঞাত, নির্য্যাতিত, পদদলিত, দীনদুঃখী "পটুয়া"দের পুরুষানুক্রমিক অনুপম চিত্রকলা-কৌশল প্রতিভায়। তাহাদের তুলিকা-সৃষ্ট চিত্রলেখা-সুন্দরীর ভুবনমোহিনী প্রতিভার ঐশ্বর্য্য বাংলাকে আবার পৃথিবীর রসকলার আসরে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন দান করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

▸▸ *বঙ্গলক্ষ্মী, বৈশাখ ১৩৩৯*

বাংলার অজ্ঞাত পল্লীতে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্যময় চিত্রলেখা সম্পদ এখনও অবগুণ্ঠনের আড়ালে লোক-চক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া আছে, তাহার সেই সলজ্জ অবগুণ্ঠনের ঈষদুন্মোচন করিবার সৌভাগ্যলাভের গৌরবে আজ আমার জীবন ধন্য।

ভ্রান্ত-শিক্ষা বিমূঢ় বাঙালী তাহার সঙ্গে শ্রদ্ধানত মস্তকে আজ পরিচয় করুক;এবং যে গভীর নির্য্যাতন-প্রপীড়িত পল্লীবাসী পটুয়াগণ প্রাচীন বাংলার এই অদ্বিতীয় চিত্রকলা-প্রতিভার বাহক, তাহাদিগকে স্নেহালিঙ্গনে তুলিয়া লইয়া শিক্ষকের আসনে বরণ করুক;—বাঙ্গালীর আত্মনিকৃষ্টতা-বিশ্বাস অরুণালোক সংস্পর্শে কুজ্ঝটিকার ন্যায় অচিরে দূর হইয়া যাইবে; বাঙালীর আত্মবিশ্বাসহীনতা-দুর্ব্বল অবনত মস্তক আবার সমুন্নত হইয়া উঠিবে;বাঙ্গালী তাহার নিজস্ব প্রাচীন রসকলা-প্রতিভার ঐশ্বর্য্যে অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়া পৃথিবীর রসকলামন্দিরে পুনরায় শ্রেষ্ঠ পূজারীর আসন গ্রহণ করিবে।





কালিঘাট পট, কলকাতা (উনবিংশ শতাব্দী)

বাংলার মেয়েদের আল্‌পনা ও প্রাচীর-চিত্র

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষায়, সমাজে ও সভ্যতায় যে অনেকগুলি বিশেষ গলদ আছে, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। কৃত্রিমতা, প্রাণহীনতা, নীরসতা, ও নির্ম্মল আনন্দের অভাব যে এই সকল গলদগুলির অন্যতম ইহাও নিঃসন্দেহ।

শিশুর চরিত্রে ও প্রকৃতিতে যে স্বাভাবিক, সজীব প্রাণবান্, সরল ও নির্ম্মল আনন্দের ভাব পরিলক্ষিত হয়, ইহাই যে মানবজীবনের আদর্শ স্থল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজ-কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Wordsworth) তাই তাঁহার গীতিকবিতায় গাহিয়াছেন—

"My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky :
So it was when my life began,
So is it now I am a man.
So be it when I shall grow old–
Or let me die!
The child is father of the man
And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety."

অর্থাৎ ঃ— "নেচে উঠে প্রাণ মোর, নেহারি যখন
ইন্দ্রধনু আকাশের পটে ঃ
জীবনের প্রভাত-উষায় ছিল মন এই ভাবে গড়া,
আজিও তেমনি আছে মধ্যাহ্ন লগনে—
থাকে যেন সায়াহ্নেও এমনি অটুট—

▸▸ *বঙ্গলক্ষ্মী, আষাঢ় ১৩৩৯*

নয় তো এখনি প্রাণ হ'য়ে যাক্ শেষ।
মানুষের প্রকৃতির মূল
শিশুর স্বভাব মাঝে থাকে বিনিহিত ঃ—
কামনা আমার তাই মনে—
জীবনের দিনগুলি যেন
একে অপরের সনে হ'য়ে থাকে গাঁথা
প্রকৃতির স্বভাব-সরলতার ডোরে।"

এই শিশুসুলভ সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের অনুভূতি ও অভিব্যক্তিই ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উৎকর্ষের একটি বিশিষ্ট মাপকাঠি। অথচ আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর, ধর্ম্মের সামাজিক রীতি-নীতির ও সভ্যতার আদর্শ এমনি অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে যে বর্ত্তমান যুগে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এই শিশুসুলভ সহজ আনন্দের অনুভূতি ও অভিব্যক্তিকে অবজ্ঞার ও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। অতি বস্তু-তন্ত্রতার, অতি-যান্ত্রিকতার ও অতি-বাণিজ্য-তন্ত্রতার এই যুগে, কেবল ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশে নয়, প্রায় সকল দেশেই মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে আত্মার সহজ সরল শিশুসুলভ এই আনন্দ-ভাবের বিচ্ছেদ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বিচ্ছেদের মাত্রা, অন্যান্য দেশের অপেক্ষা ভারতবর্ষে ও বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে, আজকাল বেশীদূর গড়াইয়াছে। আর তার ফলে আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবন দিনের পর দিন অধিকতর কৃত্রিমতা, আড়ষ্টতা ও প্রাণহীনতা, নীরসতা ও নিরানন্দতায় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

ইহার মূলে যে শিক্ষার, ধর্ম্মের ও সামাজিক রীতিনীতির বিকৃতি, তাহা নিঃসন্দেহভাবে বলা যাইতে পারে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীকে, ধর্ম্মপ্রণালীকে ও সামাজিক রীতিনীতিকে কৃত্রিমতার ও নীরসতার কবল হইতে মুক্ত করিয়া যদি আমরা জাতীয় জীবনকে আবার সরস, সরল, প্রাণবান ও আনন্দময় করিয়া তুলিতে না পারি, তবে প্রাণশক্তির উৎসের এই নিরুদ্ধতার ফলে জাতি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তা সুনিশ্চিত।

বর্ত্তমান কালের সহুরে সভ্যতা ও উচ্চশিক্ষার আদর্শের সঙ্গে যে জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ-বিকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহার প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যায়। দেশের উচ্চশিক্ষার মধ্যে যে একটা নীরসতা ও কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিকতার মননবৃত্তি-মূলক (intellectual) পারদর্শিতার উপর অতিনির্ভরতা ও তাহার ফলে জীবনের কল্পনারাজ্যের ও ভাবরাজ্যের সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা আমরা প্রতিপদে দেখিতে পাইতেছি। আমাদের দেশের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ও উচ্চ প্রতিষ্ঠানের মার্কামারা ছাপধারীরা যে রসহীন, আনন্দহীন ও অস্বাভাবিক একটা কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্রবৎ পদার্থে পরিণত হইয়া

পড়েন, ইহা কি দেশী, কি বিদেশী, সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং কি করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষার এই গলদ নিরাকরণ করা যায় তাহা লইয়া অনেক কল্পনা, জল্পনা, তর্কবিতর্ক ও আলোচনা কলিকাতা ইউনিভার্সিটি-কমিশন বসিবার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার ফলে এখনও এমন কোন প্রণালীর উদ্ভাবন করা হয় নাই যাহাতে এই গলদের উৎপাটন হইতে পারে।

ইহার কারণ এই যে, মানুষের শিক্ষাপ্রণালী যদি বিশ্বপ্রকৃতির ও সৃষ্টির সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তভাব এবং বিশেষ মূলীভূত আনন্দরসের প্লাবন হইতে বিচ্যুত হইয়া কৃত্রিম, অস্বাভাবিক, নীরস ও আনন্দহীন হইয়া পড়ে, এবং তাহার জীবন যদি বিশ্বের বিরাট ও সহজ সরল ছন্দের উপলব্ধি হইতে ও সেই ছন্দের সঙ্গে সমন্বয় হইতে বিচ্যুত হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র মননবৃত্তি-মূলক (intellectual) বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ অথবা যান্ত্রিক সভ্যতামূলক বস্তুবাহুল্যের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা তাহার জীবনকে প্রাণবান, সজীব ও আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারে না।

ভারতের ও বাংলার প্রাচীন সংকৃষ্টিতে যেমন একদিকে যান্ত্রিক সভ্যতামূলক বস্তুবাহুল্যের উপর নির্ভরের মাত্রা কম ছিল, তেমনি অপরদিকে জীবনকে বিশ্বপ্রকৃতির সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত করিবার এবং বিশ্বপ্রকৃতির সহজ ও বিরাট ছন্দের সঙ্গে সমন্বয়মণ্ডিত করিবার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। তাহার ফলে কবি Wordsworth যে জীবনব্যাপী শিশুসুলভ ও সহজ আনন্দময় ভাবের কামনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন ভারতের ও প্রাচীন বাংলার সংকৃষ্টিতে উচ্চশিক্ষার ও ধর্ম্মের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ স্বরূপ ছিল। কেবলমাত্র পরব্রহ্মের অথবা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত আনন্দ-রসের উপলব্ধি দ্বারাই এই শিশুসুলভ, সহজ ও সরল আনন্দময় ভাবের জীবনব্যাপী অধিকার লাভ করা যাইতে পারে। তাহার অভাব হইলে মানুষের জীবন মননবৃত্তির ও বিজ্ঞানের বহুমুখী উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও নীরস ও নিরানন্দময় হইয়া পড়িবে ইহা অনিবার্য্য। তাই ঋষিগণ উপনিষদে বলিয়াছেন ঃ—"রসো বৈ সন। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।" (পরব্রহ্মারসস্বরূপ। মানুষ সেই রসের অনুভূতি লাভ করিয়াই আনন্দ লাভ করে।) সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক অথবা জাতীয় জীবনে যদি শিক্ষা অথবা ধর্ম্মের বিকৃতির ফলে রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির শক্তি ও প্রবৃত্তির হ্রাস অথবা লোপ হয়, এবং বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দময় ছন্দের সঙ্গে জীবনের সমন্বয়ের যদি অভাব হয়, তাহা হইলে মানুষের জীবন বস্তু-তান্ত্রিকতার ও যান্ত্রিক সভ্যতার শত পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও নিরানন্দ, নীরস ও ছন্নছাড়া হইয়া পড়িবে। এবং আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে আধুনিক সহুরে শিক্ষার ফলে ইহাই হইয়াছে।

কিন্তু ইহা আমাদের একটি পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, ভারতের ও বাংলার প্রাচীন সংকৃষ্টিতে রসানুভূতির, রসগ্রাহিতার ও রসাভিব্যক্তির এবং বিশ্বপ্রকৃতির সহজ সরল

আনন্দময় ছন্দের সহিত সমন্বয়ের যে ব্যাপক ব্যবস্থা জাতির ও ব্যক্তির জীবনে সাধিত করা হইয়াছিল, তাহা আমাদের সুদূর পল্লীর নিভৃত প্রদেশে যেখানে সহুরে শিক্ষার হাওয়া এখনও গিয়া পৌঁছিতে পারে নাই—আজ পর্য্যন্তও কোনপ্রকারে অল্পাধিকভাবে জাগিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। জীবনের এই সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দরসের ও আনন্দময় ছন্দের প্লাবনমূলক যে ভাগীরথী-ধারা এখনো বাংলার নিভৃত পল্লীর নিরক্ষর সরলপ্রাণ নরনারীর জীবনে বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাহারই অভিসিঞ্চন দ্বারা আমাদের আধুনিক ও সহুরে শিক্ষার প্রাণহীন ক্ষেত্রকে পুনরায় সরস ও উর্ব্বর করিয়া তুলিতে হইবে।

কিন্তু ইহা করিতে হইলে পল্লীগ্রামের প্রতি আমাদের বর্ত্তমান যে মনোভাব, তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করা সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন। সহুরে শিক্ষার গর্ব্বে গর্বিত হইয়া আমরা মনে করিয়া থাকি যে আমাদের পল্লীগ্রামগুলি সম্পূর্ণ মাপহীন, তাহাদিগকে সংস্কার করা এবং পল্লীবাসী দিগকে শিক্ষা দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। পল্লীর জীবন হইতে শিখিবার যে আমাদের কিছু আছে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বড় বড় ধুরন্ধরদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা উপলক্ষে আমি এই আভাষই পাইয়াছি যে, বাংলার পল্লীতে ম্যালেরিয়া, মশা, পচাপুকুর ও নিজ... ছাড়া আর কিছুই আছে বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। ইউনির্ভাসিটির মার্কামারা যুবক ও প্রৌঢ়দের একমাত্র কর্ত্তব্য—সহরের আলোক নিয়া পল্লীতে ফেলা এবং পল্লীর সংস্কার করা—এই তাঁহাদের বিশ্বাস। পল্লীর জীবনে যে এমন কিছু গৌরবময় মূল্যবান জিনিস থাকিতে পারে, যাহা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধুরন্ধরগণও মূল্যবান শিক্ষা লাভ করিতে পারেন ইহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত, এবং এইরূপ কথা বলিলে তাহারা তাহা অবিশ্বাসের হাসিতে উড়াইয়া দেন।

বাংলার অজ্ঞাত পল্লীর গভীর অন্তস্থলে আধুনিক শিক্ষার ঝলসবিহীন সরলপ্রাণ নিরক্ষর সরলতার জীবনে বাংলার প্রাচীন সংকৃষ্টিমূলক বহুমূল্যবান সম্পদের যে এখনও অনেক কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং এই সকল সম্পদের সহিত পরিচয় স্থাপন করিয়া এবং তাহাদিগকে জাতীয় জীবনে পুনরায় ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে জাতীয় জীবনকে পুনরায় বিশুদ্ধ, সরল, আনন্দময়, গৌরবময় ও শক্তিময় করিয়া আমরা তুলিতে পারিব, বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতির সাহায্যে নানা দিক দিয়া ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা আমি সম্প্রতি করিয়াছি এবং করিতেছি। কারণ বাংলার জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য এবং প্রকৃত সম্পদ যে কোথায়, তাহার অভাব আমি পাইয়াছি—বাংলার সহুরে ও আধুনিক শিক্ষালয়ে নয় বাংলার নিভৃত পল্লীর সরলপ্রাণ সেকেলে নরনারীর জীবনে। তাহারাই আমাদের দেশের প্রাচীন সংকৃষ্টির অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দরসের অনুভূতির ও অভিব্যক্তির দ্বারা এবং নিজের নৃত্যগীতের চর্চার দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে জীবনের সহজ সমন্বয়রক্ষার ধারা বহন করিয়া আসিতেছে। এই সহজ অনাবিল আনন্দময় ভাবের সঙ্গে যোগ স্থাপন এবং জীবনে ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমরা করিতে পারিব- —বাংলার পল্লীর সরল ও বিশুদ্ধ

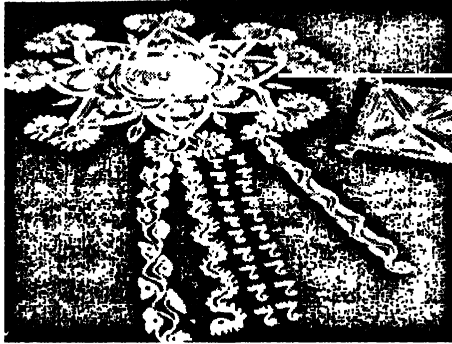
লোকসঙ্গীতের ও লোকনৃত্যের প্রতিষ্ঠা শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজে পুনরায় ব্যাপকভাবে সম্পাদন করিয়া। আর কেবল লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের ভিতর দিয়া নয়,—বাংলার প্রাচীন সংকৃষ্টি-প্রসূত যাবতীয় রসকলার বিশুদ্ধ ধারাকে জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে পুনরায় ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা বাংলার জীবনকে আবার সরস, প্রাণবান্, আনন্দময় ও শক্তিময় করিয়া তুলিতে পারিব।

বাংলার পল্লীগ্রামে যে সকল প্রাণময় লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের বহুল প্রচলন এখনও আছে এবং যাহা আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় এতদিন অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিশ্বপ্রকৃতির রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির যে কি বিশিষ্ট সহায়তা হইতে পারে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার কত বড় মূল্য, তাহা আমি অন্যত্র দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বিশ্বপ্রকৃতির রসাত্মক ছন্দের সঙ্গে বিশুদ্ধ সঙ্গীত এবং বিশুদ্ধ নৃত্যের প্রচলন ও চর্চ্চা যেমন মানুষকে সাহায্য করিয়া থাকে, তেমনি চিত্রকলার বিশুদ্ধ ছন্দাত্মক ও আনন্দমূলক চর্চ্চাও ইহাতে সবিশেষ সাহায্য করে। আমাদের আধুনিক সহুরে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার উপলব্ধি সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু বাংলার সুদূর নিভৃত পল্লীজীবনে ইহার নিবিড় ও গভীর উপলব্ধির জীবন্ত দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি এখনো রহিয়াছে। ছন্দাত্মক রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির যে ব্যাপকতা এখনও বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অবশিষ্ট রহিযাছে তেমনটি অন্য কোন দেশে আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। ছন্দাত্মক রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির এই ভাবে পাই—বাংলার পল্লীর সরলপ্রাণ নিরক্ষর ছোট বড় সেকেলে মহিলাদের জীবনে। আধুনিক শিক্ষার গবির্বত ও কৃত্রিম ঝলস্ ইঁহারা এখনও পান নাই বলিয়াই এই ধারা ইঁহাদের মধ্যে এখনও বিশুষ্ক হইয়া যায় নাই।

বাংলার পল্লীগ্রামের মেয়েদের মধ্যে বিবাহ, ব্রত ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলিম্পনা অঙ্কন করিবার যে ব্যাপক প্রথা এখনও প্রচলিত আছে, ইহা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নরনারীরা হয়ত লক্ষ্যই করেন না, অথবা লক্ষ্য করিলেও ইহাকে তাঁহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন ও একটি কুসংস্কারপ্রসূত সেকেলে অনাবশ্যক বাহুল্যমূলক প্রথা বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। ইহা যে কত বড় জাতীয় সম্পদ তাহার উপলব্ধি করিবার শক্তি আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আধুনিক সহুরে "আর্টিষ্ট" অর্থাৎ রসশিল্পীদের বিজাতীয় প্রথামূলক অঙ্কনশিল্প-চাতুর্য্য দেখিয়া আমরা মূর্চ্ছা যাই; কিন্তু বাংলার পল্লীর মেয়েদের স্বভাবজাত শিল্পনৈপুণ্য যে আধুনিক সহুরে শিল্পীদের আয়াসলব্ধ নৈপুণ্য হইতেও অনেক মূল্যবান একটি জাতীয় সম্পদ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

চিত্র রসকলার প্রথম এবং প্রধান উপাদান—লীলায়িত রেখার অঙ্কন। ইহাই চিত্র-রসকলার ভিত্তিস্থানীয়। বাংলার মেয়েদের আলিম্পন-শিল্প লীলায়িত রেখাঙ্কন-চাতুর্য্যের

দৃষ্টান্তস্বরূপ। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সুদুর অবজ্ঞাত পল্লীজীবনে অবশিষ্ট এই রসকলায় শক্তি-সম্পদের ব্যাপক ধারাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, ইহা বাংলার আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর মূঢ়তার পরিচায়ক। যেদিন আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যাইবে সেইদিন আমরা ইহার প্রকৃত সমাদর করিয়া আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইহার রীতিমত চর্চার ব্যবস্থা করিয়া জাতির ও ব্যক্তির জীবনে পুনরায় ব্যাপকভাবে রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির শক্তির পুনরুদ্দীপনের সহায়তা করিতে আরম্ভ করিবে।


তারাব্রত আলপনা

বাঙ্গালী জাতি যে রসকলা-ক্ষেত্রে পারদর্শিতায় পৃথিবীর মধ্যে একটি অসাধারণ প্রতিভাবিশিষ্ট জাতি, বাংলার মেয়েদের এই আলিম্পনা-অঙ্কন করিবার বহুব্যাপক স্বভাবজাত শক্তি তাহার একটি প্রমাণ স্বরূপ। ইহাদের পারদর্শিতা যে কত অদ্ভুত তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। কিছুদিন হইল আমি অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি সুদুর পল্লীগ্রাম দেখিতে যাই। আমার গ্রামে পৌছিবার পর গ্রামের মেয়েরা খবর পাইলেন যে আমি আলপনা দেখিতে ভালবাসি। যেই খবর পাওয়া অমনি ঘরে ঘরে আলপনা আঁকিবার ধুম পড়িয়া গেল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী, বারান্দা, ভিটে, আঙ্গিনা ও দ্বারদেশ আলিম্পনার অনুপম লীলায়িত শুভ্র রেখাবলীতে ও রূপাবলীতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দেখিয়া ত আমি অবাক। মেয়েদের আলিম্পনা আঁকিবার কি অবলীলাময় ও স্বভাবসিদ্ধ কৌশল! কোথাও ভুল-ত্রুটি নাই। একটি রেখা অঙ্কন করিয়া তাহাকে আবার মুছিয়া ফেলিয়া অন্য রেখা আঁকিবার প্রয়াস নাই। অভ্রান্ত প্রতিভার সহজ স্ফুরণের অটুট ছন্দে মেয়েদের অঙ্গুলিগুলি রেখা অঙ্কিত করিয়া যাইতেছে। সেই লীলায়িত রেখার কোথাও এতটুকু ভুল-ত্রুটি বা আড়ষ্ট ভাব নাই। যেন বিশ্বপ্রকৃতির গভীর প্রাণের আনন্দময় ছন্দ মুর্ত্তিমতী হইয়া আলিম্পনার রেখায় আপনার আত্মপ্রকাশ করিয়া দিতেছে। সেই ছন্দোবদ্ধ আলিম্পনা এত অনিন্দ্যসুন্দর ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত না, যদি এই সরলপ্রাণ নিরক্ষর মেয়েদের আত্মা বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দময় ছন্দের ও রসের অনুভূতিতে ভরপুর না থাকিত। আমাদের সহুরে শিল্পীরা বহু চেষ্টা করিলেও যে লীলায়িত রেখাঙ্কনের এইরূপ অবলীলাময় কৌশল প্রদর্শন করিতে পারিবেন না, তাহা স্থিরনিশ্চয়। আধুনিক যে শিক্ষাপ্রণালী আনন্দ-ছন্দের ও আনন্দরসের এই জাতিগত স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভাকে দেশের নরনারীর জীবন হইতে নির্বাসিত করিতেছে—তাহার মূঢ়তার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু

ইহা সত্য যে আমাদের আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির নীরস ও ছন্নছাড়া শিক্ষাপ্রণালীর ফলে শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে এই জাতিগত প্রতিভা দ্রুত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

এইত গেল মাটিতে ও পিঁড়িতে আলিম্পনা-কলার কথা। ইহা কি পূর্ব্ববঙ্গে, কি পশ্চিমবঙ্গে, সুদূর পল্লীগ্রাম মাত্রেই এখনও প্রচুর ভাবে অবশিষ্ট আছে এবং ইহারই সাহায্যে এখনও বাঙ্গালী জাতির জীবনে রসকলা-চর্চ্চার ব্যাপকভাবে পুনর্বিস্তার করা যাইতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। ব্রত উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জেলায় নানা রঙ্গের চাউলের গুঁড়ো দিয়া যে বিচিত্র রঙ্গীন আলিম্পনকলার প্রথা এখনও অবশিষ্ট আছে, ইহাও অতি সুন্দর ও মনোরম রসানুভূতির, রসাভিব্যক্তির এবং শিল্প কুশলতার পরিচায়ক। কিন্তু ইহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের পল্লীগ্রামে মাটির প্রাচীরে তুলিকার সাহায্যে যে নানাবর্ণের পদ্ম ও অন্যান্য প্রাচীর-চিত্র আঁকিবার প্রথা এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা বড়ই মনোমুগ্ধকর ও উঁচুদরের শিল্পকুশলতার, রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির পরিচায়ক। এই প্রথা যে এখনও পশ্চিমবঙ্গের পল্লীগ্রামে প্রচলিত আছে তাহা আবিষ্কার করিবার সুযোগ বৎসরেক কাল পূর্ব্বে আমার কি করিয়া হইয়াছিল, তাহা সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং এই প্রাচীরচিত্রাঙ্কন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই এখন করিব।

পশ্চিম বাংলার মেয়েদের প্রাচীর-চিত্রশিল্প

বীরভূম ও মুশির্দাবাদের সীমান্ত প্রদেশে রামনগর এবং সাহোড়া গ্রামে একদিন বেড়াতে গিয়াছিলাম। সাহোড়া গ্রামের বাইরে থেকেই দূরে একটি আধভাঙ্গা খড়ের চাল ওয়ালা কুটীর নজরে পড়ল। আশে পাশে আরও অনেক বাড়ীই ছিল তার মধ্যে এই জীর্ণ-চাল কুটীরটি যে আমার নজরে পড়লো তার কারণ কুটীরের মাটির দেয়ালে উজ্জ্বল নীল, হলদে, সাদা ও সবুজ রঙ্গে আঁকা দুটি পদ্মফুল, —এই দুটি পদ্ম রেখা ও রঙ্গের অসাধারণ সৌন্দর্য্যের সমাবেসের সম্পদে কুটীরটিকে এমনই একটি গৌরবময় রূপ দিয়েছিল যে কুটীরটিকে লক্ষ না করে' থাকা অসম্ভব ছিল। কুটিরের দরজার দুই পাশে খড়ের চালের অল্প নীচে এই পদ্ম আঁকা ছিল। নজরে পড়েছিল আমার অনেক দূর থেকেই, কিন্তু সেই দূর থেকেই আমাকে এই পদ্মটির সৌন্দর্য্য যেন চুম্বক পাথরের মত আকর্ষণ করে সেই কুটীরের দোরে নিয়ে গেল। খবর নিয়ে জানলাম কুটীরটির মালিক একটি "ভল্লা" জাতীয় রমনী। ভল্লা জাতটা বাগ্দী জাতের মত সমাজের চক্ষে অতি নীচু স্থানীয়। যদিও এই জাতির নাম হতেই অনুমান করা যায় যে এরা এক সময় ভল্লধারী প্রচণ্ড যোদ্ধার জাত ছিল আর আজকালও এদের মত নির্ভীক ও শক্তিশালী জাত বাংলাদেশে কম আছে; কিন্তু বাংলার আধুনিক সমাজের চোখে এরা দীনহীন ও অনশনে পীড়িত। যাক সে কথা। ভল্লা রমনীটি বিধবা, সে গ্রামের একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করে। ঘরে গিয়ে দেখলাম সে সমস্ত দিন দাসীবৃত্তি করে খেটে আসার পর খেতে বসেছে। তার বাড়ীতে তার আপনারজন আর কেউ নেই। অতি কষ্টে সৃষ্টে সে জীবিকা নির্বাহ করে। বাইরে আঁকা—অর্থাৎ এ দুটি আঁকবার মত শিল্পকৌশল, সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তির প্রেরণা যে এই নীচ জাতীয় দীন-দুঃখী বিধবা রমনীর থাকতে পারে, তা সহজে কল্পনা করা যায় না, কিন্তু তার কাছ থেকে জানা গেল যে পদ্মদুটি তাঁরই আঁকা এবং প্রতি

▸▸ *বঙ্গলক্ষ্মী, শ্রাবণ ১৩৩৯*

বৎসরই লক্ষ্মীপূজার সময় দুটি রঙ্গীন পদ্ম কুটীরের দেয়ালে এঁকে সম্বৎসরকাল সে তার কুটীরকে সৌন্দর্য্যের আকর করে রাখে।

জিজ্ঞাসা করে জানলাম, যে খালি এই রমনীর নয়, এই সকল গ্রামের উচ্চ-নীচ সকল জাতীয় মেয়েরাই নিজেদের বাড়ীর মাটির দেয়ালে নানাপ্রকার রঙ্গীন পদ্ম ও অন্যান্য সৌন্দর্য্যময় পরিকল্পনা লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর এঁকে থাকেন। তাই সেদিন বাড়ী বাড়ী ঘুরে এই রেখ ও রঙ্গের বিচিত্র রূপাবলী দেখতে লাগলাম।

যা দেখলাম তাতে অবাক হয়ে গেলাম। ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্য পীড়িত বাংলাদেশের এক অজ্ঞাত কোণে পল্লীরমনীর স্বভাবজাত সৌন্দর্য্যরস সৃষ্টির এত ছড়াছড়ি থাকতে পারে তা পূর্ব্বে কখনও কল্পনাও করিনি। গ্রামের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে চাওয়া যায় সে দিকেই প্রত্যেক বাড়ীর দেয়ালে অনুপম সৌন্দর্য্যময় রঙ্গীন রূপাবলী নজরে পড়ে। কি সুরুচিময় বন-সমাবেশ, কি অপূর্ব কৌশলময় রেখা-বিন্যাস। সবই গ্রামের মেয়েদের হাতের কাজ। সহরে শিল্পীদের মত রঙ্গের বাহুল্যের ব্যবহার নাই, অতি অল্প কয়েকটি প্রাথমিক রঙ্গের সহজ অথচ উজ্জ্বল সমাবেশ, কি অনুপম ছন্দোবদ্ধ রেখা-বিন্যাস, কোথাও এতটুকু ভুল ত্রুটি নাই। অথচ, প্রত্যেক চিত্রেই কেমন একটা অনিবর্বচনীয় সরলতা ও মাধুর্য্য যেন মাখা রয়েছে।

আমি এটা স্পষ্ট বুঝলাম যে যা দেখছি এ শুধু চিত্র নয়, এই চিত্রগুলি গ্রামের যে সরলপ্রাণ মেয়েরা এঁকেছেন তাঁদের বিশুদ্ধ ও সহজ সরল মনের এক একটা প্রতিকৃতি। এই রাঢ় দেশেরই প্রাচীন কবি লোচনদাসের পদাবলীর একটি লাইন মনে পড়ে গেল—

"লাবণ্য বাটিয়া কেবা চিত নিরমিল গো
অপরূপ রূপের বণনী।"

আড়ম্বরহীন সহজসরল অথচ মাধুর্য্যময় লীলায়িত রেখা ও উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশময় এই যে অনুপম রূপাবলী এগুলি যাদের মনের পরিকল্পনা ও যাদের হাতের তুলির সৃষ্টি, তাদের মান নিশ্চয়ই "লাবণ্য বাটিয়া" গড়া তাতে সন্দেহ নাই; নইলে এরূপ অপরূপ সহজ ও সুন্দর রসে ভরপুর রূপ সৃষ্টি অসম্ভব হতো। বাংলার গ্রামীণ সংকৃষ্টির ধ্বংসাবশিষ্ট এই যে অপরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেখবার সৌভাগ্য আমার হল এতে জীবন ধন্য মনে করলাম।

দেয়ালে রঙ্গীন প্রাচীরচিত্র আঁকার এই যে প্রথা, এটা মাটিতে ও পিঁড়িতে আলপনা আঁকার প্রথা হতে অনেকটা পৃথক, কারণ আলপনা সাধারণতঃ আঁকা হয় চালের পিটুলি দিয়ে এবং মেয়েরা হাতের আঙ্গুল দিয়ে সেই পিটুলি নানাপ্রকার নুমনায় এঁকে থাকেন, তাতে কোন তুলির দরকার হয় না। কিন্তু এই প্রাচীরচিত্র আঁকার প্রথা অন্যরূপ। এতে তুলি ব্যবহার করতে হয়, এবং এতে কয়েকটি প্রাথমিক রঙ্গের অর্থাৎ কাল, সাদা, সবুজ, লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদির ব্যবহার হয়। ইংরাজীতে যাকে **tempara painting** বলে, এই

প্রথাটি ঠিক সেইরূপ অর্থাৎ রংগুলিয়ে জল মিশিয়ে পাতলা করে তুলি দিয়ে দেয়ালে লাগাতে হয়। মাটির দেয়ালে এইরূপ নানারঙ্গের পরিকল্পনা বড়ই সুন্দর দেখায় এবং গ্রামটিকে যেন একটা নন্দনলোক অথবা একটা জীবন্ত অজন্তার মত করে তোলে। এই সাহোয়া গ্রামটির ঘরে ঘরে প্রাচীরচিত্রের সৌন্দর্যে [illegible]কই একে একটি জীবন্ত অজন্তা বলে মনে হয়েছিল। প্রতি বৎসর লক্ষ্মীপূজার সময় মেয়েরা প্রত্যেক বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে নানাপ্রকার পদ্ম ও অন্যান্য চিত্র এঁকে বাড়ীগুলিকে সৌন্দর্য্যের আধার করে রাখেন। গ্রামের পুরুষরা কিন্তু এগুলির দিকে বিশেষ নজর দেন না। পুরুষরা আধুনিক শিক্ষার একটুকু ছোঁয়াচ পেয়েছেন বলেই এই সকল প্রথাকে মেয়েদের একটা কুসংস্কার মূলক অভ্যাস মাত্র মনে করে থাকেন। তাই আমি যখন ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে আগ্রহের সহিত এগুলি দেখতে লাগলাম তখন এক দিকে পুরুষরা যেমন অবাক হয়ে গেলেন, তেমনি অপর দিকে মেয়েরাও আশ্চর্য্য হয়ে পড়লেন। পুরুষরা আমাকে একটা বাতিকগ্রস্ত লোক বলেই ধরে নিলেন, আর মেয়েরা যে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন তার কারণ, এই সব চিত্রের যে বিশেষ কোন মূল্য আছে বলে কেউ মনে করে সে ধারণা তাঁদের নিজেদেরই ছিল না। এরূপ ধারণা না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রতি বৎসর তাঁদের এই আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি রক্ষণ করে আসছেন। দেখলাম কেবল বাড়ীব বাইরের দেয়ালে নয় ধানের মরাইয়ের দেয়ালেও চিত্র আঁকা রয়েছে, আর ঘরের ভিতরে দেয়ালে বড় বড় এক একটি চমৎকার রঙ্গীন চালচিত্র আঁকা রয়েছে।

একটি ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়ে দেখলাম, তাঁর ২৪/২৫ বৎসর বয়স্কা বিবাহিতা মেয়ে অপর্ণা দেবী বাড়ীটাকে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত নানাপ্রকার রঙ্গীন পরিকল্পনার চিত্রে একটা অলকাপুরী করে রেখেছেন। মাটির দেয়াল, কাঠের দোর, ধানের মরাই, কোনটাই বাদ যায়নি, ঢেউখেলান জলের পরিকল্পনা, পদ্মের ও লতাপাতার পরিকল্পনা, মকরের মুখের পরিকল্পনা ইত্যাদি নানাপ্রকার পরিকল্পনার মৌলিকত্বময় চিত্রে সমস্ত বাড়ীটি ভরা। স্থাপত্যের সঙ্গে চিত্রের এই চুড়ান্ত সমাবেশ দেখে মুগ্ধ ও অবাক হলাম। ধানের মরাই-এর দেয়ালে দেখলাম মেয়েরা সাধারণতঃ এঁকে থাকেন লক্ষ্মীর পেঁচার পরিকল্পনা। এর একটা ডবল মানে আছে। পেঁচা লক্ষ্মীর বাহন, তাই মরাই-এর দেয়ালে পেঁচার পরিকল্পনা আঁকাতে লক্ষ্মীকে আহ্বান করা হয়। আবার পেঁচা যে লক্ষ্মীর বাহন তারও একটা বিশেষ অর্থ আছে। রাত্রের ধানের মরাইতে যে সব ইঁদুর ইত্যাদি জীবগণ উপদ্রব করতে আসে, পেঁচা তাদের শত্রু স্বরূপ তাদের ধ্বংস করে এবং মরাই রক্ষণ করে সুতরাং পেঁচার যেমন লক্ষ্মীর বাহন হওয়াতে সার্থকতা আছে, তেমনি মরাই এর দেয়ালে পেঁচার পরিকল্পনা আঁকাতেও একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। দেখলাম প্রত্যেক বাড়ীতেই মেয়েরা এটাকে একটা পরম্পরাগত প্রথার মত পালন করে আসছে। লীলায়িত রেখা ও উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশের অপূর্ব বিন্যাসে সমস্ত বাড়ীটা যেন তক্তক্ করছে এবং একটা

অনিবর্বচনীয় স্নেহ ও পবিত্রতার ভাবে মাখা হয়ে রয়েছে। অনেক দেশ ঘুরেছি, কিন্তু পল্লীর মেয়েদের আত্মার নির্মলতার সহজ ভাবের এবং সৌন্দর্য্য অনুভূতির ও সৌন্দর্য্য অভিব্যক্তির এমন সুমধুর মূর্ত্তিমান দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখিনি।

আর একটি বাড়ীতে গেলাম। সেখানে ব্রজগোপীদেবী নাম্নী একটি ৩২ বৎসর বয়স্কা রমনী বাড়ীর বাইরের ও ভিতরের দেয়ালগুলি নানাপ্রকার সুন্দর প্রাচীরচিত্রে শোভিত করে রেখেছেন। কদম গাছের জলে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন, গাছে কদমফুল ফুটে রয়েছে। নীচের রাস্তা দিয়ে রাধা কলসী কাঁখে নিয়ে জল আনতে যাচ্ছেন, এমন একটি সুন্দর সহজ পবিত্র ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন যা বর্ণনার অতীত। ইনি ঘরের ভিতরকার দেয়ালে যে চালচিত্রটি এঁকে রেখেছেন সেটি শিল্পক্ষেত্রে একটি উচ্চস্থানের অধিকারী। নীচে জলের পরিকল্পনা, দু'দিকে দুটি মকরের মাথা। কেন্দ্রস্থলের নীচে একটি লীলায়িত পাপড়িওয়ালা পদ্মের মৌলিক পরিকল্পনা;তাঁর উপরে একটি সিংহাসনে লক্ষ্মী ও নারায়ণের অতি সুন্দর পরিকল্পনা। দুই দিকে দু'টি লক্ষ্মীর পেঁচা। এই পেঁচাগুলির চিত্র রসসম্পদে ভরপুর। পেঁচাদুটির আশে পাশে ফুল-ফল-পূর্ণ বাগানের পরিকল্পনা এবং উপরে ও নীচে ধানের শীর্ষের অতি সুন্দর মৌলিক পরিকল্পনা রয়েছে। ফুল লতাপাতার বিচিত্র পরিকল্পনার সমাবেশে এই চালচিত্রটি একটি অনিবর্বচনীয় শোভা ধারণ করেছে। বাংলার পল্লীর লক্ষ্মীস্বরূপিনী সরল ও নির্ম্মলপ্রাণ মেয়ে ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশের মেয়েদের দ্বারা যে এ পরিকল্পনা সম্ভব হত না, তা স্থির নিশ্চয়।

রামনগর গ্রামের প্রমোদিনী দেবী নাম্নী একটি ৪২ বৎসরের বিধবা ব্রাহ্মণ মহিলা তাঁর বাড়ীর ঘরের ভিতরে যে একটি চালচিত্র এঁকে রেখেছেন সেটি উপরোক্ত চালচিত্র হতে একটি বিভিন্ন প্রণালীর শিল্প অতি অপরূপ রসে ও সৌন্দর্য্যে ভরপুর। (এই চালচিত্রটির একটি প্রতিরূপ এই সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।) এর নীচের দিকে মর্ত্ত্যলোকের পরিকল্পনা এবং উপরের দিকে স্বর্গলোকের পরিকল্পনা। মর্ত্ত্যলোকে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও তাঁদের তিনজন সহচর বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই পাঁচটি মহাপুরুষের অথবা "পঞ্চতত্ত্বের" চিত্র আঁকা হয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই দুই হাত তুলে ভক্তিরসে গদগদ হয়ে কীর্ত্তন নৃত্য করছেন। প্রত্যেকের পায়ের নীচে এক একটা পদ্মের পরিকল্পনা রয়েছে। দুই পাশে দুইটি বৈষ্ণবের চিত্র। উপরে স্বর্গলোকের মাঝখানে বিষ্ণু, তাঁর দুইপার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুইটি পরিচারিকা চামর দিয়ে এঁদের ব্যজন করছে। তাঁদের এক পাশে গণেশ ও শিব এবং অপরদিকে ব্রহ্মা ও নারদ। বিষ্ণুর নীচে তাঁহার বাহন গরুড়, লক্ষ্মীর নীচে তাঁর বাহন পেঁচা এবং সরস্বতীর নীচে তাঁর বাহন হংস। একটা পবিত্রতাময় গাম্ভীর্য্যরসে এই চিত্রটি ভরপুর। চালচিত্রের উপরে পদ্মের ও লতার দুইটি চমৎকার সারি রয়েছে—একটি হলদে ও একটি লাল। শিল্পচাতুর্য্যে এই দুটি চালচিত্র পেশাদার শিল্পীদের ঈর্ষার উদ্রেক করবে। কিন্তু এত অল্প

চেষ্টায় এবং এত অবলীলাক্রমে এত সহজ সরল ও মাধুর্য্যরসে মাখিয়ে দিতে পারেন এ রকম সাধ্য তাঁদের মধ্যে অনেকেরই যে নেই তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

একদিকে যেমন লীলায়িত রেখা আঁকবার চমৎকার কৌশল, অপর দিকে আবার মনোমুগ্ধকর বর্ণবিন্যাসের অপূর্ব শক্তি, এই দুইটির সমাবেশে এই সকল প্রাচীরচিত্র গুলি রসকলাক্ষেত্রে যে একটি অতি উচ্চ আসনের অধিকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সকল মেয়েরা কারো কাছে চিত্র শিক্ষা লাভ করেন নি। তাঁরা শুধু মা, দিদিমা ও পাড়-পড়শী মেয়েদের কাছ থেকে পুরুষানুক্রমিক পরম্পরার ধারা অভ্যাস করে আসছিল। এক সময়ে পশ্চিম বাংলার ঘরে ঘরে এ রকম অনিন্দ্যসুন্দর রঙ্গীন প্রাচীরচিত্রের ছড়াছড়ি ছিল। যেখানে রেল লাইন গিয়েছে, যেখানে সহর হয়েছে, সেখানে এই প্রথা ধ্বংস হয়েছে। সেখানকার মেয়েরা পুরুষদের মতন বাবু বনে আজকালকার সহুরে সৌখিন বিলাস-শিল্প ব্যবহার ও শিক্ষা অভ্যাস করছেন। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির প্রাচীন সংকৃষ্টিমূলক এই যে পুরুষানুক্রমিক রসাভিব্যক্তির শক্তি এখনও দুই একটা গ্রামে অবশিষ্ট রয়েছে তা এই সকল সহুরে ও অর্দ্ধ সহুরে যদি অবিলম্বে বিনাস না হয়, তাহলে এখনও যা অল্প কিছু অবশিষ্ট আছে তাও দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যাবে। পল্লীর নিরক্ষর মেয়েদের হাতের কাজগুলি যে আমাদের শিক্ষিত সমাজ অবজ্ঞার চক্ষে দেখে থাকেন, এ-ই আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার মূঢ়তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ এই যে, সহজ রেখা ও বর্ণের সমাবেশময় রসব্যঞ্জনায় ভরপুর বিশুদ্ধ চিত্র শিল্পের এই যে ধারা বাংলার গ্রামে নিরক্ষর মেয়েরা ও বিশ্বকর্মার বংশধর বাংলার অবগত পটুয়াগণ যুগের পর যুগ চর্চ্চা করে এখনও কিঞ্চিৎ রক্ষা করে রাখতে সমর্থ্য হয়েছে, এই চিত্র রসকলায় বাঙ্গালীর মাতৃভাষা স্বরূপ;এবং বিদেশী শিল্পকলার কথা দূরে থাক অজন্তা, রাজপুত ও মোগল শিল্পের গর্বিত প্রণালী হতে ও আমাদের প্রাচীন বাংলার এই সহজ সরল আধ্যাত্মিকতাময় ও রসব্যঞ্জনাময় চিত্রধারা যে আরও অধিক উচ্চাঙ্গের রসকলা সেটা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের শিক্ষিতসমাজ একদিন বুঝতে পারবে। আমাদের দেশের সহুরে শিল্পীরা এখনও বাইরের রংচং এর আড়ম্বরের চর্চ্চায় মত্ত। বাহ্যিক সৌন্দর্য্যময় রূপকল্পনার বিলাসিতার স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে তাঁরা আধ্যাত্মিক রসব্যঞ্জনার সহজ সরল শক্তি ভুলে গিয়েছেন। পাশ্চাত্য জগতে যাঁরা আজকাল অগ্রণী চিত্রশিল্পী, তাঁরা এটা বুঝতে পেরেছেন যে বাহ্যিক রংচং এর ও রূপ লাবণ্য বাহুল্যের সমাবেশ চিত্র শিল্পের রসব্যঞ্জন শক্তি বিনষ্ট হয়। তাঁরা আজ বাইরের চাকচিক্য ছেড়ে দিয়ে যে ধারা ধরতে চেষ্টা করছেন বাংলার মেয়েরা তাদের আলপনা ও প্রাচীরচিত্রের এবং পল্লীগ্রামের দীন-দুঃখী পটুয়ারা তাদের জড়ানো পটে কৃষ্ণলীলা, রামলীলা ও গৌরাঙ্গলীলা ইত্যাদির চিত্রাবলীতে সেই অনাবিল চিত্রধারারই চর্চ্চা যুগের পর যুগ করে আসছেন। ভগবান

করুন, আমাদের আধুনিক শিক্ষার মূঢ়তার ফলে এগুলি সম্পূর্ণ লোপ পাবার আগে যেন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও আমাদের সহুরে শিল্পীগণ আমাদের এই জাতীয় চিত্র শিল্পের বহুমূল্য গুণ চিনবার শক্তি লাভ করেন এবং এই ধারার বহুব্যাপক চর্চা করে আমরা যেন আবার বাংলাদেশকে রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির শক্তিতে অনুপ্রাণিত করে ঘরে ঘরে নরনারীর চরিত্রকে নির্ম্মল সৌন্দর্য্যরসের সহজ অনুভূতিতে মার্জিত পবিত্র ও আনন্দময় করে তুলতে পারি।

বাংলার মেয়েদের কলা-প্রতিভা

যে দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সংকৃষ্টি (culture) বহুব্যাপক ভাবে বিস্তৃত সেই দেশই প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার উচ্চাসনের অধিকারী বলে গণ্য। রসের অনুভূতির, রসের অভিব্যক্তির ও রসশিল্পের চর্চ্চার ব্যাপকতা জাতীয় সংকৃষ্টির একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। প্রাচীন বাংলার ও প্রাচীন ভারতের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের, ধর্ম্মের ও শিল্পের বহুব্যাপক চর্চ্চা একটি অতি উচ্চ সংকৃষ্টের লক্ষণস্বরূপ বর্ত্তমান ছিল। সম্প্রতি পাশ্চাত্য নমুনার অনুকরণের ফলে আমাদের দেশের প্রাচীনকালের অধ্যাত্ম জ্ঞানের, ধর্ম্মের, রসানুভূতির, রসাভিব্যক্তির ও রসশিল্প চর্চ্চার ক্ষেত্রে সেই ব্যাপকতা আমরা হারাইতে বসেছি। দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ছড়াছড়ির ও রসশিল্প-কৌশলের সহজাত যে প্রতিভা আমাদের দেশে ছিল তার জায়গায় বর্ত্তমান যন্ত্রতান্ত্রিক ও পণ্যতান্ত্রিক যুগে তা লোপ পেয়ে সহরের কয়েকটি স্কুলের বই-মুখস্থ-করা-বিদ্যাই আমাদের দেশের শিক্ষা ও সংকৃষ্টির সম্বল হয়েছে, আর রসকলার ক্ষেত্রে দেশের নরনারীর মধ্যে যে বহুব্যাপক সহজাত কৌশল ও প্রতিভার সঞ্চার হয়েছিল তা নষ্ট হয়ে গিয়ে কলাপ্রতিভার স্বাভাবিক উৎস দেশে শুকিয়ে গিয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দশা ললিত কলার ক্ষেত্রেও সেই দশা। স্বাভাবিক উৎসবকে শুকিয়ে দিয়ে আমরা সহরে সহরে খাড়া করেছি—শিল্পের স্টুডিও (Studio) ওরফে কলাভবন অথবা কারখানার আর এই সব Studio ও কলাভবনগুলিতে বস্তুশিল্পের কারখানার মতই অগণিত চিত্র ইত্যাদি শিল্প তৈরী হয়ে দেশ শুদ্ধ পণ্যশিল্পের মতই অল্পবিস্তর দরে ছড়াচ্ছে। দেশের লোকের মধ্যে যে স্বাভাবিক রসানুভূতির শক্তি ছিল, তা কিন্তু গিয়েছে লোপ পেয়ে; কাজেই সহরে কারখানার তৈরি এই সব শিল্পের উৎকৃষ্টতা নিকৃষ্টতা বিচার করবার শক্তিও দেশের লোকের লোপ পেয়ে গিয়েছে। অন্যান্য বস্তুর মত এখন বিজ্ঞাপনের চোটেই শিল্পের কাট্‌তি। যে শিল্পী নিজের

▸▸ *বঙ্গলক্ষ্মী, পৌষ ১৩৩৯*

নামে যত বিজ্ঞাপন দিতে পারেন অথবা যিনি বড় বড় লোকের সার্টিফিকেট যোগাড় করতে পারেন, তাঁরই চিত্রের দাম হয় বেশী।

এই যে শোচনীয় অবস্থা আমাদের দেশে এসেছে তার একমাত্র প্রতিকার—সহুরে বিলাস-শিল্পের মোহ ত্যাগ করে বাংলার পল্লীবাসী পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে (বিশেষভাবে মেয়েদের মধ্যে) যে সহজাত শিল্পকলা কৌশলের বিকাশ এক সময় ছিল ও যা এখন সম্পূর্ণ লোপ পেতে বসেছে তাকেই পুনরায় ফুটিয়ে তোলা। বাংলার পল্লীর এই সহজ সরল, প্রাণবান ও শক্তিশালী কলাপ্রণালী আমাদের আধুনিক নাগরিক শিল্পের বিলাসিতা ও চাকচিক্যময় প্রণালীর চেয়েও যে অনেক উঁচুদরের ও আধ্যাত্মিক রসব্যঞ্জনার দিক দিয়ে অনেক বিশুদ্ধতর তা আমাদের বুঝে নিতে হবে;তবেই আমরা দেশের লোকের চরিত্রকে এই আধুনিক সহুরে কৃত্রিম বিলাসিতাময় ভাব থেকে ফিরিয়ে আবার সহজ সরল, নির্মল, প্রাণবান ও সবল করে তুলতে পারব।

পল্লীর মেয়েদের যে কি আশ্চর্য্য শিল্পকলাকৌশল ছিল তার নির্দেশস্বরূপ একটি রঙ্গীন পুরাতন কুলার চিত্র এই ....

বড় অক্ষরে তুলির স্নেহমাখা টানে তিনি শিখে রেখেছেন। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর বিপর্য্যয়ে সাবিত্রীবালা আজ আর ইহ জগতে নাই; কিন্তু এই সুচিত্রিত কুলার উপর তুলির স্নেহমাখা টানে আঁকা তাঁর নাম তাঁর স্মৃতিকে আমাদের মাঝে অমর করে রাখবে। সাবিত্রীর মা যশোহর জেলার ডোঙ্গাঘাটা গ্রামের মহিলা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী নলিনীবালা বসু। পল্লীশিল্পে আমার অনুরাগের কথা শুনে শ্রীমতী নলিনীবালা অনুগ্রহ করে তাঁর স্নেহের মেয়ের মধুময় স্মৃতিমাখা বহুমূল্য এই কুলাটি আমাকে উপহার দিয়ে আমাকে অতি গভীর কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। ১৪ বৎসর পূর্ব্বে নূতন অবস্থায় এই কুলার যে মনোহারিত্ব ছিল তার শতাংশের একাংশও এখন যে নাই তা সত্য;এমন কি কুলার কিনারার এবং মাঝখানেরও অনেক জায়গায় নক্সার রংগুলি বহুদিনের ব্যবহারে ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী অবহেলার ফলে মুছে উঠে



বরণ কুলো (পূর্ববঙ্গ)

গিয়েছে; কিন্তু এখনও এর যে সৌন্দর্য্য ও মনোহারিত্ব অবশিষ্ট আছে, সেইটুকুই অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলার পল্লীর মেয়েদের মধ্যে উঁচুদরের শিল্পকৌশলের যে কি অপূর্ব বিকাশের ব্যাপকতা ছিল তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পেতে আমাদিগকে শিহরিত করবে। কুলাটির উপরের দিকে যে একটি বড় পদ্ম আঁকা রয়েছে, এটি রেখাঙ্কনের ছন্দে ও বর্ণবিন্যাসের কৌশলে .... এক কোণে একটি হাঁসের পরিকল্পনা ও অন্য কোণে একটি ঝরা পদ্মের টাঁঠির ছবি এবং পদ্মের দুই পাশে প্রত্যেক দিকে তিনটি করে প্রজাপতির ছবি অতি সূক্ষ্ম রেখাপাতের সহিত আঁকা হয়েছে। কুলাটির মধ্যভাগে লতা বিতানের মাঝখানে একটি হাতীর ছবি অতি সুন্দর ভাবে আঁকা হয়েছে। চারিদিকে লতা ও ফলের অতি মনোহর পরিকল্পনা। হাতীর ছবির নীচের দিকের ও ফুলটির কিনারার চিত্রগুলি যদি মুছে না যেত তা হলে কুলাটি দেখতে যে আরও কত সুন্দর হত তা এর থেকেই কতকটা অনুমান করা যায়। রেখার সাবলীল ছন্দের ও বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল বর্ণের সমন্বয়পূর্ণ সমাবেশের দিক দিয়ে এই চিত্রটি যে একটি অতি উচ্চ অঙ্গের শিল্প তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। একটা অনিবর্ব্বচনীয় সরলতা ও শুচিতা যেন ছবির প্রত্যেকটি রেখাপাতের ও প্রত্যেকটি বর্ণবিন্যাসের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হয়ে আছে। যে নাগরিক বিলাস শিল্পের প্রচলন ও ফ্যাসান পল্লীর এই অমূল্য প্রাণবান্ শিল্পকলার প্রচলনকে ধ্বংস করতে বসেছে। তাতে এ রকম অনিবর্ব্বচনীয় শুচিতা, সরলতা ও রসের এ রকম সহজ বিশুদ্ধ ও সুমধুর, সমাবেশ খুব কমই খুঁজে পাওয়া যায়। অযত্ন-রক্ষিত ও নষ্টপ্রায় এই চিত্রিত কুলাটিই বাংলার পল্লীর ধ্বংসোন্মুখ অনুপম শিল্পকলা প্রতিভার ব্যাপকতার প্রতীকস্বরূপ। নাগরিক শিল্পের বিলাসিতা ও চাকচিক্যের মোহ ত্যাগ করে আমরা আবার এই সহজ সরল বিশুদ্ধ ও বহুব্যাপক শিল্পকলা প্রতিভাকে বাংলার ঘরে ফিরিয়ে আনতে চাই; আর তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে আনতে চাই বাংলার ঘরে ঘরে নাগরিক জীবনের শিক্ষার ও ফ্যাসানের বিলাসিতা ও কৃত্রিমতার পরিবর্ত্তে বাংলার পল্লীর সাদাসিদে নরনারীর সহজ সরল ও আনন্দময় স্বভাব—যে স্বভাব এই অনুপম মাধুরীময় চিত্রকলায় স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ করেছে। তা করতে পারলে আমরা বাংলার বর্ত্তমান শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজের জীবনের কৃত্রিমতা, নীরসতা ও নিরানন্দময়তার নিরাকরণ করে তাকে আরো প্রাণবান, সরস ও আনন্দময় করে তুলতে পারব। বিলাসের বস্তুর পরিবর্তে শিল্পকে আবার সহজ, সরল ও নির্মল করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনপ্রণালীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত করে তৈরি করে তুলতে হবে। তা হলেই দেশে বাস্তবিক শিল্পের পুনরুজ্জীবন হবে এবং তার ফলে জাতির জীবন সরস ও আনন্দময় হয়ে উঠবে। শিল্পকে আমরা যে এখন বিজাতীয় আদর্শের অনুকরণে—ব্যবসায়ের বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য করে তুলেছি, তার পরিবর্ত্তে শিল্পকে জাতির সকল নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ

মাত্র করে তুলে জীবনের তুচ্ছ বস্তুগুলিকেও শিল্পের সহায়তায় সৌন্দর্য্যের আধার করে তুলতে হবে। এই চিত্রিত কুলাটি তার একটি উদাহরণ। ইহা তুচ্ছ জিনিস। সামান্য বাঁশের তৈরি। কিন্তু বাংলার পল্লী নারীর অন্তরের সহজ প্রেমের ও আনন্দের অনুপ্রেরণাময় স্পর্শে ইহা একটি অপূর্ব কলাসম্পদ হয়ে উঠেছে।

কুলার চিত্রণপ্রণালী নিম্নে বর্ণিত হল ঃ—

বাজার থেকে নূতন কুলা কিনে আনা হয়। ভাল এঁটোল মাটি এনে জলে শুকিয়ে ন্যাকড়ায় ভাল করে ছেঁকে নিতে হয়, যাতে ঐ কাদার সঙ্গে কাঁকর বা কোন ময়লা না থাকে। তারপর কুলার উপর ন্যাকড়া পেতে তাতে সাবধানের সহিত সমান ভাবে কাদা লেপতে হয়। ন্যাকড়া ও কাদা কুলায় দৃঢ়ভাবে এঁটে যায়। ঐ কাদা শুকোলে তার উপর খড়ি গুলে তুলি দিয়ে লাগিয়ে শুকিয়ে লওয়া হয়। তার উপর নানারঙ্গের চিত্র আঁকা হয়। এই চিত্রণের কাজ তুলি ও হাত দিয়ে করা হয়। বাঁশের কঞ্চি চিবিয়ে নিয়ে, একটা কাঠি দিয়ে ফাঁক করে অনেকটা চিমটির আকারের একটি যন্ত্র তৈরি করা হয়। এটা আঁকবার কাজে লাগে। ভাঙ্গা কাঁচের চুড়ির সহায়তায় বৃত্ত আঁকা হয়। যে সকল বেদেরা শূকর পালন করে তাদের কাছ থেকে শূকরের ঘাড়ের লোম সংগ্রহ করা হয়। এই লোম সরু বাঁশের শলায় বেঁধে তুলি তৈরি করা হয়।

রঙ মেয়েরা নিজেরা তৈরি করে নেন। বাজার থেকে সিঁদূর, হরিতাল, খয়ের ও নীল কিনে আনা হয়। হলুদ রান্নাঘর থেকেই মিলে। দু'চারটা ফুলও মাঝে মাঝে কাজে লাগে। তেঁতুলের বীচি সিদ্ধ করে তার উপরের লাল খোসা ঘষে তুলে ফেলা হয়। তারপর আটা শুদ্ধ বেলের বীচির সঙ্গে তেঁতুলের বীচি ঘষে অবলেহ তৈরি করা হয়। এক একটি পাত্রে কাঁচা দুধে সিঁদূর হরিতাল প্রভৃতি গুলে পৃথক পৃথক রাখা হয়। রঙ্গের সঙ্গে জল ব্যবহার করা হয় না। শেষটা নানা পাত্রের রং মিশিয়ে সবুজ কুটুকী প্রভৃতি নানারকম রং তৈরি করা হয়।

রং তৈরি ও রং-এর বিন্যাসে পল্লীর মেয়েরা পাকা ওস্তাদ ছিলেন।

বিবাহ, অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ প্রভৃতি যাবতীয় শুভ অনুষ্ঠানে যে সকল বরণকুলা লাগে তা মেয়েরা অতিযত্নে সুচিত্রিত করতেন। এটা বহুকালের বহুব্যাপক প্রথা ছিল। এ ছাড়া পিঁড়ি, ঘড়া, লক্ষ্মীর সরা প্রভৃতিতে সুন্দর সুন্দর চিত্র আঁকতেও মেয়েদের অশেষ দক্ষতা ছিল। এমনকি পূজার প্রতিমার কাঠামো সুন্দর চালচিত্র আঁকতেও কোন কোন মেয়েরা বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

এগুলি পাশ্চাত্যের অনুকরণে সহরের স্টুডিও (Studio) ওরফে কলাভবন অথবা কারখানায় তৈরি হত না;এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রদর্শনীতে প্রাইজের প্রতিযোগিতার জন্য অথবা হালফ্যাসানের ন্যায় কড়াদরে বাজারে বিক্রয়ের জন্য তৈরি হত না। সমগ্রজাতির নরনারীর দৈনন্দিন জীবনে সহজ সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অকৃত্রিম ব্যঞ্জনার বনফুলের

মতই স্বাভাবিক ভাবে দেশের প্রতি ঘরে ঘরে এই অমূল্য জাতীয় কলাকৌশল ফুটে উঠত। সভ্যতার ও সংকৃষ্টির এই যে চরম পরিণতি রসকলার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে একদিন হয়েছিল, বর্ত্তমান নাগরিক কৃত্রিম ও সঙ্কীর্ণ আদর্শের মোহ ত্যাগ করে আমরা আবার যাতে সেটি দেশে ব্যাপকভাবে ফিরিয়ে এনে ফুটিয়ে তুলতে পারি—ভগবান করুন, সেই সুবুদ্ধি সেই শক্তি ও সেই প্রবৃত্তি যেন অচিরে আমাদের শিক্ষিত সমাজের নর-নারীর হয়।

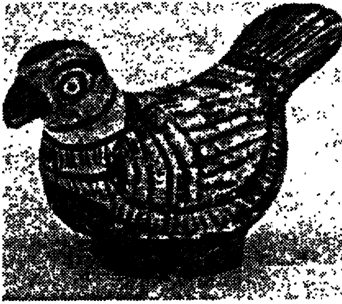


রুমাল কাঁথা, উনবিংশ শতাব্দী (খুলনা)

বাংলার পুতুল

বাংলার পুতুল ও খেলনার মূর্ত্তিগুলির মধ্যে বাংলার জাতীয় সংস্কৃতির এমন একটি সুস্পষ্ট ছাপ আছে, যাতে করে অন্যান্য প্রদেশের পুতুল ও খেলনার থেকে এগুলির পার্থক্য সহজেই বোঝা যায়। অল্প কথায় একটু আলোচনা অসম্ভব, তাই এখানে সামান্য কয়েকটি বিশেষত্ব উল্লেখ করা গেল।

বাংলা দেশে পুতুল ও খেলনার মূর্ত্তি সাধারণত গাছের পাতা, কাপড়, ময়দা, মাটি, কাঠ বা গালা দিয়ে তৈরি হয়। এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রণালীর সবচেয়ে আদিম নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় বাংলার অনেক গ্রামে গাছের তলায় গ্রাম্য-দেবতার বেদীর উপর ছোট ছোট মানুষের মূর্ত্তির সহজ কাঠামো রূপে ও বিভিন্ন পশু-মূর্ত্তি আকারে। এই মূর্ত্তি নির্মাণ প্রণালীর অপর দিক আমরা দেখতে পাই, গ্রামের মেলায় সুচিত্রিত কাঠ বা মাটির মনোজ্ঞ মূর্ত্তির আকারে, যা দর্শক মাত্রেরই মনে আনন্দ পরিবেশন করে থাকে। আদিম প্রণালীর যেসব মূর্ত্তিগুলির কথা বলা হ'ল, এই মূর্ত্তিগুলিতে আমরা পাই সুপ্রাচীন মহেঞ্জোদারো যুগের ধারার জীবন্ত অবিচ্ছিন্ন পরিসৃতি।



পোড়ামাটির পুতুল

বাংলার এই মূর্ত্তি বা পুতুল শিল্পের একটা বিশিষ্টতা এই যে, এই সামান্য জিনিসগুলির ভিতর দিয়ে অতি সহজাত শিল্প-প্রতিভার গুণে পল্লীশিল্পীগণ উঁচুদরের কলা সৃষ্টি করে

▶▶ *বাংলার শক্তি, শ্রাবণ ১৩৪৫*

থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের কলা নিদর্শনগুলিকে গঠন-সুষমাপ্রধান ও চিত্র-সুষমাপ্রধান এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এই নিদর্শনগুলি সবই রঙীন। সুতরাং এই প্রবন্ধে সেগুলির কেবল মাত্র একরঙা ছবি থেকে বাংলার পল্লী-শিল্পীগণের লাল, নীল ও হলুদ রঙের ব্যবহারের অপূর্ব দক্ষতার অতি অপ্রচুর আভাসই পাওয়া যায়।



কাঠের মাম্মি পুতুল

প্রথম শ্রেণীর গঠন-সুষমাপ্রধান মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটি "কলসী কাঁখে নারী মূর্ত্তি" ও একটি "আহ্লাদী" পুতুলের রঙের ব্যবহার এই দুটো মূর্ত্তিতে অতি মনোজ্ঞ ভাবে করা হয়েছে বটে। কিন্তু গঠন সুষমাই এই মূর্ত্তি দুটির বৈশিষ্ট্য। এ দুটি মূর্ত্তির মধ্যে এমন একটি সহজ ও বলিষ্ঠ গঠন সুষমা আছে, যাতে করে একটি জীবন্ত ভাব এনে দেয়। "কলসী কাঁখে" নারীমূর্ত্তির মধ্যে এমন একটি আশ্চর্য্য সমগ্রতা সজীবতা ও গতিশীলতা ফুটে উঠেছে, যা বাস্তবিকই অসাধারণ। বাম কক্ষে যেখানে কলসীর ভার পড়েছে, সেখান থেকে গতির ছন্দ উৎসারিত হয়ে সবর্ব-অঙ্গে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এর গঠন-ছন্দের সঙ্গে রঙের ছন্দ মিলে এক অপূর্ব ছন্দ ও ভাবসমন্বয় সৃষ্টি করেছে।

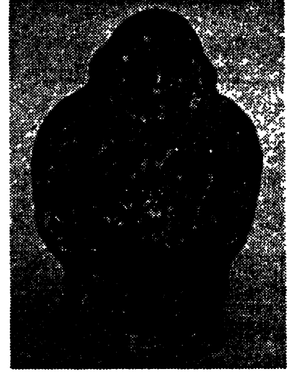


পোড়ামাটির রঙ্গিন পুতুল

"আহ্লাদী" পুতুলটি পল্লীশিল্পীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নৈপুণ্যের এক বিশিষ্ট নিদর্শন। মূর্ত্তির কোথাও আতিশয্যের দোষ নেই, ইহার গঠনপ্রণালী অতি সহজ সরল ও মিততাপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও চিত্তাকর্ষক হয়েছে। এর সকল প্রত্যঙ্গ মিলে এক অপূর্ব হাস্যময়ীমূর্ত্তি সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে যেন হাসি ফুটে বেরোবার চেষ্টা করছে, অথচ সর্বত্র একটি সহজ সংযমের ভাব রয়েছে। এখানে দেখতে পাই, পল্লীশিল্পী সাধারণ শিল্পীর মত হাস্যরসের অপরিমিত আতিশয্য বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অতিশয় হাস্যোড়ম্বর-প্রকাশ থেকে নিজেকে একটি সহজাত কলাজ্ঞানের প্রেরণার বলে বিরত করে রাখতে সমর্থ হয়েছে। "কাদাখোচাপাখী" চিত্রসুষমা প্রধান দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলনার মধ্যে পড়ে। সামান্য মাটির মূর্ত্তিতে মোটামুটিভাবে পাখীর গঠন রচনা করে পালকের সাদাজমি ও শরীরের অন্যান্য অবয়বের হলদে জমির উপর লাল ও কালো রেখা-চিত্রের সহজ সরল রচনা বিন্যাস করে শিল্পীর প্রতিভা পাখীটিকে প্রাণদান

করে তুলেছে। এই সকল পুতুলের ও খেলনার পরিকল্পনায় কোন জটিলতা নেই, এদের রেখা এবং রং-এর রচনা অতি সহজ ও সরলভাবে অঙ্কিত হয়েছে, শিশুমন যাতে সহজে এর রস অনুভব করতে পারে।

শাড়ী-পরা ও কাঁচুলি-আঁটা গতিশীল নারীমূর্ত্তি বাংলার পল্লীশিল্পীর অসাধারণ কলাপ্রতিভার একটি মনোরম নিদর্শন। এই মূর্ত্তিটিতে চমৎকার চিত্র-সুষমাপ্রতিভার সঙ্গে বলিষ্ঠ গঠনসুষমার মিলনে একটি মনোজ্ঞ সৃষ্টির অবতারণা হয়েছে। পটুয়াদের রচিত পটের ছবিতে সাড়ীর ভাঁজ আঁকার যে সুন্দর প্রাচীন প্রণালী পরিলক্ষিত হয়, এর বসনবিন্যাসরচনা তদ্রূপ। এই মূর্ত্তিটি সজীব তেজস্বিতা এবং লাল, সবুজ ও কাল রঙে চিত্রবিন্যাসের সমন্বয়-সম্ভূত আনন্দোদ্বেল রচনা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। বাংলার খাঁটি পল্লী-নারীর সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও নির্ভীক জীবনের আদর্শ পল্লীশিল্পী এতে অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।


আহ্লাদী পুতুল

রঞ্জিত কাঠের পুতুল দুইটির সঙ্গে মিশরের "মাম্মি"র বহিরাবরণের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এই জন্য অনেকে হয়ত ভাববেন যে এগুলি মিশরের মাম্মিব রচনার অনুকরণ। কিন্তু এই অনুমান ভ্রান্ত। এগুলি যে বাঙ্গালী শিল্পীর একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

"মা ও ছেলে"র মূর্ত্তিতে মাতৃত্বের মহনীয় ভাব অতি সহজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অত্যধিক অসমতল পুতুলমূর্ত্তি নিয়ে শিশুদের খেলা করতে আঘাত লাগতে পারে, সেজন্য মাটিতে উঁচু-নীচু স্থানে না রেখে শিল্পী মায়ের মুখের কাছে শিশুর মুখ অনুচ্চ গঠনের উপর কেবলমাত্র রং ও রেখা-পাতের দ্বারা পরিস্ফুট করেছেন। শাড়ির আঁচল ও জমি রেখাপাতের কৌশলে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পুতুল হিসেবে এর পরিকল্পনা হলেও একে সহজেই পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন প্রখ্যাত মাতৃমূর্ত্তির সহিত তুলনা করা যেতে পারে।

বাংলার পল্লীর এই পুতুলশিল্পের মধ্যে শিল্পীর অন্তর্নিহিত গূঢ় অভিপ্রায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। শিশুদের মনে যাতে অস্থিরতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব না জাগে এবং তাদের জীবন যাতে একটি সহজ সরল শান্ত সুনিয়ন্ত্রিত নিরুদ্বেগ অথচ ছন্দোময় ও আনন্দময় ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, এদিকে লক্ষ্য রেখেই এই পুতুলগুলির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বাংলার পোড়ামাটি-শিল্প

বাংলার পোড়ামাটি-শিল্প দুটো দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে মূর্ত্তি গঠনের দিক, আর একটা স্থাপত্যশিল্পের দিক। এই উভয় দিক দিয়েই আমরা দেখতে পাই, বাংলার অপরাপর শিল্পের ন্যায় এই শিল্পেরও দুটো যুগ আছে। পাল ও সেন আধিপত্য বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রথম যুগ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় যুগ মুসলমান আধিপত্যের সমকালবর্ত্তী, এই যুগ চলেছে প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত।

আমরা প্রাচীন যুগের যে সকল পোড়ামাটি শিল্পের নমুনা পাচ্ছি তার মধ্যে এক পাহাড়পুর মন্দির ছাড়া আর সমস্তই প্রধানত মূর্ত্তি-গঠন-বিষয়ক। মুর্শিদাবাদ জেলার গীতগ্রামে যে সব পোড়ামাটির মূর্ত্তি পাওয়া গেছে (এদের বয়স খ্রীঃপূর্ব্ব তৃতীয় থেকে প্রথম শতাব্দীর মধ্যে) এই প্রসঙ্গে তাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা পোড়ামাটি-শিল্পের প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করতে চাই না। মন্দির, দেউল প্রভৃতি কালজয়ী কীর্ত্তি-স্থাপত্যে এই পোড়ামাটি-শিল্পের কি রকম ব্যাপক ও বহুল প্রচলন হয়েছিল—আমরা তারই আলোচনা করব। বস্তুত বিভিন্ন দিক দিয়ে বাংলার একটি বিশিষ্টরূপ অবদান রয়েছে।

বাংলার পোড়ামাটির যে সব প্রাচীন নমুনা পাই, তার মধ্যে একখানি হচ্ছে গীতগ্রামের অশ্বারোহী মূর্ত্তিফলক। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এখানির বয়স খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী বলে



পোড়ামাটির ফলক—মথুরাপুর দেউল, ফরিদপুর

▸▸ *বাংলার শক্তি, বৈশাখ ১৩৪৬*

অনুমান করেছেন। এই রকমের আর একটা নমুনা আমরা পাই মহাস্থানে আবিষ্কৃত একটি তৈজস-খণ্ডে; তাতে খোদিত আছে—একটি লোক চতুরণ-বাহিত রথে চড়ে যাচ্ছে, সে তীর নিক্ষেপ করছে একটা কিন্নর মূর্ত্তির দিকে।

এই যে দৃষ্টান্ত দিলাম, এরা স্থাপত্যশিল্পের কোঠায় পড়ে না। তা হলেও এরা বাংলার শিল্পের প্রাণবত্তা ও গতিশীলতার পরিচয় দিচ্ছে; পরবর্ত্তী যুগে এই প্রাণবত্তা অধিকতর প্রকাশ লাভ করেছে। বাংলার ভিত্তিগত শিল্প ও সংস্কৃতি-ধারার মধ্যে সুপ্রাচীন যুগ থেকেই একদিকে যেমন স্বকীয় আদর্শ ও স্বকীয় রূপের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়; তেমনি অপরদিকে প্রাগ্-বুদ্ধ যুগের নিখিল-ভারত শিল্প ও সংস্কৃতি-ধারার সঙ্গে এর সংযোগ ছিল। কিন্তু এর পূর্ণ বিকাশ এবং আত্মচেতনা লাভ হল তখনই যখন গুপ্ত ও পাল যুগের রাজন্য ও ব্রহ্মণ্য প্রভাব থেকে এ মুক্তি লাভ করলে।

বস্তুত বাংলার জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় শিল্পধারা বহু শতাব্দী ধরে গুপ্ত ও পাল সংস্কারের চাপে তথা নিখিল ভারতীয় রাজন্য ও ব্রহ্মণ্য প্রভাবে রাহুগ্রস্ত হয়েছিল। পালযুগের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে অবশ্য বাংলার আত্মার অবদান কিছু পরিমাণে ছিল; তা হলেও তার প্রধান অনুপ্রেরণা এসেছিল নিখিল-ভারত ব্রহ্মণ্য-সংস্কৃতি থেকে, বাংলার গণ-সংস্কৃতি থেকে নয়। বাংলা ভাষার সম্পর্কেও আমরা এই রকম দেখতে পাই। তার উৎপত্তি অশোক পূর্ব্ব যুগে হলেও বহু শতাব্দী কাল উহা নিখিল ভারত ব্রহ্মণ্য ও রাজন্য প্রভাবে প্রভাবিত ছিল সেইজন্য পাল যুগের সমাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা ভাব স্বকীয় রূপ মাধুর্য্যে মঞ্জরিত হতে পারে নি। পালযুগের পরেই বাংলা কবিতা, গান, নৃত্য, স্থাপত্য, কাঠ খোদাই শিল্প এবং আমাদের আলোচ্য পোড়ামাটিশিল্প নিজস্ব ভাবধারায় সতেজ ও পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছে। পোড়ামাটি-শিল্প তখন আর ব্রহ্মণ্য সংস্কার প্রভাবিত প্রাণহীন অনুকৃতি নয়, তখন বাংলার শিল্পীরা তার মধ্য দিয়ে বাংলার জাতীয় প্রকৃতির বিশিষ্ট রূপদান করতে সক্ষম হয়েছে। বাঙালী যে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্ব প্রকৃতি ও জীবন পর্য্যবেক্ষণ করে, শিল্পের মধ্য দিয়ে তখন থেকেই তা প্রকাশ লাভ করল।



পোড়ামাটির ফলক—মথুরাপুর দেউল, ফরিদপুর

যে ব্রহ্মণ্য ও রাজন্য প্রভাবিত যুগের বিষয়ে উপরে উল্লেখ করেছি, তারই অবসান কালে বাংলার শিল্পশক্তি পুঞ্জিত হয়েছিল পাহাড়পুর মন্দির রচনায়। এই কালজয়ী ইষ্টক-আয়তন কেবল বাংলা দেশে নয় ভারতবর্ষের মধ্যেও একটি বিশিষ্ট শিল্প-কীর্ত্তি।

একদিকে অস্তোম্মুখ তবুও প্রভাবশালী রাজন্য ও ব্রহ্মণ্য প্রভাব, অপরদিকে জাতীয় ধারার প্রমত্ত জোয়ার—এই উভয়ের মধ্যে যে বিপুল সংঘাত হয়েছিল, তারই পরিচয় আমরা পাহাড়পুরে পাই। এই বিরাট শিল্পের উপকরণ বাংলার মৃত্তিকা (ইট)। কিন্তু এখানেও যে বস্তু রচিত হয়েছে সেটা ব্রহ্মণ্য ও রাজন্য সংস্কৃতির গৌরব-স্মৃতি।

পাহাড়পুরে যে সব পোড়ামাটির ফলক দেখতে পাই, তার প্রকাশশীলতা অপেক্ষাকৃত দুর্বল;কিন্তু তা হলেও বাংলার স্থপিতরা এর মধ্যে বাংলার নরনারীর এবং বাংলার অপরাপর নিজস্ব বস্তুর প্রতিকৃতি যে সগর্বে অঙ্কন করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সেনযুগের শেষভাগ থেকেই বাংলার জাতীয় জীবনের নব জাগরণ শুরু হয়। সেনযুগ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতি সাহিত্য, শিল্পে, শাসন ব্যাপারে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিচিত্রভাবে রূপায়িত হয়।

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও শিক্ষার এবং জয়দেব-চণ্ডীদাসের কাব্য-প্রতিভার আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন হয়েছিল। বস্তুত বাংলার সংস্কৃতির এই নব অভ্যুদয় উহারই ফলস্বরূপ। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, জাতীয় শিল্প জাতীয় ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত হয়ে তার প্রসারে সহায়তা করেছে।

শিল্পের ক্ষেত্রে এই নবধর্ম্মের প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গ লীলার এবং শক্তির নানা রূপ পরিচিত্রণে। বস্তুত বাংলার নিজস্ব আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি এদেরই মধ্য দিয়ে হয়েছে। এ সব ছাড়াও এই শিল্পীরা পশ্চিম ভারতে প্রচলিত রাসলীলা কাহিনী এবং দশঅবতার প্রমুখ হিন্দুপুরাণের আরও কতগুলি ব্যাপার চিত্রিত করেছেন। বহু শতাব্দী অতীত হয়েছে, কিন্তু এই শিল্পধারা তার বিশেষত্ব হারায় নি। তার কারণ এই শিল্পের বাহক সরলপ্রাণ পল্লীবাসীরা, যাদের জীবনধারা অনাদিকাল থেকে অব্যাহত স্বাধীন চিত্তবৃত্তি নিয়ে বর্দ্ধিত হয়েছে; বাইরের কোন রাজন্য বা ব্রহ্মণ্য শক্তি কখনও তাদের জীবনে ও চিত্তে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। যখনই বাইরের থেকে কোন প্রভাব এসেছে, এই শক্তিমান গণ-সংস্কৃতি স্বধারাচ্যুত না হয়ে তখনই তাকে হজম করে নিয়েছে। বাংলার জাতীয় শিল্পধারা এবং জাতীয়-শিল্পীদল একদিকে যেমন বিভিন্ন আগন্তুকের রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি রেখেছে তেমনি অপরদিকে নিজের স্বকীয়তা কখন হারায় নি। তাই পাঠান, মোগল, পর্ত্তুগীজ বা ইংরাজ—যে কেউ তাদের চোখের সামনে এসেছে, তারা নিজস্ব রীতিতেই এদের মূর্ত্তিদান করেছে।

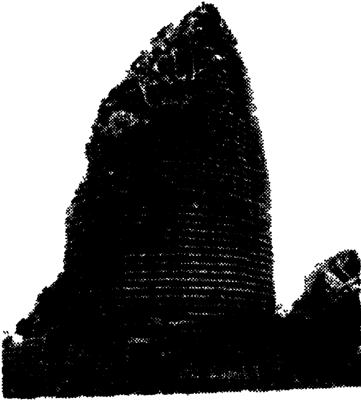
মথুরাপুর দেউল

মথুরাপুরে একটি অতি প্রাচীন অর্দ্ধভগ্ন দেউল আছে—বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া ইহা দেখিবার আকাঙক্ষা আমার মনে জাগ্রত হয়; গত পূজার ছুটিতে অজিত বাবুর পিতার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ইহা দেখিয়া আসিয়াছি।

দেখিবার মত জিনিস এই মথুরাপুর দেউল—স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পে বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন।

(১)

মথুরাপুর গ্রাম ফরিদপুর জিলার রাজবাড়ি মহকুমার অন্তর্গত। ইস্‌টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া শাখার নলিয়াগ্রাম হইতে তিন মাইল ও কালুখালি হইতে এক মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। পূর্বে রেলপথ ও পশ্চিমে চন্দনা নদী হইতে প্রায় সমদূরবর্ত্তী স্থানে এই দেউল শতাব্দীর পর শতাব্দী এই পল্লীগ্রামে এই উন্নত শিল্পের দেউল দাঁড়াইয়া আছে—কোন ঐতিহাসিক, ভাস্কর নতুবা প্রত্নতত্ত্ববিদের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। আমি যখন প্রথম ইহা দেখিতে যাই তখন ইহার চারিদিকে প্রায় ১০ ফুট উঁচু কাঁটা জঙ্গল। অতি কষ্টে একটি সরু পথ ধরিয়া আমি দেউলের পাদদেশে উপস্থিত হইতে সমর্থ্য হইলাম। কাঁটায় আমার সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ আঁচড় লাগিয়াছিল। দক্ষিণ দিকের দ্বারের উপরি



মথুরাপুর দেউলের পশ্চিম দ্বার

▸▸ *প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪০*

ভাগের ও প্রাচীরগাত্রের চিত্রসমূহ আমার চোখে পড়ে—ইহাতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ ভীষণ অন্ধকারময়, তবু আমি ভিতরে প্রবেশ করিতে মনস্থ করিলাম। ইহাতে যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা, কারণ হয়ত ঐ দেউল এখন বন্যপশুর বিশ্রামস্থান অথচ আমাদের সঙ্গে আত্মরক্ষার কোনই অস্ত্র নাই। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া বুঝিলাম আমাদের আশঙ্কা অমূলক। অকস্মাৎ লোকসমাগমে শান্তি ভঙ্গ হওয়ায় কতকগুলি বাদুড় চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল—ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী ছিল না। বাহির হইতে যত মনে করিয়াছিলাম, ভিতরটা কিন্তু তত অন্ধকার নহে। উপরের চূড়া ভগ্ন—আলো ভিতরে প্রবেশ করিবার বেশ পথ পায়। আলোকে দেখিলাম—এই দক্ষিণ-দ্বার ব্যতীত পশ্চিম দিকেও একটি দ্বার আছে, কিন্তু এত জঙ্গল যে গমনাগমন অসম্ভব। লোক নিযুক্ত করিয়া পশ্চিমদ্বারের নিকটবর্ত্তী জঙ্গল পরিষ্কার করিতেই একটি নূতন দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। দেউলের সম্মুখ দিকের প্রাচীরে স্তরে স্তরে নানা বিচিত্র মূর্ত্তি উৎকীর্ণ।

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য আমি নিকটবর্ত্তী অশ্বত্থ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রায় ১৫ ফুট ঊর্দ্ধে উঠিলাম। এইবার মূর্ত্তিগুলির স্বরূপ আমার চক্ষে ধরা পড়িল, ইহাদের অনুপম সৌন্দর্য্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি হইল। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল; বেশিক্ষণ দেখিতে পাইলাম না, তাই প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।



মন্দিরপার্শ্বে। মধ্যস্থলে শ্রীগুরুসদয় দত্ত

ক্ষণকালের দর্শনে আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইল না, বরং বৃদ্ধি পাইল। চারিদিকে জঙ্গল পরিষ্কার করিতে লোক নিযুক্ত করা হইল। দেউলটিকে চারিদিকে ঘিরিয়া প্রায় দশ ফুট স্থান এই ভাবে মুক্ত হইলে আমি পুনরায় গমন করিলাম। দেখিলাম ভূমি হইতে অন্ততঃ ৫ ফুট ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত প্রাচীরের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে—কোথাও বা নোনা ধরিয়াছে, কোথাও বা গাছের শিকড়ে ফাটল ধরিয়াছে। পশ্চিম, পশ্চিম-দক্ষিণ, উত্তর-পশ্চিম এই তিনটি সম্মুখস্থ দেওয়ালেই ভাস্কর্য্যের উৎকর্ষ। এই মূর্ত্তি ভাস্কর্য্যের তেরটি লম্বা লম্বা সারি, তন্মধ্যে পশ্চিমদ্বারের উপরস্থ ছয়টি অটুট আছে।

ভূমি হইতে সঠিক পর্য্যবেক্ষণ সম্ভবপর নহে বুঝিয়া আমি কয়েকটি মাচা প্রস্তুতের উপদেশ দিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন মাচায় উঠিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে চমৎকৃত হইলাম। নিম্নভূমি হইতে একটি পশু-চিত্রের সারি দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল বুঝি-বা এই পশুগুলি ঘোড়া।

নিকটে আসিয়া দেখি এগুলি সিংহ। পদ্মবনের ভিতর দিয়া নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে ইহারা চলিয়াছে—ইহাদের কেশর ও লেজ বীর্য্যবান ঢঙে উৎকীর্ণ, —তাহাতে পৌরুষ, সংযম ও গর্বের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাস্কর্য্যে এরূপ বীর্য্যমান মূর্ত্তি আর কোথাও আমি দেখি নাই। আমার নিঃসন্দেহ ধারণা হইল যে, এই দেউলটি বিজয়স্তম্ভ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।



ভরত ও রাম

এই তিনটি সম্মুখ দিকের দেওয়ালের দক্ষিণাংশে রামলীলা ও উত্তরাংশে কৃষ্ণলীলার নানাবিধ মূর্ত্তি।

এই দেউলের ঐতিহাসিক, স্থাপত্যগত ও ভাস্কর্য্যগত মূল্য সম্পর্কে আমার মনে আর কোন দ্বিধা রহিল না। আমি আরও কয়েকদিন দেউলটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিলাম।



মন্দিরগাত্রে কারুকার্য্য

(২)



কীর্ত্তিমুখ

এই দেউল যে অতি প্রাচীন এ-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। মেজর রেনেল তাঁহার বর্ণনা বা স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন—৮ জুলাই ১৭৬৪—অদ্য অপরাহ্নে দক্ষিণ-পূর্ব্বে দুই তিন মাইল দূরে একটি উচ্চ মন্দির দেখিলাম। ইহা মোত্রাপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী।

১০ জুলাই—মোত্রাপুরের মন্দিরের পাশ দিয়া গেলাম। গ্রামটি নদীর উভয় তীরেই অবস্থিত। মন্দিরের দুই মাইল দূরে একটি বড় নদী পূর্ব্বদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহা দিয়া সময় সময় বড় বড় নৌকা চলিতে পারে, কিন্তু শীতকালে কোন কোন স্থানে একেবারেই জল থাকে না, শুকাইয়া যায়। নদীটি জয়নগর ও হবিগঞ্জের পথে চলিয়াছে এই বাঁক হইতে নদীটি চন্নণা নামের পরিবর্ত্তে কুমার নামে পরিচিত।

মেজর রেনেলের জর্ণালের সম্পাদকগণ এইস্থলে একটি পাদটীকা জুড়িয়া দিয়াছেন (মেময়র্স অব্ দী এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ভলুম ৩, নং ৮, পৃ ৯৫—২৪৮)

পাদটীকা—এই নদী ও কুমার নদীর সঙ্গমস্থলে মথুরাপুর অবস্থিত। এই সময়ের ৭০ বৎসর পুর্বে বৈদ্যবংশসম্ভূত সংগ্রাম শাহ নামক এক ব্যক্তি দ্বারা নির্ম্মিত। কিন্তু জনৈক মিস্ত্রী চূড়া হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করায় মন্দির অসমাপ্ত রহিয়া যায়।

মেজর রেনেলের মানচিত্রে মথুরাপুর বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। যদিও মানচিত্রে দেউলের উল্লেখ নাই, তথাপি ইহার অবস্থান-নির্ণয় কঠিন নহে। রেনেলের মানচিত্র হইতে লঘিমা ২৩°৩৫ ও দ্রাঘিমান্তর কলিকাতা হইতে পূর্বে ১°১৫ নির্ণয় করা যায়। ইহা আমি রেভেনিউ সার্ভে মানচিত্রে দেউলের অবস্থানের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি।

স্থানীয় কিম্বদন্তীও সংগ্রাম শাহ কর্ত্তৃক এই দেউল নির্ম্মাণের কথাই সমর্থন করে, কিন্তু তিনি কোথা হইতে এই গ্রামে আগমন করেন সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, তিনি কাশ্মীর হইতে আসিয়াছিলেন, কেহ বলেন রাজপুতানা হইতে, কেহ কেহবা কোন বিশেষ দেশের নাম না করিয়া বলেন যে তিনি উত্তর দিক হইতেই আসিয়াছিলেন। স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ কোন্ জাতি, তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি অবগত হইলেন যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। যখন তিনি জানিলেন যে ব্রাহ্মণের নীচেই বৈদ্যবর্ণের স্থান, তখন তিনি বলিলেন—হাম বৈদ্য। স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁহার কথার অর্থ (আমি বৈদ্য) না বুঝিয়া ধারণা করিল যে, "হামবৈদ্য" স্বতন্ত্র একটি বর্ণ এবং সংগ্রাম শাহ সেই বর্ণের লোক। কথিত আছে যে, তিনি বলপূর্বক স্থানীয় এক বৈদ্য পরিবারে বিবাহ করেন এবং নিজের কন্যাগণকে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের বৈদ্য পরিবারেই বিবাহ দেন। ইহাদের বংশধরগণ এখনও "হামবৈদ্য" বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করেন।

সংগ্রাম শাহ আদেশ করেন যে, ইহা এত উচ্চ করিতে হইবে যে, চূড়া হইতে যেন ঢাকা নগর দেখা যায়। দেউল নির্ম্মাণ যখন শেষ হইল তখন সংগ্রাম শাহ প্রধান মিস্ত্রীকে চূড়ায় আরোহণ করিতে ও ঢাকা নগর দেখা যায় কি-না বলিতে বলিলেন। মিস্ত্রী চূড়ায় উঠিয়া ঢাকা দেখিতে পায় নাই। সে নিজের দোষ স্খলনের জন্য বলিল যে, সে আরও মাল মসলা পাইলে আরও উঁচু করিতে পারিত; তখন ঢাকা দেখা যাইত। ইহাতে সংগ্রাম শাহের ক্রোধ হইল। আরও জিনিষপত্র সে কেন চাহিল না এই অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে, সংগ্রাম শাহ এরূপ শাসাইলে মিস্ত্রী ঐ চূড়া হইতে লাফ দিয়া আত্মহত্যা করে।

এই শোচনীয় ঘটনার পর এই দেউল সম্পূর্ণ করা হইল না, কোন বিগ্রহ স্থাপনের প্রশ্নও উঠিল না।

রেনেলের স্মৃতি কথার সম্পাদক পাদটিকায় বোধ হয় এই কিম্বদন্তীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

সীতারাম রায়ই এই দেউল নির্মাণ করাইয়াছিলেন, এরূপ একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে; কিন্তু সংগ্রাম শাহ সম্পর্কে কিম্বদন্তী যতটুকু প্রবল সীতারাম রায় সম্পর্কে ততটুকু নয়।

আনন্দনাথ রায় প্রণীত ফরিদপুরের ইতিহাস গ্রন্থে এক সংগ্রাম শাহের বিস্তৃত বিবরণ আছে। টডের রাজস্থানে ঔরংজেবের মনসবদার বলিয়া এক সংগ্রাম শাহের উল্লেখ আছে এবং বাংলাদেশে এক সংগ্রাম শাহ বারভুঁইয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও জলদস্যুদিগকে



সিংহের মুখ

দমন করিয়া শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ ভাগে রাঠোর সর্দ্দারদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন —রায় মহাশয়ের মতে এই তিন সংগ্রাম শাহ্-ই এক। বাংলা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠাতা ও মথুরাপুর দেউল প্রতিষ্ঠাতা সংগ্রাম শাহ যে অভিন্ন, এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। স্থানীয় লোকেরও বিশ্বাস এইরূপ;এবং বহুকাল যাবৎ এরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ফরিদপুরের ইতিহাসেও এইরূপ লিখিত আছে যে, তিনি মথুরাপুরে তাঁহার আবাস নির্ম্মাণ করেন। দেউলের দেওয়ালের মূর্ত্তিগুলিও ইহা সমর্থন করে। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মিণী হরণ ও পরিণয় এই সংগ্রাম শাহের বলপূর্ব্বক বিবাহেরই দ্যোতকরূপে স্থাপিত, এরূপ বিশ্বাস করিলে অন্যায় হইবে না। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বৃন্দাবন লীলার দৃশ্যাবলীতে শ্রীকৃষ্ণ রাখালমূর্ত্তিতেই চিত্রিত, কিন্তু রুক্মিণীহরণ ও বিবাহের দৃশ্যে শ্রীকৃষ্ণের পরিণত বয়স্ক ও পুষ্টায়তন মনুষ্য-রূপ। পুরাণে বর্ণিত মূর্ত্তির সহিত ইহার কোনই সাদৃশ্য নাই।

রামায়ণ দৃশ্য

যদি এই কিম্বদন্তী সত্য হয় তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই দেউল সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধের প্রথম ভাগে নির্মিত হয়—হয়ত ১৬৬৫ খৃস্টাব্দে। একটি সরকারী বিবরণে নির্ম্মাণের তারিখ ১৪৭২ খৃস্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই তারিখ সমর্থন করিবার মত কোন কাহিনী আমি অবগত নহি।

(৩)

দেউলটির গঠনের বিশেষত্ব এই যে, ইহা ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত সমদ্বাদশভুজ। ভূমি হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় সত্তর ফুট। ভিত্তি ভূমিতে ইহার ব্যাস বাহিরের বৃত্তে ৩৪°১১´ ও ভিতরের বৃত্তে ১২°১১´ অর্থাৎ দেওয়াল ১১´ পুরু। দ্বার মাত্র দুইটি—পশ্চিম ও দক্ষিণের দিকে; পশ্চিমেরটিই প্রধান দ্বার। উত্তর ও পূর্ব দিকে নকল দরজা আছে। পূবর্বদিকের দ্বার পিপুল বৃক্ষটিতে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

দেউলের ভিতরে প্রাচীরগাত্রে কোনও কারুকার্য্য নাই; নেহাতই সাধারণ ভাবে ২৯° পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। তারপর চূড়া পর্য্যন্ত "চষা ক্ষেত" পদ্ধতি অর্থাৎ প্রাচীরগাত্র সমান নহে, একবার উঁচু, একবার নীচু। ইহাতে সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। কোন দেউলে ইহার

অনুরূপ আমি দেখি নাই। সর্বোচ্চ চূড়ায় সমদ্বাদশভূজ পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহা যেন বিপরীত ভাবে স্থাপিত জলপাত্রের তলদেশের ভিতর-দিকের ন্যায় ঈষৎ সমতল। এই ছাদের কিয়দংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

ভিত্তিভূমিতে বাহির দিকে এই সমদ্বাদশভূজের প্রত্যেক ভূজ ৯°১১´ মাত্র। একটি পঙ্‌ক্তির পর একটি পঙ্‌ক্তি—এই একই পদ্ধতিতে ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত চলিয়াছে। তবে ভূমি হইতে ২৯°১´ পৌঁছিয়া সামান্য একটু বিরতি আছে—একটি কার্ণিস।

তারপর একই পদ্ধতিতে চূড়া পর্য্যন্ত প্রাচীর উঠিয়াছে—তবে গাত্রে কোন কারুকার্য্য নাই। চূড়ায় হয়ত শোভনীয় "মুকুট" ছিল; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। চূড়ার 'খিলানের'ও বৃহদংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

বাহিরের প্রাচীরগাত্রের অপর বিশেষত্ব ইহার 'পঞ্চরথ' পদ্ধতি—প্রত্যেকটি ভূজে বা প্রাচীরে ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত পাঁচটি পগ (Pagas) চলিয়াছে। সাধারণতঃ এই



পূজারিণী ও বীরসেনা

জাতীয় স্থাপত্যে কেন্দ্রে উন্নত রাহাপগ (Rahapaga) এবং পার্শ্বে ক্রমনমিত অনর্থপগ ও কনকপাগ থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

এই দেউল যে কখনও দেবপূজার কার্য্যে ব্যবহৃত হয় নাই, বা দেবপূজার জন্য নির্মিত হয় নাই বা দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত হয় নাই—আমার এ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ আছে। যতই ইহার কারুকার্য্য এবং স্থাপত্য-নৈপুণ্য পর্য্যবেক্ষণ করা যায় ততই যেন প্রতীয়মান হয় যে, এ দেউল কোন বিজয়ীর বিজয়স্তম্ভ। রাময়ণের ও কৃষ্ণলীলার চিত্রে যুদ্ধের ভঙ্গিমা উৎকীর্ণ আছে বলিয়াই যে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা নহে—এই দেউলের সকল চিত্রই যেন যুদ্ধের ভাব প্রকাশ করে। ভূমি হইতে ২৮ ফিট ঊর্ধ্বে দ্বাদশ ভূজের মধ্যে নয় ভূজ ব্যাপিয়া যে সিংহশ্রেণীর মূর্ত্তি খোদিত আছে, তাহারা যেন গর্বভরে পদ্মবন দলিত করিয়া বিজয়যাত্রায় চলিয়াছে এবং তাহাদের দীর্ঘ সূচীমুখ দন্ত দ্বারা পদ্মকলি ধ্বংস করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, ইহার জলনিকাশের নলেও সিংহেরই মুখ। উদ্দাম মল্লযুদ্ধের চিত্রও ইহাতে উৎকীর্ণ। কীর্ত্তিমুখ তিনটি বিভিন্ন আদর্শে উৎকীর্ণ প্রত্যেকটি আদর্শই রণ-মনোবৃত্তির প্রতীক।



নৃত্য ও বাদ্য

এই দেউলের অপর বিশেষত্ব এই যে, একটির পর একটি স্তরে রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার সমগ্র কাহিনীই পর্য্যায়ক্রমে খোদিত। সম্মুখের তিনটি প্রাচীর গাত্রে পর পর তেরটি স্তরে এই মূর্ত্তির প্ল্যাক্ স্থাপিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যবদ্বীপে সুবিখ্যাত প্রাম্বানাম্ মন্দিরের ভাস্কর্য্যের সঙ্গে অপূর্ব সাদৃশ্য ইহাতে দেখা যায়—উৎকীর্ণ মূর্ত্তিগুলির ঠিক্ সেইরূপ, এমন কি তাহার অপেক্ষাও বেশি, পুরুষোচিত দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা। প্রভেদ এই যে, যবদ্বীপের মন্দির প্রস্তরনির্মিত, দেউলটি বাংলার মাটিতে-গড়া ইষ্টকের।

দেউলের স্থাপত্যে পরিকল্পনা ও গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে বাঙালী ভাবের পরিচায়ক। বাংলার পল্লীগ্রামের বাঁকা ছাদের (জুত) ঘর, বাংলার তৎকালীন রীতিনীতি ও জীবনযাপনের চিত্র. বাংলার নরনারীর আকার-প্রকারের বিশেষত্ব, বাংলার চালা হইতে ঝুলানো ধানের শীস, বাঙালী শাড়ীর অনুপম লীলা মাধুর্য্য—সমস্তই বাঙালী গৃহস্থ ঘরের প্রতিদিনের দৃশ্য বাঙালী পুরুষের দৃঢ়তাব্যঞ্জক চিত্র, ও নারীর শ্রীসম্পন্ন মূর্ত্তি —এগুলি ইটের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা সহজ কাজ নহে। এই দেউল একান্ত ভাবে বাংলার নিজস্ব—বাংলার পুরুষোচিত কৃষ্টির পরিচায়ক। বাংলার বাহির হইতে কোন প্রভাবই ইহাকে স্পর্শ করে নাই। লঙ্কা, মথুরা, বৃন্দাবন—বাংলার বাহিরের বহুঘটনার দৃশ্য, বাংলার এক গ্রাম্য স্থপতি এমন ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, যেন বাংলার কুটীরে বাংলার নর-নারীই ইহাদের নায়ক নায়িকা।



স্নান দৃশ্য

মথুরাপুর দেউল বাংলার গবের্বর জিনিষ। অনুপম ভাস্কর্য্য গৌরবে এই দেউল যে এই কলাজগতে একটি বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিবে ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। আমি এ বিষয়ে সরকারী আর্কিওলজি বিভাগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি।

এই দেউল দর্শন ও তৎপর এই প্রবন্ধ প্রকাশে যাঁহারা আমায় সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

বাংলার লোকনৃত্য

বাংলার বীরযোদ্ধা রায়বেঁশে

রায়বেঁশের পরিচয়

(১)

বাঙালী যোদ্ধার কি স্বরূপ দেখায়
তার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি যদি দেখবি তো আয়।
বোরো বুদুর[১] আর অজন্তার[২] গুহা হ'তে
যেন উঠে এসেছে লোক বাংলার পথে।
বহু দীর্ঘ শতাব্দীর অবজ্ঞা স'য়ে
পথে এসে বীরের দল কাঙাল হয়ে।
তবু ভোলে না অতীতের গৌরব ধারা
নাচে বীরের নৃত্যে, —হ'য়ে আত্মহারা।
পদ দলিত লাঞ্ছিত নির্যাতিত
থাকে নিরন্নোদর—রাখে বক্ষ স্ফীত।

[১] সুদূর বৌদ্ধযুগে যে সকল বঙ্গদেশবাসী যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ কর্ত্তৃক আনুমানিক খ্রীস্টিয় ৭ম শতাব্দীতে এই ভুবনবিখ্যাত "বোরো-বোদুর" মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহার ভাস্কর্য্য ও অতুলনীয় মূর্ত্তিগঠন-দক্ষতা সমগ্র জগতের বিস্ময় উৎপাদন করে।

[২] অজন্তা গুহার চিত্রিত বীরমূর্ত্তির ও পরিচ্ছদ প্রণালীর সঙ্গে বর্তমান "রাইবিশে"দের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পাওয়া গিয়াছে।

রণ-বীরের অতীতের প্রকৃতির ভঙ্গে
ফিরে বীরত্ব-বিশ্রুতি লুপ্ত বঙ্গে।
পায়ে বাজন-নূপুর, বুকে অসীম সাহস,
পেটে অন্নের ক্ষুধা, মুখে নৃত্যের হরষ;—
মুহুঃ হুঙ্কার রবে ভীতি জাগায় মনে,
তেজো-দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ—ঝলক নয়নে;—
বেড়া পাকের চাকে, কভু দ্রুত ঘুরে,
বেগে দাপট মেরে 'কভু' শূন্যে উড়ে;
কভু ব্যাঘ্র-ঝম্পে পড়ে ভূমি তলে,
কভু লম্ফে কাঁপায় ক্ষিতি সিংহের বলে।

মহা— দেবের মূর্ত্তি কালের ভস্মে ঢেকে।
খেলে তাণ্ডব-নৃত্যে গায়ে ধূলি মেখে;—
রণ— ভল্লবিহীন হাতে মুষ্টি পেকে।
রণ— ভল্লবিক্ষেপ রীতি বেড়ায় এঁকে।
কবে আসবে সেদিন—ভাবে থেকে থেকে'—
সেদিন চিন্‌বে স্বদেশবাসী আমরা যে কে?

(২)

শূদ্র যে কে, আর ক্ষত্র যে কে?
স্পৃশ্য যে কে, আর অস্পৃশ্য কে?—
তা বুঝবে জগৎ বাসী এদের দেখে।
কোন্‌টি যে আসল আর কোন্‌টি মেকি—
তা চিনবে জগৎবাসী এদের দেখি'।
খেলে নৃত্যে বাঙলার লোক এদের দেখে
পুনঃ প্রাণে আনন্দধারা আনবে ডেকে'।
কভু হয়না কু-ভাব মনে নির্ম্মল নাচে—
তা শিখবে বাঙলার লোক এদের কাছে।
রণ নৃত্য-কলার তেজোদ্দীপক ধারা,
যারা বুঝবে এদের দেখে বুঝুক তারা।
রণ বীরের ক্রীড়ার তেজোস্ফুটক ধারা
যারা শিখবে এদের কাছে শিখুক তারা।

(৩)

মহা মদ্‌পাত্রের "রায়বেঁশে" সহায়
এমনি ছুটেছিল লাউসেনের ময়নায়।[১]
রাজ নগরবাসী "বীররাজা'র বংশ[২]
রায় বেঁশের সহায়ে করত শত্রুর ধ্বংস।
রাজা মানসিংহের দুর্দ্ধর্ষ ফৌজ 'রায়বেঁশে'
এমনি নাচ্‌ত উল্লাসে রণবিজয় শেষে[৩]
ক- লিঙ্গের সম্রাটের পদাতিক বেশে
এমনি ছুটত রায়বেঁশে'র দল গুজরাট দেশে[৪]
থেকে ছদ্মবেশে অধঃপতিত দেশে
'রায় বেঁশে নাচে রাইবিশের বেশে।[৫]

[১] একাদশ শতাব্দীতে মহামদ্‌পাত্র "ময়নাগড়" আক্রমণ করেন। ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গলে' ইহার উল্লেখ আছে (বঙ্গবাসী সং ১২৯৫, ২৭২ পৃঃ)।

[২] বীরভূম, রাজনগরের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন 'বীর রাজা' বংশীয় হিন্দু রাজগণের এবং তৎপরবর্ত্তী মুসলমান রাজগণের সৈন্যশ্রেণীতে অনেক 'রায়বেঁশে' যোদ্ধা ছিল, এবং তাহাদের বংশধরেরা এখনও 'রাইবিশে'র দল নামে খ্যাত।

[৩] অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র। বঙ্গবাসী সং ১২৯৩, ১১৪ পৃঃ।

[৪] কবিকঙ্কণ চণ্ডী—বঙ্গবাসী সং ১৩১৩, ৯৫ পৃঃ।

[৫] আধুনিক বাঙালীদের বিকৃত রুচির ফলে অনেক স্থলে 'রায়বেঁশে' যোদ্ধাদের বংশধরদিগের বীরোচিত নৃত্যের কিরূপ অবনতি ঘটিয়েছে তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত আছে।

সূচনা

বাঙালীকে প্রকৃত ও পূর্ণ স্বাস্থ্যবান হইতে হইলে প্রথমে হইতে হইবে 'স্ব-স্থ'। এবং 'স্ব-স্থ' হইতে হইলে সাধনা করিতে হইবে বাঙলার 'স্ব-রূপের'। বাঙলার যা কিছু নিছক নিজস্ব সৃষ্টি, সেগুলিতে বাঙলার আত্মার স্ব-রূপ প্রকাশ পায়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ইহা প্রযোজ্য। একদিকে বাঙলার ভাষা, বাঙলার সাহিত্য যেমন বাঙলার 'স্বরূপের অভিব্যক্তি, তেমনি বাঙলার বৈশিষ্ট্যময় নরনারীগণ, যথা —চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, মধুসূদন, বঙ্কিম, দৌলত কাজি, আলাওল, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিও বাঙলার স্বরূপের অভিব্যক্তি। আবার বাঙলার মাটি ও বাঙলার জীবন থেকে জাত রায়বেঁশে নৃত্য, ঢালি নৃত্য, কাঠি নৃত্য, জারি নৃত্য, বাউল নৃত্য, ঝুমুর নৃত্য ও এদের আনুষঙ্গিক জনসঙ্গীতগুলিও বাঙলার স্বরূপের বিশিষ্ট ও গৌরবময় অভিব্যক্তি।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিতেন, "বাঙালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি" এই আত্মবিস্মৃতির মানে—জাতির আত্মার প্রকৃত স্বরূপ হইতে ভ্রষ্টতা—এমনকি সেই স্বরূপের স্মৃতিরও বিলুপ্তি। আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এই দুটিই ঘটিয়াছে। অন্ততঃ কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্ত এই অবস্থা আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ছিল। নানা ঐতিহাসিক কারণে এবং বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষে আমাদের শিক্ষিত সমাজ জাতির নিজস্ব শাশ্বত ধারাগুলি হইতে একেবারে ভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছিল এবং অদৃষ্টের বিপর্য্যয়ে ও বিদেশীদের বহুকাল ব্যাপী বিদ্রূপের ফলে আমাদের এইরূপ বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল যে আমাদের জাতি একটা ভীরু ও অনুন্নত জাত— আমাদের বাঙলাভূমির নিজস্ব প্রথাগুলিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমূলক কোন মূল্য নাই—আমাদের নিজস্ব শৌর্য্যধারা কিছুই নাই; আমাদের জাতির জনসাধারণের যা কিছু আছে, সেগুলো সব সেকেলে মূল্যহীন, কুসংস্কারময় ও লজ্জাকর। যতশীঘ্র সম্ভব সেগুলি সব ত্যাগ করিয়া সিনেমা, রেডিও এবং অন্যান্য উপায়ে ইয়োরোপ-আমেরিকার চরিত্রগত ও সমাজগত যা কিছু প্রণালী সেগুলো গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নাই। সভ্য জাতি বলে গণ্য হইতে হইলে প্রগতির খাতিরে এ ছাড়া আর উপায় নাই।

আজকাল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বরাজ্যের স্বাতন্ত্র্যের স্বাধীনতার এবং মুক্তির জন্য সংগ্রামের প্রচেষ্টা দেশে অনেক দেখা যায়। এগুলির যে কোন মূল্য নেই, তা আমি বলি না। কিন্তু সে সব উন্নত জাতির আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমরা আজকাল প্রগতির দোহাই দিতেছি তাদের মধ্যে একটা কথা আছে যে, নিজের আত্মাকে হারাইয়া সমস্ত পৃথিবীর ওপর রাজত্ব লাভ করাও একটা চূড়ান্ত নিঃস্বতা মাত্র। সুখের বিষয়, এই গভীর সত্যের উপলব্ধি আমারে রাষ্ট্রীয় দেশনেতাদের মধ্যে যে আসিতেছে—তার প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে। এই উপলব্ধি না জন্মাইলে এবং এই চেষ্টা না হইলে, বাঙলার এবং ভারতের পক্ষে প্রকৃত স্বরাজ লাভ করা অসম্ভব হইবে। আত্মাকে হারাইয়া জাতির আত্মার চিরাগত ধারার সঙ্গে যদি বাঙলার ও ভারতের বিচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলে কেবল রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও স্বাতন্ত্র্যে বা আর্থিক মুক্তি। স্বাতন্ত্র্য ও স্বচ্ছলতায় সেই ক্ষতির পূরণ হইবে না। মোট কথা, সংস্কৃতে যে কিম্বদন্তী আছে "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এর মধ্যে প্রকৃত স্বরাজ লাভের প্রণালীর নীতি নিহিত আছে। ধর্ম্ম কথাটাকে আমরা তার ভারতীয় মূল অর্থ থেকে ভ্রষ্ট করে একটা সংকীর্ণ গন্ডিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। "ধর্ম্মকথার" যথার্থ মানে ব্যক্তির ও জাতির প্রকৃতিগত ধারা। জাতির যে প্রকৃতিগত ধারা তার সঙ্গে তার স্বভূমির ছন্দোগত গভীর সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভারতের ও বাঙলার যে ভূমিগত স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারা—এইগুলিই ভারতের এবং বাঙলার প্রকৃত স্ব-ধর্ম্ম।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এবং আর্থিক ক্ষেত্রে প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই 'স্ব-ধর্ম্মে'র রক্ষা যদি জাতি না করিতে পারে তা হইলে তার নিধনই শ্রেয়। সেজন্য আমি বলি যে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ক্ষেত্রে মুক্তির চেষ্টা বাঙলার পক্ষে বা ভারতের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বাঙলার এবং ভারতের 'স্ব-ধর্ম্ম' (স্ব-ধর্ম্মের যে সংজ্ঞা উপরে দেওয়া হইয়াছে সেই অর্থে) রক্ষা করার ব্যবস্থার প্রয়োজন ও গুরুত্ব তার চাইতে কোন অংশে কম নয়, বরং বেশি। এসব কথা বলার আজকাল অনেক বেশি প্রয়োজন হইয়াছে এই জন্য যে, আমাদের দেশে অধুনা যে সব শিক্ষিত লোক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রগতির জন্য বিশেষ ব্যগ্র, তাঁদের উপরোক্ত এই সত্যটির যে স্পষ্ট উপলব্ধি আছে, তা মনে হয় না। কারণ যে ব্রতচারী প্রচেষ্টা আজ ভারতের এবং বাঙলার অন্তর্নিহিত স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ, স্ব-ধারা অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে 'স্ব-ধর্ম্মের' সঙ্গে জাতির শিক্ষার ক্ষেত্রে ও দৈনন্দিন জীবনে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য এবং সেগুলির সংরক্ষণ করবার জন্য সর্ব্বতোমুখী প্রচেষ্টার সূচনা করিয়াছে এবং যার এই জাতীয় স্ব-ধর্ম্ম রক্ষার মহাপ্রচেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ (স্যর) আকবর হায়দরী, সরলা দেবী চৌধুরাণী এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দেশনেতা ও দেশনেত্রীগণ শতমুখী হইয়া প্রশংসা করিয়াছেন, তাকে এঁদের মধ্যে অনেকে 'মধ্যযুগের মনোবৃত্তিমূলক এবং প্রগতির পরিপন্থী' বলে অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হননি। এঁদের এই ভ্রান্তিমূলক ধারণার মূলে আছে জাতির 'স্ব-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে উপলব্ধির অভাব।

বাঙালী যদি বিশ্বাস করে—বিশেষ করে বাঙলার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে যদি এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বাড়িয়া ওঠে যে বাঙালী একটা ভীরু জাত, বীরের ধর্ম্ম তার 'স্ব-ধর্ম্ম' নয়, বীরের ধর্ম্মের আদর্শের জন্য তাহাকে যাইতে হইবে হয় ইংলণ্ডে বা জার্মানীতে অথবা জাপানে অথবা অন্ততঃপক্ষে রাজপুতানায়; তা হইলে বাঙালীর আত্মা এর থেকে তার নিজের শক্তির ও গৌরবের খোরাক জোগাড় করিতে পারিবে না। অন্য জাতির বীর ধর্ম্মের গুণ গাইয়া সে চিরকালের নিজেকে ভীরুর জাত বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিবে। বাঙালীকে বীরের জাত করবার একমাত্র উপায়, প্রত্যেক বাঙালীর মনে বিশ্বাস করিয়া বাঙলার প্রত্যেক ছেলে মেয়ের মনে এই ভাব গভীর মাত্রায় জাগাইয়া তোলার কোন ব্যবস্থা করা, সে বীর ধর্ম্ম বাঙলার আত্মার ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট উপাদান।

এর চেয়ে প্রকৃষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ আমরা কোথায় পাইব? কেউ কেউ হয়ত বলিবেন যে বাঙলার ইতিহাসে, যথা—প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, ঈশা খাঁ, দাউদ খাঁ প্রভৃতির বীর চরিত্রের উদাহরণে, এগুলিতে যে আমাদের জাতীয় আত্মার বীর ধর্ম্মের প্রমাণ আছে তা সত্য। কিন্তু ইতিহাসের কাহিনীর মধ্যে অনেক সময় যে কিছু কিছু ভেজাল বার হয় তার কারো অজানা নয়। যে ইতিহাস মিথ্যা বলিতে পারে না, তা হইল জাতির জীবনে বহু যুগ থেকে রূপায়িত আচার প্রণালী। কারণ, তার উৎপত্তি হয়, জাতির আত্মার "স্ব-ধর্ম্মের' থেকে। আর জাতির আত্মার 'স্ব-ধর্ম্মের' ধারা একবার তার জীবনে প্রগাঢ়ভাবে রূপায়িত হইয়া যদি প্রকাশ পায়; তা হইলে পরবর্ত্তী বহু যুগের ধ্বংসমূলক পরিবর্ত্তনে সেটা চাপা পড়তে পারে, কিন্তু অনুসন্ধান করলে কোথাও না কোথাও তার মূল পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক হয়ত বানিয়ে বলেই মিথ্যা বলিতে পারেন; কিন্তু বাইরের রূপ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেলেও হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর মতো মাটি খুঁড়ে গভীর তলদেশ থেকে দেশের আদিম স্ব-রূপের যে ধ্বংসাবশেষ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় তার প্রমাণ অকাট্য ও মিথ্যার অতীত। ওডিসী বা মহাভারতের বীর কাহিনীগুলি যে কবির কল্পনামাত্র, এরূপ বিতর্ক করা যাইতে পারে। নেপোলিয়ন, ওয়েলিংটন, প্রতাপাদিত্য বা ঈশা খাঁর বীর কাহিনীর কত অংশ সত্য এবং কত অংশ মিথ্যা এ বিষয়ে তর্ক হইতে পারে, কিন্তু জাতির গভীর আত্মার যে ধর্ম্মছন্দ রূপ গ্রহণ করে তার জীবনে জীবন্ত ভাবে রূপায়িত হয়, তা কখনও মিথ্যা বা কৃত্রিম হইতে পারে না। ভারতের আদিম জীবনের অকাট্য রূপ যেমন মাটি খুঁড়ে মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া যায়, সেই রকম বাঙলার অদৃষ্টবৈগুণ্যে ও বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে পুঞ্জীভূত ভীরুতার তলদেশে চাপা পড়া রায়বেঁশে ও ঢালির মূর্ত্তি যখন আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়, তখন আমরা এমন একটি ইঙ্গিতের সন্ধান পাই, যার মূল্য বাঙলার বা ভারতের শত শত লিখিত ইতিহাসের চাইতেও সহস্র গুণে অকাট্য। কারণ, এগুলি হইতে আমরা শুধু যে কোন ইতিহাসে বর্ণিত কাহিনীর প্রমাণ ও ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন পাই তা নয়; এইগুলির মধ্যে আমরা পাই—জাতির জীবন্ত

স্ব-রূপ, জাতির 'স্ব-ধর্ম্মের' অকাট্য নির্দশন। শত শত যুগ থেকে এগুলি বেঁচে আছে এবং জাতির যুগযুগান্তরের বীর কীর্ত্তির রূপধারায় ছন্দায়িত হয়ে এসেছে। নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত প্রাচীন ভারতের অভিনয় পদ্ধতির ভঙ্গির চাইতে এর মূল্য বাঙলার ও বাঙালীর জীবনে অনেক বড়।

নাট্য-শাস্ত্রের ভঙ্গিকে বড় করিয়া এবং এগুলিকে ছোট করিয়া দেখা অন্ধতার পরিচয়। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় যে ধ্বংসাবশেষ আর নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত অথবা পাহাড়ে ও মন্দির গাত্রে খোদিত জাতির আদিম রূপের যে স্মারকচিহ্ন রয়েছে সেগুলি অতীতের মৃত রূপ। তার অভিনয় করিয়া ভারতের সংকৃষ্টির প্রচার এক জিনিষ, আর জাতির দৈনন্দিন লৌকিক আচারের ছন্দধারায় রূপায়িত তার 'স্ব-ধর্ম্মের' যে জীবন্ত প্রকাশ যুগ যুগ ধরে বয়ে আসছে। সে আর এক জিনিষ। Renaissance অথবা জাতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবনের নাম যাঁরা কি চিত্রে, কি নৃত্যে, অতীতের মৃত রূপের পুনরাভিনয় করিয়া ভারতের গৌরবের প্রমাণ পৃথিবীর সামনে এবং ভারতীয়দের সামনে আনিতে চেষ্টা করেন, তাঁদের সেই চেষ্টা আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে যতই প্রশংসা অর্জন করুন না কেন, বিশ্বের দরবারে তার আসল মূল্য স্বীকৃতি হবে এটা স্থিরনিশ্চিত। ইয়োরোপের লোক এটা আজকাল অনুধাবন করিতে পারিয়াছে; তাই সমস্ত কলাশিল্পের ক্ষেত্রে তারা Revival অর্থাৎ অতীতের পুনরাভিনয় এক জিনিষ, আর জাতির আদিম ধারায় যে স্ব-রূপ ব্যক্তির জীবনে জীবন্ত ছন্দরূপে যুগে যুগে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে তার সংরক্ষণ অন্য জিনিষ। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এতদিন একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, আমাদের দেশের নিরক্ষর অথবা ইংরাজি বিদ্যায় অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে জাতির যা কিছু প্রাচীন ধারা সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে সেগুলি নিকৃষ্ট ও বর্জনীয়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি জাতির 'স্ব-ধর্ম্মের' সর্বশ্রেষ্ঠ যে সব ধারা, যেগুলি জাতির স্বরূপের বাহক—সেগুলিকে অস্পৃশ্য বিবেচনা করিয়া আসিতেছে কয়েক বৎসর আগে থেকে। চিত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে এবং নৃত্যবিদ্যার ক্ষেত্রে এই ভ্রান্তি দূর করিবার চেষ্টা আমি করিয়া আসিতেছি। বাঙলার পটুয়ার চিত্রে বাঙলার আত্মার আধ্যাত্ম স্ব-রূপের জীবন্ত মূর্ত্তির সন্ধান আমরা পাই। বাঙালী যতদিন একে ঘৃণা করিয়া চলিবে, ততদিন চিত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগে এবং ভবিষ্যৎ যুগে তার পূর্ণ স্ব-রূপের সন্ধান ও শক্তি-বিকাশ ঘটাইতে পারিবে না। বাঙলার বাউল, কীর্ত্তন, ভাটিয়ালিতেও আমরা একদিকে বাঙলার আত্মার আধ্যাত্মরূপের এবং অন্যদিকে তার আনন্দ রূপের সন্ধান পাই। বাঙলার সেই নিছক স্ব-রূপকে বরণ করে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সভায় বাঙলার ছন্দের পূর্ণরূপের প্রতীক হয়ে আজ বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন এবং বাঙলার মানুষকে তার জাতীয় আত্মার অবলীলাময় আনন্দ-ছন্দের সন্ধান দিয়েছেন।

কিন্তু এটা ধ্রুব সত্য যে, বাঙলার আত্মার ধর্ম্ম কেবলমাত্র আনন্দের ও আধ্যাত্ম অনুভূতির গৌরবে পর্য্যবসিত নয়। তার আত্মার একটি গৌরবময় বীররূপও আছে। বর্তমান শিক্ষিত বাঙালীর রুচিভাবমূলক সহস্র বদনামের আড়ালে বাঙলার আত্মার বীরধর্মের স্ব-রূপ, শাশ্বত কাল থেকে বাঙালীর জীবনে প্রচ্ছন্ন ফল্গুধারার মতো যুগ যুগ ধরে বয়ে আসছে। বাঙলার সেই বীর—স্ব-রূপ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আজ আবিষ্কৃত হইয়াছে, রায়বেঁশের বীর রূপে। 'লোক-নৃত্য' অথবা 'জন-নৃত্য' বলে একে অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখিলে যে চলিবে না, তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাণীতে বুঝাইয়া দিয়েছেন। অর্থাৎ, অতীতের মৃতরূপই হইয়াছে শ্রেষ্ঠ কলাসম্পদ আর সাধারণ লোকের মধ্যে, জাতির যে ধারা সংরক্ষিত ও আচরিত হয়ে আসছে সেটা নিকৃষ্ট, —আজকালকার দিনে তা আর বলা চলবে না—যে দিনে ভারতের শ্রেষ্ঠ মানুষগণ ভারতের জনসাধারণের মধ্যে যে সহজ সরল ধারা সংরক্ষিত হয়ে এসেছে, তাকে ইউরোপ-আমেরিকার দৃপ্ত সাজ-সরঞ্জাম, পোষাক এবং জীবনধারার থেকে ভারতের নিজস্ব দানস্বরূপ নিজের জীবনে গ্রহণ করছেন এবং তাতে করে জাতির প্রাণে এক নতুন ও সুগভীর আত্মমর্য্যাদা জাগরিত করিয়া দিচ্ছেন। ঠিক সেই রকমই অতীতের নৃত্যকলার পুনরাভিনয় জাতির জীবনে যে তেজ, শক্তি ও আত্মমর্য্যাদা সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হইয়াছে, বাঙলার আত্মার বীরধর্ম্মের সরল অকৃত্রিম জীবন্ত স্ব-রূপ রায়বেঁশে ছন্দধারা শুধু বাঙালীর জীবনে নয়, সমগ্র ভারতের জীবনে সেই দুর্বার তেজ, সেই দুর্নিবার শক্তি ও সুগভীর আত্মমর্য্যাদা জাগাইয়া তুলতে পারে। তাই সেদিন বিশ্ব-বিশ্রুত সাংবাদিক সন্ত নেহাল সিং আশুতোষ কলেজের ব্রতচারী সংঘের রায়বেঁশে নৃত্য দেখে বলেছেন—

The dance of the Bratacharis carried us over the wings of fancy away from the degenerate present, with its devitalized youth, to an age, when Bengal, in common with the rest of the Motherland, was filled with vigorous, joyous people. The movements of the body, ascending rhythmically in perfect harmony with the music until they produced a sense of exhiliration in the performer and spectator alike, brought to us a vision of the future in which our people once again will possess the gift of hesith and strength without which we cannot but lag behind the more virile sections of humanity in the race for life. It was choosing to my wife and ... to noto that in all we saw and heard, nothing but the genius of our forefathers was finding expression—that that genius looked upon life as a unity, instead of dividing it into water-tight compartments.....

তাৎপর্য্য—

ব্রতচারীদের নৃত্য দেখে আমার ও আমার সহধর্মিণীর মন কল্পনার পাখায় উড়ে আমাদের দেশের বর্ত্তমান প্রাণহীন যুবকে পরিপূর্ণ নিস্তেজ যুগ থেকে ভারতের এক প্রাচীন যুগে উড়ে গেল—যখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশেও সতেজ, সবল ও আনন্দময় মানুষের আবাসভূমি ছিল। ব্রতচারীদের অঙ্গপ্রতঙ্গের গতি বাজনার তালে তালে ছন্দে ছন্দে লীলায়িত হয়ে উঠে নর্ত্তক ও দর্শক নির্বিশেষে সকলের মনে এক রোমাঞ্চভাবের সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎযুগের এমন করে দাবি এবং দিয়েছিল, যখন আমরা আবার সেই স্বাস্থ্য-সম্পদ ও সেই শক্তিসম্পদের অধিকারী হব—যা না পেলে জীবনের প্রতিযোগিতার আমাদিগকে অন্যান্য শক্তিমান জাতির পিছনে পড়ে থাকতে হবে। আর একটা বিশেষ কারণে আমরা উভয়ে এই অতিপ্রদশনী থেকে গভীর আনন্দ পেয়েছি—তা এই যে, ব্রতচারী অভিপ্রদর্শনীতে আমরা যা দেখলাম ও শুনলাম তাতে কেবলমাত্র আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিজস্ব প্রতিভাই প্রকাশ পেয়েছে, আর সেই প্রতিভা মানুষের জীবনকে বিভিন্ন কোঠায় বিখণ্ডিত না করে একটি পূর্ণ ও অখণ্ড সত্ত্বার রূপ দান করেছিল।....

রায়বেঁশের আবিষ্কারের দিনেই তাই আমরা বলিয়াছি—

"নহে ঘৃণ্য জিনিষ এ—মহামূল্য জিনিষ এ"

ইহা বাঙালীর জাতিগত আত্মার বীর-ধর্ম্মের ও বীররসের দুর্নিব্বার স্বরূপ—অনন্তকালের পট-ভূমে বাঙালী জাতির আত্মার 'স্ব-ধর্ম্মের' চির জীবন্ত ও মূর্ত্ত অমর অভিব্যক্তি।

রায়বেঁশের অজ্ঞাতবাস

বাঙালী যোদ্ধা

"বাঙালী যোদ্ধা" এই কথাটি বলিলে, বিদেশীদের কথা দূরে থাকুক, বাঙালীদের মধ্যেও অনেকেই এখনও হাস্য সম্বরণ করতে পারেন না। বাঙালী যে যুদ্ধ করতে পারে এ কথা কল্পনা করাও আজকাল একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বিগত জার্মান যুদ্ধের সময় মেসোপটেমিয়ায় যে বাঙালী রেজিমেণ্ট পাঠানো হইয়াছিল তাহারা যুদ্ধবিদ্যায় বাঙালী কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল কিনা কিম্বা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল কিনা, সে সম্বন্ধেও পরিষ্কার ধারণা বেশীর ভাগ লোকেরই নাই। মোট কথা, আজকাল এটা এক রকম স্বতঃসিদ্ধের মতই হইয়া গিয়াছে যে বাঙালী "যোদ্ধার জাতি" নয় অথবা বাঙালী জাতি হইতে যোদ্ধা তৈয়ারি করা একটা অস্বাভাবিক এবং দুষ্কর কাজ।

যুদ্ধবিদ্যায় ও নৌবিদ্যায় বাঙালী

অথচ খৃস্টের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই এই বাঙালী জাতির যুদ্ধবিদ্যার ও নৌ-বিদ্যার, পারদর্শিতার যত প্রমাণ পাওয়া যায়; তত ভারতবর্ষ হইতে অন্য কোন প্রদেশের জাতি সম্বন্ধে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। সেই সুদূর খৃস্টপর্ব্ব যুগে ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্র যাত্রার যে প্রধান বন্দর ছিল বাঙলা দেশেরই তাম্রলিপ্তে তাহার অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহার সম্বন্ধে কোনই দ্বিধা নাই। ইহাও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙালীর নির্ম্মিত যুদ্ধজাহাজের সাহায্যে বাঙালী নৌবাহিনী সুদূর সিংহল ও যবদ্বীপে শত্রুদলকে বাহুবলে পরাভূত করিয়া সে সব দেশে ভারতের একছত্র জয়পতাকা প্রোথিত করিয়াছিল তাহার পরবর্ত্তী বহু শতাব্দী ব্যাপিয়াও

যে বাঙালীর শৌর্য্যবীর্য্য ভারতবর্ষের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণও ক্রমেই পাওয়া যাইতেছে। খৃস্টীয় যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙালী সৈন্যের অস্তিত্বের এবং শৌর্য্য-বীর্য্যের এইরূপ প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য ও সীতারামের অমর বাহিনী যে বাঙালীই ছিল এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কি স্থলযুদ্ধ, কি নৌযুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রের বাঙালী যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিল।

প্রাচীন যোদ্ধাদের বংশধরগণ

এখনও বাঙলার সহস্রবর্ষ পূর্ব্বের প্রাচীন যোদ্ধাদের বংশধরগণ বাঙলায় বর্ত্তমান আছে, এবং তাহাদের মধ্যে এখনও তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের যোদ্ধৃভাবের জীবন্ত প্রবাহ বর্তমান আছে, ইহা বলিলে অনেকেই হয়ত হাসিয়া উঠিবেন, কিন্তু ইহা সত্য, গত ১৩৩৭ সালের পৌষ মাসে বীরভূম জেলায় “লোক নৃত্য” সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে এই মহামূল্য সত্য আবিষ্কার করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে।

লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য

বাঙলার বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের (Folk song and Folk dancc) পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও প্রচলনের প্রচেষ্টাকে আমি চিরকাল অত্যন্ত মূল্যবান মনে করি।

নৃত্যগীত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

নাচগান সম্বন্ধে বাঙলাদেশে আজকাল কোন কথা বলিতে, একটু কেন, বিশেষ ভাবেই ভয় হয়, কেননা দেশের জনমতের মধ্যে এ বিষয়ে একটা বিকৃত ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। নৃত্যগীত বিশেষতঃ নৃত্য, আদতেই একটা খারাপ জিনিষ বলিয়া লোকের বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এ দেশে প্রাচীন কালে এ ভাব ছিল না তাহা ঠিক। এই দেশের শাস্ত্রে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয ব্যাপাবেব সঙ্গে মহাদেবের তাণ্ডব-নৃত্যের কথা এখনও প্রচলিত আছে, এবং এ দেশেই স্বয়ং নারদ মুনির নির্ম্মল নৃত্যগীতের উদ্দীপনায় যে মানুষ অনুপ্রেরণা পাইয়াছে তাহার কাহিনীতেও সংহিতা ও পুরাণ ইত্যাদি পরিপূর্ণ। আবার এই দেশেতেই গৌর-নিতাই নাচিয়া, গাহিয়া ভক্তিরসের প্লাবন ধারা বহাইয়া দিয়াছিলেন এবং কৃত দুরাচার পাপীর জীবন সেই নির্ম্মল ধারায় বিধৌত করিয়া বিশুদ্ধ করিয়াছিলেন। যে দেশের নৃত্যগীতের আদর্শ এত উচ্চ, নৃত্যগীতের স্থান যে বিশ্বের সকল সূক্ষ্মকলার উচ্চে এবং ইহারা যে মানুষের প্রাণ ঈশ্বরের পদপ্রান্তে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ যে দেশ পৃথিবীর সকল দেশকে এত সুন্দর ভাবে দেখাইয়া দিয়াছে; সেই দেশে আজ যে এই নৃত্যগীত এত হেয় বলিয়া পরিগণিত ইহার কারণ কি? আমার মনে হয়, এই দুঃখজনক মনোভাবের মূলে আমাদের আধুনিক শিক্ষার বিকৃত ধারা।

আমি ইহা বলিতেছি আমার নিজের জীবনের যে অল্প কিছু অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহার ফলে। সৌভাগ্যবশতঃ আমার ছেলেবেলায় আমি ছিলাম এক সুদূর কোণের নিভৃত পল্লীতে। আজকাল তার কথা মনে হইলে মনে হয়, সে যেন এক অতীত যুগের কথা, তখনও সেই সুদূর পল্লীর কোন লোক আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পায় নাই। আমার বাল্যকালের সেই পল্লীর জীবন ছিল নির্ম্মল নৃত্যগীতে ভরা। বাউলরা গাহিয়া গাহিয়া নাচিত, —মুসলমানরা মহরমের সময় 'জারি' গান গাহিয়া গাহিয়া নাচিত, এবং 'সারি' গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচিত, এমনকি হিন্দুদের দুর্গাপূজার সময়ে তাহারা নৌকা-বাইচের অভিনয় করিয়া গাহিত ও নাচিত। ছেলেবেলায় আমরাও তাহাদের সহিত গাহিয়াছি, নাচিয়াছি। এমনকি, আমাদের গ্রামের ভদ্রমহিলারাও বিবাহ, ব্রত ইত্যাদি নানা পর্ব্ব এবং 'জলভরা' ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষ্যে অতি সহজ ও নির্ম্মলভাবে গাহিয়া গাহিয়া নাচিয়াছেন। তাহাতে কেহ কখনও কোন কুৎসিত ভাব মনে স্বপ্নেও আনে নাই। কাজেই আমার ছেলেবেলায় আমি শিখিয়াছিলাম যে লোকগীত ও লোকনৃত্য একটা পরম নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ জিনিষ এবং তাহা জাতির জীবনে নানা দিক হইতে আনন্দের স্ফুরণের সহায়তা করে। স্বাস্থ্যের দিক হইতেও যে এই সকল প্রাচীন লোকনৃত্যের নির্দ্দোষ-ভাবের অঙ্গ সঞ্চালনের ব্যায়াম হিসাবে একটা বিশেষ মূল্য ছিল, এ বিষয়ে তখন ভাবি নাই, কিন্তু এখন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, অর্থাৎ জাতির জীবনে লোকগীতের ও লোকনৃত্যের যে কত উচ্চস্থান এবং নানা দিক হইতে জাতির জীবনীশক্তি-বিকাশের ইহা যে কত সহায়তা করে, তাহা আমার ছেলেবেলার সেই পল্লীজীবনের নৃত্যগীতের প্লাবনধারার কথা এখন মনে হইলে বুঝিতে পারি।

নৃত্যগীতে ধর্ম্ম সমন্বয়

আর শুধু বাইরের দিক হইতেও নয়। শিক্ষার দিক হইতেও তাহার মূল্য ছিল খুব বড়। সেই বহুপ্রচলিত বাউলের গানে, জারি গানে ও কীর্ত্তনের গানে হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম সমন্বয়ের কি যে একটা সুন্দর ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়া শিক্ষাপ্রদ এবং আনন্দঘন করিয়া তুলিত— এবং জাতির বহুযুগের অর্জ্জিত জ্ঞানের ভাণ্ডারের বড় বড় সত্যগুলি সহজ কথায় সাধারণের বোধগম্য রূপে গানের সুরের মধ্য দিয়া কি সুন্দর ভাবে ইতরভদ্র সকল নরনারীর মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া উদ্দীপনার সঞ্চার করিত, তাহা এখন বুঝিতে পারি।

গ্রাম ছাড়িয়া যখন জেলার হাইস্কুলে এবং তারপর কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিলাম, তখন দেখিলাম যে, শহরের লোক নাচ, গানকে কুভাবে দেখে। আধুনিক

শিক্ষার প্রেক্ষিতে বিশেষতঃ নাচকে তাহারা খুবই কুৎসিত রুচিবিকারের সমার্থক করিয়া তুলিয়াছে, শহরে এইরূপ কয়েকটা বছর একটানা থাকিবার পর আমার সেই অতীত পল্লী জীবনের সহজ নির্ম্মল নৃত্যগীতের কথা যেন একটা স্বপ্নের মত অপ্রাকৃত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এমন কি, আমাদের আধুনিক শিক্ষার ধারার ফলে, সেগুলি একটা বর্ব্বরতা ও কুসংস্কার মূলক প্রথা—মনে অনেকটা এরূপ ধারণা হইয়া গিয়াছিল।

য়ুরোপে লোকসঙ্গীতের পুনঃপ্রবর্তন

সম্প্রতি ইয়োরোপের নানা দেশ ঘুরিয়া দেখিলাম, লোকসঙ্গীত জাতীয় জীবনের শিক্ষাক্ষেত্রের কতবড় একটা সম্পদ, সেখানে দেখিলাম যে, প্রত্যেক দেশে প্রাচীন বিলুপ্তপ্রায় লোকগীত ও লোকনৃত্যের পুনরুদ্ধারের বিরাট প্রচেষ্টা চলিতেছে, এবং সকল শ্রেণীর লোককে সেগুলি শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেইসব জাতিও আজ-কাল বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আধুনিক শিক্ষা যদি শুধু বিজ্ঞানের নীরস বাস্তবতায় অতিরিক্ত নির্ভরের ফলে জাতীয় জীবনের আদিম সহজ ও সরল ভাবের উৎসগুলিকে অনাবশ্যক বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া নষ্ট করিয়া দেয়; তাহা হইলে জাতি ও ব্যক্তি একটা অমূল্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হয়—যে সম্পদ যুক্তিতর্ক মূলক দর্শন বিজ্ঞানেও লাভ করা যায় না। দেশের এই সব মহামূল্য লোকগীত ও লোকনৃত্যের প্রচলন আমাদের দেশে যত ছিল, অন্য দেশে তত ছিল না। অন্যান্য দেশে এখন এইগুলি প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছে; কিন্তু আমাদের দেশে, আমাদের মহাসৌভাগ্য বশতঃ দেশের যে সব শ্রেণীর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষার ধারা এখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহারা এখনও এইসব মূল্যবান জাতীয় সম্পদকে সযত্নে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে। এই সম্পদের উদাহরণ পাওয়া যায় আমাদের দেশের হিন্দু ও মুসলমান বাউলের গানে ও নৃত্যে, পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদের জারি গান ও নৃত্যে।

১৩৩৭ সালের শিউড়ী প্রদর্শনীর সময় হইতে এই সকল প্রাচীন পল্লীসম্পদকে সাধারণের সমক্ষে যথাযোগ্য স্থান দিবার প্রচেষ্টা আমি করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে যে কত নির্ম্মল আনন্দের উৎস, আমাদের দেশের বিশেষ অভিজ্ঞতাজাত ধর্ম্মসমন্বয়ের কত সুন্দর চিন্তা ও ভাবধারা আমাদের জন্য যুগ যুগ হইতে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সাধারণের কাছে সাক্ষাৎ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

বাঙলার পল্লীতে রায়বেঁশে যোদ্ধার পুনরাবিষ্কার

বীরভূম জেলার লোকনৃত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে বাঙলার প্রাচীন যোদ্ধাদের বংশধরগণের আবিষ্কার করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে।

'রাইবিশে' নৃত্য দেখিবার ঔৎসুক্য ও সুযোগ

অনুসন্ধান করিতে করিতে জানিলাম, ডোম-বাউরী জাতীয় নিম্নশ্রেণীর একদল লোক এক ধরণের নাচ করে, ইহাকে 'রাইবিশে' নৃত্য বলে। হিন্দুদের বাড়িতে বিবাহের আনন্দ উৎসবে এই শ্রেণীর লোকদিগের নৃত্য দেখাইবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমি ইহাদের নৃত্য দেখিবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় একটি বন্ধু আমাকে তাহাদের নৃত্য দেখাইবার আয়োজন করিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, সাঁওতাল, ভীল ইত্যাদি বর্বর জাতির নৃত্যের মতোই একটা কিছু দেখিব। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। যে মুহূর্ত্ত হইতেই ইহাদিগকে নৃত্য করিতে করিতে আমাদের দিকে আসিতে দেখিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। ভাবিতে লাগিলাম কি দেখিলাম! ইহা তো থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চের কৃত্রিম নৃত্য বা কোন অসভ্য জাতির উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য নয়। ইহাদের নৃত্য দেখিবার প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই মনে আমার সন্দেহ রহিল না যে, এই নৃত্যকলার উৎস, জাতির জীবনের এবং জাতির ইতিহাসের একটা বিশেষ উচ্চস্থানে।

কি দেখিলাম

কি সুন্দর বীরোচিত ভাবভঙ্গী, — কি সংযম, — কি অনন্দ্য ছন্দ—চাতুর্য্য, এবং সকলের উপরে, কি একটা যেন অনির্ব্বচনীয় রহস্যময় ভাব! যেন অতীতের কি একটা বাণী ইহারা এই নৃত্যের এবং ভাবভঙ্গীর ভিতর দিয়া আমাদিগকে বলিবার চেষ্টা

করিতেছে—কিন্তু মুখের ভাষায় তাহা ফুটাইয়া বলিতে পারিতেছে না। কারণ যদিও তাহারা অতীতের এই নৃত্যকলাকে অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখিয়াছে, তবু অতীতের সেই রহস্যময় কাহিনী তাহারা নিজেই ভুলিয়া গিয়াছে।

'রায়বিশে' গান রচনা

এই 'রায়বিশে' নৃত্যের রহস্য সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমাকে পাইয়া বসিল, এবং আমি ইহাদের সম্বন্ধে এই নৃত্যের তালে তাল মিলাইয়া একটি গান রচনা করিয়া ফেলিলাম।

"রাইবিশে"র গান

আয় মোরা সবাই মিশে', —খেলবো রাইবিশে।
মোরা খেলবো রাইবিশে—
মোরা নাচবো রাইবিশে।
আয় মোরা সবাই মিশে, — খেলবো রাইবিশে।।
নহে ঘৃণ্য জিনিষ এ—
মহামূল্য জিনিষ এ।
আয় মোরা সবাই মিশে খেলবো রাইবিশে।।
মোদের ভাবনা ভয় কিসে?
হ'য়ে খেলায় ময়—ভাবনা ভয় ভাঙবো নিমিষে
হ'য়ে নৃত্যে ময়—ভাবনা ভয় নাশবো নিমিষে।।
ইঃ আঃ—[১]
দামামার তালে তালে হেলে' দুলে
মোরা মারবো কুঠার নিরানন্দের মূলে।

---

[১] রায়বেঁশেরা নৃত্য করিতে করিতে মুহুর্মুহু 'ইঃ আঃ' শব্দে সিংহনাদ করিয়া উঠে।

লেখক 'রাইবিশে' নৃত্যের তালে তালে তাল মিলাইয়া এবং তাহার অন্তর্নিহিত ভাবকে ভাষায় সুপরিস্ফুট করিয়া এই গান রচনা করিয়াছেন। ইহার সুরও অপূর্ব গতিশীল—এবং বীররসের অভাবনীয় উদ্দীপনাময়। শিউড়ী প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী খান বাহাদুর ফারোকী মহোদয় এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে শিউড়ী লীজ (Lees) ক্লাবের এমেচার সঙ্গীত সমিতির বহু সম্ভ্রান্তবংশীয় সভ্যগণ কর্তৃক "রাইবিশে" নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে এই গানটি গীত হইয়াছিল। এখন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ রাইবিশে নৃত্যের সহিত এই গান শিক্ষা ও আবৃত্তি করিয়া ব্যায়ামের সহিত যুগপৎ আনন্দ লাভ করিতেছে।

দেখে পরের নাচ আনবো না কুভাব মনে—
নেচে নির্ম্মল আনন্দ পাবো আপন মনে।।
ইঃ আঃ—
আয়রে দশ-বিশে
চল্লিশে
ছিয়াল্লিশে!
ভয় কিসে?
দুলে নৃত্যের বশে, মারবো পিত্তের বিষে।।
ইঃ আঃ
আয় বিভেদ ভুলি'—সবে খেলি মিশে'।
আয় বিভেদ ভুলি—সবে নাচি মিশে,
আয় মোরা সবাই মিশে খেলবো রাইবিশে,
ইঃ আঃ.......... ইঃ আঃ............ ইঃ আঃ.........

বাংলার বীরসন্তান-রায়বেঁশে

''নহে ঘৃণ্য জিনিষ এ'—
মহামূল্য জিনিষ এ।''

অনুসন্ধান

কেন শিখিলাম? — কি করিয়া জানিলাম? আমার মন যেন স্বতঃই বলিয়া ছিল যে, ইহার সঙ্গে দেশের একটা কিছু বড় সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহারা যে কেবল একটা নৃত্যই দেখাইয়াছিল, তাহা নহে, এমন সুন্দর ব্যায়াম-কৌশল দেখাইল যাহা অপূর্ব্ব অসাধারণ বলিয়া আমার মনে হইল। তখন হইতেই আমি অনেক সাহিত্যিক ও পণ্ডিতের কাছে ''রাইবিশে'' নৃত্য ও ব্যায়ামকলার উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমতঃ কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। তারপর কোন পণ্ডিত বন্ধু বলিলেন, রাজবংশী জাতের নাম হইতে হয়ত ''রাইবিশে'' নামের উৎপত্তি হইয়াছে, —হয়ত রাজবংশী জাতের লোকেরাই এই নৃত্য ও ব্যায়ামকলার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। আমি এই ব্যাখা গ্রহণ করিতে পারিলাম না, কারণ আমি জানিতাম যে রাজবংশীয়দের মধ্যে এরূপ নাচের প্রচলন নাই, আবার কেহ কেহ বলিলেন, ইহারা অনেক সময় বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে স্ত্রীলোক বেশ পরিধান করিয়া নৃত্য করে; সেই জন্যই হয়ত এই নৃত্যের 'রাইবিশে' আখ্যা লাভ হইয়াছিল এবং তাহা হইতেই 'রাইবিশে' হইয়াছে। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, ইহাদের যে বিশেষ ইতিহাস আছে তাহা তিনি অবগত নহেন, এবং কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া তাঁহার মনে পড়িতেছে না। আমি তাহাকে বলিলাম যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই নৃত্য সামরিক নৃত্য জাতীয় এবং ইহার ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি আছেই।

আবিষ্কারের প্রমাণ

আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ইহা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহার পরে সপ্তাহকাল পরে তিনি তাঁহার 'রতন লাইব্রেরী' মন্থন করিয়া যে সকল প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ আমাকে আনিয়া দিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না যে, এই 'রাইবিশে'ই ধর্ম্মমঙ্গলের, কবিকঙ্কন চণ্ডীর এবং অন্নদামঙ্গলের রায়বাঁশ (-ভল্ল) ধারী অমিতবীর্য্য 'রায়বেঁশে" যোদ্ধা[১] যাহারা একাদশ শতাব্দীতে বর্দ্ধমান জেলার 'শ্যামরূপা'র গড় হইতে মহামদ পাত্রের নেতৃত্বে "ময়নাগড়ে" লাউসেনকে আক্রমণ করিয়াছিলেন—যাহারা অতি সুদূরে অতীতের গৌরবময় যুগে একদিন কলিঙ্গ রাজ্যের নেতৃত্বে সুদূর গুজরাট আক্রমণ করিয়াছিল এবং ষোড়শ শতাব্দীতে যাহারা মানসিংহের বিজয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের বর্ত্তমান দারিদ্র্য ও সামাজিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নৈতিক অবনতি সত্ত্বেও, তাহারা যে সেই একাদশ শতাব্দীর বীরোচিত ভাবভঙ্গী ও সামরিক নৃত্যপ্রণালী অটুটভাবে যুগের পর যুগ সযত্নে রক্ষা করিয়া এই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের সম্মুখে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ্য, —এই সকল প্রাচীন পুস্তকে তাহাদের শৌর্য্যবীর্য্য ও যুদ্ধপ্রণালীর পরিচয় পাইয়া তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। এমন কি অনেক বিষয়ই সেই প্রাচীন বর্ণনার সঙ্গে তাহাদের বর্ত্তমান ভাবভঙ্গী হুবহু মিলিয়া গেল।

ইহাদের অনিন্দ্যসুন্দর বীরোচিত নৃত্যকলা ও অসাধারণ সামরিক ব্যায়ামক্রীড়া দেখিলে, ইহারা যে কেবল নামে নয়; প্রকৃতি পরম্পরায়ত্ত সহস্র বর্ষাধিক পূর্বের বাঙালী "রায়বেঁশে" যোদ্ধা-বীরদিগের বংশধর, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। ধর্ম্মমঙ্গলের কবিকঙ্কন চণ্ডীর, অন্নদামঙ্গলের সেই তিনশত বর্ষ হইতে সহস্র বৎসর আগের "রায়বেঁশে" যোদ্ধার ভাবভঙ্গী ও বেশভূষার সহিত ইহাদের কি আশ্চর্য্য ও অভাবনীয় সাদৃশ্য। সেই "বাজন নূপুর পায়"[১] সেই "বীর মুঠা"[২] সেই "মণ্ডলী"[৩] করিয়া "বেড়া-পাকে" ধাওয়া [৪] পরিধানে "বীর-ধড়ি" ও সেই "অঙ্গেতে লেপয়ে রাঙ্গা মাটি!"[৫]

---

[১] রাজা—(সংস্কৃত) = রাআ (প্রাকৃত) = রায়; রায় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ—রায়বাঁশ = শ্রেষ্ঠ বাঁশ = ভল্ল বা বল্লম (এই "রায়বাঁশ" দ্বারা বল্লমের হাতল নির্ম্মিত হইত বলিয়া বল্লমেরই "রায়বাঁশ" আখ্যা লাভ হইয়াছিল); রায়বেঁশে = ভল্লধারী যোদ্ধা।

এই "রায়বেঁশে"র কথা ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলের পাওয়া যায় এইরূপ—(মহামদ পাত্রের ময়না যাত্রা) "রণভূয়া", মল্লভূঁয়া, মগধ মাগধ মিঞা, একলক্ষ সেনা সঙ্গে ধায়। ধামুকী বাদুকী ঢালী। 'রায়বেঁশে' ফারিকালি, রাহুত, মাহুত সমুদায়। মানিক গাঙ্গুলীর 'ধর্ম্মমঙ্গলে'ও আছে— "রায়বেঁশে রাউত বসেছে রণসাজে।"

সমাজের বহুশতাব্দী-ব্যাপী অবজ্ঞা, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা সত্ত্বেও এবং নিজেদের নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও এই বীর জাতি যে অতীত যুগের গৌরবময় বাঙলার অতুল সম্পদ পুরুষানুক্রমিক সামরিক বীরোচিত সুন্দর নৃত্যকলার গৌরবময় প্রণালী অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহা কম আশ্চর্য্য নয় এবং বর্তমান যুগের পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। এই নৃত্যপ্রণালী এত সুন্দর, এত বীরত্বমণ্ডিত, সূক্ষ্মকলার এত উচ্চ আদর্শে গঠিত যে ইহা আমাদের দেশের লোকনৃত্যের মধ্যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিবে। ইহাতে আমার সন্দেহ নাই।

অবনতি ও অবনতির কারণ

এমন যে বাঙালী শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী সুদূর অতীতের উপরে নিহিত হইয়া গিয়াছে এমন কি, "বাঙালী যোদ্ধা" কথাটিতেও লোকের হাস্যের উদ্রেক হয়, সামান্য তিনশত বৎসর কালের মধ্যে এই যে অভাবনীয় অবনতি, —ইহা এক মহাবিস্ময়ের ব্যাপার।

"কবিকঙ্কন চণ্ডীর" বহু স্থানে ইহার উল্লেখ আছে। যথা—১। (সিংহলের রাজা শালবানের যুদ্ধসজ্জা) 'বাজন নূপুর পায়, বীর ঘণ্টা পাইক ধায়, রায়বাঁশ ধরে খরশান'। ২। (কলিঙ্গ রাজের যুদ্ধসজ্জা) "বাজন নূপুর পায় বীরমুঠা পাইক ধায়, রায়বাঁশ ধরে খরশান।" ৩। (কলিঙ্গ রাজের যুদ্ধসজ্জা----পাঠান্তর) "সোনার নূপুর পায়, বীর বেড়াপাকে ধায়, রায়বাঁশ ধরে খরশান।" ".......... পরিধানবীর ধড়ি) কানে ফটিকের খড়ি, অঙ্গেতে লেপয়ে রাঙামাটি।। ৪। (কলিঙ্গের গুজরাট আক্রমণ)" শত শত বাজে ঢাক, পাইক ধায় লাখ লাখ, কার কেহ না শুনে বাণী। **রায়বাঁশ** তবকী ফরিকাল ধানুকী, আগুদলে কনক নিশানী"।। ৫। "মণ্ডলী করিয়া ধায় **রায়বাঁশিয়া**, কেহ ধায় ফিরায়ে নেজা।"

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে আছে—"আগে চলে লাল-পোষ-খাস-বরদার। সিপাই সকলে চলে কাতারে কাতারে।। তবকী ধানুকী ঢালী **রায়বেঁশে** মাল। দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল।।"

রামপ্রসাদের কাব্যগ্রন্থেও আছে—"কোটি কোটি তীরন্দাজ, যেথা বিন্দে একন্দাজ, রায়বাঁশে কেহ নহে টুটা।"

(১) "বাজন নূপুর পায়, বীর ঘণ্টা পাইক ধায়, রায়বাঁশ্যা ধায় খরশান।" কবিকঙ্কন চণ্ডী (বঙ্গবাসী সং ১৩১৩, ২৬৫ পৃঃ)

(২) "বাজন নূপুর পায়, বীর মুঠা পাইক ধায়, রায়বাঁশ ধরে খরশান।"—কবিকঙ্কন চণ্ডী (বঙ্গবাসী সং ১৩১৩। ৯৫ পৃঃ)

(৩) "সোনার নূপুর পায়, বীর বেড়া-পাকে ধায়, রায়বাঁশ ধরে খরশান।"—কবিকঙ্কন চণ্ডী (বিশ্ববিদ্যালয় সং ১ম ভাগ। ২২৯ পৃঃ)

(৪) "মশুলী করিয়া ধায় রায় বাঁশিয়া—" কবিকঙ্কন চণ্ডী (বিশ্ববিদ্যালয় সং, ৬৭৯ পৃঃ)

(৫) "পরিধানে বীর ধড়ি কানে ফটিকের খড়ি, অঙ্গোতে লেপয়ে রাঙা মাটি।" —কবিকঙ্কন চণ্ডী (বিশ্ববিদ্যালয় সং, ১ম ভাগ, ২২৯ পৃঃ)

এই আশ্চর্য্য রহস্যের সঙ্গে বাংলার বীর সন্তান "রায়বেঁশে" যোদ্ধাদের উন্নতি অবনতির রহস্য ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছে। প্রাচীনকালে যে সকল বিজয়ী বাঙালী সেনানীদল নৌবাহিনীতে সিংহল যাত্রা করিয়া সিংহল বিজয় করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যে 'রায়বেঁশে' যোদ্ধারা ছিল এবং তাহারা যে অজয় নদীর তীরবর্তী রাঢ় অথবা বীরভূম অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিল তাহার জীবন্ত প্রবাদ অন্ততঃ তিনশত বৎসর আগে এদেশে বর্ত্তমান ছিল ও তাহা মুকুন্দরাম এবং কবিকঙ্কন চণ্ডী কাব্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।[১] খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে "রায়বেঁশে" যোদ্ধাদিগের শৌর্য্যের প্রমাণ আমরা পাই ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহের মধ্যে যে সকল ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে বাঙালী 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধাদের বীরত্ব কাহিনীর প্রমাণ আমরা পাই ভরতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে, "ধর্ম্মমঙ্গল", "অন্নদামঙ্গল" ও কবিকঙ্কন—"চণ্ডী" পড়িলে এই ধারণা স্পষ্ট মনে উদয় হয় যে, আজকাল স্কটল্যান্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশীয় হাইল্যাণ্ডের যোদ্ধারা তাহাদের অতুলনীয় শৌর্য্যবীর্য্যে যেরূপ সমগ্র বিলাতী সৈনিকদের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠার স্থান লাভ করিয়াছে, সেইরূপ বাঙলা দেশে খৃস্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বহুযুগ ব্যাপিয়া "রায়বেঁশে" যোদ্ধারাও বাঙালী সৈন্যদের মধ্যে শক্তি, সাহস ও পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিল। "রায়বেঁশে"দের নাম এবং তাহাদের শক্তি, সাহস, অপূর্ব্ব যুদ্ধ চাতুর্য্য ও সামরিক ভাব-ভঙ্গীর কথা ভাবিতে ও বর্ণনা করিতে ভারতচন্দ্র, ঘনরাম ও মুকুন্দরামের যে গর্ব্বে বুক ফুলিয়া উঠিত, এই কাব্যগুলি পাঠ করিয়া তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

এই তো গেল তিনশত বৎসর আগেকার বাঙালীর মনের অবস্থা। এবং এই তিনশত বৎসর পরেই আমরা দেখিতে পাই এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন—"বাঙালী যোদ্ধা" কথা বলিতেই লোকে হাসে। যে 'রায়বেঁশে' যোদ্ধারা অসীম সাহস, শক্তি ও যুদ্ধচাতুর্য্যের বর্ণনায় এই সকল কাব্য পরিপূর্ণ, সেই "রায়বেঁশে" নামের স্মৃতি পর্য্যন্তও ইতিমধ্যে এই বাংলাদেশে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনেকেই আজকাল ঘনরাম, ভারতচন্দ্র ও

[১] "সবাকারে বাড়ী ঘর করি সমর্পণ। নৌকায় চড়িল কবি শিবের স্মরণ।..... কাবু হাতে কেরোয়াল কাবু হাতে ফাঁস। কাবু হাতে দণ্ড, কাবু হাতে রায়বাঁশ"..... লহনা খুল্লনা ঠাঁই মাগিল মেলানি। বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী॥"—কবিকঙ্কন চণ্ডী; ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণ (ধনপতির নৌকারোহণ)

"খলে পাইক বাঙালী, খাণ্ডাফনা বিজুলি, কেহ রিন্দে পুতিয়া রেজা। মণ্ডলী করিয়া ধায় রায়বাঁশিয়া, কেহ ধায়-ফিরায়ে নেজা পাইকের কল-কল, ভরিল সিংহল, শিঙ্গা কাড়া ঠমক নিশান। সুভঙ্গ ভয়ঙ্করী, সঘনে মুছন্দরী, গগনে হানে শিখিবান।" —কবিকঙ্কন 'চণ্ডী' ই, প্রে, সং, (সিংহলে ত্রাস ২০৮ পৃঃ)।

মুকুন্দরাম লিখিত এই কাব্যগুলি কাল্পনিক ও অলীকতাপূর্ণ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন। কেননা ইঁহাদের কাব্যে আছে বাঙালী যোদ্ধার যুদ্ধের বর্ণনা, আর যে বর্ণনাতে আছে বাঙালী যোদ্ধার অসাধারণ সাহস ও যুদ্ধ কুশলতার কাহিনী। ''বাঙালী যোদ্ধা'' জিনিষটা যখন একটা কাল্পনিক আখ্যায়িকার শ্রেণীভুক্ত, এইরূপ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকের কাছে এই সব কাব্যের যুদ্ধের গল্পগুলি একটা হেঁয়ালির মতই অমূলক ও অবোধ্য ছিল, কারণ ''রায়বেঁশে'' বলিয়া যে কোন যোদ্ধা জীব বর্ত্তমান আছে তাহা কেহ ভাবে নাই। 'রায়বেঁশে' যে কি বস্তু তাহা ঐ বইগুলির বর্ণনা ছাড়া জানিবার উপায় ছিল না, আর সেই বইগুলিই যখন কল্পিত বলিয়া ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল, তখন 'রায়-বেঁশে' নামক যোদ্ধা শ্রেণীও যে একটা কবি-কল্পনা মাত্র এই ধারণা হওয়াটা অস্বাভাবিক নহে।

াঙালী যোদ্ধার ছদ্মবেশ

আমরা দেখিলাম যে, 'রায়বেঁশে' নামক যোদ্ধাগণ যে বাস্তবিকই বাংলা দেশে ছিল কেবল তাহা নহে, এমনকি তাহাদের বংশধররা এখনও বাংলা দেশে বর্ত্তমানে আছে। কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে ছদ্মবেশে। এবং এই দীর্ঘ ছদ্মবেশের অন্ততঃ শেষভাগ তাহারা যাপন করিয়াছে এই বীরভূম জেলায় এবং তাহারা পার্শ্ববর্তী প্রদেশে নর্ত্তক-ব্যবসায়ে—নর্ত্তক এবং নর্ত্তকীর বেশে।

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস

এই 'রায়বেঁশে' যোদ্ধাদের কথা বলিতে বলিতে ভারতবর্ষের এক দল যোদ্ধার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাঁহাদের নাম ছিল পঞ্চ পাণ্ডব। তাঁহাদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে প্রবঞ্চিত হইয়া দুইবার যোর্দ্ধৃত্ব ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইতে এবং অজ্ঞাতবাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রথম অজ্ঞাতবাসকালে তাঁহারা বাসা করিয়াছিলেন—এই রাঢ়প্রদেশের বীরভূম জেলার একচক্রা[1] নামক স্থানে। ইহার নিকটবর্ত্তী কোন বন প্রদেশে ভীম ভীষণ দর্শন

---

[1] "EKCHAKRA—A village in the Mayureshwar Thana of the Rampurhat Sub-division. Here the Five Pandava brothers are said to have taken refuge during their excile and legend relates that here. Bhim killed a monster named Hirambak and married his sister Hiramba, by whom he begot a son called Ghototkach, who, as related in the Mahabharat, played a conspicious part in the battle of Kurukshetra. Another account is the Ekchakra was a tract of country comprising Nimai. Ghoradaha Gauntia and Kotasur, and that Bhim resided there with his wife and mohur Kotasur is said to have been the dwelling place of a monster named Bakasur, whom Bhim slew"—Birbhum District Gazette (1920) by L.S.S.O' malley (p-116).

দ্রষ্টব্যঃ—(১) প্রবাসী ১৩৩১, ফাল্গুন, ৬৮৮ পৃঃ (২) মহাভারতের আদি পর্বে 'একচক্রা'র উল্লেখ।

"কৃষ্ণ-অঙ্গ"[১] হিড়িম্ব এবং বকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। তিনি হিড়িম্বের ভগিনী কৃষ্ণাঙ্গী হিড়িম্বাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামক বীর সন্তানের জন্ম এইখানেই হইয়াছিল।

একচক্রা জনপ্রবাদ

এই বীরভূম প্রদেশের জঙ্গলেই যে হিড়িম্বের অরণ্য ছিল, এই বীরভূমের একচক্রা নামক স্থানই যে মহাভারতে বর্ণিত একচক্রা, এবং এখানেই যে পঞ্চ পাণ্ডবগণ প্রথম অজ্ঞাতবাস থাকাকালীন ভীম হিড়িম্বকে বধ করিয়া তাহার ভগিনী হিড়িম্বাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এই সম্বন্ধে জনপ্রবাদ এত প্রবল, এবং পঞ্চ পাণ্ডবদের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে যে জনপ্রবাদ বহুযুগের বিশ্বাস ও কিম্বদন্তীর উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়।[২]

বাস্তব ও জীবন্ত কথা

যাহা হউক, জনপ্রবাদ ও পুঁথিপুরাণ, অনুমান ও তর্কের উপর ছাড়িয়া দিলেও আমরা কয়েকটি বড় বড় বাস্তব ও জীবন্ত কথা পাই। প্রথমতঃ—এই বীরভূম অঞ্চলের 'রায়-বেঁশে'দের বর্ণ ও আকার মহাভারতের বর্ণিত ঘটোৎকচেরই অনুরূপ; দ্বিতীয়তঃ ইহাদের শক্তি, সাহস ও সামরিক ব্যায়ামকুশলতা দেখিলে ইহারা যে "ভীমের বাচ্চা" জাতীয় এই কথাই স্বতঃই মনে উদয় হয়; আর এই শক্তি, সাহস ও কুশলতার মূল ভিত্তি ইহাদের প্রকৃতির এত গভীরতম প্রদেশে প্রোথিত যে, এগুলি ইহারা বহুযুগের দৈন্যদারিদ্র্য-দুর্দ্দশা ও লাঞ্ছনা সত্ত্বেও ভুলিয়া যাইতে বা হারাইতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ ইহাদের রণতাণ্ডব নৃত্যকলা গৌরবে ও সৌন্দর্য্য-সম্পদে একমাত্র গাণ্ডীবধারী মহাবীর অর্জ্জুনেরই নৃত্য-শিষ্যের যোগ্য, একাধারে ঘটোৎকচের প্রতিকৃতি ও প্রকৃতির সহিত এত সাদৃশ্যসম্পন্ন, ভীমের মত শক্তি, সাহস ও সামরিক ব্যায়াম-ক্রীড়া-কুশলতার উত্তরাধিকারী ও অর্জ্জুনোচিত রণতাণ্ডব নৃত্যে পারদর্শী শত শত লোক ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে বর্তমান নাই, এ কথা বোধ হয় জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। সুতরাং ভীমসেনের ও ঘটোৎকচের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিষয়ে যে বহুল-প্রচলিত জনপ্রবাদ এ দেশে

---

[১] মহাভারত (চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) পৃঃ-১৩৬।

[২] "According to tradition, the district was once inhabited by fierce jungle tribes, black sturdy men, who devoured any flesh they could obtain. Their chief was one Hirambak, who was killed by Bhima, one of the five Pandava brothers, during their exile."

—Birbhum District Gazette by L.S.S.O' malley.

বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাকে পুঁথির লেখার কোথাও দু'একটা ভুলভ্রান্তির উপর নির্ভর করিয়া অযৌক্তিক অথবা অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

অভাবনীয় সাদৃশ্য

সকলেই জানেন, অদৃষ্টচক্রে দ্যুত-ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পঞ্চ পাণ্ডব বীর ভ্রাতাদিগকে আবার দীর্ঘকাল বনবাসে এবং তাহার পর ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাসে থাকিতে হইয়াছিল। ও সেই সময়ে অর্জ্জুনকে বৃহন্নলা নামে নর্ত্তকীর বেশ ধারণ করিয়া বিরাট অন্তঃপুরে নৃত্যশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, যে বীর-ভূমির সঙ্গে পাণ্ডবদিগের প্রথম অজ্ঞাতবাসের এই অভাবনীয় সম্বন্ধ, সেই বীর-ভূমিতে যে বাঙলার শ্রেষ্ঠ বীর-সৈন্য "রায়বেঁশে" দিগকে দুই-শতাব্দী বা তদূর্দ্ধে দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসে ও ছদ্মবেশে নর্ত্তক ও নর্ত্তকী বেশে কাটাইতে হইয়াছে ইহা ভারত ইতিহাসের এক আশ্চর্য্য রহস্য। এবং পাণ্ডবদিগের সহিত বীরভূমের সম্বন্ধ প্রধানতঃ প্রবাদমূলক হইলেও, এই দুইটি ব্যাপারের অভাবনীয় সাদৃশ্য যে বাঙালীর কল্পনার রাজ্যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সৃষ্টি করিবে তাহা স্বাভাবিক। পাণ্ডবদিগের মতনই এই "রায়-বেঁশে" দিগকেও অদৃষ্টদ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া যোদ্ধার ব্যবসায় ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ঐতিহাসিক অদৃষ্টের অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে বাঙালী জাতির অবস্থায় এবং প্রকৃতিতে যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এই দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে হইয়া গিয়াছে, তাহা এই "রায়বেঁশে"দের ভাগ্য ও অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা পর্য্যালোচনা করিলে যথেষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

বাঙলার ইতিহাসে পরিবর্ত্তন

পূর্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, ষোড়শ শতাব্দী ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও বাঙালী 'রায়বেঁশে' যোদ্ধাদের গৌরবে বাঙলাদেশ ও বাঙলাসাহিত্য গৌরবান্বিত ছিল। ইহার পর হইতেই বাঙলার গভীর প্রকৃতি ও চরিত্রে একটা আমূল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। সেই পরিবর্ত্তনের কারণ অথবা কারণগুলি যে কি, তাহা আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। তবে বাঙালীর আধুনিক ভীরুত্ব বা কাপুরুষত্বের প্রবাদের মূলে যে পরিবর্ত্তন এবং বাঙালীর আর্থিক অবস্থার মূলেও যে পরিবর্ত্তন, তাহা বিশেষভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী এবং তাহারা পরবর্ত্তী যুগে হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ষোড়শ, সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত 'রায়বেঁশে' যোদ্ধারা বাঙলার হিন্দু মুসলমান রাজাদের—স্বয়ং মোগল সম্রাটের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মানসিংহেরও সৈন্যশ্রেণীতে স্থান পাইয়া নিজেদের যুদ্ধ ব্যবসায় পরিচালনা করিবার সুযোগ পাইয়াছে।[1] তাহার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও এই সুযোগ অনেক পরিমাণে ছিল। 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধারা যে শুধু বীরভূমেই ছিল তাহা নহে, ইহার পার্শ্ববর্ত্তী দুমকা অঞ্চলে, বর্দ্ধমান অঞ্চলে এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বহুসংখ্যক 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধা বর্ত্তমান ছিল। এখনও তাহাদের বংশধররা এই সব জেলায় সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া যায় নাই। ইহারাই যে এখন 'রাইবিশে' নামে আখ্যাত তাহার বিশদ পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে বাঙালী পাঠকদের দিয়াছি।[2] এখনও ইহাদের মধ্যে যেরূপ শক্তি, সাহস ও অত্যাশ্চর্য্য সামরিক ব্যায়াম কৌশল অবশিষ্ট আছে, তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আলীবর্দ্দী খাঁর ও সিরাজদৌলার অমর কাহিনীতে যে সব বাঙালী যোদ্ধা ছিল বলিয়া অকাট্য প্রমাণ ইতিহাসে আছে, কিন্তু

[1] অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র। বঙ্গবাসী সং ১২৯৬, ১১৪ পৃষ্ঠা।

[2] বঙ্গলক্ষ্মী, ১৩৩৭ ফাল্গুন ও ১৩৩৮ বৈশাখ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

যাহাদের বসতিস্থান, জাতি, বংশ পরিচয় নির্ণয় সম্বন্ধে এমন কি যাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পর্য্যন্তও এখনও বিস্তর আনুমানিক কল্পনা, জল্পনা, সন্দেহ ও তর্কযুদ্ধ চলিতেছে তাহাদের মধ্যে এই "রায়বেঁশে" যোদ্ধাদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। যদি কাহারও এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে, তবে আমি বলি যে, অনুমানের উপর তর্ক না করিয়া তাঁহারা এই সব জীবন্ত যোদ্ধা-মূর্ত্তিদের সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ পরিচয় করুন। তাহা হইলে, ইহাদের দীর্ঘযুগব্যাপী দৈন্যমগ্ন অবস্থা সত্ত্বেও, ইহারা যে যোদ্ধার জাত ও ইহাদের অস্থিমজ্জাপেশী যে বীরের বীর্য্যে গঠিত এবং ইহাদের ধমনিতে যে এখনও বীরের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পরন্তু দেখিবেন যে, এই বলিষ্ঠ, কৃষ্ণকায়, অসাধারণ শক্তি ও সাহস সম্পন্ন, আধুনিক সমাজের বিচারে অবনত, বীরের দল যে সেই মহাবীর ভীমের ঔরসজাত অমিতবিক্রম যোদ্ধা ঘটোৎকচেরই বংশধর, এই অনুমানকে মন হইতে দূর করিয়া রাখা দুষ্কর হইবে।[১] রায়বাঁশ (ভল্ল) ধারণ হইতে বঞ্চিত হইয়াও ইহারা এখনও কাল্পনিক যুদ্ধে রায়বাঁশ (ভল্ল) পরিচালনার ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে করিতে বাংলার পথে পথে কাঙাল বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যোদ্ধার প্রকৃতি যে শত অবজ্ঞা, শত দৈন্য, শত নির্য্যাতন সত্ত্বেও মানুষ সহজে একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারে না, তাহার জ্বলন্ত ও জীবন্ত প্রমাণ বাঙলার এই দৈন্য-প্রপীড়িত ও সমাজের হাতে নির্য্যাতিত 'রাই-বিশে'র দল।

পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে বাঙালী সৈন্য সংগ্রহের প্রথা নাই। ইহার ফলে প্রাচীন অসংখ্য 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধাদলকে যে দারুণ বেকার সমস্যায় পড়িয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নিতান্ত অসুবিধায় ভুগিতে হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অনেক 'রায়-বেঁশে'কে যে অবস্থার পরিবর্তনে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল তাহার উল্লেখ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের 'ইস্ট-ইণ্ডিয়া' কোম্পানীর ফিফ্‌থ্ রিপোর্টে (Fifth Report, 1812) আছে। সৌভাগ্যক্রমে সকল রায়বেঁশেকেই তাহা করিতে হয় নাই। অনেকে রাজা ও জমিদারের অধীনে ঘাটোয়াল, কোটাল, মগ্‌দী, বরকন্দাজ, পাইক— প্রভৃতি রূপে জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে নানা কারণে সেই সুযোগ ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। সুতরাং কি

[১] পশ্চিম রাঢ় প্রদেশের যে সকল কৃষ্ণকায় অধিবাসীরা বহু শতাব্দী হইতে মল্লখ্যাতি লাভ করিয়াছে, এবং পশ্চিম রাঢ়ের 'মল্লভূমি' আখ্যা দান করিয়াছে, তাহারা খুব সম্ভবতঃ ঘটোৎকচেরই বংশধর এই অনুমান মহাভারতের অভ্যন্তরীণ প্রমাণের দিক হইতেও অযৌক্তিক নহে।

করিয়া তাঁহার নিজেদের জীবিকা-নির্বাহ করিবে, এই বেকার সমস্যা এই বহুসংখ্যক 'রায়বেঁশে' যোদ্ধাগণের বংশধরদিগের সম্মুখে এক বিষম বিভীষিকা রূপে উপস্থিত হইল। ভারত ইতিহাসের ইহাও একটি অভাবনীয় রহস্য যে, এই সমস্যার সমাধান ইহারা করিল, সেই প্রণালীতে যে প্রণালীতে স্বয়ং ভারতের আদর্শ মহাবীর অর্জ্জুন তাহার ছদ্মবেশ কালীন জীবিকা-নিবর্বাহের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ নৃত্য-ব্যবসার অবলম্বনে।

যোদ্ধার নৃত্যবৃত্তি

নৃত্যকলা পৌরুষেরই সহচরী

জাতীয় বীরত্ব স্মৃতি-বিস্মৃতি আমাদের অনেকেরই হয়ত ইহাতে হাসি পাইবে, এবং অনেকেই বলিবেন, যাহারা নৃত্য ব্যবসায় অবলম্বন করে, তাহারা কখনও কি যোদ্ধা ছিল ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে ভারতবাসীর কাছে বীর-চূড়ামণি অর্জ্জুনের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কোন দৃষ্টান্ত দিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না। কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের যে পত্রাংশ বঙ্গলক্ষ্মীতে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে তিনি বলিয়াছেন "পাশ্চাত্য মহাদেশে নৃত্যকলা পৌরুষেরই সহচরী।" ইহা যে ঠিক, তাহা আমরা অনেকেই জানি, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশ বাহিনীর বিখ্যাত হাইল্যাণ্ডার যোদ্ধাদের অসিনৃত্য (sword dance) দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। স্বয়ং প্রলয়ঙ্কর মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও; অর্জ্জুনের দৃষ্টান্ত হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি যখন ছদ্মবেশ ধারণ করেন, তখন ধনুর্বিদ্যার পরেই নৃত্যবিদ্যায় তাঁহার সবিশেষ পারদর্শিতা ছিল বলিয়াই তিনি ছদ্মবেশে অন্য কোন জীবিকা বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া, এই নৃত্যবিদ্যাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং পাশ্চাত্য দেশের বহু পূবর্ব হইতেই ভারতবর্ষে নৃত্যবিদ্যা মহা-পৌরুষের সহচরী হইয়া আসিয়াছে। অবশ্য, সে নৃত্যবিদ্যা আধুনিক রঙ্গমঞ্চের অথবা বাইজী নাচের লাস্য-প্রণালীর নৃত্যবিদ্যা নহে, ইহা ভারতের আদিম বিশুদ্ধ তাণ্ডবজাতীয় প্রলয় নৃত্য।

আমি বিশুদ্ধ সূত্রে জানিয়াছি যে ভারত সাম্রাজ্যের পাঠান সৈন্যদের মধ্যে কোন কোন সৈন্যদল 'খট্টক' নৃত্য নামক এক প্রকার নৃত্য করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা তাণ্ডব জাতীয় নয়। হিন্দুদের বিশুদ্ধ প্রণালীর রণ-তাণ্ডব নৃত্যের প্রচলন, রাঢ় প্রদেশের 'রায়-বেঁশে' যোদ্ধার মত এইরূপ ব্যাপকভাবে ভারতবর্ষের অন্য কোন জাতির সৈন্যদলের মধ্যে

আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। এখানে স্বতঃই একটা প্রশ্ন মনে আসে—এই তাণ্ডব নৃত্যের বহুল প্রচলন ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে না হইয়া এই রাঢ় অঞ্চলের যোদ্ধাদের মধ্যে হইল কেন? পঞ্চ পাণ্ডবগণ তাহাদের বনবাস কালে যে "একচক্রা" নামক স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন তাহা বীরভূম জেলারই 'একচক্রা' এই বলিয়া যে প্রবাদ আছে, অর্থাৎ হয়ত স্বয়ং অর্জ্জুনই এই অঞ্চলে বাসকালীন ইহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন, এই কল্পনা যে এ ক্ষেত্রে নিতান্ত অস্বাভাবিক অথবা অযৌক্তিক, তাহা বলা যায় না।

বিবাহেতে রাইবিশে

যাক্ কল্পনা ও অনুমান রাজ্যের কথা। এখন বাস্তব রাজ্যের কথা বলি। 'রায়-বেঁশে'রা দেখিল যে, যুদ্ধ বিদ্যা দ্বারা আর জীবিকা নিৰ্ব্বাহের উপায় নাই। এখন আর সেই ভল্লও (রায়-বাঁশ) নাই এবং ভল্ল (রায়-বাঁশ) ব্যবহারের সুযোগও নাই। এখন করিতে হইবে জমিদারের পাইকগিরি ও বরকন্দাজী। অনেকে তাহাই করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য, বরকন্দাজী ও পাইকগিরিও যে সকলের জুটিয়া ওঠে না। সুতরাং ইহাদের অর্জ্জুনের মতই যুদ্ধ বিদ্যার পরিবর্ত্তে নৃত্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল। কারণ যুদ্ধ যাত্রাকালীন এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে ইহারা যে মণ্ডলী করিয়া উল্লাসের সহিত নৃত্য করিত এবং সেই নৃত্যে তাহারা যে বিশেষ পারদর্শী ছিল, ইহার প্রমাণ আমরা পাই কবিকঙ্কন চণ্ডীতে, অন্নদামঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গলে।[১] যুদ্ধ বিদ্যার পরিবর্ত্তে ইহাদের জীবিকানিৰ্ব্বাহের এখন তিনটি পুঁজি রহিল—সামরিক তাণ্ডব নৃত্য, সামরিক ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শন ও প্রয়োজন অনুসারে লাঠি বা বল্লম ব্যবহার করিয়া তাহাদের মনিবদের—জমিদারদের ও সমাজের ধনীদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, রাঢ় অঞ্চলে বিবাহ উপলক্ষে 'রাইবিশে'র নাচ, 'রাই-বিশে'র ব্যায়াম ক্রীড়া এবং শোভাযাত্রার শোভাবৰ্দ্ধন ও রক্ষাবিধান একটা গৌরবময় ফ্যাসানে পরিণত হইল। আর, সেই সুযোগে রাইবিশেদেরও জীবনযাত্রার একটা সহজ ও স্বাভাবিক উপায় হইয়া গেল। তাহারা তখন তাহাদের চিরাভ্যস্ত সামরিক তাণ্ডব নৃত্যই এই সব বিবাহ উপলক্ষে প্রদর্শন করিত। তাহাদের ব্যায়াম ক্রীড়াও ছিল এবং এখনও আছে অদ্ভুত দৈহিক শক্তি,

---

[১] —কবিকঙ্কণ চণ্ডী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং—২২৯ পৃঃ ও ৬৭৯ পৃঃ)।
—কবিকঙ্কণ চণ্ডী (বঙ্গবাসী সং ১৩১৩/৯৫ পৃঃ ও ২৬৫ পৃঃ)।
—ধর্ম্মমঙ্গল—ঘনরাম (বঙ্গবাসী সং ১২৯৫/২৭২ পৃঃ)।
—অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র। (বঙ্গবাসী সং, ১২৯৫/১১৪ পৃঃ)।

সাহস ও কুশলতার পরিচায়ক। ইহারা কখনও এই সকল ব্যায়ামক্রীড়া কোন সার্কাসে শিক্ষা করে নাই। তাহাদের পুর্ব্বপুরুষেরা প্রাচীনকালে বাঙলার ও বাঙলার বাহিরের অসংখ্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে সামরিক ব্যায়াম ক্রীড়া অভ্যাস করিত, তাহাই তাহারা বংশপরম্পরাক্রমে, তাহাদের অবস্থার দুর্ভাগ্যজনক শত পরিবর্তন সত্ত্বেও অভ্যাস করিয়া যতদূর সম্ভব অটুট রাখিয়া আসিয়াছে। যাঁহারা বড় বড় সার্কাসের অদ্ভুত ব্যায়াম ক্রীড়া দেখিয়াছেন, তাহাদিগকেও এই রাইবিশে ক্রীড়ার অত্যদ্ভুত শক্তির পরিচয় ও কুশলতা দেখিয়া এখনও বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়।

রায়বেঁশের রায়বেঁশে

কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস যে কালক্রমে জীবিকা নিবর্বাহের এই প্রণালীটিও ইহাদের পক্ষে দুর্ঘট হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার কারণ অনেক। প্রথমতঃ অনেকেই বিবাহ উপলক্ষ্যে রাইবিশে না আনিয়া ব্যাণ্ড ইত্যাদি আনিতে লাগিল। ইহা ছাড়া বাঙালী জনসাধারণের অবস্থার, মনের ও শিক্ষাধারার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব বিষয়ে রুচিরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল—বিশেষতঃ নৃত্য সম্বন্ধে। বাইনাচেরও অন্যান্য প্রকার লাস্য জাতীয় নাচের মোহে যে বাঙালী একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িল—তাহার কাছে পুরুষের ল্যাঙ্গট পরা কাটখোট্টা নাচ ভাল লাগিবে কেন? ইহারা যে যোদ্ধার জাত তাহা ইতিমধ্যে বাঙালী ভুলিয়া গিয়াছে। 'রায়-বেঁশে' নামের প্রকৃত অর্থ যে কি, তাহাও যে তাহারা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে, কেবল তাহা নহে, "রায়-বেঁশে" নামটা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে এবং এখন এই নাচের নাম তাহারা দিয়াছে 'রাইবিশে'। সুতরাং এখন এই 'রাইবিশে' নামে পরিচিত প্রাচীন "রায়বেশে"দের আদব যোদ্ধার সামরিক নৃত্যের মাপকাঠিতে হইবার অবকাশ আর রহিল না। এই যুগে বাঙালী শুধু তিন প্রকার নৃত্যের সঙ্গেই পরিচিত ছিল—অর্থাৎ বাইনাচ, বাউল ও কীর্ত্তন জাতীয় ভক্তিমূলক নাচ ও কৃষ্ণলীলার নাচ। কীর্ত্তনের নাচ ব্যতীত এই তিন প্রকার নৃত্যেই নর্ত্তকেরা কোন একটা বিশেষ বেশভূষা পরিধান করিয়া নৃত্য করে। সুতরাং নগ্নদেহে শুধু 'বীরধড়ি' (ল্যাঙ্গট) পরিয়া পুরুষের নৃত্য যে বাঙালীর চোখে আর ভালো লাগিবে না ইহা বোঝা দুষ্কর নহে। বিবাহের সময় স্বভাবতঃই বাউল অথবা কীর্ত্তন নৃত্যের স্থান নাই। সুতরাং নর্ত্তকদের প্রতিযোগিতা করিতে হইল বাই নাচের সঙ্গে কৃষ্ণলীলার নাচের সঙ্গে, এবং এই প্রতিযোগিতায় যে কি করিয়া তাহাদের অধিকাংশকেই 'রায়বাঁশ'এর পরিবর্ত্তে 'রাই-বেশ' ধরিতে হইল তাহার বিচিত্র কাহিনী পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা বিবৃত করিব।

বাঙলার ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্র

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই "রায়-বেঁশে" যোদ্ধাদের অদৃষ্টের যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। তখন হইতেই তাহাদিগকে যোদ্ধার ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সমাজের অন্য ক্ষেত্রে ব্যবসা খুঁজিতে হইয়াছে। ইহাও দেখানো হইয়াছে যে, যখন বাঙালী জমিদারের অধীনে পাইকগিরি, বরকন্দাজি ইত্যাদি ব্যবসাও বাঙালীর পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন অগত্যা বিবাহ উপলক্ষ্যে বরযাত্রীদের শোভাযাত্রার অনুগমন এবং পথে বরের দলকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার ভার তাহাদের উপর পড়িল। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ উপলক্ষ্যে নৃত্য করিয়া তাহারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেশের অনেক স্থানেই অশান্তি ও ডাকাতি ইত্যাদির উপদ্রব ছিল বলিয়া বিবাহের শোভাযাত্রায় বলশালী 'রায়-বেঁশে'দের রক্ষকস্বরূপে অনুগমনের বিশেষ আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দেশে পূর্ণশান্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সেই আবশ্যকতা আর রহিল না। বরের শোভাযাত্রায় 'রায়-বেঁশে'দের অনুগমনের প্রথা উঠিয়া গিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে ব্যাণ্ড ইত্যাদির ফ্যাসান প্রচলিত হইতে লাগিল। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, ইতিমধ্যে 'রায়-বেঁশে'র প্রাচীন যোদ্ধাবৃত্তির স্মৃতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, —এমন কি, সাহিত্যে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও বাঙালী রায়-বেঁশে নামটি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া ইহাদিগকে সাধারণ নর্ত্তক-নর্ত্তকীর দল মনে করিয়া 'রাই-বিশে' আখ্যা প্রদান করিয়াছে। আর এই 'রাই-বিশে'দিগকে তাণ্ডব নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ উপলক্ষ্যে কৃষ্ণলীলার নাচ ও বাই-নাচের সঙ্গে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইতে হইয়াছে। বাঙালী

তাহা নিজেই ভুলিয়া গিয়া এখন কেবল রাধাকৃষ্ণের নৃত্যাভিনয়ে ও বাই-নাচের উপভোগে গা ঢালিয়া দিয়াছে। এখন আর নগ্ন দেহে বীর-ধড়ি (ল্যাঙ্গট) পরিয়া পুরুষের যোদ্ধার নৃত্যের মূল্য বাঙালী বুঝিতে পারে না—সেই নৃত্য তার চোখে আর ভালো লাগে না।

এই হইল বাঙলার ইতিহাসের ও বাঙালীর চরিত্রের ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্র। এখন নর্ত্তকের বেশে নাচিতে হইলে ধরিতে হইবে কৃষ্ণের ধরাচূড়া ও বাঁশী, —নর্ত্তকীর বেশে নাচিতে হইলে পারিতে হইবে—হয় বাঙালী রাধিকার শাড়ী ও ঘোম্‌টা, নয় বৃন্দাবনী রাধিকার অথবা পশ্চিমী বাইজীর ঘাগরা। কিন্তু এই যুগে, নর্ত্তকের নৃত্য হইতে নর্ত্তকীর নৃত্যেরই চাহিদা বাঙলার সমাজে বেশি হইয়া পড়িল।

বাঙলার জীবনে অতি 'রাই' ভাব

ইতিমধ্যে বাঙালী সমাজে ও বাঙালী চরিত্রের একটা মহা পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত বাংলার সমাজে ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, পা ফাঁক করিয়া সিগারেট ফুঁকা ও মজলিস করিয়া মদ খাওয়া সভ্যতার একটা বিশেষ ও চূড়ান্ত নিদর্শন। এবং এইসব মজলিসের এমন কি, দুর্গোৎসব ইত্যাদি উপলক্ষ্যেও শিক্ষিত বাঙালী সমাজে এই যুগে মদমাৎসর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে রাই-নাচের বহুল প্রচলন ঘটিল। সুতরাং—'রাই-বিশে' আখ্যায় পরিচিত 'রায়-বেঁশে'র বংশধরেরা এখন দেখিল যে বিবাহ উপলক্ষ্যে নৃত্য করিয়াই যদি জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে বাইজীর ঘাগরা পরা ছাড়া আর উপায় নাই। তাই অর্জ্জুনকে যেমন দায়ে পড়িয়া ধরিতে হইয়াছিল বৃহন্নলার বেশ, তেমনি রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বীর বংশধর দিগকেও ধরিতে হইল বাইজীর রাই-বেশ, 'রায়-বাঁশের' পরিবর্ত্তে ধরিতে হইল 'রাই-বেশ'—বীর ধড়ির পরিবর্ত্তে ঘাগ্‌রা। বজ্রমুষ্টি সঞ্চালন ও 'বেড়া-পাকের' তাণ্ডবের পরিবর্ত্তে, তাহাদিগকে অভ্যাস করিতে হইল মৃদু পদবিক্ষেপে কোমর দুলাইয়া লাস্য। রায়বেঁশেদের জাতীয় জীবনে অসমসাহসিক যোদ্ধার পৌরুষমণ্ডিত গৌরবময় স্থান হইতে বাই-নাচের কুরুচিকর গহ্বরে পতন, বাঙালী চরিত্রে ও সমাজে প্রাচীন যুগের প্রকৃতি হইতে বর্ত্তমান অধঃপতনের প্রতীকমূলক একটি নিদর্শন মাত্র।

অবনতির কারণ

এই অবনতির ধারা যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহা বীরভূম, বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাইবিশে নৃত্যের বর্ত্তমান প্রণালীর সহিত যাহারা পরিচিত

আছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। অবনতি যেখানে অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর হইয়াছে সেখানে রাইবিশেরা বডিস ও ঘাগরা পরিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, কিন্তু যেখানে খাঁটি বাই-নাচের চাহিদা বাঙালী সমাজে বেশি হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে তাহাদের লম্বাচুল রাখিয়া মাথার মাঝখানে মেয়েলি সিঁথি কাটিয়া খোঁপা পরিতে হইয়াছে, এবং চুলে ও খোঁপায় বাইজীর অনুকরণে মনভুলানো অলঙ্কার পরিধান করিতে হইয়াছে। ঘাগরা পরা একটা ছবি এই প্রবন্ধের সঙ্গে দেওয়া গেল। পাটি করিয়া মেয়েলি সিঁথিকাটা খোঁপা বাঁধা চুলে অলঙ্কার পরিয়া রাই-বিশে নৃত্য দেখিয়া আমার মনে এত লজ্জা ও ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছিল যে, তাহার ছবি পর্য্যন্ত লইতে আমরা প্রবৃত্তি হয় নাই, এবং সমাজের রুচির পরিবর্ত্তনে সেই গৌরবময় তাণ্ডব নৃত্যের স্থানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রায়-বেঁশেদের কি জঘন্য প্রণালীর নৃত্যের ব্যবসা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তাহা দেখিয়া লজ্জায় আমার মাথা হেঁটে হইয়া গিয়াছে। কোথায় সেই স্ফীত বক্ষে, বজ্রমুষ্টিবদ্ধ বাহু-সঞ্চালনের সহিত রণডঙ্কা ও কাঁসির তালে তালে সতেজে উন্নত দৃপ্ত পদবিক্ষেপে ও বীরত্বব্যঞ্জক মুখভঙ্গে, মুহুর্মুহু হুহুঙ্কার ও রণশিঙ্গার নিনাদ সহযোগে রণতাণ্ডব নৃত্য—আর কোথায় এই বাঁয়া তব্‌লায় বিলাস-তালে ও সভ্য জগৎ বর্জ্জিত কিম্ভূতকিমাকার আম্‌দানী হারমোনিয়াম যন্ত্রের লাস্যপ্রণোদক মেয়েলি মিহি কোমল সুরের সঙ্গে হাত কাঁপানো, কোমর দুলানো, কটাক্ষ ছড়ানো, ইঙ্গিত-মাখানো আধুনিক 'বঙ্গসমাজের' মনভুলানো 'রাই' ভাবাত্মক মজ্‌লিসী নৃত্য? ইংরাজী কিম্বদন্তী অনুসারে বলিতে ইচ্ছা করে—'এই ছবি দেখ, —আর ঐ!' (Look at this picture and that!)

আয় ঢকাঢক মদ্ খিসে

বাঙলার ভদ্রসমাজের নৈতিক আবহাওয়া ও বাঙালীর চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তনের চমৎকার প্রতিকৃতি আমরা পাই এই দুই ছবির তুলনায়। প্রাচীন বাঙালী সমাজের রণতাণ্ডব 'রায়বেঁশে' নৃত্যের সঙ্গে বর্ত্তমান 'রাইবিশে'র অতি 'রাই' ভাবাপন্ন লাস্য নৃত্যের যে পার্থক্য গঙ্গারাঢ় ও পাল যুগের বাঙলার পৌরুষময় ও প্রাণবান্ জীবন পদ্ধতির সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের বাঙলার জীবনে, ধর্ম্মে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, অতিকৃত্রিমতায়, অতি কোমলতায় প্রাণস্পর্শহীনতার ও পৌরুষহীন অতি 'কচি' ভাবের সেই পার্থক্য রায়বেঁশেদের নৃত্যের প্রণালীতে এই যে দুর্ভাগ্যময় পরিবর্ত্তন, ইহার জন্য দায়ী তাহারা নয়, ইহার জন্য দায়ী বাঙলার ভদ্রসমাজের রুচিবিকৃতি, আমরা আগেই দেখাইয়াছি, প্রাচীন রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বীর বংশধরেরা জীবিকা নিবর্বাহের নির্ম্মম প্রয়োজনের খাতিরে, যে প্রণালীর নৃত্যের

চাহিদা, দেশের ধনী ও ভদ্রসমাজে হইয়াছে, তাহাই যোগাড় করিয়াছে। ইহাতে ইহাদের দোষ দেওয়া চলে না। কেননা, যে ভদ্র মজ্‌লিসের সামনে ইহাদের নৃত্য করিতে হয় তাহাদের মনোমত ও রুচি অনুযায়ী ভাব-ভঙ্গীময় নাচই ইহারা দায়ে পড়িয়া অগত্যা সংগ্রহ করিয়াছে।

পাঁচমাস আগে এই রায়বেঁশে নৃত্য যখন প্রথম আমার নজরে আসিয়াছিল, এবং ইহার উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমি যখন বীরভূমের অনেককেই এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন এই জেলার স্বনামখ্যাত নাট্যকার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "রায়বেঁশে" সম্বন্ধে এই মাত্র জানি যে এই নাচ বিবাহ উপলক্ষ্যে হইয়া থাকে এবং ছেলেবেলা হইতেই এ সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী শুনিয়া আসিতেছি—

"দাদার বিয়ে যেমন তেমন
আমার বিয়েয় রাইবিশে,
আয় ঢকাঢক্ মদ্ খি'সে।"

এই কিম্বদন্তী হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙালী ভদ্র সমাজের বিলাস মজলিসে কি আবহাওয়া প্রচলিত ছিল এবং কি প্রকৃতির দর্শকের রুচি অনুযায়ী নৃত্য বিবাহের সময়ে রাইবিশের দলকে জোগাড় করিতে হইয়াছিল। এই আবহাওয়া যে এখনও চলিত আছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, এখনও রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বীর প্রকৃতির বংশধরদিগকে ভদ্র সমাজের বিবাহের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছদ্মবেশী বৃহন্নলার মত রাইবিশে নৃত্য করবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

রায়-বেঁশের বিশেষত্ব

কচি ভাব হইতে রক্ষা

জাতীয় জীবনের দীর্ঘকালব্যাপী এই বিকৃত রুচি ও বিকৃত মনোভাবের দুর্ভাগ্যময় ফল প্রসব সত্ত্বেও যে এই রাইবিশের দল বাঙলার ভদ্র মতোই তাহাদের পুরুষানুক্রমিক প্রাচীন বীরভাব ও বীরত্ব পদ্ধতি একেবারে ভুলিয়া গিয়া 'কচি সংসদে' অথবা একটা পুরুষকার ও প্রাণবস্তুহীন কৃত্রিম দোআঁসলা কিম্ভূত পদার্থে পরিণত হইয়া যায় নাই; ইহা বাঙালী জাতির পক্ষে একটা মহা সৌভাগ্যের কথা। যদি তাহাদের প্রকৃতিতেও এই শোচনীয় বিকৃতি ঘটিত, তাহা হইলে বাঙালীর জাতীয় জীবনের এই প্রাচীন মহাগৌরবমণ্ডিত রণতাণ্ডব নৃত্যকলা ও ব্যায়াম প্রণালী চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যাইত, এবং কেবল মহাদেব মূর্ত্তির ও প্রাচীন মন্দিরের গায়ে খোদিত মূর্ত্তির প্রতিকৃতি অনুকরণ ও পুঁথির বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া এই নৃত্যকে আবার জীবন্ত ভাবে জাতীয় জীবনে প্রচলন করিবার সুযোগ ও সুবিধা বাঙালীর ভাগ্যে ঘটিত না।

রায়বেঁশের বিশেষত্ব

ইহারা যে 'কচি-সংসদে' পরিণত হইয়া যায় নাই, তাহার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ সৌভাগ্যবশতঃই বলিতে হইবে, তাহারা এতদিন আমাদের আধুনিক পাঠশালা, স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত্রিমতা, প্রাণস্পর্শহীনতা, জড়তা, আনন্দহীনতা ও বিলাসিতা প্রণোদক পুরুষাকারনাশী শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ লাভ করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই রায়বিশে জিনিষটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত সত্তা, —ইহা কেবল একটি বিশেষ প্রকার নৃত্যকলা মাত্র নয়, ইহা পাঁচটি বিশিষ্ট অঙ্গসমন্বিত একটি পূর্ণাবয়ব সত্তা। এই পাঁচটি অঙ্গের প্রথম অঙ্গ —রণতাণ্ডব নৃত্যকলা, দ্বিতীয় অঙ্গ—নৃত্যকলার সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহু "য়্যাঃ" নিনাদে হুঙ্কার;

তৃতীয় অঙ্গ—রণশিঙ্গার স্বনন এবং রণডঙ্কা ও কাঁসির উন্মাদ ছন্দের রনন; চতুর্থ অঙ্গ—এই ধবনি, নৃত্য ও সিংহনাদের তালে তালে বীরোচিত সামরিক ব্যায়াম-ক্রীড়ার সময় মুখে হাততালি দিয়া উচ্চ আরাব করিয়া উল্লাস প্রকাশ।

বৃহন্নলার লুক্কায়িত বীর মূর্ত্তি

আধুনিক ভদ্র সমাজের বিকৃত রুচির ফরমাইসের খাতিরে ইহাদের নৃত্যকলা অনেক জায়গায়ই শোচনীয় অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে, এমনকি; ইহাও শুনি যে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কোন কোন স্থানে ইহারা নৃত্যকলার অঙ্গটি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইহা তাহারা সম্পূর্ণভাবে ভুলিতে পারে নাই। আর যেখানে ইহাদের নৃত্যকলা 'রায়বেঁশে' ভাব ও পদ্ধতি হইতে বিচ্যুত হইয়া 'রাই' ভাব ও 'রাই' বেশ ধারণ করিয়াছে সেখানেও রণডঙ্কা ও কাঁসির তালে তালে সামরিক ব্যায়াম-ক্রীড়ার প্রথা ইহারা এখনও বজায় রাখিতে পারিয়াছে বলিয়া ইহাদের বীরভাব এখনও অনেকটা বজায় রহিয়া গিয়াছে। কারণ, বিবাহের সময় ইহারা যে, কেবল নৃত্য করে তাহা নয়, সেই নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সার্কাসের ব্যায়াম-ক্রীড়া হইতেও অদ্ভুত আপনাদের শক্তি ও সাহসের পরিচায়নে বাঙ্গলার প্রাচীন সামরিক ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে। আর যখন সেই সামরিক ব্যায়ামক্রীড়া প্রদর্শন করে তখন ইহাদের 'রাই' বেশ খুলিতে হয় এবং তাহার ভিতরে এখনও ইহারা যে বীরধড়ি পরিধান করে তাহা বাহির হইয়া পড়ে এবং অর্জ্জুনের যেমন বৃহন্নলার নপুংসক বেশের আবরণের আড়ালে বীরের শক্তিময় মূর্ত্তি লুক্কায়িত ছিল ইহাদেরও তেমনি 'রাই' বেশের ঘাগ্‌রার অন্তরালে (এবং অনেক ক্ষেত্রে মেয়েলি সিঁথি ও লম্বা চুলের খোঁপা সত্ত্বেও) যে বীরের শক্তিমান মূর্ত্তি লুক্কায়িত আছে, তাহা বাহির হইয়া পড়ে। যাহারা 'রাই' বেশের ঘাগ্‌রা পরিয়া মেয়েলি নৃত্য করিয়া বিবাহের মজলিসে আধুনিক বাংলার ভদ্রসমাজের চিত্তবিনোদন করে তাহারাই যে আবার পর মুহূর্ত্তে ঘাগ্‌রা খুলিয়া ফেলিয়া, তাহার আড়ালে বীর-ধড়ি পরিহিত বিশাল বক্ষ স্ফীত পেশীযুক্ত নগ্নদেহে বীরের ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে, ইহা ইহাদের বিচিত্র ইতিহাসময় জীবনের ও আমাদের আধুনিক সমাজের এক আশ্চর্য্য প্রহেলিকা।

অধিকাংশ স্থলেই এই প্রহেলিকাময় দৃশ্য রাঢ় প্রদেশে বিবাহ উপলক্ষে আজকাল দেখা যায়, অর্থাৎ 'রাই'-বেঁশে পুরুষের লাস্যময় নৃত্য, —আবার সেই পুরুষদেরই বীরধড়ি পরিয়া নগ্ন বীরদেহে রণডঙ্কা ও কাঁসির তালে তালে অদ্ভুত সামরিক ব্যায়াম-ক্রীড়া। রায়বেঁশে শ্রেণীয় এই সামরিক ব্যায়াম ক্রীড়াতে এমন একটি মৌলিকতা আছে, যাহাকে বিশেষভাবে বাঙ্গলার প্রতিভাজাত বলা যাইতে পারে। ইহারা ব্যায়াম-ক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে

ঢোলের ও কাঁসির তালে তালে পরম উল্লাসের নৃত্য করিয়া থাকে এবং তাহাতে একটি অভিনব রসকলার সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইহাকে ব্যায়াম-ক্রীড়া না বলিয়া ব্যায়াম-নৃত্য বলা যাইতে পারে।[১]

খাঁটি রাইবিশে

এখনকার সকল রাইবিশের দলই যদি তাহাদের প্রাচীন 'রায়বেঁশে' রণতাণ্ডব নৃত্য ভুলিয়া গিয়া 'রাইবেশে' নৃত্য করিত, তাহা হইলে এই রায়বেঁশে রণতাণ্ডব যে ভারতীয় সূক্ষ্মকলার উচ্চ আদর্শে গঠিত, কি গৌরবময় জাতীয় সম্পদ তাহা জানিবার এবং তাহাকে অবলুপ্তি হইতে উদ্ধার করিবার সুযোগ আমাদের ঘটিত না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি প্রথম যে রাইবিশে দলের নৃত্য দেখিয়াছিলাম, তাহাদের আদিম নৃত্যকলা পদ্ধতিতে এই অবনতি প্রবেশ করে নাই। অনুসন্ধানের ফলে এখন দেখা যাইতেছে যে, 'রাঢ়' অঞ্চলের পূর্ব্বভাগে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ জেলায় এবং বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশে ইহারা প্রাচীন "রায়বেঁশে" তাণ্ডব নৃত্য সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া তাহার স্থলে এখন কেবলমাত্র 'রাই' বেশে বাই নাচের মত লাস্য নৃত্য করিয়া থাকে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নগ্নদেহে বীরধড়ি পরিয়া ব্যায়াম প্রদর্শন করিয়া থাকে। এমনকি শুনিতে পাই যে মুর্শিদাবাদে ইহাদের মধ্যে নৃত্যকলাটি একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ও কেবলমাত্র ব্যায়াম ক্রীড়াই অবশিষ্ট আছে। কিন্তু রাঢ় প্রদেশের একান্ত পশ্চিমভাগে অর্থাৎ বীরভূমের পশ্চিমভাগ ও বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশের কোন কোন স্থানে ইহাদের প্রাচীন তাণ্ডব-নৃত্য-পদ্ধতি এখনও অনেকটা অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রহিয়াছে।

[১] লেখকের পক্ষে ইহা অতি গৌরবের বিষয় যে, এই আন্দোলনের ফলে ইতিমধ্যে বাঙলার নানা জেলায় বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ রীতিমত রায়বেঁশে তাণ্ডব নৃত্য ও রাইবিশে ব্যায়াম নৃত্য শিক্ষা করিতেছেন এবং ইহার ফলে তাঁহারা শিক্ষাক্ষেত্রে একটা নূতন শক্তি ও সাহসের উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন।

রাঢ় সৈন্যের গৌরব ধারা

গঙ্গারাঢ়

রাঢ় প্রদেশের পশ্চিম সীমান্তেই খাঁটি রায়বেঁশে শ্রেণীর অমিতপরাক্রম যোদ্ধাদের অতি প্রাচীন কাল হইতেই বসতি ছিল। ইতিহাস হইতে ইহা এখন অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে 'গঙ্গারাট' বা গঙ্গারাঢ় প্রদেশের ভারতীয় যোদ্ধাদের অতুল পরাক্রমের কথা শুনিয়া দিগ্বিজয়ী সেকেন্দরের সৈন্যদল পূর্ব্বভারত অগ্রসর হইতে অস্বীকার করে এবং ইহার ফলে সেকেন্দরকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। ইহা হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি এই গঙ্গারাঢ়ী সেনাদল সেই সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড পরাক্রমশালী যোদ্ধা ছিল।[১]

গঙ্গারাঢ় প্রদেশ যে আধুনিক রাঢ় প্রদেশ ইহা বিদেশী পর্য্যটক মেগাস্থিনিস্ ও টলেমির গ্রন্থ এবং অন্যান্য প্রমাণাদি হইতে অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হইয়াছে। এবং এই গঙ্গারাঢ় নাম

---

[১](a) ....He (Alexander)......learnt beyond the river by extensive deserts which it would take eleven days to traverse. Next come the Ganges, the largest river in all India, the father bank of which was inhabited by two nations, the Gangaride and the Parsii, whose king Argammes kept in the field for guarding the approaches to his country 20,000 cavalry and 2,00000 infantry, berises 2,000 four-horsed chariots and what was the most formidable force of all, a troop which he said ran up to the number of 3,000.
(b) ....He (Alexander) gathered them (His soldiers) altogether and in a well weighted speech addressed the assembly on the subjects of the expedition against the Gangaride; but when the Macedonians would by no means assent to his proposal, renounced his contemplated enterprise. —History of Alexander, the Great by Q. Curtis Rufus and I. W. Mcerindles—Ancient India.

হইতেই খুব সম্ভবতঃ আধুনিক রাঢ় নামের উৎপত্তি। রাঢ় প্রদেশের এই প্রচণ্ড পরাক্রমশালী যোদ্ধাদের অনেকেই যে রায়বেঁশে শ্রেণীর ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গঙ্গারাঢ়ীদের সময় হইতেই যে একটা বিশেষ গভীর সামরিক গৌরব ধারা এই প্রদেশে চালিয়া আসিয়াছিল তাহাও নিঃসন্দেহ। কেননা ইহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ আমরা পাই যে, রাঢ় প্রদেশের সৈন্যদলের বাহুবলের সাহায্যেই সেন রাজবংশ সামান্য সামন্তের পদ হইতে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ্য হইয়াছিল।[১] এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাঢ় প্রদেশের সৈন্যদলের বাহুবলের সাহায্যেই উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজাগণ উড়িষ্যার মুসলমান আক্রমণ বার বার প্রতিহত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।[২] পশ্চিম রাঢ়ের এই দোর্দ্দণ্ড সৈন্যদলের বলে বলীয়ান হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বীরভূমের রাজনগরের মুসলমান রাজবংশ এত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা মুর্শিদাবাদের নবাবের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই।[৩] এবং পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পূবের্বও লর্ড ক্লাইভ বিলাতে সিলেক্ট কমিটির নিকট রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে, তৎকালে বীরভূমের রাজা, দিল্লীর উজির এবং মারাঠা "এই তিন প্রধান শক্তির" সঙ্গে সন্ধি করা বাঞ্ছনীয়।[৪] ইহা হইতেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত পশ্চিম রাঢ় প্রদেশের সৈন্যদলের দুর্জ্জয় প্রতাপের প্রমাণ আমরা পাই। পলাশীর যুদ্ধের তিন বৎসর পরেও পশ্চিম রাঢ় প্রদেশের পরাক্রান্ত সৈন্যদের সাহায্যে বীরভূমের রাজা ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।[৫]

ইহার পরেও বাঙলার অন্যান্য রাজাদের শৌর্য্য-বীর্য্যের তিরোধানের অনেক কাল পর পর্য্যন্তও বীরভূমের রাজনগরের রাজবংশ এই অঞ্চল তাহাদের পরাক্রম বহুকাল বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৈন্যদলে অসংখ্য রায়বেঁশে যোদ্ধা ছিল। সুতরাং বর্ত্তমানে ইহাদের 'রাইবিশে' নামে খ্যাত বংশধরদিগের মধ্যে তাহাদের পূবর্বপুরুষানুক্রমিক সামরিক ভাব ও নৃত্যকলা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা যে বেশি দিন বজায় থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। আমি অনেক রাইবিশে দলের নৃত্যক্রীড়া ও ব্যায়াম দেখিয়াছি। রাজনগরের রাজধানীর অনতিদূরে এবং রাজনগরের গড়ের ভিতরে অবস্থিত 'গোহালিয়াড়' গ্রামের রাইবিশে দলের নৃত্যই ইহাদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা বিশুদ্ধ ও সুন্দর। ইহা হইতেও

---

[১] বল্লাস সেনের কাটোয়ার তাম্রশাসন। বাংলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

[২] (১) বিবিধ প্রসঙ্গ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(২) Elphinstone's History of India, P. 243 (7th ed.)

[৩] Sair—Ul Mutakhasin II, P. 393-94.

[৪] C. R. Hill's Bengal in 1756-57, Vol. I, P. exc. VII and Vol. II, P. 418.

[৫] Hunters Annals of Rural Bengal.

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সত্যতার সমর্থন হয়। এই পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে এখনও প্রাচীন 'রায়বেঁশে' যোদ্ধা দলের বংশধরদের লুপ্তাবশেষই এখন যোদ্ধার ব্যবসা হইতে বিচ্যুত হইয়া কাঙাল বেশে 'রাইবিশে' নামে অতি দীনভাবে কালাতিপাত করিতেছে এবং বিবাহ উপলক্ষ্যে নৃত্য ও ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতেছে।

বাংলার স্পার্টান সৈন্য

রাঢ় প্রদেশের বাঙালী যোদ্ধাদিগের খৃস্টপূর্ব্ব সুদূর যুগ হইতে অমিত পরাক্রমের এই বিচিত্র ইতিহাস স্মরণ করিলে পশ্চিম রাঢ় প্রদেশকে বাংলার 'স্পার্টা' এবং রায়বেঁশে যোদ্ধাদিগকে বাংলার 'স্পার্টান' সৈন্য নামে অভিহিত করা অশোভন বা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।[১] যে দেশে এবং যে সমাজে জাতির এইরূপ গৌরবস্থানীয় যোদ্ধাদিগকে ধর্ম্ম ও সমাজের ভ্রান্ত বিধানে পদদলিত, নির্য্যাতিত, অবজ্ঞাত, অস্পৃশ্য ও শিক্ষা হইতে বিচ্যুত করিয়া রাখা হয়, সেই দেশের এবং সেই সমাজের যে ইতিহাসে পরাজয় হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। যে যে যুগে অর্থাৎ গঙ্গারাঢ় যুগে ও পাল যুগে এবং সেন রাজত্বের প্রথম যুগে, এই বীরের দলকে উপযুক্ত শ্রদ্ধার স্থান দেওয়া হইয়াছে, সেই সেই যুগেই বাংলার ইতিহাসের এই যুগব্যাপী গৌরব সহসা অস্তমিত হইবে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। অতিরিক্ত হিন্দুয়ানির অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ইহারা যে বক্তিয়ার খিলজীর আক্রমণে স্বস্তি বোধ করিয়াছিল এবং সেন রাজগণের সাহায্যে অগ্রসর হয় নাই তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।[২]

নবযুগ প্রতিষ্ঠার সুযোগ

ইহাদের শৌর্য্যবীর্য্য এবং সামরিক প্রকৃতি ও প্রণালী এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই; এখনও ইহাদিগকে সমাজে ইহাদের পৌরুষের স্বাভাবিক প্রাপ্য উচ্চ ও গৌরবময় স্থান

---

[১] "......On its inhabitants devolved, during three thousand years, the duly of holding the passes between the highlands and the valley of the Ganges. To this day they are a manlier race than their hensmen of the plains...."

W. W. Hunter's Annals of Rural Bengal, P. 3.

[২] ইহারা তখন ছিল বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। বল্লালী যুগের সেন রাজাগণ ছিলেন ঘোরতর বৌদ্ধ বিদ্বেষী। ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বৌদ্ধরাও হিন্দুদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিল। এই বিদ্বেষের পরিচয় শূন্য পুরাণের শেষভাগে "নিরঞ্জনের উষ্মা" নামক কবিতায় পাওয়া যায়। উহা হইতে জানা যায় যে ব্রাহ্মণ পীড়নে ব্যতিব্যস্ত বৌদ্ধেরা মুসলমান বিজেতার সাহায্যে হিন্দুদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়া মনে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

দিয়া, ইহাদের নিকট হইতে বাঙালীর প্রাচীন বীর প্রভৃতির অনুপ্রাণনা পুর্নগ্রহণ করিয়া, এবং ইহাদের শিক্ষার ও অন্নসংস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া বাংলার জাতীয় জীবনকে পুনরায় প্রভাবান্বিত করিবার সুযোগ আছে। সে সুযোগ বাঙালী কি গ্রহণ করিবে? যদি ধর্ম্মের ও শিক্ষার ভ্রান্ত আদর্শের মূঢ়তাবশতঃ এখনও বাঙালী ইহাদিগকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া সমাজে ইহাদের প্রাপ্য স্থানে না বসায়, তাহা হইলে ক্ষতি বাঙালীরই। কারণ, আর বেশি দিন ইহাদিগকে উপেক্ষা করিলে দেশ হইতে যে শৌর্য্য সম্পদ লুপ্ত হইবে তাহা আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না।

বাংলার হিন্দু সমাজের বিধানে নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত ও অস্পৃশ্য এই বীরের দলকে অতীতের ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া আবার কোলে টানিয়া তুলিয়া সমাজে তাহাদের প্রাপ্য গৌরবময় স্থান প্রদান করিলে শিক্ষায় ও শৌর্য্যে বাংলায় আবার যে কি নূতন যুগের সূচনা করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করিব।

বাঙলার যোদ্ধা

আমরা দেখিয়াছি যে রায়বেঁশেদের বিচিত্র কাহিনী—তাহাদের অভ্যুত্থান প্রভাব, অজ্ঞাতবাস ও অবনতি, ইতিহাসে বাঙলার জীবনে যুগে যুগে পরিবর্ত্তনের একটি প্রতীক স্বরূপ। অতি প্রাচীন যুগে, বাঙলাভাষার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, ইহাদের নাম যে কি ছিল তাহা আমরা জানি না;কিন্তু ইহারা যে খুব সম্ভবতঃ ভীমের বংশধর ও অর্জ্জুনের রণতাণ্ডব নৃত্যকলার উত্তরাধিকারী তাহা আমরা দেখিয়াছি। এবং গঙ্গারাঢ় (গঙ্গারাষ্ট্র) যুগে যখন বাঙলা শৌর্য্যে-বীর্য্যে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, তখন হইতেই রাঢ় দেশে এই শ্রেণীর যোদ্ধারা শৌর্য্যগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া বাঙলার স্পার্টা নামে অভিহিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। ইহারা প্রধানতঃ ভল্লধারী যোদ্ধা ছিল এবং 'রায়বেঁশে' নাম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে খুব সম্ভবতঃ ভল্ল অস্ত্রের[1] নামের সঙ্গে ইহাদের নামের সংযোগ ছিল। এই অনুমানের অপ্রত্যাশিত প্রমাণ পাওয়া যায়—'ভল্লা' নামে যে একটা জাতি মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় এখনও বর্ত্তমান আছে তাহা হইতে। এই ভল্লা জাতির লোক আধুনিক সমাজের শ্রেণীবিভাগ হিসাবে বাগ্দী জাতি শ্রেণীয়। ইহারা যে এককালে প্রবল বলশালী এবং যোদ্ধা শ্রেণীর ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বহুযুগের অবজ্ঞা ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ইহাদের আর্থিক অবস্থা অবনতির গভীরতম স্তরে আসিয়া পড়িয়াছে এবং যুগের পর যুগ, বৎসরের পর বৎসর অনশনে থাকিতে হয় বলিয়া, ইহাদের শারীরিক তেজস্বিতা ও শক্তির মাত্রা এত অভাবনীয় ভাবে হ্রাস পাইয়াছে যে, ইহাদের প্রাচীন যুগের তেজস্বিতা ও শক্তির শতাংশের একাংশও বজায় আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, অবনতির গভীরতম স্তরে নিপতিত বাঙলার নির্য্যাতিত এই বীরের দলের বীরোচিত মূর্ত্তির, তেজস্বিতার, অসমসাহসিকতার, অনির্ব্বচনীয় নির্ভীকতার ও বিপদে ভ্রূক্ষেপহীনতার যে শতাংশের একাংশ আজিও অবশিষ্ট আছে, তাহা আজকালকার বাঙলার পুরুষকারবিহীন শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজের প্রাণে এখনও যে

---

[1] 'ভল্ল' শব্দটি বিনাশার্থক 'ভল্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

ভীতিসঞ্চার করিয়া দেয়, ইহা বীরভূমের পূর্ব্বাঞ্চলের ও মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাঞ্চলের লোকের কাছে অবিদিত নাই। এবং ইহারা যে রাঢ় প্রদেশের 'স্পার্টান' সৈন্যদলের একটা বিশেষ অংশ ছিল তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহাদের বর্ত্তমান নাম হইতেও প্রতীয়মান হয় যে সংস্কৃত যুগে ইহাদের 'ভল্লায়ুধ', 'ভল্লধারী' অথবা ভল্ল কথার সহিত সংযুক্ত এমন কিছু একটা নাম ছিল, এবং বাংলা যুগে এই শ্রেণীর বেশীর ভাগ যোদ্ধাই 'রায়বেঁশে' আখ্যা লাভ করা সত্ত্বেও ইহাদের একটি শ্রেণীর এখনও এই প্রাচীন নামের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি হইয়া যায় নাই। সমাজের হস্তে নির্য্যাতিত এবং জীবিকা নির্ব্বাহ বৃত্তির সুযোগ হইতে বিচ্যুত হইয়া আর্থিক অবস্থার পীড়নে ইহারা আজকাল অনেক স্থলে দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু উপরোক্ত শিক্ষা এবং জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থার সুযোগ পাইলে ইহারা যে আধুনিক কালেও বাংলার গৌরবের পাত্র হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

মন্দির প্রাচীরের যোদ্ধা মূর্ত্তি

গঙ্গারাঢ় যুগে যে বাঙালী সৈন্যের প্রচণ্ড পরাক্রমের শ্রুতি মাত্রেই সেকেন্দরের সৈন্যদের প্রাণে ভীতি সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাদের আকৃতি যে কিরূপ ছিল, তাহার ছবি কল্পনাচক্ষে আঁকিয়া তুলিতে কোন্ বাঙালীর প্রাণেই না একটা তীব্র আগ্রহ জাগিয়া উঠে? কিন্তু সেই আগ্রহের পরিতৃপ্তি সাক্ষাৎভাবে সম্ভব না হইলেও তাহার বহুপরবর্তী যুগের ভাস্কর্য্যে, তাহার এমনই একটা নিদর্শন আমরা পাইয়াছি,যাহা আমাদের চোখের সামনে গঙ্গারাঢ় ও পালযুগের বাঙ্লার যোদ্ধার আকৃতির ছবি ফুটাইয়া তুলিবার সাহায্য করিবে বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ বিগত দুই তিনশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্লার সমাজে যোদ্ধা শ্রেণীর জাতির যে কি আকস্মিক ও অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার প্রমাণও আমরা এই ভাস্কর্য্য মূর্ত্তির নিদর্শন হইতে পাই।

এই বহুমূল্য নিদর্শনটি আমরা পাইয়াছি শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের সৌজন্যে। বৎসর কাল পূর্ব্বে নন্দলাল বাবু বীরভূম জেলার ইলামবাজার নামক গ্রামের আনুমানিক দুই তিনশত বৎসর কাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে দুইটি বীরমূর্ত্তি কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন। এবং সেই দুইটিকে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে সংরক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যে দুইটি বীরের প্রতিমূর্ত্তি তিনি কুড়াইয়া পাইলেন, ইহারা যে কোন্ জাতীয় এবং কোন্ দেশের লোক, তাহা তিনি তখন ঠিক নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বিগত মাঘ মাসে (১৩৩৭) সিউড়ী প্রদর্শনী ক্ষেত্রে পুনরাবিষ্কৃত বাঙ্লার 'রায়বেঁশে' যোদ্ধাদের বংশধরদিগের আকৃতি প্রকৃতি এবং তাণ্ডবনৃত্য দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সেই দুইটি বীরমূর্ত্তি ইলামবাজারের ভগ্নমন্দির হইতে তিনি কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন, তাহা দুই-তিন শত বৎসর আগেকার

রায়বেঁশে যোদ্ধাদেরই প্রতিমূর্ত্তি। নন্দলাল বাবুর নিকট হইতে এই মূর্ত্তি দুইটি লইয়া আমি তাহার যে আলোকচিত্র (Photo) উঠাইয়াছি তাহা এই স্থলে মুদ্রিত হইল (৩৪৬ পাতায়), এবং ইহার সঙ্গে তুলনার জন্য রায়বেঁশেদের দুইটি বর্ত্তমান বংশধরের প্রতিকৃতির একই ভঙ্গীতে গৃহীত আলোকচিত্রও এই সঙ্গে এই স্থলে প্রকাশিত হইল।

ভাস্কর্য্য ও সাহিত্যের সমর্থন

রের দেওয়ালে ক্ষোদিত যে দুইটি প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার একটি রায়বেঁশের (ভল্ল) উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে[১] ও অপর মূর্ত্তিটির দক্ষিন হস্তে উদ্যত তরবারি। উভয় মূর্ত্তি ভীমকায়, স্ফীত পেশী, উন্নত বক্ষ। উভয়টিতেই অমিতবীর্য্য, সংহত শক্তি, সংযম ও গুরুগাম্ভীর্য্যের এমনই একটি অনিবর্বচনীয় ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে যাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু যে গঙ্গারাঢ়ীয় বাঙালী যোদ্ধাদের বীর্য্য কাহিনী শুনিয়া সেকেন্দরের সৈন্যদল ভয়ে পশ্চাদ্পদ হইয়াছিল, এবং যাহারা খৃষ্টপূবর্ব শেষ শতাব্দে ভারতবর্ষের বাহিরে এন্টনীর সহিত রোমসম্রাট আগস্টাসের যুদ্ধে আগস্টাসের পক্ষে যোদ্ধৃ বেশে রণক্ষেত্রে অসীম শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া তৎকালীন ইতালীয় মহাকবি ভার্জ্জিলের অপরিমিত প্রশংসা লাভ করিয়াছিল[২] এবং পাল যুগে যে সকল বাঙালী সৈন্য সমগ্র ভারতে দিগ্বিজয়ী আখ্যা লাভ করিয়াছিল, এবং তাহাদেরই অমিতশক্তি ও পরাক্রমের কিঞ্চিৎ আভাস আমরা এই দুই মূর্ত্তি হইতে পাই। আর এই দুই মূর্ত্তি হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে ঘনরাম তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গলে, মুকুন্দরাম তাঁহার কবিকঙ্কন চণ্ডীতে, ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গলে এবং রামপ্রসাদ তাঁহার কাব্যগ্রন্থে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেও 'রায়বেঁশে' যোদ্ধাদের শক্তি, সাহস ও শৌর্য্য বীর্য্যের যে অপরিসীম প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র কবিকল্পনা নহে, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও রায়বেঁশে যোদ্ধাদের শারীরিক শক্তি ও সামরিক শৌর্য্যবীর্য্য তৎকালীন জনসাধারণের বিস্ময় ও গৌরবের বিষয় ছিল। বর্ত্তমান বাঙলার জীবিকা নিবর্বাহ বৃত্তি হইতে বিচ্যুত ও দারিদ্রপীড়িত অনশন ও অর্দ্ধাশন ক্লিষ্ট রায়বেঁশে বংশধরদিগের নৃত্যে

---

[১] ভল্লের নিম্নের ফলকাংশটি ভাঙিয়া গিয়াছে।

[২] ইতালীয় মহাকবি ভার্জ্জিল খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে তাঁহার 'জর্জ্জিক্‌স্' নামক কাব্যে লিখিয়াছেন—
"আমি আমার জন্মভূমি মস্টুয়া নগরে প্রত্যবর্ত্তন করিয়া একটি মর্ম্মর মন্দির নির্ম্মাণ করিব এবং তাহার তোরণ শীর্ষে সুবর্ণ ও গজদন্তে গঙ্গারাঢ়ীদিগের সমরে শৌর্য্য কাহিনী লিখিয়া রাখিব।—"
"....On the doors will I represent in gold and ivory the battle of the Gangaride and the arms of our victorious Quirinius."—Georgics iii, 27. Translated by Ransdale Lee.

আমরা যে নানা রূপ অভিনয়ের আভাস পাই, তাহা হইতে অনুমান হয় যে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে কেবল ভল্লধারী সৈনিক ছিল তাহা নহে তাহারা যুদ্ধে প্রয়োজনমত তীরধনুক ব্যবহার[১] ও অসি চালনা করিত এবং তাহাদের মধ্যে অশ্বারোহী যোদ্ধাও ছিল। কেননা, তাহাদের তাণ্ডব নৃত্য তাহারা এখনও এই সকল বিভিন্ন প্রকারের সমরপ্রণালীর অঙ্গভঙ্গী ও অস্ত্রচালনার অভিনয় করিযা থাকে। শুধু তাহাই নহে, আজকাল ইহাদের মধ্যে অনেক কাষ্ঠনির্মিত 'গদকা' (তরবারির কাষ্ঠ নির্ম্মিত অনুকৃতি) হস্তে অসিযুদ্ধের অভিনয় করিয়া থাকে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ভল্ল যুদ্ধ ছাড়াও অসিযুদ্ধ করিত, তাহার সমর্থন আমরা পাই এই মন্দির প্রাচীরের মূর্ত্তি হইতে। এই মূর্ত্তি দুইটি দেখিলে রামপ্রসাদের কার্য্যে "দেখিতে সাক্ষাৎ কাল"বর্ণনাটি যে অতিরঞ্জন নয় তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।[২] ইহাদের মাথায় যে সিংহের কেশরের ন্যায় বীরোচিত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরি চুল থাকিত, তাহার প্রমাণও এই মন্দির প্রাচীরের মূর্ত্তি হইতে আমরা পাই। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে ইহাদের বর্ণনায় "সোনার মুকুট শিরে", "সোনার টোপর শিরে", "মাথায় জালের দড়ি" ইত্যাদি বর্ণনা পড়িয়া আজকাল অনেকেরই মনে এইগুলি

---

১ "কোটি কোটি তীরন্দাজ থেকোবিন্ধে একন্দাজ
রায়বাঁশে কেহ নহে টুটা।"

—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ
(বঙ্গবাসী সং, ১৭ পৃঃ)

২ .... নামজাদা মালগুলা গায়মাথা রাঙ্গা ধুলা
বিক্রমের কত কব কথা।।
গাছে ডানা মারে আটি ধমকেতে মাটি ফাটি
গোড়াশুদ্ধ উপাড়ে অমনি।
পিছে হাটে মারে তাল দেখিতে সাক্ষাত কাল
অকালেতে জলদেব ধবনি।।
বাহু-যুদ্ধে যুঝে ভেলা ভূমে পড়ে করে খেলা
সন্ধান সবাই ভাল জানে।
পরস্পর ছিদ্র চায় যে যারে পালোটে পয়
হাঁ করিয়া একা চোট হানে।।
কোটি কোটি তীরন্দাজ যেথা বিন্দে একন্দাজ
রায়বেঁশে কেহ নহে টুটা।
বাঘে ও মহিষে লড়ে ধারা বয়া রক্ত পড়ে
খোম্‌কে সমান যুঝেন দুটা।।

—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ
(বঙ্গবাসী সং, ১৭ পৃঃ)

কবি-কল্পনা বলিয়া সন্দেহ করার একটা ফ্যাসান হইয়া পড়িয়াছে।[১] কিন্তু এইসব বর্ণনার মধ্যে যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই তাহার চমৎকার প্রমাণ আমরা পাই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রাম্য ভাস্কর দ্বারা ইলামবাজার মন্দির গাত্রে খোদিত তৎকালিক রায়বেঁশেদের প্রতিমূর্ত্তিতে। এই দুইটি প্রতিমূর্ত্তি হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন—একটি মূর্ত্তির মাথায় ঝাঁকড়া চুলকে বেষ্টন করিয়া জালের দড়ির মতই ঝালবওয়ালা বেষ্টনী বাঁধা আছে, এবং ইহা কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাব্যের "মাথায় জালের দড়ি" এই বর্ণনাটি আশ্চর্য্যভাবে সমর্থন করিতেছে। অপর মূর্ত্তিটির মাথায় টোপরের মতই একটি পাগড়ী বাঁধা আছে,এই টোপরটি

---

১ "লয়ে শত করিকাল ধাইল মদন পাল
ঘন ঘন ফেলে খাণ্ডা লোফে।
দুঃসহ সেনার ভরে মহী থর থর করে
ফনিপতি আদিনাগ কাঁপে।।
সোনার নূপুর পায় বীর বেড়া পাকে ধায়
রায়বাঁশ ধরে খরশান।
সোনার মুকুট শিরে ঘন সিংহনাদ করে
বাঁশে দিল চামর নিশান।।
আশীগণ্ডা বাজে ঢোল তের কাহন সাজে কোল
কাঁড় ধরে তিন তিন শাঁটি।
পরিধান বীর ধড়ি কানে ফটিকের খড়ি
অঙ্গেতে লেপয়ে রাঙ্গা মাটি।।"

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী
(বিশ্ববিদ্যালয় সং, ২৯০ পৃঃ)

(কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ সজ্জা—পাঠান্তর)

"লক্ষ লক্ষ ফিরে কাল সাজিল মদন পাল
ঘন ঘন ফেলে খাণ্ডা লোফে।
দুঃসহ সেনার ভরে ক্ষিতি টলমল করে
ফনিপতি আদিনাগ কাঁপে।।
আশী গণ্ডা বাজে ঢোল তের কাহন সাজে কোল
কাড় ধরে তিন তিন কাঠি।
পরিধান বীর ধড়ি মাথায় জালের দড়ি—
অঙ্গে মাথায় রাঙ্গামাটি।।"

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী (কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ সজ্জা),
বঙ্গবাসী সং, ৯৪ পৃঃ

যে খুব সম্ভবতঃ সোনালী কাপড়ের ছিল তাহা উক্ত কাব্যের "সোনার টোপর শিরে", "সোনার মুকুট শিরে" ইত্যাদি বর্ণনার দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। এই কাব্য এবং ভাস্কর্য্যের উভয়বিধ প্রমাণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে অন্ততঃ দুই শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রায়বেঁশে জাতীয় বাঙালী সৈন্যদের মাথায় ঝাঁকড়া বাবরি চুলকে অতি শোভন ভাবে বেষ্টন করিয়া টোপর পরিবার অথবা পাগড়ী বাঁধিবার প্রথা তৎকালে প্রচলিত ছিল।

"রথদলে সাজে রথী বীরবলে সেনাপতি
রথ আগে ধাইল দম্বল।
সোনার কলস জড়ে নেতের পতাকা উড়ে
রথশিরে ধবল চামর।।
বাজন নূপুর পায় বীরঘণ্টা পাইক ধায়
রায়বাঁশ্যা ধায় খরশান।
সোনার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ পুরে
বাঁশে বান্ধে চামর নিশান।।"

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী
(বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ২৬৫)

সেকাল ও একাল

সমাজ তখন তাহাদের যোদ্ধা হিসাবে সমাদর করিত; সুতরাং অন্নাভাবে তাহাদের দেহ শীর্ণ হইত না, জীবিকা নির্ব্বাহের বৃত্তির অভাবে তাহাদিগকে কাঙাল বেশ ধরিতে হইত না এবং তাহাদের মাথায় গৌরব-মণ্ডিত বাবরি চুলের বেষ্টনী বাঁধিবার জন্য সোনার পাগড়ীর, সোনার কাপড়ের অভাব হইত না। ইহাদের বর্ত্তমান বংশধরদিগের যে দীনতাব্যঞ্জক মূর্ত্তি, তুলনার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে মুদ্রিত করা হইয়াছে, তাহা হইতে গত দুইশত বৎসরের মধ্যে বাঙলার অমূল্য সম্পদ এই অমিত বিক্রম যোদ্ধাদের বংশধরদিগের অবস্থা ও আকৃতির কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। এই শোচনীয় পরিবর্ত্তন কেন হইয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে আমাদের বর্ত্তমান সমাজের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি এবং মানসিক ভাবের অন্তর্নিহিত ধারার একটি প্রকৃত পরিচয় অতি আশ্চর্য্যভাবে ফুটিয়া উঠে। সেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে বাঙলাদেশের বীরের দলকে কেন কাঙাল সাজিতে হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে দুঃসহ অভাবের নির্ম্মম প্রয়োজনে পড়িয়া দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে লুঠতরাজের দ্বারাও জীবিকা অর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বাঙলার প্রাচীন রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বংশধর দিগকে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃহন্নলার নপুংসক বেশে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া, রণতাণ্ডব নৃত্যকলা পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণলীলা ও বাই নাচের লাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত তাহাও আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ইহাদের যুদ্ধ ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের সুযোগ এদেশে আর নাই। ইহাও আমরা দেখিয়াছি যে, বর্ত্তমান বাঙলা দেশের লোক পুরুষের তাণ্ডব নৃত্যের আদর করিতে এবং অর্থ বুঝিতে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা এখন কেবল চায় মেয়েলি বাইজী নৃত্য অথবা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের নৃত্য।

বাঙলার সমাজে উলটপুরাণের অভিনয়

ইহা অপেক্ষাও আর একটা ঘোরতর স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন বাঙলার জীবনে ঘটিয়াছে। বাঙলার সমাজে জড়তা, অলসতা, নিষ্কর্মন্যতা, দেহের অক্ষমতা, দুবর্বলতা, ভীরুতা এবং মেয়েলি কৃত্রিম 'কচিভাব' শিক্ষিত সমাজের আদর্শ স্থানীয় হইয়া ভদ্র সংজ্ঞার নিদর্শক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং শ্রমপটুতা, কর্ম্মঠতা, দৈহিক ক্ষিপ্রতা ও বলশালিতা, সাহসিকতা এবং পৌরুষের ভাব সমাজে ঘৃণ্য বিবেচিত হইয়া ছোটলোকের সংজ্ঞার নির্দেশক হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর সবর্বত্র খুঁজিয়া দেখুন, আর কোন দেশে এরূপ "উল্টো পুরাণে"র বীভৎস অভিনয় একটা জাতির জীবনে বাস্তব ভাবে স্থায়ী হইয়া গিয়াছে, এবং দেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের চক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া গিয়াছে এরূপ উদাহরণ পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। অমুক লোকটি লাঠি খেলিতে অভ্যাস করে অথবা লাঠি খেলায় পারদর্শী, এবং তাহার শরীরের বল এবং মনে সাহস আছে? তবে সেই ব্যাটা নিশ্চয়ই গুণ্ডা অথবা দস্যু, নিশ্চয়ই তাহার ভিতরে একটা কিছু কু-অভিসন্ধি আছে, কেননা, সে বর্ত্তমান বাঙলার শিক্ষার ও আদর্শের ব্যতিক্রম। তুমি যদি শিক্ষিত বলিয়া গণ্য হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে হইতে হইবে ভীরু, রুগ্ন ও দুবর্বল। যদি ধার্ম্মিক হইতে চাও, তাহা হইলে তোমার জীবনকে করিতে হইবে বিচারহীন আচারের শৃঙ্খলাবদ্ধ, মনকে করিতে হইবে মন্ত্রতন্ত্রের সংকীর্ণ প্রাচীরে আবদ্ধ এবং ফোঁটা তিলক পরিয়া পালন করিতে হইবে ছোঁয়াছুঁয়ির 'শুচিবাই'। যদি হালফ্যাসানের কবি অথবা সংকৃষ্টিবান (cultured) বাঙালী বলিয়া গণ্য হইতে চাও তাহা হইলে রাখিতে হইবে ফুল-কোঁচানো মিহি ধুতি এবং রেশমী পাঞ্জাবী, চলিতে হইতে সলজ্জ কচি-ভাবে, কহিতে হইবে টানা টানা মেয়েলি সুরে কথা এবং লিখিতে হইবে কোমল পেলব ধোঁয়াটে ভাবের অর্দ্ধ-বোধ্য অর্দ্ধ-অবোধ্য ভাষায়। আর যদি সঙ্গতিসম্পন্ন বা সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে চাও, তাহা হলে শরীরটাকে করিতে হইবে একটা পেশীহীন স্ফীত থল্থলে মাংসপিণ্ড, গজাইতে হইবে ভুঁড়ি, বলিতে হইবে অলস ও অকর্ম্মণ্য এবং চলিতে হইবে নির্ভর করিতে হইবে নিজের পায়ের উপর নয়—পাল্কী-বেহারার কাঁধের উপর, অথবা মোটর গাড়ির গদীর উপর, আর আত্মরক্ষার ভার দিতে হইবে পশ্চিমা অথবা গুরখা দরওয়ানদের উপর, বাঙলার পল্লীগ্রামে গরিবদের মধ্যে যদি দৈবাৎ কেহ বলশালী, সাহসী অথবা লাঠিয়াল শ্রেণীর হয়, তাহা হইলে তাহারা সমাজের কর্ত্তৃপক্ষদের সন্দেহ দৃষ্টিতে পতিত হইয়া অচিরে দুর্ভাগ্যময় ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

নির্যাতন ও গোপন সাধনা

এইরূপ ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে রায়বেঁশে যোদ্ধাদিগের বীর বংশধরগণ যে গত দুই শতাব্দী কাল তাহাদের পুরুষানুক্রমিক পৌরুষাত্মক ব্যায়াম কলার চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছে, তাহা যে কি কষ্ট ও দুঃসাধ্য সাধনা সাপেক্ষ ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। "শারীরিক ব্যায়ামের চর্চ্চা করিতে গিয়া ইহাদের অনেককেই সমাজের চক্ষে সন্দেহের ভাগী হইয়া নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছে, এবং অনেককেই এই নির্যাতন ও সন্দেহের ভয়ে এইরূপ ব্যায়াম চর্চ্চা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।" যাহাদের এইরূপ বিপদ সত্ত্বেও পুরুষানুক্রমে ব্যায়াম চর্চ্চা একেবারে না ভুলিয়া উহা করিতে হইয়াছে, তাহাদিগকে উহা করিতে হইয়াছে অতি গোপনে—লোকচক্ষুর আড়ালে। আমি যখন প্রথম বীরভূম অঞ্চলে কোথায় কোথায় রায়বেঁশের দল এখনও আছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রথম প্রবৃত্ত হই তখন এই নির্য্যাতনের ভয়ে ইহাদের অনেকেই রায়বেঁশে দলে থাকার কথা ও আপনাদের ব্যায়াম চর্চ্চার পারদর্শিতার কথা অস্বীকার করিয়াছিল। এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব দূর করিতে আমাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। দেশের এবং সমাজের মনোভাবের, শিক্ষাধারার ও আদর্শের এই শোচনীয় পরিণামের ফলে, বাংলাদেশ হইতে গত দুই শতাব্দীর মধ্যে যে কত সাহস ও শৌর্য্য সম্পদ লোপ পাইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

জাতীয় জীবনের সংস্কার ও পুনর্গঠন

জাতীয় জীবনের সংস্কার ও পুনর্গঠন

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ের আলোচনার ফলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে—বাঙলার সমাজকে আবার শৌর্য্যে বীর্য্যে প্রভাবান্বিত করিতে হইলে বাঙলার ভদ্র সংজ্ঞা হইতে ও ভদ্র সমাজের জীবন হইতে জড়তা, অলসতা, ভীরুতা, শ্রমবিমুখতা ও নিষ্কর্মণ্যতার আদর্শ এবং শূন্যগর্ভ হামবড়া ভাবকে বাঙলার ধর্ম্ম জীবন হইতে অতি ব্রাহ্মণ্যের ছোঁয়াছুঁয়ি ও অস্পৃশ্যতার ভণ্ডামিকে অতি মন্ত্র-তন্ত্র বাদের মিথ্যা ভেল্‌কি-বাজিকে এবং বাঙলার শিক্ষার ও সাহিত্যের আদর্শ হইতে পুরুষকার হীন কৃত্রিম কচিভাবকে চিরদিনের মত নিবর্বাসিত করিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে সহজ, সরল, সবল পৌরুষময়, জীবন্ত ভাবকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, নিরন্ততার ভাবকে উৎপাটিত করিয়া জাতীয় জীবনকে নির্ম্মল আনন্দময় করিয়া তুলিতে হইবে, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক মর্য্যাদা দান করিবার স্বভাব গঠিত করিতে হইবে।

জাতীয় জীবনের এই সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য যে শিক্ষা ক্ষেত্র একটা আমূল সংস্কারের প্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও প্রয়োজন, দেশের লোকের ভাবের, চিন্তার ও জীবনের ধারাকে বর্ত্তমান কালের জড়তা, সঙ্কীর্ণতা, কৃত্রিমতা, এলোমেলো অস্বভাবিকতা হইতে টানিয়া আনিয়া এমন একটা ছন্দে ঢালিয়া দেওয়া, যাহা সহজ অথচ গৌরবময়, যাহা আনন্দময় অথচ নির্ম্মল, যাহাতে মানুষের মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক মর্য্যাদা, কৃত্রিম সাজগোজ ও জাঁকজমকের সহায়তা ছাড়া আপনা হইতে ফুটিয়া ওঠে, যাহাতে দেশের লোককে জাতিবর্ণ ও ধনীদরিদ্র নির্বিবর্শেষে সাম্যের ও আনন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে এবং দেশের মানুষের মনকে, দুবর্বলতা, কৃত্রিম লজ্জাশীলতা ও সঙ্কুচিত ভাব হইতে উদ্ধার করিয়া একটি সহজ আড়ম্বর হীন পৌরুষের ধারায় চালিত করিয়া দেয়। এই ছন্দের সন্ধান আমরা বর্ত্তমান বাঙলার শিক্ষায় ও আচারে পাইব না, —পাইব

প্রাচীন ভারতের গঙ্গারাঢ়যুগের ও মৌর্য্য যুগের জীবন্ত অনুপ্রাণনার স্পর্শে। বাঙলা দেশের সৌভাগ্যক্রমে আমাদেরই অতি আপন প্রাচীন রায়বেঁশে যোদ্ধাদের নির্য্যাতিত বংশধরগণ তাহাদের দীনতার মধ্যেও প্রাচীন ভারতের কৃত্রিমতাহীন শক্তিময় জীবনের যে টুকরোটি আমাদের জন্য সযত্নে রক্ষা করিয়া আমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, তাহাতে এমনই একটি প্রাণবান জীবনীশক্তি চিহ্নিত রহিয়াছি যাহা আমাদিগকে এই ছন্দের সন্ধান আনিয়া দিবে। জাতীয় জীবনের সকল শ্রেণীর শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ছন্দের পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়া আমরা যে জাতীয় জীবনকে আবার সহজ সরল ও প্রভাবান্বিত করিতে পারিব ইহার প্রমাণ ইতিমধ্যে আমরা পাইয়াছি।

বাঙালীর এই কাপুরুষতার যুগে রুচিবিকার ও অবনতির স্রোতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়া সমাজের বহু শতাব্দী ব্যাপিত অবজ্ঞা, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা সত্ত্বেও যে ডোম ও বাউরী জাতি বাঙালীর মহামূল্য গৌরবময় সম্পদ বীরোচিত সামরিক নৃত্যকলা ও ব্যায়ামক্রীড়া সযত্নে অভ্যাস করিয়া অটুট রাখিয়াছে তাহারা যে সমাজের কত আদরের, সম্মানের ও গৌরবের পাত্র তাহা সহজেই অনুমেয়। এই মহাজাতির প্রতি আমাদের মূঢ়তামগ্ন সমাজের ব্যবহারের জন্য প্রাণ যেমন লজ্জায় ও ধিক্কারে ভরিয়া উঠে, তেমনি এই ডোম বাউরী জাতীয় সরলপ্রকৃতি আনন্দময় প্রাণ অসীম সহিষ্ণু বীর ভ্রাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও স্নেহরসে আমাদের প্রাণ আর্দ্র হইয়া উঠে ও তাহাদিগকে বুকে টানিয়া আনিয়া বলিতে ইচ্ছা করে—"ধিক্ সে সমাজ যে সমাজ তোদের ছোটলোক, নীচলোক আখ্যা দিয়া অপমান করিয়া, পদদলিত করিয়া, উপবাসে কৃশাঙ্গ করিয়া রাখিয়াছে।"

আশা ও আকাঙ্ক্ষা

কিন্তু ইহা পতিত বাঙালী সমাজের একটা পরম আশ্চর্য্য সৌভাগ্যের কথা যে, উপবাসে নিরন্নোদর, শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত ও অস্পৃশ্যতার অন্ধ অবজ্ঞায় উপেক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, ইহাদের আত্মার বীরোচিত তেজ ও আনন্দ ইহারা এখনও হারায় নাই; এবং তাহারা এই মহাসম্পদগুলি হারায় নাই বলিয়াই এখনও বাঙালী হয়ত অতীতের আত্মঘাতী ভুল সংশোধন করিয়া ইহাদিগকে ইহাদের উপযুক্ত আদর ও স্নেহদান করিয়া, ইহাদিগের অন্নসংস্থান ও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে, ইহাদিগকে বীরোচিত প্রকৃতির শিক্ষকের পদে বরণ করিয়া লইবে, এবং ইহাদিগকে নিকট হইতে আমাদের অতীত যুগের এইসকল উদ্দীপনাময় অমূল্য সামরিক নৃত্যকলা ও ব্যায়াম ক্রীড়া শিক্ষা করিয়া জাতির জীবনে আবার শক্তি, সাহস ও আনন্দের সহজ ও জীবন্ত ধারার উৎস জাগাইয়া তুলিতে পারিবে—এই আশা আমি করি।

এই যে আজ আমাদেরই অতি আপন রায়বেঁশে যোদ্ধাদের সঙ্গে আমাদের বহুযুগের পর নূতন করিয়া আবার পরিচয় হইল, তাহার ফলে যেন সেই উদ্বোধন ও সেই প্রচেষ্টা আমাদের "শিক্ষিত", "সম্ভ্রান্ত" ও "ভদ্র" সমাজের হয়—এই আমার প্রাণের আশা ও প্রার্থনা। "রাইবিশে" নামে প্রচ্ছন্ন থাকিয়াও আজ সেই অতীত যুগের গৌরবময় বাঙলার বীরসন্তান "রায়বেঁশে" যোদ্ধাদের বীর বংশধরগণ আমাদিগকে আবার বীর প্রকৃতিতে নূতন করিয়া দীক্ষিত করুক বা বীরের প্রকৃত মর্য্যাদা দেখাইত আমাদিগকে শিক্ষিত করুক।

বীরের নৃত্যকলার পরিচয় ও শিক্ষা পাইবার জন্য বাঙালী যেন আর আধুনিক শহরের কৃত্রিম নাট্যালয়ে দলে দলে গিয়া বহু অর্থব্যয়ে বাই নাচের অনুকরণ মিশ্রিত লাস্য ও তাণ্ডব নৃত্যের মিশ্র খিচুড়ী দেখার ফ্যাসানে মত্ত না হইয়া বাঙলার পল্লীতে শত 'উদয়শঙ্করের' শিক্ষাগুরু স্থানীয় ভারতীয় আদিম বিশুদ্ধ তাণ্ডব নৃত্যকলার যে জীবন্ত মূর্ত্ত রূপ আজ কাঙাল বেশে বাঙলার পথে পথে বেড়াইতেছে তাহাকে চিনিয়া লইতে পারে এবং তাহার প্রকৃত আদর করিতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে রায়বেঁশে নৃত্যের প্রচলনের উপযোগিতা

রায়বেঁশে নৃত্যের আদর

সৌভাগ্যক্রমে ইতিমধ্যেই বাঙালী তাহার আপন সংকৃষ্টি প্রসূত এই গৌরবময় পৌরুষ নৃত্যের মূল্য বুঝিতে পারিতেছে, ইহাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বরণ করিয়া লইতেছে। বীরভূমের সুলতানপুর, লাভপুর, নলহাটী বেণীমাধব ইনষ্টিটিউশন ও অন্যান্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রগণ অতি আগ্রহের সহিত এই নৃত্য অভ্যাস করিয়া শিক্ষা করাইতেছে এবং তাহার ফলে ইতিমধ্যেই এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের চরিত্রে এক অপূর্ব্ব গৌরবময় ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে ও রায়বেঁশে নৃত্য ও ব্যায়ামের রীতিমত চর্চ্চায় তাহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও শক্তির উৎকর্ষ লাভ হইয়াছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অভিমত ও ব্যবস্থা

(বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রায়বেঁশে নৃত্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এই নৃত্য সম্বন্ধে যে বাণী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন—"এ রকম পুরুষোচিত নাচ দুর্লভ.... আমাদের দেশের চিত্তদৌর্ব্বল্য দূর করতে পারবে এই নৃত্য।")

রবীন্দ্রনাথ কেবল এই নৃত্যের প্রশংসাবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের পৌরুষময় এই নৃত্যশিক্ষা বিধানের জন্য তিনি শান্তিনিকেতনের একাধিকবার এই রায়বেঁশে নৃত্য প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহার ফলে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের মধ্যে এই পৌরুষময় নৃত্যচর্চ্চার সূত্রপাত হইয়াছে।

ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। আমরা দেখিয়াছি যে রায়বেঁশে পদ্ধতি কেবল একটি নৃত্যপ্রণালী মাত্র নহে;ইহা আরও এমন কয়েকটি প্রাণবান উপাদানে গঠিত যাহা আমাদের বর্ত্তমান সমাজে প্রাচীন ভারতের অমূল্য দান বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং যাহাকে শিক্ষা

ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া আমরা বাঙলার জাতীয় জীবনের সংস্কার ও পুনর্গঠনে প্রত্যক্ষ সহায়তা লাভ করিতে পারিব।

নৃত্যকলা যে "পৌরুষের সহচরী" তাহা ইতিপূর্ব্বে আমরা স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছি। বাঙালী জাতিকে আবার শক্তিমান করিয়া তুলিতে হইলে এই পৌরুষের সহচরী নৃত্যকে জাতীয় জীবনের শিক্ষা ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিলে চলিবে না পরন্তু লাস্য নৃত্যকে বর্জ্জন করিয়া পৌরুষ নৃত্যের মঙ্গল রূপকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বরণ করিয়া লইতে হইবে।

বাঙলার প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রগণ এবং বাঙলার প্রতি গ্রামের ও প্রতি শহরের যুবকগণ প্রাচীন বাঙলার এই গৌরবময় রায়বেঁশে বীরনৃত্যের নিয়মিত চর্চ্চা করিয়া যে দিন ইহাকে শিক্ষার জাতীয় জীবনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করিয়া লইবে, সেই দিনই আমরা প্রাচীন বাঙলার গঙ্গারাঢ় ও পাল যুগের পৌরুষ ধারার সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারিব। তাই বলি—

নাচো রণতাণ্ডব—
পরিহরি লাস্য—
বেড়ে যাবে পৌরুষ—
ঘুচে যাবে দাস্য।।

রায়বেঁশে নৃত্যের কার্য্যকারিতা

ইহা আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের কৃত্রিমতা ও বিলাসিতার ভাব বিদূরিত করিতে সমর্থ্য হইবে। কারণ, এই নৃত্য করিতে হইবে নগ্ন দেহে কেবলমাত্র বীরধড়ি পরিধান করিয়া। মিথ্যা সাজসজ্জার উপকরণের বর্জ্জন পুনরায় শিক্ষা দিয়া ইহা আমাদিগের জীবনের প্রাচীন বাংলার জীবনের সহজ সরল ও স্বাভাবিক ভাব আনিয়া দিবে। বর্ত্তমান আলস্যের ভাব দূর করিয়া জাতীয় জীবনে আবার সাম্যের ভাব আনিয়া দিতে এই নৃত্য আমাদিগকে শিক্ষা দিবে। কারণ, জামিদার প্রজা; ছোট বড়; শিক্ষিত আশিক্ষত; ধনী নির্ধন সকলেই একসঙ্গে এই নৃত্যের চর্চ্চা করিয়া সমাজে পুনরায় সাম্যভাব প্রবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবে।

জাতির বর্ত্তমান ভীরুতা, সঙ্কোচ, বিহ্বলতা, চিত্তদৌর্বল্য ও শারীরিক দৌর্বল্য দূর করিয়া এই নৃত্য আমাদিগকে আরও সাহস, পৌরুষ ও শক্তি দান করিতে সক্ষম হইবে। কারণ এই নৃত্যের ধারা এতই পৌরুষময় যে ঢোল কাঁসির তালে তালে উন্নতবক্ষে দৃপ্ত পদবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার জনসাধারণের মনে আবার পৌরুষের ভাব ফিরিয়া আসিবে ও রায়বেঁশে ব্যায়ামক্রীড়া নিয়মিত চর্চ্চা দ্বারা শরীরের শক্তি বৃদ্ধি হইবে।

রায়বেঁশে নৃত্যের ছন্দ বিশ্বচরাচরের নৃত্যছন্দের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে জাতীয় জীবনে এই অনির্বচনীয় গৌরবময় নৃত্যের ছন্দে ঢালিয়া দিয়া বর্ত্তমান বাঙলার জনসাধারণের জীবন পদ্ধতির শৃঙ্খলাবিহীন ছন্নছাড়া এলোমেলো ভাবকে বিদূরিত করিয়া জাতীয় জীবনকে আবার একটা সহজ গৌরবময় ধারায় চালিত করিয়া দিবে।

রায়বেঁশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

মাত্র আড়াই বৎসর কাল হইল রায়বেঁশের আবিষ্কার করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। এই আড়াই বৎসর কালের মধ্যেই ইহার আবিষ্কারের ফল যে কতদূর গড়াইয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে এবং তাহার সঙ্গে এখন যে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা তুলনা করিলেই আমরা ইহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিব। এই আড়াই বৎসর পূর্বে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নৃত্য সম্বন্ধে একটি অতি কদর্য্য ভাব ছিল এবং নৃত্য যে শিক্ষার অথবা ব্যায়ামের মূল্যবান অঙ্গ অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইহার প্রচলন জাতীয় মঙ্গলের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় ইহা বলিলে তখন সাধারণ লোকের এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ লোকই ইহাকে যে বাতুলতা বলিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না তাহা নিঃসন্দেহে।

ইহা সত্য যে কোন কোন বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের মধ্যে নৃত্য প্রচলনের চেষ্টা কয়েক বৎসর হইতে করা হইতেছিল, কলিকাতায় কখন কখন এই রকম নৃত্য প্রদর্শিত হইতেছিল, কিন্তু এই প্রচেষ্টা শুধু কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে এবং শুধু মেয়েদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ছেলেদের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৃত্যের প্রবর্ত্তনের চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে হয় নাই বলিলেই চলে, আর মেয়েদের মধ্যেও যে প্রচেষ্টা হইতেছিল তাহা ব্যাপকভাবে দেশের মধ্যে অথবা দেশের বালিকা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিস্তৃত লাভ করে নাই। বরং দেশের অধিকাংশ লোকই ইহাকে নিন্দার চক্ষে দেখিয়া অসিতেছিলেন। ইহার কারণ এই যে মেয়েদের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে যে সকল নৃত্যের প্রচলনের চেষ্টা হইতেছিল, সেগুলি ছিল বাঙলার বাহির হইতে আমদানি লাস্যনৃত্য। এগুলি বাঙলাদেশের শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে আদর লাভ করে নাই, তাহার কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ বাঙলার সংকৃষ্টির সঙ্গে এগুলির কোন সম্পর্ক ছিল না এবং দ্বিতীয়তঃ, এগুলির আদর্শ ছিল সকল নৃত্য সম্বন্ধে কদর্য্যভাব পোষণ করা, এখন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে তেমনি আবার অপরদিকে বাঙলার যুবকগণ রায়বেঁশে নৃত্যের পৌরুষময় ও উন্মাদনাময় প্রণালী চর্চ্চা করিবার জন্য ব্যগ্র

হইয়া পড়িয়াছে, কেবল বালকদের মধ্যে নয় প্রৌঢ়দের মধ্যেও অনেক স্থলে এই উৎসাহ দেখা যাইতেছে এবং অন্ততঃ বীরভূম জেলার গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক স্কুলের বালিকাগণও বালকদের সঙ্গে এই গৌরবময় নৃত্যে আপন আপন অভিভাবকের সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে যোগদান করিয়া শারীরিক স্বাস্থ্যের ও শক্তির এবং বীরোচিত প্রকৃতির ভিত্তি স্থাপন করিতেছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রথম আমি যখন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে রায়বেঁশে নৃত্যের প্রচলনের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করি এবং সাধারণের বিদ্রূপ কটাক্ষের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজেই ছাত্রদিগকে এই নৃত্য শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হই তখন অনেকেই আমাকে অপ্রকাশ্য ভাবে বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই;কিন্তু এখন তাঁহাদের এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাহারা সকলেই যে কেবল তাঁহাদের বিদ্রূপ প্রত্যাহার করিয়াছেন তাহা নহে; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন রায়বেঁশে নৃত্য প্রচলনে সবিশেষে উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছেন। অবশ্য বাঙলার মনোভাবের এই পরিবর্ত্তন আনিতে আমাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। শারীরিক পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয় উভয়ই আমাকে এই ব্রতের সাধনায় যথেষ্ট পরিমাণে বহন করিতে হইয়াছে। একমাত্র সিউড়ী প্রদর্শনী কমিটি ব্যতীত এ বিষয়ে অর্থ সাহায্য কাহারও নিকট পাই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তবে অন্যান্য প্রকার সাহায্য অনেক বন্ধুর নিকট হইতে পাইয়াছি। এবং যে সফলতা রায়বেঁশে নৃত্যের প্রচলনে এখন আসিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও আসিবে বলিয়া আশা করা যায়,তাহার কৃতিত্বের অংশ তাহাদেরও সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্য।

সুতরাং সঙ্গীত কলার ক্ষেত্রে, নৃত্য কলার ক্ষেত্রে এবং ব্যায়াম কলার ক্ষেত্রে আবার যে বাঙলা দেশে রায়বেঁশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে। ইহার ফলে ইতিমধ্যে বাঙলার বর্ত্তমান জীবনের অনেকগুলি গলদ দূর হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। যে বাঙালীর পূর্ব্বপুরুষগণ একটি মাত্র ধুতি পরিয়া অনাবৃত দেহে জীবন যাপন করিতেন ও আলো হাওয়ার সংস্পর্শে অনাবৃত শরীরকে শক্তিমণ্ডিত ও স্বাস্থ্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতেন, সেই বাঙালীর ছেলেরা আজকালকার বিদ্যালয়ের প্রাপ্ত আদর্শের ফলে শরীরটাকে জুতা, জামা ও কামিজ কোট ইত্যাদি মণ্ডিত না করিয়া রাখিলে মর্য্যাদার হানি হয় বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছে। এই ভ্রান্ত আদর্শকে দূর করিয়া বীরধড়ি পরিহিত অনাবৃত দেহের মর্য্যাদা বাঙালীর ছেলেকে আবার শিখাইতে রায়বেঁশে নৃত্য ও ব্যায়ামকলার চর্চ্চা অতি মূল্যবান সহায়তা করিতেছে। শরীর শিক্ষা বিভাগের ডিরেকটর শ্রীযুক্ত J. Buchanan মহাশয় বৎসরেক কাল পূর্ব্বে যখন প্রথম সিউড়ীতে আসিয়া রায়বেঁশে নৃত্য দেখেন, তখন হাই স্কুলের ছেলেরা ও তাহাদের শিক্ষকগণ খালি গায়ে শুধু মালকোঁচা পরিয়া নৃত্য ও ব্যায়াম করিতেছে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি করিয়া আমি বাঙালী ভদ্রলোক শ্রেণীয় ছেলেদিগকে ও মাষ্টারদিগকে খালি

গায়ে নৃত্য করিতে রাজি করিয়াছি। তিনি বলিলেন তিনি অন্যান্য জেলায় অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহা করিতে পারেন নাই। ইহার উত্তরে আমি বলিলাম যে ইহা রায়বেঁশে প্রতিভার ফলে হইয়াছে। শিক্ষক ও ছাত্রগণ এই রায়বেঁশের প্রতিভার ফলে একসঙ্গে নৃত্য করিতে শিখিয়াছে। শিক্ষকগণ প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে ইহাতে হয়ত তাহাদের মর্য্যাদার হানি হইবে এবং হয়ত ছেলেরা তাহাদিগকে আগেকার মতন সম্মান প্রদর্শন করিবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছেন যে ফল হইয়াছে ঠিক তাহার বিপরীত। ছেলেদের শুধু আপনাদিগের মধ্যে নয় শিক্ষকদিগের সঙ্গে নৃত্যের সূত্রে একটি নূতন ঐক্যের ভাব ও প্রেমের ভাব জাগিয়া উঠিতেছে এবং ছাত্রগণ শিক্ষকদিগকে আরও বেশি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতেছে। এই রায়বেঁশে নৃত্যের প্রতিভার ফলে হাই স্কুলের হেডমাস্টারগণ ও এমনকি অনেক স্থলে পণ্ডিত ও মৌলভিগণও মালকোঁচা আঁটিয়া খালি গায়ে আপন আপন স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে পৌরুষ নৃত্যে এবং ব্যায়াম কলায় যোগদান করিয়া শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি নূতন সাম্যভাবের, মুক্তভাবের ও আনন্দময় ভাবের অবতারণা করিতেছে।

সাম্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রায়বেঁশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে জাতীয় জীবনের আরও প্রগাঢ় পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ব্রাহ্মণ জাতীয় গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকগণ ডোম বাউরি জাতীয় রায়বেঁশেদের বংশধরদের সঙ্গে অবাধে নৃত্যে যোগ দিয়া এবং তাহাদিগকে ওস্তাদের পদে বরণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন এবং তাহাদিগের নিকট হইতে নৃত্য ও কসরত শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে রণডঙ্কা ও ঢোল বাজাইবার প্রণালীও শিক্ষা করিতেছেন।

ইহা সৌভাগ্যের কথা যে রায়বেঁশে আন্দোলনের সূত্রপাত হইবার ছয় মাসের মধ্যে বাঙলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এবং শারীরিক শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সকলেই শিক্ষাক্ষেত্রে রায়বেঁশে নৃত্যের সবিশেষ উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া ইহার প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন এবং ড্রিলের পরিবর্ত্তে রায়বেঁশে নৃত্য ও রায়বেঁশে কসরৎ শিক্ষা করিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য শারীর শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহাশয় অনুশাসন প্রচার করিয়াছেন। শারীর শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহাশয় রাইবিশে কসরতের ব্যায়ামে বিজ্ঞানের দিক দিয়া গুরুতর মূল্য উপলব্ধি করে রাইবিশে কসরৎ এবং পঞ্চাশ প্রকার বিভিন্ন প্রণালী যাতে স্কুল কলেজে প্রবর্ত্তিত হয় এইরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন।

রায়বেঁশে নৃত্য প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার প্রাচীন সংকৃষ্টি প্রসূত কাঠি নৃত্য, জারি নৃত্য, বাউল নৃত্য এবং কীর্ত্তন নৃত্যেরও প্রচলন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমি করিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহার কোনটিতেই বিলাস বিভ্রমসূচক হাবভাব নাই। ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে এগুলি মনে নির্ম্মল আনন্দের ও স্ফূর্তির বিকার এবং চরিত্রের নির্ম্মলতার ও উদারতার বিকাশ আনিয়া দেয়। সম্প্রতি বাঙলার পল্লীগ্রামে ভদ্র পরিবারের মেয়েদের মধ্যে এখনও

যে সব নির্ম্মল ব্রত নৃত্যের প্রচলন রহিয়াছে তাহার আবিষ্কার করিবার সুযোগ আমার হইয়াছে। মনিপুরী রাসনৃত্য অথবা গুজরাটি গরবা নৃত্য হইতেও বাঙলার নিজস্ব এই ব্রত নৃত্যগুলি যে অধিকতর নির্ম্মল ও উচ্চাঙ্গের রসকলা তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাও আমি করিয়াছি।

১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এবং ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারী মাসে সিউড়ীতে যে লোকনৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র আমার তত্ত্বাবধানে খোলা হইয়াছিল তাহাতে বাঙলার বহু জেলার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যোগদান করিয়াছিলেন এবং সেখানে নানা প্রকার লোকনৃত্য, লোকসংগীত ও সমষ্টি নৃত্য ও সমষ্টি সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া এগুলি তাঁহারা আপন আপন বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। তাহার ফলে বাঙলার অনেক সুদূর জেলার বিদ্যালয়েও ইতিমধ্যে লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতের প্রবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে এবং এপ্রিল মাসে কলিকাতার সুবিখ্যাত গলষ্টন পার্কে দুইটি লোকনৃত্য ও সঙ্গীত উৎসবের ব্যবস্থা আমার তত্ত্বাবধানে হইয়াছিল এবং ইহার ফলে বাঙলার শিক্ষিত জনসাধারণ বাঙলার নিজস্ব লোকনৃত্যের ও সঙ্গীতের এবং বিশেষ করিয়া বাঙলার মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ব্রত নৃত্যের পুনরায় আদর করিতে শিখিয়াছেন বলিয়া আশা করা যায়। আমার রচিত অনেকগুলি সমষ্টি সঙ্গীত (community songs) সমষ্টি নৃত্যের সঙ্গে গাইবার প্রচলন অনেক বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই হয়েছে। এতে ছাত্রদের মধ্যে আনন্দজনক ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঐক্যভাব জাগাবার বিশেষ সহায়তা আছে।

১৯৩৩ সনের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারী মাসে সিউড়ীতে আমার তত্ত্বাবধানে যে দ্বিতীয় লোকনৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছিল তাতে বাঙলার অধিকাংশ জেলা থেকেই প্রায় ৫০ জন উচ্চ ইংরাজী স্কুলের শিক্ষক যোগদান করিযাছিলেন ও অতিশয় আগ্রহের সহিত রায়বেঁশে ও অন্যান্য লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত শিখে নিয়েছেন, এসব ভাল করে শিখে নিয়ে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্ত্তন করবার জন্য বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল ইনস্‌পেক্টর মহাশয় বিশেষ সাবধানে সেই বিভাগের নানা বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক নিবর্বাচন করে পাঠিয়েছেন।

এই দু'বছর অনুষ্ঠিত দুটি লোকনৃত্য শিক্ষা কেন্দ্রের (শিক্ষা সমিতির নয় আমার স্বাক্ষরিত) যে সকল সার্টিফিকেট শিক্ষকদিগকে দেওয়া হয়েছে তাতে বঙ্গীয় শারীর শিক্ষার ডিরেকটর শ্রীযুক্ত জে, বুকানন মহাশয় তাঁর স্বাক্ষর সংযোজিত করে তাতে শিক্ষা বিভাগের অনুমোদনের ছাপ দিয়েছেন।

বাঙলার নরনারীর মধ্যে বাঙলার নিজস্ব সংকৃষ্টিজাত বিশুদ্ধ নৃত্য ও সঙ্গীতের চর্চ্চা পুনঃপ্রবর্ত্তনের এই যে সূত্রপাত হইয়াছে—তাহা সম্ভব হইয়াছে রায়বেঁশে নৃত্যের

গৌরবময় আদর্শে ও প্রতিভার মর্য্যাদার ফলে, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং আমরা কামনা করি যে রায়বেঁশের এই পুনঃপ্রতিষ্ঠা বাঙলার জীবনে চিরস্থায়ী ও চিরমঙ্গলময় হউক।

ইতিমধ্যেই রায়বেঁশের প্রতিভা বাঙলাদেশের সীমা ছাড়িয়ে বাঙলার বাইরেও তার প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে। আমি যখন ১৯৩২ সনের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হিসাবে দিল্লিতে যাই, তখন রায়বেঁশে ও বাঙলার অন্যান্য লোকনৃত্য সম্বন্ধে সেখানে আবার বক্তৃতা করে দিল্লিবাসী, পাঞ্জাবী ও অন্যান্য প্রদেশীয় স্কুল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণ এই সকল নৃত্য শিক্ষার জন্য উৎসুক্য প্রকাশ করেছেন যে, দিল্লিতে তাহার ফলে একটা লোকনৃত্য শিক্ষা সমিতি গঠিত হয়েছে ও তাঁহারা আপনাদের মধ্যে চাঁদা করে টাকা তুলে বাঙলা দেশ থেকে লোকনৃত্য শিক্ষায় পারদর্শী লোক আনিয়ে এই সকল নৃত্য শিক্ষার উদ্যোগ করেন। রায়বেঁশে আবিষ্কারের ফলে বাঙলা দেশের পল্লীগ্রামের নৃত্য প্রতিভা যে অচিরে সমগ্র ভারতের উপর তীব্র প্রভাব বিস্তার করবে তার প্রত্যাশা আমরা করতে পারি।

বাংলার লোকনৃত্য

প্রবন্ধাবলি

রায়বেঁশে, ঢালি ও কাঠিনৃত্যের পোষাক

প্রত্যেক ব্রতচারী নৃত্যে তার বিশিষ্ট পোষাকের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত লক্ষ্য করেছি, কোন কোন ব্রতচারী নৃত্যের অতিপ্রদর্শনের সময় ব্রতচারীরা যাতে উপযোগী পোষাক পরিহিত থাকে, উস্তাদেরা সব সময় সেই বিধানের প্রবর্ত্তন করার বিষয়ে মনোযোগী হন না। ব্রতচারী নৃত্যের প্রত্যেকটি যদি যথাযোগ্য পোষাকে না করা হয়, তা হলে সেই নৃত্য তার অন্তর্নিহিত ভাব থেকে নষ্ট হয়ে যায় এবং তার যথার্থ ফল উৎপাদন করতে পারে না।

রায়বেঁশে নৃত্য। (রায়বেঁশে-ব্যঞ্জক নৃত্যও এর অন্তর্ভুক্ত), ঢালি-নৃত্য ও কাঠি নৃত্য পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর নৃত্যগুলির মধ্যে অন্যতম। এই নৃত্য গুলি খালি গায়ে এবং হাঁটুর উপরে দৃঢ়ভাবে মালকোঁচা এঁটে করতে হয়। অন্যথা এগুলি কোমল ও নারী-ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। উস্তাদেরা সব সময় এই নিয়ম মেনে চলবেন; শিক্ষার্থী ব্রতচারীদের এবং অভিপ্রদর্শনরত ব্রতচারীদের সঙ্গে তাঁরাও ঐরূপ পোষাক পরিধান করবেন। উপরোক্ত তিনটি নৃত্যে যে ব্যক্তি ঢোল বা মাদল বাজাবে কেবল সে-ই পাট কুর্ত্তা বা বানিয়ান পরে থাকতে পারে।

জনসাধারণ এবং ব্রতচারীদের মধ্যে যাঁরা খালি পা'কে অশোভন বলে মনে করেন, তাঁরা হয়ত জানেন না যে বর্ত্তমানে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে—এমন কি ইউরোপের শীতপ্রধান অঞ্চলেও—সমষ্টিগত ব্যায়াম ও ব্যায়ামমূলক নৃত্যাদি খালি গায়ে হতে থাকে এবং এর মধ্যে কোন অশোভনতা থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে, মাথা থেকে কোমর অবধি এবং হাঁটুর নিম্নভাগের নগ্নতায় মানবদেহের এমন একটা গৌরবময় রূপ প্রকাশ পায় যা বস্ত্রাচ্ছাদিত রূপে কিছুতেই থাকতে পারে না।

▸▸ *বাংলার শক্তি, শ্রাবণ ১৩৪০*

আমি আশা করি যে জমায়েতে হোক, অতিপ্রদর্শনে হোক, অথবা দৈনন্দিন চর্চ্চার মধ্যেই হোক অতঃপর উপশীলন-প্রাপ্ত উস্তাদেরা তাঁদের অধীনে ন্যস্ত ব্রতচারীদের মধ্যে উপরোক্ত নিয়মের বিন্দুমাত্র শৈথিল্য হতে দেবেন না।

এই নিয়মের পরিপালনে আমি অঙ্গ-সমিতি সচিবগণের, বাংলার ব্রতচারী সমিতির সংশ্লিষ্ট উস্তাদ-আললা ও সহ-উস্তাদগণের কেন্দ্র-সমিতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংঘের উস্তাদগণের সহযোগিতা আহ্বান করি।

পূর্ব্ববঙ্গের বিবাহ-উৎসবের নৃত্যগীত

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে এক কালে বাংলাদেশে ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর মেয়েদের জীবন দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের সঙ্গে ও প্রচলিত পূজাপাবর্বণের প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মল নিত্যগীতে ভরপুর ছিল। বিশেষ করিয়া বস্তু উপলক্ষে বিবাহ ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষ্যে এই সকল নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হইত। আমার নিজের জন্মভূমি শ্রীহট্ট জেলার নারদী গ্রামে আমি ছেলেবেলায় দেখিয়াছি আমার মা-বোনেরা ও ভদ্র সমাজের অন্যান্য মেয়েরা বিবাহ ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামের সকল শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া নির্ম্মল প্রণালীর নৃত্য গীত করিতেন। পূর্ব্ব বাংলার অনেক জেলার সুদূর পল্লীগ্রামে ভদ্র পরিবারের মধ্যে এমন প্রাচীন প্রথা প্রচলিত আছে। সম্প্রতি ফরিদপুর অঞ্চলের নলিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইত্যাদি উচ্চবংশীয় কয়েকটি মেয়েদের দ্বারা এই সব নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছে।

আজকাল আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষিত পুরুষ এবং মেয়েরা এক সকল প্রাচীন নৃত্যগীতকে ঘৃণার সহিত দেখিয়া থাকেন এবং এই শ্রেণীর সহজ সরল নৃত্যগীতের প্রথার পুনঃ প্রচলনের যে চেষ্টা আমি করিতেছি এবং বিশেষ করিয়া এইগুলি রসকলা হিসাবে উচ্চস্থানের অধিকারী, এই মত যে আমি প্রচার করিতেছি তাহাতে অনেকেই প্রথমে আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয় যে সম্প্রতি কয়েক মাস যাবৎ এই সব ঠাট্টা বিদ্রূপ সত্ত্বেও আমার অনেক লেখালেখি করার ফলে দেশের মধ্যে এই সকল প্রাচীন প্রথার মূল্য সম্বন্ধে একটা মত পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের বিবাহ-ব্যাপার বাংলার পল্লীজীবনের প্রচলিত একটি উৎকৃষ্ট রসকলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পূর্ব্বে এই বিবাহ উৎসবে কোন জাতি ভেদাভেদ ছিল না। নিম্ন শ্রেণীর ও উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সকলেই এক সঙ্গে এই বিবাহ উৎসবে নৃত্যগীত করিতেন।

▸▸ *বঙ্গলক্ষ্মী, জৈষ্ঠ ১৩৪০*

প্রাচীন বাংলার পল্লীনারীরা তাহাদের এই যে সমুজ্জ্বল রসকলাপ্রতিভার ধারা যুগের পর যুগ সন্তর্পণে চর্চ্চা করিয়া প্রতিনিয়ত জীবনীরস আহরণ করিতেন এবং আপনাদিগকে শক্তিমতী ও স্বাস্থ্যবতী করিয়া তুলিতেন তাহা দেখিয়া আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদের শক্তিহীন দেহের এবং নীরস ও নিরানন্দময় জীবনের কথাই বারবার মনে হয়।

এই সকল প্রাচীন প্রথা সম্বন্ধে যত অনুসন্ধান করা যায় এবং যত তথ্য সংগ্রহ করা যায় ততই দেশের মঙ্গল। পূর্ব্ব বাংলার হিন্দু সমাজে বিবাহ উপলক্ষ্যে যে সব নৃত্যগীতের প্রথা এখনও ফরিদপুরের নলিয়া অঞ্চলে ভদ্র সমাজের মধ্যেও প্রচলিত আছে সে সম্বন্ধে পরের পৃষ্ঠায় কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হইল।

বিবাহ উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত উৎসবগুলি হইয়া থাকে ঃ—

১। আশীর্ব্বাদ ২। হলুদ কোটা ৩। নাওয়ান (স্নান করান) ৪। অধিবাস (দধিমঙ্গল) ৫। বৃদ্ধি ৬। গঙ্গাবরণ ৭। চলন ৮। বিবাহ ৯। বাসর ১০। সেজতুলনী ১১। বাসি-বিবাহ ১২। ফুলশয্যা ১৩। দ্বিতীয় বিবাহ। এই কয়েকটি উৎসবেই গান হইয়া থাকে, ইহা ছাড়া গঙ্গাবরণ, ... বিভিন্ন প্রকার বরণ, কাদামাটি ও কুলার সাগুনে নৃত্য হইয়া থাকে।

বিবাহের পূর্ব্বে বরপক্ষের ও কন্যাপক্ষের কর্ত্তারা উভয়ে পরস্পরের নিকট পত্র লেখেন। যদি দুই পক্ষেরই বিবাহে মত হয়, তবে উভয়েই এক একটি টাকার সিন্দুর মাখিয়া পত্রে ছাপ দিয়া রাখেন। একেই "পত্রলেখা" বলা হয় এবং এই ভাবেই বিবাহের প্রথম সূচনা আরম্ভ হইয়া থাকে। বিবাহ পাকা হইলে উপরোক্ত ছাপ দেওয়া পত্র দুইখানি পরস্পর বিনিময় করিয়া বরপক্ষ কন্যাকে ও কন্যাপক্ষ বরকে "আশীর্ব্বাদ" করিয়া যান। এই সময় গ্রামের মেয়েরা একত্র হইয়া নিম্নলিখিত "আশীর্ব্বাদের" গান অতি সুমধুর স্বরে গালে হাত দিয়া বসিয়া গাহিয়া থাকেন।

আশীর্ব্বাদের গান

কম্পিত হ'ল কমলিনি শুনে বংশীধবনি
নারদ তোমায় বলি।
তুমি আহ্বান পাঠাও আহ্বান পাঠাও
দুর্গার বাড়ি।
দুর্গা আসবেন শিব রথে,
কার্ত্তিক গণেশ লয়ে সাথে
নারদ তোমায় বলি।
তুমি আহ্বান পাঠাও আহ্বান পাঠাও কালীর বাড়ি।
আসবেন কালী শিবসঙ্গে মুণ্ডমালা গলে দোলে।

কম্পিত হ'ল কমলিনী শুনে বংশীধবনী
নারদ তোমায় বলি।
তুমি আহ্বান পাঠাও আহ্বান পাঠাও
গঙ্গার বাড়ি।
আসবেন গঙ্গা মকর মাছে ভগীরথ লয়ে সঙ্গে
নারদ তোমায় বলি।
তুমি আহ্বান পাঠাও আহ্বান পাঠাও
চণ্ডীর বাড়ি।
আসবেন চণ্ডী চন্দন নিয়ে আশীর্ব্বাদ করি।
নারদ তোমায় বলি।
দুর্গা মা আয়োতে যাবেন
কার্ত্তিক গণেশ সঙ্গে লয়ে।
ও দুর্গা আসিও সকাশে, —
নারদ বাজায় বাঁশী দিবানিশি অযোধ্যা ভুবনে।
কালী মা আয়োতে যাবেন
মুণ্ডমালা গলে দিয়ে
ও কালী আসিও সকালে—
নারদ বাজায় বাঁশী দিবানিশি অযোধ্যা ভুবনে।
গঙ্গা মা আয়োতে যাবেন
ভগীরথকে সঙ্গে লয়ে
ও গঙ্গা আসিও সকালে
নারদ বাজায় বাঁশী দিবানিশি অযোধ্যা ভুবনে।
লক্ষ্মী মা আয়োতে যাবেন ধান্য দুর্ব্বা হতে লয়ে।
ও লক্ষ্মী আসিও সকাশে
নারদ বাজায় বাঁশী দিবানিশি অযোধ্যা ভুবনে।

এই ভাবে প্রত্যেক দেব-দেবীকে আহ্বান পাঠান হয়। আশীর্ব্বাদের গানের সহিত সাধারণতঃ কোনরূপ বাদ্য হয় না। যেদিন কন্যা অথবা বরকে আশীর্ব্বাদ করা হয় সেই দিনই কেবল মাত্র এই সব গান হইয়া থাকে।

আশীর্ব্বাদ উপলক্ষ্যে যে সকল গান হয় তাহার মধ্যে আরও একটি গান নীচে দেওয়া গেল ঃ—

দুর্গা মা রথে যাবেন ব'লে, দুর্গা মা করিলেন গমন
নারদ বাজায় বাঁশী দিবানিশি অযোধ্যা ভুবনে।

কালী মা রথে যাবেন ব'লে, কালী মা করিলেন গমন
নারদ বাজায় বাঁশী দিবানিশি অযোধ্যা ভুবন।
গঙ্গা মা রথে যাবেন ব'লে, গঙ্গা মা করিলেন গমন
নারদ বাজায় বাঁশী দিবানিশি অযোধ্যা ভুবন।
লক্ষ্মী মা রথে যাবেন ব'লে লক্ষ্মী মা করিলেন গমন,
নারদ বাজায় বাঁশী দিবানিশি, অযোধ্যা ভুবন।

তাহার পর একটি নির্দ্দিষ্ট ভাল দিনে "হলুদ কোটা" হয়। নূতন পরিষ্কার পাত্রে ১।০ সওয়া সের হলুদ রাখিয়া সরা দ্বারা উহার মুখ আবৃত রাখা হয়। তার পর বরণগুলা চিত্রিত সরার মধ্যে প্রদীপ এবং পাঁচটি মুছি (ছোট মাটির পাত্র) ধান দুব্বা এবং জলপূর্ণ পঞ্চ পল্লব শোভিত ঘট দ্বারা সজ্জিত করিয়া পাঁচজন এয়ো (সধবা স্ত্রীলোক) উপরোক্ত হলুদ ঢেঁকিতে কুটিতে যান। হলুদ কোটার সময় অন্যান্য মেয়েরা হলুদ কোটার গান এইরূপ ভাবে মুখে হাত দিয়া এক জায়গায় বসিয়া গাহিয়া থাকেন। হলুদ কোটার সময় ঢুলি তাহার ঢোল বাজাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে এয়োরাও উলুধবনি করিতে থাকেন।

হলুদ কোটার গান

হলুদ কুটিলাম কুটিলাম
গৃহেতে রাখিলাম
গোপাল বিনে সাধের হলুদ
সখি কার বা শোভে।
বস্তর আনিলাম আনিলাম
হস্তেতে রাখিলাম
গোপাল বিনে সাধের বস্তর
সখি কার বা শোভে।
চন্নন ঘষিলাম বধিলাম
গৃহেতে রাখিলাম
গোপাল বিনে সাধের চন্নন
সখি কার বা শোভে।
কাজল পাড়িলাম পাড়িলাম
হস্তেতে রাখিলাম
গোপাল বিনে সাধের কাজল
সখি কার বা শোভে।

মালা গাঁথিলাম গাঁথিলাম
হস্তেতে রাখিলাম
গোপাল বিনে সাধের মালা
সখি কার বা শোভে।
মটুক আনিলাম আনিলাম
গৃহেতে রাখিলাম
গোপাল বিনে সাধের মটুক
সখি কার বা শোভে।
নূপুর আনিলাম আনিলাম
গৃহেতে রাখিলাম
গোপাল বিনে সাধের নূপুর
সখি কার বা শোভে।

(২)

হলুদ রে তোর জনম কোন স্থানে
আমর জনম শুনতে পার
পুরোর ঐ দোকানে;
হলুদ আনগো ঘরে।।
বস্তর রে তোর জনম কোন স্থানে
আমার জনম শুনতে পার
তাঁতির ঐ দোকানে;
বস্তর আন্‌গো ঘরে।।
চন্নন রে তোর জনম কোন স্থানে
আমার জনম শুনতে পার
বানিয়ের ঐ দোকানে;
চন্নন আন গো ঘরে।
মালা রে তোর জনম কোন স্থানে
আমার জনম শুনতে পার
চট্‌কীর ঐ দোকানে;
মালা আন্ গো ঘরে।
কাজল রে তোর জনম কোন স্থানে
আমার জনম শুনতে পার

দীপের ঐ দোকানে;
কাজল আন্ গো ঘরে।
মটুক রে তোর জনম কোন স্থানে
আমার জনম শুনতে পার
মালীর ঐ দোকানে;
মটুক আন গো ঘরে।।
নূপূর রে তোর জনম কোন স্থানে
আমার জনম শুনতে পার
কামারের ঐ দোকানে;
নূপুর আন গো ঘরে।

এইরূপ ভাবে হলুদ কোটা না হওয়া পর্য্যন্ত এয়োরা বসিয়া বসিয়া হলুদ কোটারই নানারূপ গান করিয়া থাকেন।

হলুদ কোটার আরো কয়েকটি গান নীচে দেওয়া হইল।

(৩)

ওমা যশোদে পুরোর হলুদ দে মা অঙ্গেতে।
গোপাল তোরে লয়ে গোষ্ঠে যাবো
রাখাল রাজা সাজাইব
বন ফল তোর মুখে দিব
আমরা সব রাখালগণে।
ওমা যশোদে তাঁতির গরদ দে মা কটিতে।
গোপাল তোর লয়ে গোষ্ঠে যাবো।
রাখাল রাজা সাজাইব
ক্ষীর সর তোর মুখে দিব
আমরা সব সখিগণে।
ওমা যশোদে বাণিয়ের চন্নন দে মা কপালে।
গোপাল তোরে নিয়ে গোষ্ঠে যাবে
রাখাল রাজা সাজাইব
বনফল তোর মুখে দিব
আমরা সব এয়োগণে।।
ওমা যশোদে দীপের কাজল দে মা নয়নে।
গোপাল তোরে নিয়ে গোষ্ঠে যাবো

রাখাল রাজা সাজাইব
ক্ষীর সব তোর মুখে দিব
আমরা সব এয়োগণে।
ওমা যশোদে চটকীর মালা দে মা গলেতে।
গোপাল তোরে নিয়ে গোষ্ঠে যাবো
রাখাল রাজা সাজাইব
বনফল তোর মুখে দিব
আমরা সব রাখালগণে।
ওমা যশোদে মালীর মটুক দে না মস্তকে
গোপাল তোরে নিয়ে গোষ্ঠে যাবে
রাখাল রাজা সাজাইব
ক্ষীর সর তোর মুখে দিব
আমরা সব সখিগণে।
ওমা যশোদে সোনার নুপুর দে মা চরণে।
গোপাল তোরে নিয়ে গোষ্ঠে যাবো
রাখাল রাজা সাজাইব
বনফল তোর মুখে দিব
আমরা সব এয়োগণে।

(৪)

হলুদের খাল হস্তে লয়ে রাজপথে দাঁড়াবো
ও আমরা রাখাল সাজাবো
ব্রজের রাখাল ব্রজে গেছে
সখিরে আমরা কানাই সাজাব।
বস্তরের থাল হস্তে লয়ে রাজপথে দাঁড়াব।
ও আমরা নিমাই সাজাব।
ব্রজের নিমাই ব্রজে গেছে সখিরে
ও আমরা বলাই সাজাব।
চন্ননের থাল হস্তে লয়ে রাজপথে দাঁড়াব।
ও আমরা রাখাল সাজাবো।
ব্রজের রাখাল ব্রজে গেছে সখিরে
ও আমরা কানু সাজাব।

কাজলের থাল হস্তে লয়ে রাজপথে দাঁড়াব।
ও আমরা রাখাল সাজাব।
ব্রজের রাখাল ব্রজে গেছে সখিরে
ও আমরা নিমাই সাজাব।
মালার থাল হস্তে লয়ে রাজপথে দাঁড়াব।
ও আমরা কানাই সাজাব।
ব্রজের কানাই ব্রজে গেছে সখিরে
আমরা বলাই সাজাব।
মটুকের থাল হস্তে লয়ে রাজপথে দাঁড়াব।
ও আমরা নিমাই সাজাব।
ব্রজের নিমাই ব্রজে গেছে সখিরে
আমরা কানাই সাজাব।
নুপূরের থাল হস্তে লয়ে রাজপথে দাঁড়াব।
আমরা রাখাল সাজাব।
ব্রজের রাখাল ব্রজে গেছে
সখিরে আমরা কানাই সাজাব।

(৫)

স্বর্ণথালে ফুলের মালা
সাজায়ে দাও গিরিবালা
সরোজিনী মনমোহিনী গো আয় সকালে।
হলুদ নিয়ে নাওয়াই রামরে
বস্তর মাত্তর রেখে বাকী।
সরোজিনী মনমোহিনী গো আয় সকালে।
বস্তর দিয়ে সাজাই রামরে
চন্নন মাত্তর রেখে বাকী।
সরোজিনী মনমোহিনী গো আয় সকালে।
চন্নন দিয়ে সাজাই রামরে
কাজল মাত্তর রেখে বাকী।
সরোজিনী মনমোহিনী গো আয় সকালে।
স্বর্ণথালে ফুলের মালা
সাজায়ে দাও গিরিবালা

সরোজিনী মনমোহিনী গো আয় সকালে।
কাজল দিয়ে সাজাই রামরে
মালা মাত্তর রেখে বাকী।
সরোজিনী মনমোহিনী গো আয় সকালে।
মালা দিয়ে সাজাই রামরে
মটুক মাত্তর রেখে বাকী।
সরোজিনী মনমোহনী গো আয় সকালে।
মটুক দিয়ে সাজাই রামরে
নুপুর মাত্তর রেখে বাকী।
সরোজিনী মনমোহিনী গো আয় সকালে।
স্বর্ণথালে ফুলের মালা
সাজায়ে দাও গিরিবালা।
সরোজিনী মনমোহিনী গো আয় সকালে।

(৬)

আমি যাবোরে ও নতুন বাজারে
কি জন্যেতে ডাক্‌ছো মদন আমারে,
ঘরে আছে ও পুরোর হলুদ রে
তাই দিয়ে নাওয়াও মদন আমারে।
আমি যাবোরে ও তাঁতির দোকানে
কি জন্যেতে ডাক্‌ছো মদন আমারে,
ঘরে আছে ও তাঁতির গরদ রে
তাই দিয়ে সাজাও মদন আমারে।
আমি যাবোরে ও বানিয়ের দোকানে রে
কি জন্যেতে ডাক্‌ছো মদন আমারে,
ঘরে আছে ও বানিয়ের চন্নন রে
তাই দিয়ে সাজাও মদন আমারে।
আমি যাবোরে ও দীপের দোকানেরে
কি জন্যেতে ডাক্‌ছো মদন আমারে,
ঘরে আছে ও দীপের কাজলরে,
তাই দিয়ে সাজাও মদন আমারে।

আমি যাবোরে ও চটকীর দোকানেরে
কি জন্যেতে ডাক্‌ছো মদন আমারে,
ঘরে আছে ও চটকীর মালারে
তাই দিয়ে সাজাও মদন আমারে।
আমি যাবোরে ও মালীর দোকানেরে
কি জন্যেতে ডাকছো মদন আমারে,
ঘরে আছে ও মালীর মটুক রে
তাই দিয়ে সাজাও মদন আমারে।
আমি যাবোরে ও কামারের দোকানেরে
কি জন্যেতে ডাকছো মদন আমারে,
ঘরে আছে ও সোনার নূপুর রে
তাই দিয়ে সাজাও মদন আমারে।

(৭)

ওরে দ্বারী রে ওরে নিষ্ঠুর দ্বারী
গোপাল বিনে প্রাণে মরি
আমি গোপালের মা, দ্বারী তাও জান না
গোপাল বিনে প্রাণ বাঁচে না।
রাণী হলুদ সেজে, হলুদ লয়ে হস্তে
রাই দাঁড়াইছেন ব্রেজের পথে,
রাণী গরদ লয়ে, গরদ লয়ে হস্তে
রাই দাড়াইছেন ব্রেজের পথে,
ওগো বিশখা গো, চিন্তে করো না গো,
তোমার গোপাল আছে সুখে,
গোপাল মথুরাতে রাজা হৈয়েছে।
রাজা হৈয়্যা রাজ্য পাইয়াছে—
রাণী চন্নন ঘষে, চন্নন লয়ে হস্তে
রাই দাড়াইছেন ব্রেজের পথে,
রাণী কাজল পাইড়ে, কাজল লয়ে হস্তে,
রাই দাড়াইছেন ব্রেজের পথে।
রাণী মালা গাঁইথে, মালা লয়ে হস্তে,
রাই দাঁড়াইছেন ব্রেজেব পথে।

রাণী নূপুর লয়ে, নুপূর লয়ে হস্তে,
রাই দাঁড়াইছেন ব্রেজের পথে;
ওগো বিশখা গো, চিন্তে করো না গো
তোমার গোপাল আছে সুখে।
গোপাল মথুরাতে রাজা হৈয়েছে
রাজা হৈয়্যা রাজ্য পাইয়াছে।

(৮)

রাণী মন সুখে ডাকেন গোপাল বলে
চূড়ায় ময়ূর পাখা দিয়ে,
ওহে বাছাধন নীলরতন যেতে হবে গোচারণ
রাখাল বেশে কোলে আয়রে প্রাণজীবন।
রাণী মন সুখে ডাকেন গোপাল ব'লে
চূড়ায় ময়ূর পাখা দিয়ে।
ওহে বাছাধন নীলরতন সাজায়ে দেও গোচারণ
রাখাল বেশে কোলে আয়রে বাছাধন।
রাণী গরদ লয়ে ডাকেন গোপাল বলে
চূড়ায় ময়ূর পাখা দিয়ে
ওহে বাছাধন নীলরতন যেতে হবে গোচারণ
রাখাল বেশে কোলে আয়রে প্রাণজীবন।
রাণী চন্নন লয়ে ডাকেন গোপাল বলে
চূড়ায় ময়ূর পাখা দিয়ে
ওহে বাছাধন নীলরতন সাজায়ে দেও গোচারণ।
রাখাল বেশে কোলে আয়রে কৃষ্ণধন।
রাণী কাজল লয়ে ডাকেন গোপাল বলে
চূড়ায় ময়ূর পাখা দিয়ে
ওহে বাছাধন, নীলরতন সাজায়ে দেও গোচারণ
রাখাল বেশে কোলে আয়রে প্রাণজীবন।
রাণী মালা লয়ে ডাকেন গোপাল বলে
চূড়ায় ময়ূর পাখা দিয়ে
ওহে বাছাধন নীলরতন সাজায়ে দেও গোচারণ
রাখাল বেশে কোলে আয়রে কৃষ্ণধন।

রাণী মুকুট লয়ে ডাকেন গোপাল বলে
চূড়ায় ময়ূর পাখা দিয়ে
ওহে বাছাধন, নীলরতন সাজায়ে দেও গোচারণ
রাখাল বেশে কোলে আয়রে প্রাণজীবন।
রাণী নূপুর লয়ে ডাকেন গোপাল বলে
চূড়ায় ময়ূর পাখা দিয়ে
ওহে বাছাধন নীলরতন সাজায়ে দেও গোচারণ।
রাখাল বেশে কোলে আয়রে কৃষ্ণধন।

(৯)

হলদিস্থল লয়ে হস্তে রাণী দিলেন গৌরীর অঙ্গে
রাণী তোমার সুখের ভাগ্য হল, কৈলাসের নাথ এসে
সতীর পতি হলো, জয় জয় দুর্গা বল।
চন্ননের স্থল লয়ে হস্তে রাণী দিলেন গৌরীর অঙ্গে
রাণী তোমার সুখের ভাগ্য হল, কৈলাসের নাথ এসে
সতীর পতি হলো জয় জয় দুগ্‌গো বলো।
বস্তরের স্থল লয়ে হস্তে রাণী দিলেন গৌরীর অঙ্গে,
রাণী তোমার সুখের ভাগ্য হল, কৈলাসের নাথ এসে
সতীর পতি হল, জয় জয় দুগ্‌গো বল।
এস সীয়ে বল সীয়ে জামাই এলে বাকল পরে।
গিরিরাজ তোমার গৌরী লয়ে হিমালয়ে চল
জয় জয় দুগ্‌গো বল।
ঢোল বাজে ডগর বাজে ছিতারা তাম্বুরো বাজে
বাজে ভোম্ ভোম্ রবে,
শিব যাত্রা করে।
এমন সোনার গৌরী পাগলের ঠেন* দেব,
জয় জয় দুগ্‌গা বল।

হলুদ কোটা হইয়া যাওয়ার পর বর অথবা কন্যাকে ঐ হলুদ দিয়া স্নান করান হয়। ইহাকে নাওয়ান বলে। এই সময়ও এয়োরা ঐরূপ ভাবে বসিয়া "নাওয়ানর" গান গাহিয়া থাকেন। সঙ্গে ঢুলি ঢোল বাজাইতে থাকে। সাধারণতঃ দাতা এবং এয়োরাই বর অথবা কন্যার স্নান কার্য্য সম্পাদন করেন।

---

*ঠেন = ঠাঁই।

নাওয়ানর গান

কি করগো রামের মাগো ঘরেতে বসিয়ে
তোমার রাম ছান করে পূর্ব্বোমুখী হৈয়ে।
আন্‌রে ছুতোরের পিড়ি দুয়ারে পাতিয়ে
তোমার সুন্দর রাম ছান করে পূর্ব্বোমুখী হৈয়ে।
কি করগো রামের মাগো ঘরেতে বসিয়ে
আনরে পূরোর হলুদ বাটাকে মাখিয়ে
তোমার রামের গায়ে মাখ কস্তুরী মিশায়ে।
আন্‌রে যমুনার জল ঝারিতে পুরিয়ে
তোমার রামের গায়ে ঢাল ঝারিতে ভরিবে।
সুনীর রাম ছান করে বদ্‌নাতে ভরিয়ে।
কি করগো বানের মাগো ঘরেতে বসিয়ে
তোমার রাম ছান করে পূর্ব্বোমুখী হৈয়ে।

(২)

চল চল চল সখি যমুনাতে যাই
যমুনাতে যাইয়ে আমারাও কলসী বুড়াই[১]
কলসী বুড়িয়ে আমরা পুরীর মধ্যে যাই
পুরীর মধ্যে যা'য়ে আমরা রামেরে নাওয়াই।
ছিনান করিয়ে রামরে চতুর্দ্দিকে চায়
এমন সময় মা ধন আমার রহিল কোথায়।
ষাটো ষাটো ওহে রামরে ষাটো আমার তুমি
ছান করিয়া পরবা গরদ ও তাই আনি আমি।
ছিনান করিয়ে রামরে চতুর্দ্দিকে চায়।
এমন সময় মা ধন আমার রহিল কোথায়?
ষাটো ষাটো ওহে রামরে ষাটো আমার তুমি
ছিনান করিয়া রামরে চতুর্দ্দিকে চায়
এমন সময় মা ধন আমার রহিল কোথায়?
ষাটো ষাটো ওহে রামরে ষাটো আমার তুমি
ছিনান করিয়া পরবা নূপুর ও তাই আনি আমি।

---

[১] বুড়াই = ডুবাই।

চল চল চল সখি যমুনাতে যাই
যমুনাতে যাইয়া আমরা কলসী বুড়াই।

(৩)

এক ঝারি[২] নবকলা পঞ্চ ঝারি জল
তারি মধ্যে সিনান করে (ও) রূপের বিদ্যাধর।
সিনান করিয়ে রামরে চতুর্দ্দিকে চায়
এমন সময়ে মা ধন আমার (ও) রহিল কোথায়?
ষাটো ষাটো ওহে রামরে ষাটো আমার তুমি।
ছান করিয়া পরবা কাপড় (ও) তাই আনি আমি।
ছিনান করিয়ে রামরে চতুর্দ্দিকে চায়
এমন সময় মা ধন আমার (ও) রহিল কোথায়।
ষাটো ষাটো ষাটো রামরে ওহে রামরে ষাটো আমার তুমি।
ছান করিয়ে পরবা চন্নন (ও) তাই আনি আমি।
ছিনান করিয়ে রামরে চতুর্দ্দিকে চায়
এমন সময় মা ধন আমার (ও) রহিল কোথায়।
ষাটো ষাটো ওহে রামরে ষাটো আমার তুমি
ছান করিয়ে পরাব কাজল (ও) তাই আনি আমি।
ছিনান করিয়ে রামরে চতুর্দ্দিকে চায়
এমন সময় মা ধন আমার (ও) রহিল কোথায়।
ষাটো যাটো ওহে রামরে ষাটো আমার তুমি
ছান করিয়ে পরবা মালা (ও) তাই আনি আমি
ছিনান করিয়ে রামরে চতুর্দ্দিকে চায়
এমন সময় মাধন আমার (ও) রহিল কোথায়।
ষাটো ষাটো ওহে রামরে ষাটো আমার তুমি
ছান করিয়া পরবা মটুক (ও) তাই আমি আমি।
এক ঝারি নবকলা পঞ্চ ঝারি জল
তারি মধ্যে সিনান ক'রে (ও) রূপের বিদ্যাধর।

[২] ঝারি = ঝাড় = বড় গুচ্ছ।

অধিবাস অথবা দধি-মঙ্গল

বিবাহ দিবসের প্রত্যুষে বর এবং কন্যাকে (আপন আপন বাড়ীতে) একটি ঘরের মধ্যে পিঁড়ির উপর বসাইয়া এয়োরা চন্দন, কাজল, ধান ও দুর্ব্বা দ্বারা বরণ করেন। বরণ হইয়া গেলে দই,খই, চিনি ইত্যাদি মিষ্টান্ন বর এবং কন্যাকে খাইবার জন্য দেওয়া হয়। ইহাকেই অধিবাস অথবা "দধিমঙ্গল" বলা হইয়া থাকে। এই সময়ও পূর্বের্বাক্ত ভাবে এয়োরা অধিবাসের গান করিয়া থাকেন।

অধিবাসের গান

(১)

কাকে করে কলবল
কোকিলেতে দিচ্ছে ধ্বনি
ভোর হ'ল যামিনী, দিদিগো গা তোল।
কোথায় রামের হলুদ বল
কোথায় রামের গরদ বল
আমার রাম সাজানর সময় হল
দিদিগো গা তোল।
কোথায় রামের মালা বল
কোথায় রামের মটুক বল
আমার রাম সাজানর সময় হল
দিদিগো গা তোল।
কোথায় রামের মটুক বল
কোথায় রামের বাঁশী বল
আমার রাম সাজানর সময় হল
দিদিগো গা তোল।
কাকে করে কল বল
কোকিলেতে দিচ্ছি ধ্বনি
দিদিগো গা তোল।

(২)

শুনেছি নারদের মুখে কৃষ্ণ নাকি যজ্ঞ করে,
সর ফেলে সর হল বাসি
আমি কার মুখে দিব ক্ষীর সর।

চন্নন ঘষে হলাম দোষী, গরদ মাত্র রেখে বাকী;
সর ফেলে সর হলাম দোষী
আমি কার মুখে দিব ওরে ক্ষীর সর।
কাজল পেড়ে হলাম দোষী, মালা মাত্র ওরে
রেখে বাকী;
সব ফেলে সর হল বাসি
আমি কার মুখে দেই ওরে ক্ষীর সর।
মটুক আইনে হলাম দোষী নূপুর মাত্র
রেখে বাকী;
সর ফেলে সর হল বাসি
আমি কার মুখে দিব ক্ষীর সর;
মালা গেঁথে হলাম দোষী মটুক মাত্র ওরে
রেখে বাকী;
সর ফেলে সর হলাম দোষী
আমি কার মুখে দেই ওরে ক্ষীর সর।

(৩)

সোনার নীল-মণিকে কোলে না রাখিয়ে
রাম সাজাব ওগো সখি আসিয়ে,
পুরোর হলুদ না আনিয়ে
রাম সাজাব মন সুখেতে
রাম সাজাব ওগো সখি আসিয়ে;
তাতের গরদ ওগো-না আনিয়ে
রাম সাজাবো মন সুখেতে
রাম সাজাবো ওগো সখি আসিয়ে;
বাইনের চন্নন আনিয়ে
রাম সাজাব মন সুখেতে
রাম সাজাব ওগো সখি আসিয়ে;
দীপের কাজল-না আনিয়ে
রাম সাজাব মন সুখেতে
রাম সাজাব ওগো সখি আসিয়ে;
চটকীর মালা-না আনিয়ে
রাম সাজাব মন সুখেতে

রাম সাজাব ওগো সখি আসিয়ে;
মালীর মটুক-না আনিয়ে,
রাম সাজাব মন সুখেতে,
রাম সাজাব ওগো সখি আসিয়ে;
কামারের নূপুর-না আনিয়ে,
রাম সাজাব মন সুখেতে,
রাম সাজাব ওগো সখি আসিয়ে।

(৪)

দ্বারীরে তোর পায়ে ধরি, দ্বারীরে তোর বিনয় করি,
হলুদ এনে থোলাম ঘরে
গোপাল সাজে মায়ের-কোলে;
গরদ এনে থোলাম ঘরে
গোপাল সাজে বুনের কোলে;
চন্দন এনে থোলাম ঘরে,
গোপাল সাজে খুড়ীর কোলে;
কাজল এনে থোলাম ঘরে,
গোপাল সাজে জেঠির কোলে;
মালা এনে থোলাম ঘরে,
গোপাল সাজে মামীর কোলে;
মটুক এনে থোলাম ঘরে,
গোপাল সাজে মাসীর কোলে;
নূপুর এনে থোলাম ঘরে,
গোপাল সাজে পিসীর কোলে;
দ্বারীরে তোর পায়ে ধরি দ্বারীরে তোর বিনয় করি।

(৫)

তোরে ডাক্‌তেছে দাদা বলাই
আর ত নিশি নাই।
চন্নন দেও না এই কপালে
ধরা দেও গো মাগো এই কটিতে
আর ত নিশি নাই
তোরে ডাকছে দাদা বলাই
আর ত নিশি নাই

বলাই দিচ্ছে শিঙ্গের ধবনি
পোহাইল সুখের রজনী
আর ত নিশি নাই।
কাজল দেওনা এই নয়নে
মালা দেও মা গো এই গলাতে
আর ত নিশি নাই।
ওরে তোরে ডেকেছে দাদা বলাই
বাঁশী দেও মা এই করেতে
চূড়ো দেও মাগো এই মস্তকে
আর ত নিশি নাই।
ওরে তোরে ডেকেছে দাদা বলাই
আর ত নিশি নাই।
বলাই দিচ্ছে শিঙ্গের ধবনি
পোহাইল সুখের রজনী
আর ত নিশি নাই।
বাঁশী দেও মা এই বদনে
নূপুর দেও মাগো এই চরণে
আর ত নিশি নাই।

বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ

অধিবাস এবং অন্যান্য ক্রিয়া কর্ম্মাদির পর "বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ" আরম্ভ হয়। বর ও কন্যা উভয়েরই সম্মুখে সাধারণতঃ একটি মঞ্চ প্রস্তুত হয়। সেইখানে পুরোহিতের দ্বারা বর এবং কন্যা উভয়েই তাহাদের মৃত পূর্ব্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। ইহাকে "বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ" বলা হয়। এই শ্রাদ্ধ করিতে কি কি জিনিসের প্রয়োজন হয় তাহা নিম্নের গানটি হইতেই বেশ সুন্দরভাবে জানা যায়। এই সময় ঢুলি তাহার ঢোল বাজাইয়া থাকে।

বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের গান

চাঁদোয়া টানারে মাঠে
বিদ্ধি করেন রাজা দশরথরে
ভাল বিদ্ধি করেন রাজা দশরথরে।
বিদ্ধি কাজে কি কি লাগে
ষোল গণ্ডা কলা লাগে
ভাল বিদ্ধি করেন রাজা দশরথরে।

বিদ্ধি কাজে কি কি লাগে
ষোল গণ্ডা পান লাগে
ভাল বিদ্ধি করেন রাজা দশরথরে।
বিদ্ধি কাজে কি কি লাগে
ষোল গণ্ডা সুপারী লাগে
ভাল বিদ্ধি করেন রাজা দশরথরে।
বিদ্ধি কাজে কি কি লাগে
ষোল সের আতপ লাগে
ভাল বিদ্ধি করেন রাজা দশরথরে।
বিদ্ধি কাজে কি কি লাগে
ঘৃত আর মধু লাগে
ভাল বিদ্ধি করেন রাজা দশবথরে।
বিদ্ধি কাজে কি কি লাগে
ষোল গণ্ডা খোলা লাগে
ভাল বিদ্ধি করেন রাজা দশরথরে।
চাঁদোয়া টানায়ে মাঠে বিদ্ধি করেন
রাজা দশরথরে
ভাল বিদ্ধি করেন রাজা দশরথরে।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইয়া যাইবার পর বিবাহের দিন বৈকালবেলায় গ্রামের সমস্ত মেয়েরা পুকুরে গঙ্গাপূজা করিবার জন্য বহির্গত হন।

জল সওয়া

প্রথমে চিত্রিত বরণ কুলা ও একটি সোহাগ মাপা হাঁড়ি এয়োরা সঙ্গে লইয়া প্রত্যেকে বাটীতে উপস্থিত হন, তখন সেই বাটীর স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের আপন আপন কাপড়ের আঁচল ধুইয়া বরণ কুলার উপরিস্থিত ঘট জল পূর্ণ করিয়া দেন। ইহাকে “জল সওয়া” অথবা “জল চাওয়া” বলে। এয়োরাও জলের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে পান, সুপারী এবং তৈল দিয়া আসেন।

জল সওয়ার গানগুলি নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

(১)

তোরা কে কে যাবি জল বিহারে
সখি আয় আনন্দে।

দিয়ে চন্দনের ছড়া* জল ছুই দেব পাড়া
যতেক দেবের নারী
তাদের পরণ দেখি সব চুনুরি*।
সখি আয় আনন্দে।
দিয়ে পুষ্পের ছড়া জল মাঙ্গিব ব্রাহ্মণ পাড়া
যতেক ব্রাহ্মণের নারী,
তাদের পরণ দেখি ঢাকাই শাড়ী
সখি আয় আনন্দে।
গাঁথিয়ে পুষ্পের মালা পূজা করব গিরিবালা
তুলে কুসুম রাশি রাশি
আমরা ঢালব্ মায়ের চরণ পরে
সখি আয় আনন্দে।

(২)

চল চল সহচরি যমুনার জল আনতে যাই
যমুনার জল এনে রামচন্দ্র নাওয়াবেন রাই
চল চল সহচরি পুরোর হলুদ আনতে যাই।
পুরো বাড়ীর হলুদ এনে রামচন্দ্র নাওয়াবেন রাই।
চল চল সহচরি যমুনার জল আনতে যাই।
চল চল সহচরি তাঁতের বস্ত্র আনতে যাই
তাঁতির বাড়ীর বস্ত্র এনে রামকে পরাবেন রাই
চল চল সহচরি যমুনার জল আনতে যাই।।
চল চল সহচরি মালীব মটুক আন্তে যাই
মালীর বাড়ীর মটুক এনে রামকে সাজাবেন রাই
চল চল সহচরি যমুনার জল আনতে যাই।।

তারপর পুকুরের ঘাটে সাধারণতঃ একটি পাট কাটি পুতিয়া গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়। ইহাকে "গঙ্গাবরণ" বলে এবং এই সময় বরণকুলা এবং সোহাগ হাঁড়ি পুকুরের পাড়ে রাখিয়া পাঁচ ছয় জন স্ত্রীলোক এই হাঁড়ির চারি পাশে বৃত্তাকারে নাচিয়া গান করিয়া থাকেন। দুই পায়ের বুড়া আঙ্গুলের সামনের দিকে একত্র করিয়া পেছনের গোড়ালির

* ছড়া = ছিটা।
* চুনুরি = রঙ্গীন কাপড় (শাড়ী)।

একত্র করিয়া সামনের আঙ্গুল ফাঁক করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ পদবিক্ষেপকে "ঘটিত" পদবিক্ষেপ নামে বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই নৃত্যের সময় মেয়েরা বাঁ হাত বাঁ দিকে সোজা করিয়া এবং ডান হাত বুকের নিকট ঈষৎ ভাঙ্গিয়া বাঁ দিকে উঁচু করিয়া কিছুক্ষণ ঢুলির ঢোলের তালে নাচিতে থাকেন। পুনরায় ডান হাত ডান দিকে সোজা করিয়া বাঁ হাত ঈষৎ বুকের নিকট ভাঙ্গিয়া ডানদিকে উঁচু করিয়া নাচিতে থাকেন। ইহাকে "গঙ্গ াবরণ" নৃত্য বলা হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত গানও হইয়া থাকে ঃ—

গঙ্গাবরণ নৃত্যের গান

(১)

সখি দ্যাখ্ দ্যাখ্ বেলা হ'ল গগনে
সখি চল যাই গঙ্গাবরণে।
আমি যাইব গঙ্গার কূল
তুলব জবা ফুল
গাঁথব মালা দিব মায়ের চরণে।
আমি তুলব কুসুম ফুল
বাইয়ে মায়ের কুল
আমি ভ'রব জল করব পূজা
দিব মায়ের চরণে, সখি চল যাই গঙ্গাবরণে।

(২)

সখি চল চাই গঙ্গাবরণে
যাইব যমুনার কুল
রাখিব মায়ের কূল
আমি তুলব ফুল
দিব মায়ের চরণে
সখি চল যাই গঙ্গাবরণে
আমি তুলিব বিল্ব
দিব মায়ের চরণে
সখি চল যাই গঙ্গাবরণে
আমি তুলবো দুর্ব্বো
দিব মায়ের চরণে
সখি চল যাই গঙ্গাবরণে।

তারপর জলের মধ্যে একটি পাটকাটি পুঁতিয়া তাহাকে ফুল চন্দন দিয়া পূজা করেন। ইহার পর পাঁচ ছয় জন এয়ো সোহাগী হন এবং তাঁহারা জলের মধ্যে ছুরি দিয়া জল কাটিয়ে উপরোক্ত সোহাগ হাঁড়ি পূর্ণ করিয়া থাকেন। গঙ্গাবরণ হইয়া গেলে এয়োরা ফিরিয়া আসিয়া (বরের বাড়িতে) বরকে এবং (কন্যার বাড়িতে) কন্যাকে স্নান করান। তাহার পর বরকে সাজান হয় এবং বরের মাতা ও আত্মীয় স্বজন ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাটী হইতে বিদায় করেন। বিদায় দিবার পূর্ব্বে কয়েকজন মেয়ে বৃত্তাকারে হাত ধরাধরি করিয়া গান গাহিয়া গাহিয়া নৃত্য করেন। ইহাকে অষ্ট সখীর নৃত্য বলা হয়।

অষ্ট সখীর নৃত্যের গান

আয় না ভাই সখিগণে
রাম সাজাইতে যাই।
এনে পুরোর হলুদ
আমরা সাজাব এখন।
আমরা অষ্ট সখী মেলন হয়ে
রামেরে সাজাইতে যাই।
আয়না ভাই সখিগণে রাম সাজাতে যাই।
আ'নে তাঁতীর গরদ আমরা সাজাব এখন
আমরা নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে
রামেরে সাজাইতে যাই।
আ'নে দীপের কাজল আমরা সাজাব এখন
আমরা অষ্ট সখী মেলন হয়ে
রামেরে সাজাইতে যাই।
আ'নে বানিয়ার চন্দন আমরা সাজাইব এখন
আমরা অষ্ট সখী মেলন হ'য়ে
রামেরে সাজাইতে যাই।
আয়না ভাই সখিগণে রাম সাজাইতে যাই।
আ'নে চটকীর মালা আমরা সাজাব এখন
আমরা নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে
রামেরে সাজাইতে যাই।
আমরা অষ্ট সখী মেলন হ'য়ে
রামেরে সাজাইতে যাই।"

আ'নে সোনার নূপুর
আমরা সাজাব এখন
আমরা নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে
রামরে সাজাইতে যাই।
আমরা অষ্ট সখী মেলন হ'য়ে
রামেরে সাজাইতে যাই।"

ইহার পর কন্যার বাটীতে যাওয়ার পূবের্ব বরকে সাজাইয়া দেওয়ার সময় মেয়েরা যে নৃত্য করিয়া থাকেন তাহাকে "সাজানর নৃত্য" বলা হয় এবং ইহার সহিত গানও হইয়া থাকে। প্রথম নৃত্যে কাপড়ে হাত দিয়া দেখানো হয় এবং দ্বিতীয় ভঙ্গীতে কাপড় দুই হাতে ধরিয়া দেখানো হইয়া থাকে। তৃতীয় ভঙ্গীতে ডান হাতের মধ্যম আঙ্গুল দিয়া কপালে চন্দনের "টিপ" দেখানো হয়। চতুর্থ ভঙ্গীতে মালা ঃ ডান হাতে উপুড় করিয়া ডান কাঁধে এবং বাঁ হাত উপুড় করিয়া বাঁ কাঁধে দেখনো হয়। পঞ্চ ম ভঙ্গীতে "মটুক" ঃ ডান ও বাঁ হাত চিৎ করিয়া মাথায় দুই কানের উপর কাঁপানো হয়। ষষ্ঠ ভঙ্গীতে নূপুর ঃ কোমর নীচু করিয়া দুই হাত দিয়া দুই পা স্পর্শ করা হয এবং সবার শেষে মেয়েরা ঠিক ত্রিভঙ্গ মুরারীর মত বাঁশী বাজাইবার ভঙ্গীতে দুই হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। কিন্তু প্রত্যেকটি ভঙ্গীর পূবের্ব গানের প্রথম কথা "সখি চল চল দেখি, অযোধ্যার ভুবনে" যখন গান করিয়া থাকেন তখন বাঁ হাত কোমরে রাখিয়া ডান হাত বুকের সামনে দোল দিতে থাকেন এবং নীচের পায়ের অংশও ঈষৎ বাঁকাইয়া দোলাইতে থাকেন অর্থাৎ যেন রামকে (বর) সবর্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সাজাইবার জন্য সব "অযোধ্যার ভুবন" চলেতিছেন। এইরূপ একটা চলার গতি নৃত্যকলা সবর্ব অঙ্গে পরিস্ফুট করিয়া তোলেন।

সাজানোর গান

(১)

সখি চল চল সখি, অযোধ্যার ভুবনে
আমরা সাজাব রাম ঐ গুণধাম, চল যাই সকালে
আমরা আগে যাইবে সাজাইব
তোমার শ্রীরামেরে।।
সখি চল চল চল সখি
অযোধ্যার ভুবনে।
আমরা এই চলিলাম
বস্তর আনতে তাঁতীর ঐ দোকানে।।

আমরা সাজাব রাম ঐ গুণধাম, চল
যাই সকালে
আমরা আগে যাইয়া সাজাইব
তোমার শ্রীরামেরে
সখি চল চল চল সখি, অযোধ্যার ভুবনে।
আমরা এই চলিলাম চন্দন আন্‌তে বানিয়ার ঐ দোকানে।
আমরা সাজাব রাম ঐ গুণধাম, চল যাই সকালে
আমরা আগে যাইয়ে সাজাইব তোমার শ্রীরামেরে।।
সখি চল চল চল সখি, অযোধ্যার ভুবনে।
আমি এই চলিলাম মালা আন্‌তে চটকীর ঐ দোকানে।।
আমরা সাজাব রাম ঐ গুণ ধাম চল যাই সকালে।
আমরা আগে যাইয়ে সাজাইব তোমার শ্রীরামেরে।।
সখি চল চল চল দেখি অযোধ্যার ভুবনে।
আমি চলিলাম মটুক আন্‌তে মালীর ঐ দোকানে।
আমরা সাজাব রাম ঐ গুণধাম চল যাই সকালে।
আমরা আগে যাইয়ে সাজাইব তোমার শ্রীরামেরে।।
সখি চল চল চল সখি, অযোধ্যার ভুবনে।
আমি এই চলিলাম নূপুর আন্‌তে কামারের দোকানে।
আমরা আগে যাইয়ে সাজাইব তোমার শ্রীরামেরে।
সখি চল চল চল সখি, অযোধ্যার ভুবনে।
আমি এই চলিলাম বাঁশী আন্‌তে কামারের ঐ দোকানে।।
আমরা সাজাব রাম ঐ গুণধাম চল যাই সকালে
আমরা আগে যাইয়ে সাজাইব তোমার শ্রীরামেরে
সখি চল চল চল সখি অযোধ্যার ভুবনে।।

(২)

ওগো বাঁশী বাজে বন মাঝে রে
বাজরে বাঁশী সময় ধরে।
বাঁশী বাজে বন মাঝে রে
বানিয়ের চন্দন এনে সাজয়ে গোপাল যত্ন করে রে
বাঁশী বাজে বন মাঝে
বাজারে বাঁশী সময় বুঝে;
বাজবে বাঁশী সময় গুণে।

ওগো বাঁশী বাজে বন মাঝে রে
বানিয়ার চন্দন দিয়ে রাম সাজাব রামকে সাজাই ধীরে
ধীরে গো
বাঁশী বাজে বন মাঝে রে
বাজরে বাঁশী মধুর সুরে।।
বাঁশী বনমাঝে রে।
বাজরে বাঁশী সময় ধরে।
তাঁতিয়ার বস্তুর এনে রামকে সাজাও যত্ন করে রে।।
বাঁশী বাজে মন মাঝ রে
মালিয়ার মটুক এনে রামকে সাজাও যত্ন করে
বাঁশী বাজে বন মাঝে রে
বাজরে বাঁশী সময় ধরে।

ছেলেকে বিদায় দিবার পূবের্ব অষ্ট সখীরা নৃত্য এবং রাম সাজানর গান ইত্যাদির পর পাত্রপক্ষ অবস্থানুসারে নানারূপ, বাদ্য এবং আত্মীয়, বর, যাত্রী, গুরু, পুরোহিত, পণ্ডিত প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া জাঁক, জমকের সহিত পাত্রীর বাটীতে যাত্রা করেন। ইহাক 'চলন' বলে এবং এই সময় মেয়েরা নিম্নলিখিত গান করিয়া থাকেন ঃ—

চলনের গান

বলাইরে, আজ কেন তোরে বেজার দেখি
দেখি বেজার যাত্রাকালে।
কলাইরে আজ চন্নন পর মায়ের কোলে
যেয়োনারে গোচরণে।
বলাইরে আজ কেন তোরে বেজার দেখি
দেখি বেজার যাত্রাকালে
বলাইরে আজ কাজল পর মায়ের কোলে
যেয়ো নারে গোচারণে।
বলাইরে আজ কেন তোরে বেজার দেখি
দেখি বেজার যাত্রাকালে
বলাইরে আজ চুড়ো পর মামীর কোলে
ষেয়ো নারে গোচারণে।
বলাইরে আজ কেন তোরে বেজার দেখি
দেখি বেজার যাত্রাকালে

বলাইরে আজ কেন তোরে বেজার দেখি
দেখি বেজার যাত্রাকালে।
বলাইরে আজ নূপুর পর পিসীর কোলে
যেয়ো নারে গোচারণে।
বলাইরে আজ কেন বেজার দেখি
দেখি বেজার যাত্রাকালে।

মাদল পূজা বা ঢোল বরণ

এদিকে কন্যার বাটীতে পাত্রীকে স্নান করানর পরই "মাদল পূজা" হইয়া থাকে। এয়োরা মাদলে (ঢোল) তৈল এবং সিন্দূর দিয়া ঢোল বরণ করিয়া থাকেন। চিত্রিত কুলার বরণের উপরকার ধান ও নূতন সিন্দূরকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া পাত্রীর মা অথবা অন্য কোন মেয়ে ওই কুলা মাথায় করিয়া ঢোলের নিকট আসেন। তখন ঢুলি তাহার ঢোল বাজাইতে আরম্ভ করে। অন্যান্য সব মেয়েরা তখন ঢুলির চারিপাশে বৃত্তাকারে নাচিতে থাকেন। কিছুক্ষণ নাচিবার পর যাহার মাথায় কুলা আছে তিনি কুলা হইতে ঢুলির ঢোলের উপর ধান ফেলিয়া দেন। ঢুলিও কুলার উপর পুনরায় সেই সমস্ত ধান ঢালিয়া দেন। এইরূপ ভাবে সাত বার ধান ঢালা ঢালি করিবার সময় ও যে সমস্ত ধান মাটিতে ছড়াইয়া যায় তাহার উপর কুলখানা রাখিয়া যে মেয়েটি কুলাখানা মাথায় করিয়াছিলেন তিনি উহার উপর বসেন এবং চতুর্দ্দিকে তখন অন্যান্য মেয়েরা বৃত্তাকারে তাঁহাদের আঁচল হাতে ধরিয়া মাটিতে তিনবার ছোঁয়াইয়া কুলার উপর উপবিষ্টা স্ত্রীলোকটির মস্তকে আঁচলগুলি এমন ভঙ্গীতে ঝাড়িয়া ফেলেন যে তাহাতে মনে হয় যেন মাটি হইতে ধানগুলি কুড়াইয়া পুনরায় কুলার উপর রাখিতেছেন। এই সময় পা "ঘটিত" পদে ফেলিয়া বৃত্তাকারে নৃত্য হয়। এইরূপ ভাবে কিছুক্ষণ নৃত্য করিবার পর মেয়েরা কুলা ধরিয়া উলুধ্বনি দিতে দিতে কুলো শুদ্ধ মেয়েটিকে ঘুরাইতে থাকেন। ইহাকেই "ঢোল বরণ" অথবা "মাদল পূজা" বলে। এই অনুষ্ঠানে কোন গান হয় না।

ইহার পর বরপক্ষ সদলবলে কন্যার বাটিতে উপস্থিত হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিবাহ আরম্ভ হইয়া থাকে। বিবাহের সময়কার প্রায় সব শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানগুলি অনেকের জানা আছে। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বিবাহের পূর্ব্বে যে সকল গান হয় তাহার দুই একটি নিম্নে দেওয়া হল ঃ—

(১)

রামের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়
জানকী বসলো গিয়ে রামের বাঁয়,
পুরোর হলুদ দিয়ে মার সাজায়ে
জানকী বসলো গিয়ে রামের বাঁয়।।

বানিয়ের চন্নন দিয়ে মায় সাজারে
জানকী বসলো গিয়ে রামের বাঁয়
(ও) রামের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়।।
তাঁতীর বস্তর দিয়ে মায় সাজায়ে
জানকী বসলো গিয়ে রামের বাঁয়
দীপের কাজল দিয়ে মায় সাজায়ে
জানকী বসলো গিয়ে রামের বাঁয়
(ও) রামের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়।।

(২)

তুমি যে সুন্দর রামরে সীতারে
করবা বিয়ে
কি কি গয়না আনছ রামরে
সীতের লাগিরে
এনেছি এনেছি গয়না বাক্সটি ভরিয়ে
ধর সীতে পর গয়না বাক্সটি খুলিয়ে।।
তুমি যে সুন্দর রামরে সীতেরে করবা বিয়ে
কি কি কাপড়ে আনছ রামরে সীতের লাগিয়ে।
এনেছি এনেছি কাপড় বোচকাটি ভরিয়ে
ধর সীতে পর কাপড় বোচকাটি খুলিয়ে।।
তুমি যে সুন্দর রামরে সীতেরে
করবা বিয়ে
কি কি সিন্দূর আনছ রামরে
সীতের লাগিয়ে।
এনেছি এনেছি সিন্দূর কৈটেটি ভরিয়ে
ধর সীতে পর সিন্দূর কৈটেটি খুলিয়ে
তুমি যে সুন্দর রামরে সীতেরে করবা বিয়ে।।

(৩)

মেঘের কোলে সৌদামিনী, অমনি বিনোদিনী রাই,
এমন রূপ কপন দেখি নাই।
আনরে পুরোর হলুদ, আনগো এখন
আমরা নেচে ঘুরে ঘুরে সাজাব রতন।
আন বানিয়ের চন্নন আনগো এখন
আমরা নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে সাজাব রতন।

মেঘের কোলে সৌদামিনী অমনি বিনোদিনী রাই
এমন রূপ কখন দেখি নাই।
আন দীপের কাজল আনগো এখন
আমরা নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে সাজাব রতন।
আন মালির মটুক আনগো এখন
আমরা নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে সাজাব রতন।
মেঘের কোলে সৌদামিনী, অমনি বিনোদিনী রাই
এমন রূপ কখন দেখি নাই।।

ধূপ্নিনাচন

বিবাহের মাঝখানে যখন বরকে একটি থামের সঙ্গে নূতন কাপড় দিয়া জড়াইয়া দেওয়া হয় এবং কন্যাকে বর হইতে আত্মীয় স্বজনেরা বাহিরে আনিয়া বরের চতুর্দ্দিকে সাতপাক ঘোরায় তখন মেয়েরা একরূপ নাচিয়া থাকেন, তাহাকে "ধূপ্নিনাচন" বলা হয়। বাঁ হাতখানা কোমরের নিকট অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বাঁকাইয়া (যেন মনে হয় কোন পাত্র ধরিয়া আছেন) ডান হাত দিয়া আঁচল ধরিয়া বাঁ হাতের মধ্যে দুইবার আঁচলের কোণ নাড়া দিয়া সামনে বাহিরের দিকে আঁচলটা ফেলিয়া দেন। এই সঙ্গে কোন গান হয় না। যতক্ষণ সাত পাক ঘোরা শেষ না হয় ততক্ষণ উহারা নাচিতে থাকেন। এই নৃত্য "ঘট্টিত" পদবিক্ষেপে বাঁ দিক হইতে ডানদিকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করা হয়। এই নৃত্যের সঙ্গে নিম্নলিখিত গান হইয়া থাকে।

মিলন গান

নিবিড় নিকুঞ্জবনে
যুগল মিলন হইতেছে।
গিয়ে সব সখীগণ ঘিরে রয়েছে।।
নিবিড় কুঞ্জবনে রাধাকৃষ্ণ একাসনে
শ্যাম নব ঘন পাশে
রাধা সৌদামিনী খেলিতেছে।
কে কে যাবি আর সজনী
হেরিতে শ্যাম রাই-বঙ্গিণী
শ্যাম সরোবরে রাধা-স্বর্ণ-সরোজিনী ফুটিয়াছে।
নিবিড় নিকুঞ্জবনে যুগল মিলন হইতেছে

কেউ দিচ্ছে চন্দনের ফোঁটা
কেউ বনমালা পরাইতেছে।
কেউ দিচ্ছে বদনে ননী
কেউ পরাইছে ধরা চূড়া
কেউ উলুধবনি করিতেছে।
নিবিড় নিকুঞ্জবনে যুগল-মিলন হইতেছে।।

পাশাখেলা

সমস্ত বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া যাওয়ার পর বর ও কন্যাকে বাসর ঘরে আনা হয়। বাসর ঘরে বর ও কন্যাকে লইয়া নানারূপ ঠাট্টা তামাসা করিবার পর এয়োরা তাহাদের দ্বারা পাশাখেলা করাইয়া থাকেন। কিছু চাউল সুপারী ও পান এবং কড়ি পাত্রীর হস্তে দেওয়া হয় তখন মহিলাদের মধ্যে কেহ পাত্রীর দ্বারা ঐ চাউল মাদুরের উপর ছড়াইয়া ফেলেন এবং বর ঐ বিস্তৃত চাউল কুড়াইয়া পাত্রীর হস্তে একত্র করিয়া দেন। এই ভাবে সাত বার করা হয়। বাসর ঘরে পাশাখেলার বা "জো" খেলা খেলিবার সময় মেয়েরা নিম্নলিখিত গান করিয়া থাকেন ঃ—

পাশাখেলার গান

দেখদেখি কি তামাসা
কন্যে বরে খেলছে পাশা।
রাম যদি চালে পাশা
পথ করিব রাজ বনে।
দেখদেখি কি তামাসা
কন্যে বরে খেলছে পাশা।
সীতে যদি চালে পাশা
দাসী হব ঐ চরণে।
দেখদেখি কি তামাসা
কন্যে বরে খেলছে পাশা।

পাশাখেলার পর বর ও কন্যাকে বরণ ও আশীর্ব্বাদ করা হয়। বরণের সময় নিম্নলিখিত গানটি গাওয়া হয় ঃ—

(১)

তোমার বহু ভাগ্য হল,
গিরিরাজ তোমার শিবকে লয়ে হিমালয়েতে এল।
জয় জয় দুর্গা বল।
বরণকুলা লয়ে মাথে
রাণী চললেন শিব বরিতে
রাণী তোমার শুভ ভাগ্য হ'ল
গিরিরাজ তোমায় শিবকে লয়ে হিমালয়তে এল।
জয় জয় দুর্গা বল।
ধান্য দুর্ব্বা লয়ে হস্তে
রাণী দিচ্ছেন শিবের মস্তে
রাণী তোমার শুভ ভাগ্য হল
গিরিরাজ শিবকে লয়ে হিমালয়তে এল
জয় জয় দুর্গা বল।
চন্দন নিয়ে স্বর্ণ থালে
রাণী দিচ্ছেন শিবের ভালে
রাণী তোমার বহুভাগ্য হ'ল
গিরিরাজ তোমার শিবকে লয়ে হিমালয়তে এল
জয় জয় দুর্গা বল।
গল লগ্ন কৃতবাসে
বরণ করে কৃত্তিবাসে
রাণী তোমার বহুভাগ্য হল
গিরিরাজ তোমার শিবকে লয়ে হিমালয়তে এল
জয় জয় দুর্গা বল।

(২)

কি বরণ বরে লো
ও সোয়ামীর সোহাগিনী
রামের মা বরণ করে
হাতের শঙ্খ ঝিক্‌মিক্ করে,
কি বরণ বরে লো
ও সোয়ামীর সোহাগিনী
রামের মা বরণ করে

হালকে মাজা হেলে পড়ে,
কি বরণ বরে লো
ও সোয়ামীর সোহাগিনী।

ইহার পরদিন 'বাসি বিবাহ' হইয়া থাকে। প্রথমে ঘরের মেঝেতে বর ও কন্যার আঁচল বাঁধিয়া প্রাঙ্গনে যেখানে কলাগাছ পোঁতা হইয়াছে সেখানে উভয়কে আনা হয়। তারপর বর মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কন্যার মস্তকে সিন্দূর দিয়ে থাকেন। সিন্দূর দেওয়ার পর বাসি বিবাহের স্থানের চতুর্দ্দিকে যে চারিটি কলাগাছ রোপণ করা হয় তাহাদের এক পাশে নৃত্য করিতে করিতে এয়োগণ গান গাহিয়া থাকেন। বাসি বিবাহের সময় যে নৃত্যটি হয় তাহার ভাবটি সুন্দর। একবার বাঁ হাত কোমরে রাখিয়া ডান কপালে ছোঁয়াইয়া এবং অন্যবার ডান হাত কোমরে দিয়া বাঁ হাত কপালে ছোঁয়াইয়া "ঘট্টিত" পদবিক্ষেপে এই করা হয়।

কালরাত্র কাকস্নান

বাসি বিবাহের রাত্রিকে "কালরাত্র" বলা হইয়া থাকে। ঐ রাত্রে বর ও কন্যাকে পৃথক ঘরে নিদ্রা দিতে হয়, ভোরবেলায় বর ও কন্যাকে স্নান করিতে লইয়া যাওয়াকে "কাকস্নান" বলে। এই রাত্রে অর্থাৎ বিবাহের পর তৃতীয় রাত্রে বর ও কন্যাকে এক সঙ্গে নিদ্রা যাইতে হয়। ইহাকে "ফুলশয্যা" বলা হয়। এই রাত্রিতে মেয়েরা গান করিয়া ফুলশয্যার নৃত্য করিয়া থাকেন। ডান হাতে কাপড়ের আঁচলের এক কোণ এবং বাঁ হাতে কাপড়ের আঁচলের অন্য কোণ ধরিয়া "ঘট্টিত" পদবিক্ষেপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অথবা এক সার বাঁধিয়া এই নৃত্য করা হয়। মাঝে মাঝে ডান হাত নীচু করিয়া বাঁ হাত বাঁ দিকে মাথা পর্য্যন্ত উঁচু করিয়া অথবা বাঁ হাত নীচু এবং ডান হাত উঁচু করিয়া নৃত্য করা হয়। এই সময় নিম্নলিখিত ফুলশয্যার গান হইয়া থাকে ঃ—

ফুলশয্যার গান

যাতী যুথী কুটরাজ বেলী
গন্ধরাজ ফুল কৃষ্ণকলি
নবকলি অর্দ্ধ বিকশিত
তাতে বনমালী হরষিত।
তুমি যাও হে নাগর
প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে আছেন ঘুমে কাতর।
আমি এই এলাম

ফুলের শয্যা গৃহে থুয়ে
তুমি যাও হে নাগর
প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে আছেন ঘুমে কাতর।
আমি এই এলাম বস্তর গৃহে থুয়ে
তুমি যাও হে নাগর
প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে আছেন ঘুমে কাতর।
যাতী যুথী কুটরাজ বেলী
গন্ধরাজ ফুল কৃষ্ণকলি
নবকলি অৰ্দ্ধ বিকশিত;
তাতে বনমালী হরষিত।
তুমি যাও হে নাগর
প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে আছেন ঘুমে কাতর।

কন্যাবিদায়

তার পরের দিন বর ও কন্যাকে বরের বাড়ীতে বিদায় দেওয়া হয়। মেয়েরা আসিয়া বর ও কন্যার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রণাম-নৃত্য করেন। এই নৃত্যের সহিত কোন গান গাওয়া হয় না। মেয়েরা সম্মুখে মাথা নোয়াইয়া জোড় হাত একবার কপালের মাঝে ছোঁয়ান এবং ডান দিকে মাথা নোয়াইয়া আবার কপালের ডান দিকে ছোঁয়ান। পুনরায় সম্মুখে মাথা নোয়াইয়া কপালে জোড়হাত ছোঁয়াইয়া মাথা বাঁ দিকে হেলাইয়া জোড়হাতে কপালের বাঁ দিকে স্পর্শ করেন।

তারপর বিদায়ের নৃত্য হইয়া থাকে। এই নৃত্যে মেয়েরা একবার বাঁ হাত কোমরে এবং ডান হাত চিৎ করিয়া কপালে ছোঁয়াইয়া থাকেন এবং তারপরেই ডান হাত কোমরে ও বাঁ হাত চিৎ করিয়া কপালে ছোঁয়াইয়া থাকেন। এইরূপ পর পর সাতবার করা হয়। প্রণাম এবং বিদায় নৃত্যের সময় মাথায় হাত ছোঁয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ডান পা ঈষৎ তোলা হয় ও বাঁ হাঁটু ঈষৎ নোয়ানো হয়।*

* নলিয়া গ্রামের মেয়েদের বিবাহ উপলক্ষে নৃত্যগীত দেখিবার ব্যবস্থাসংক্রান্ত কার্য্যে এবং এই সকল তথ্য সংগ্রহ ব্যাপারে ঐ গ্রামের শ্রীমান অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় আমাকে সবিশেষ সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। —লেখক

বাংলার মেয়েদের নৃত্যগীত

কিছুকাল পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান লেখককে রায়বেঁশের আবিষ্কার সম্বন্ধে যে একখানা পত্র লিখেছিলেন, তাতে লিখেছিলেন, "সকল রকমের আনন্দের প্রকাশ মানুষের প্রাণশক্তিকে জাগরুক করে রাখে; মানুষ কেবল অন্নের অভাবে মরে না, —আনন্দের অভাবে তার পৌরুষ শুকিয়ে মারা যায়।"

আনন্দ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, কারণ আনন্দই জীবন শক্তির উৎস। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাই উপনিষদে বলে গেছেন যে, আনন্দ থেকেই সকল সৃষ্ট পদার্থের জন্ম হয় এবং আনন্দ দ্বারাই তারা বেঁচে থাকে। সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন জাতিকে শক্তিমান করতে হলে ব্যক্তির ও জাতির জীবনে আনন্দের প্রকাশের পূর্ণ ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। যে জাতির জীবনে অথবা যে সম্প্রদায় বিশেষের জীবনে আনন্দের এ পূর্ণ ব্যবস্থার অভাব, সে জাতির অথবা সম্প্রদায়ের ধ্বংস সুনিশ্চিত।

আমাদের বাংলাদেশে আজকাল ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জীবনে আনন্দের ব্যাপক ব্যবস্থার অভাব হয়েছে বলেই জাতি ধ্বংসের মুখে চলেছে। অনেকে এর উত্তরে বলেন যে, আর্থিক অবস্থার অভাবের জন্য আনন্দের অভাব হয়েছে; কিন্তু আমরা বাস্তবিক পক্ষে দেখি, ঠিক তার উল্টো; কারণ যাদের আমরা ছোটলোক বলি এবং যারা গরীব, সে সব পল্লীবাসীদের মধ্যে এখনও আনন্দের সম্পূর্ণ ছড়াছড়ি রয়েছে। তাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং তাদের পূজা পার্ব্বণে তাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই নৃত্যে গীতে এই আনন্দের প্রকাশ করে। কিন্তু যারা অবস্থাপন্ন এবং শিক্ষিত তাদের মধ্যেই নির্ম্মল আনন্দের অভাব দেখতে পাই। তাদের দৈনন্দিন জীবনে অথবা পূজা-পার্ব্বণে নির্ম্মল নিত্যগীতের সম্পূর্ণ অভাব হয়ে পড়েছে। এর মূলে আর্থিক অসুবিধা নয়; এর প্রকৃত কারণ, আমাদের আধুনিক শিক্ষার ও ধর্ম্মভাব লোপের ফলে ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জীবনের আদর্শবিকৃতি। জীবনের সহজসরল ও আনন্দময় প্রণালী ভুলে গিয়ে এই যন্ত্রতান্ত্রিক ও কৃত্রিমতাময়

▸▸ *বঙ্গলক্ষ্মী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯*

ভাবের ফলে জাতির ও সমাজের জীবনকে আমরা একটা যন্ত্রেরই মত কৃত্রিম, আনন্দহীন ও নীরস করে ফেলেছি এবং তার ফলে আদবকায়দার এমন একটা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক আদর্শ আজকালকার ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত হয়েছে, যাতে না আছে রস, না আছে আনন্দ এবং না আছে সহজ সরলভাব। এই কৃত্রিম আদর্শকে পরিহার করে আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে একটা সহজ সরল ও আনন্দময় পদ্ধতির ধারা, যা পূবের্ব আমাদের দেশে ছিল এবং এখনও পল্লীগ্রামে যে সব জায়গায় আধুনিক শিক্ষার ও সহুরে ভাবের ছোঁয়াচ পৌছিতে পারে নাই, সেখানে এখনও বজায় আছে।

এই আনন্দময় ভাবকে ও সহজ সরল ভাবকে জাতির জীবনে আবার ফিরিয়ে আনতে হলে যে সব উপাদানের প্রয়োজন তার মধ্যে একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে নির্ম্মল নৃত্য-গীত। জাতির ও ব্যক্তির আনন্দের ও শক্তির বিকাশের জন্য যে নির্ম্মল নৃত্যের চর্চ্চার একান্ত প্রয়োজন, তা আমি আজ কয়েক মাস থেকে বিশেষ জোরের সহিত বলে আসছি; আর এটাও বলে আসছি যে, কি পুরুষের কি মেয়েদের মধ্যে নৃত্যের চর্চ্চা যে বাংলার সংকৃষ্টির একটি বিরুদ্ধ জিনিস তা নয়, পরন্তু নির্ম্মল নৃত্যগীত বাংলার নরনারীর জীবনে বরাবরই অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত ছিল এবং পল্লীগ্রামের অনেক স্থানে এখনও আছে। বাংলার নিজস্ব সংকৃষ্টি-প্রসূত এই নির্ম্মল নৃত্যগীতের চর্চ্চাকে আমাদের আবার জাগিয়ে তুলতে হবে; তা হলেই জাতির সেই মন ও আত্মা আবার শক্তি ও মুক্তি লাভ করবে।

বাংলার ভদ্রসমাজের মেয়েদের মধ্যে নির্ম্মল নৃত্যের চর্চ্চা যে এখনও অনেক জায়গায় বেঁচে আছে, এটা অনেকেই বিশ্বাস করেন না। সেইজন্য নিম্নে এ বিষয়ে কয়েকটি নৃত্যের কথা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হল।

যশোর জেলার রাজঘাট গ্রামে 'ঘটওলানো' নৃত্য যে মেয়েদের মধ্যে এখনও নিয়মিত ভাবে প্রচলিত আছে, তা আবিষ্কার করে প্রায় ৬ মাস পূবের্ব আমি ঘোষণা করেছি, এবং বিগত এপ্রিল মাসে কলিকাতায় গলষ্টন পার্কে লোক-নৃত্য উৎসবে ঐ গ্রামের অবিবাহিতা মেয়েদের দিয়ে উহা প্রদর্শিত করেছি। শ্রীহট্ট, কুমিল্লা ও মৈমনসিং জেলায় নানা ব্রত উপলক্ষে ভদ্রমেয়েদের মধ্যে নৃত্যের প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। এই সম্পর্কে মৈমনসিং-এর কার্ত্তিক-ব্রতনৃত্য এবং শ্রীহট্রের সূর্য্য-ব্রত-নৃত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীহট্র জেলার ভদ্রমেয়েদের মধ্যে বিবাহ উপলক্ষ্যে নৃত্যের প্রথা এখনও অনেক পল্লীতেই প্রচলিত আছে। পূবর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে মুসলমান ভদ্রমেয়েদের মধ্যে বিবাহ উপলক্ষ্যে নৃত্যের প্রথা এখনও অনেক পল্লীতেই প্রচলিত আছে। পূবর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে মুসলমান ভদ্রমেয়েদের মধ্যে বিবাহ উপলক্ষ্যে নৃত্যের প্রথা এখনও প্রচলিত আছে।

ফরিদপুরের নলিয়া গ্রামে ব্রত, বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে যে সকল নৃত্য প্রচলিত আছে তা দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য সম্প্রতি আমার হয়েছে এবং তার কিঞ্চিৎ বর্ণনা নিম্নে দেওয়া গেল।

অবিবাহিতা মেয়েরা "হ্যাঁচড়া" অথবা বনদুর্গা ব্রত উপলক্ষে এবং মাঘমণ্ডলের ব্রত উপলক্ষে যে নৃত্য করে থাকে, তার কয়েকটি ছবি এখানে দেওয়া গেল। পৌষের সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ করে মাঘের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত এই ব্রত চলে। কুমারী মেয়েরা ভোরবেলায় উঠে বনের ফুল ও দূর্ব্বা ঘাস কুড়িয়ে আনে, তারপর বাড়ীর উঠানে একটি মাটির বেদী করে তার উপরে একটা কুল গাছের ডাল রোপণ করে, সেই বেদীর চারি পাশে এক একটা কুলো রেখে তার চার দিকে ছড়া আবৃত্তি করতে করতে নাচতে থাকে। দূর্ব্বা আর বনফুল কুলোতে রাখা হয়। মেয়েরা যে সব ছড়া আবৃত্তি করে নাচে তার কয়েকটা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।—

(১)

"হ্যাঁচোড়া ঠাউরণ লো
ফেঁচোড়া চুল।
তাই নিয়ে শোভে না লো
লোহা গড়ার ফুল।
লোহা গড়ার ফুল না লো
বেড়ার মাটি।
বেড়ার মাটি না গো
লোহার কাঠি।
লোহার কাঠি না লো বিয়ে করে
পাড়া জুড়ে ছুকরীরা জয়-জোকার পাড়ে,
জয় দেবো না লো জোকার দেবো
সোনার ভাই বোন কোলে তুলে নেবো।

(২)

রা'ল ঠাকুরের বাগ-বাগিচায়
কে কাটেরে পাত?
রা'ল ঠাকুরের ছোট ভাই
শিবেই কাটে পাত।
ও শিবেই ও শিবেই আর কেটো না পাত।
ঘরে আছে সোনার থাল তাইতে খেয়ো ভাত।
তোমরা সাত ভাই খেয়ো ভাত
আমরা সাত বোন ফেলিব পাত।
রা'ল ঠাকুরের বাগ-বাগিচায়
কে তোলেরে ফুল?

রা'ল ঠাকুরের ছোট ভাই
শিবেই তোলে ফুল।
শিবেই ও শিবেই আর তুলো না ফুল
ঘরে আছে সোনার সাজি
তাইতে তুলো ফুল।

(৩)

মাঘ মণ্ডলের ব্রত করব
ঘাটখানি তার কই?
মালিনী লো সই?
আছে আছে ঘাটখানি
বামুনগেড়ে পাড়া
বামুনগেড়ের দুই ছুকরী, ব্রত করে তারা।
—ইত্যাদি—

বিয়ের সময় নলিয়া গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইত্যাদি পরিবারের এখনও যে সব নাচ প্রচলিত আছে সেগুলি বড়ই সুন্দর। সাধারণতঃ এয়ো মেয়েরা সব নৃত্য করে থাকেন। এখানে যে সব নৃত্যের ছবি দেওয়া হল;তাতে সধবা মেয়ে ছাড়া কয়েকটি বিধবা মেয়েও, তারা যখন এয়ো ছিলেন, তখন কি রকম করে নেচেছেন তা দেখিয়েছেন। এদের মধ্যে একটা অবিবাহিতা মেয়ে আছেন এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মেয়েরাও আছেন। প্রথমে হয় গঙ্গা বরণের নৃত্য। পুকুরঘাটে সাধারণতঃ একাট পাট কাঠি প্রস্তুত করে গঙ্গা দেবীর পূজা করা হয়। এই উপলক্ষে বরণকুলো এবং সোহাগ হাঁড়ী পুকুরের পারে রেখে মেয়েরা তার চারিদিকে বৃত্তাকারে নেচে নেচে গান করে থাকেন। একটি গানের নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল।

গঙ্গাবরণের নৃত্যের গান

সখি দ্যাখ্ দ্যাখ্ বেলা হল গগনে
সখি চল যাই গঙ্গাবরণে।
আমি যাইব গঙ্গার কুল
তুলব জবা ফুল;—
আমি তুলবো ফুল
গাঁথব মালা দিব মায়ের চরণে।
আমি তুলব কুসুম ফুল

যাইয়ে মায়ের কুল
আমি ভরব জল করব পূজা
দিব মায়ের চরণে।
সখি চল যাই গঙ্গা বরণে।

অষ্ট সখীর নৃত্য

বরকে বিদায় দিবার সময় মেয়েরা হাত ধরাধরি করে বৃত্তাকারে যে নৃত্য করে থাকেন তাকে "অষ্ট সখীর" নৃত্য বলা হয়। কন্যার বাড়ী যাবার পূর্ব্বে বরকে সাজাবার সময় একটি নৃত্য করা হয়। এতে অনেক রকমের সুন্দর সুন্দর ভঙ্গী আছে। এই সব নৃত্যের সঙ্গেই ঢোল বাজে। কন্যার বাড়ীতে পাত্রীকে স্নান করানোর পর "ঢোল বরণ" ও "মাদল পূজার" নৃত্য হয়ে থাকে। ঢোল বরণের সময় একটি মেরে কুলা মাথায় করে নাচেন এবং অন্য মেয়েরা খালি হাতে নাচেন। মাদল পূজা নৃত্যের সময় আঁচল হাতে করে ঘুরে ঘুরে নাচা হয়। সাত পাকের সময় যে নাচ হয় তাকে "ধূপ্নি" নাচন বলে। ফুল-শয্যার রাত্রে মেয়েরা শাড়ীর আঁচল হাতে ধরে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করেন। বর ও কন্যাকে যখন বরের বাড়ী থেকে বিদায় দেওয়া হয় তখন মেয়েরা বর এবং কন্যার সম্মুখে দাঁড়িয়ে "প্রণাম নৃত্য" করেন, এবং তার পরে বিদায়ের নৃত্য করেন। এই বিদায়-নৃত্যে একবার বাঁ হাত কোমরে রেখে ডান হাতে চিৎ করে কপালে ছোঁয়ানো হয় এবং তারপরে ডান হাত কপালে রেখে বাঁ হাত চিৎ করে কপালে ছোঁয়ানো হয়। এইরূপ সাতবার করা হয়। প্রণাম ও বিদায় নৃত্যের সময় মাথায় হাত ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের ভঙ্গীতে ডান পা ঈষৎ তোলা হয় ওঠা হাঁটু ঈষৎ নামানো হয়।

বরণের সময় মেয়েরা যে রকম, নৃত্যের ভঙ্গীতে শরীর সঞ্চালন করেন তার ২।৩টি ছবি এখানে দেওয়া গেল। একটি বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-বিধবা বরণ-নৃত্য প্রদর্শন করার সময় এই ছবি গুলি নেওয়া হয়েছে। উপরোক্ত নৃত্যগুলি ব্যতীত আরও অনেক নৃত্য ফরিদপুরের মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তার মধ্যে অনেকগুলি "আনন্দনৃত্য" শ্রেণীর। ইহার মধ্যে অনেকগুলি "মেঘরাণী" নৃত্য। এই মেঘরাণীর নৃত্যে মেয়েরা নিম্নলিখিত ছড়াই আবৃত্তি করে ঃ—

ওলো মেঘরাণী
হাত পা ধুয়ে ফেলাও পাণি।
চিনে বনে চিক চিকেণী
ধান বনে হাঁটু পাটি।
কলা তলায় গঙ্গা জল—
গপ গপাইয়ে নেমে পড়।

মেয়েরা এক হাতে আঁচল ধরে ঘুরে ঘুরে নেচে থাকে আর ছড়াটির শেষ লাইন আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা মাটিতে এক ঝাঁকি দিয়ে একপায়ের উপর বসে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ আবার এক পাক ঘুরে উঠে পড়ে। এ নৃত্যে কথা ও ভঙ্গীতে মেঘকে পৃথিবীতে আহ্বান করা হয়। "ঘাঘর জানি" নৃত্য সাধারণতঃ ছোট মেয়েরাই করে থাকে। কিন্তু বয়স্কা মেয়েরা কখনও কখনও এই নৃত্যে যোগ দেন। মাঝখানে যে মেয়েটি থাকে সে বলে "এতটুকু পানি"। অন্য মেয়েরা চারপাশে হাত ধরাধরি করে হঠাৎ "ঘাঘর-জানি" বলে বসে পড়ে আবার তখনই দাঁড়িয়ে পড়ে। মাঝখানের মেয়েটি পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত শরীরের প্রত্যেক অঙ্গে হাত দিয়ে প্রত্যেকবার "এতটুকু পানি" বলে আর চার দিকের মেয়েরাও তার পরেই ঘাঘরজানি বলে বসে ও উঠে নাচতে থাকে। তারপরে মাঝখানের মেয়েটি "এইপথ দিয়ে যাব" এই বলে ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে এবং বাইরের মেয়েরা ক্রমান্বয়ে "কোদাল ফেলে মারব" "খন্তা ফেলে মার" ইত্যাদি নানা অস্ত্রের কথা বলে তাকে রোধ করবার চেষ্টা করে। একরকম ছোটাছুটি করে মেয়েরা আনন্দময় নৃত্য করে থাকে।

ইহা ছাড়া বয়স্কা মেয়েরা বিবাহ ও ব্রত উপলক্ষে "ধান বুনানো" নৃত্য "ধান নিড়ালো" নৃত্য ইত্যাদি ঢোলের তালে তালে করে থাকেন এবং গণকা-গণাদ, দৈবক ঠাকুর ইত্যাদি কৌতুকময় অভিনয় নৃত্যের সঙ্গে করে থাকেন।

নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে 'ঝুমুর' নৃত্যের বহুল প্রচলন এখনও আছে। এই নৃত্যটি তাণ্ডব শ্রেণীর এবং ঢোলের বাজনার সঙ্গে হয়ে থাকে। ঝুমুর নৃত্যের ২টি ছবি এখানে দেওয়া হল।

বাংলার পল্লীর যে সকল নৃত্যের কথা এখানে বলা হল এগুলিতে বাই খেমটা নাচের বিলাস-বিভ্রমের লেশমাত্র নাই। এই সকল নৃত্য প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও প্রত্যেক পরিবারে পুনঃ প্রচারিত করে মেয়েদের জীবনকে আবার আনন্দময় এবং তাদের শরীরকে স্বাস্থ্যময় ও শক্তিময় করে তুলে জাতির জীবনে আবার শক্তির ও মুক্তির সন্ধান আমাদের মিলিয়ে দিতে হবে। ইতিমধ্যেই বর্ত্তমান লেখকের প্রচেষ্টায় কয়েকটি বিদ্যালয়ের বাংলার প্রাচীন "ব্রত নৃত্যের" পুনঃ প্রচলন হতে আরম্ভ হয়েছে।

ছেলেদের স্কুলে গত দেড় বৎসরের চেষ্টায় শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে লোকে নৃত্যের চর্চ্চা প্রবর্ত্তন করতে অনেকটা সফলকাম আমি হয়েছি। কিন্তু কেবল পুরুষদের জন্য নৃত্যের বন্দোবস্ত করে নিরস্ত হয়ে থাকলে আমাদের চলবে না। দেশের ছেলেদের জীবনে এখনও আনন্দের এবং ব্যায়ামের কতকটা সুযোগ এবং বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু দেশের মেয়েদের ও বালিকাদের বেলা তার কিছু মাত্র নাই বললেই চলে এবং এর ফলে বাংলার মেয়েদেব কেবল যে স্বভাবজাত শারীরিক সৌন্দর্য্যের লোপ হচ্ছে তা নয়, দিন দিন তাদের স্বাস্থ্যহীনতার ও দুর্ব্বলতার মাত্রা বেড়ে চলে জাতিকে দ্রুত ধ্বংসের পথে নিয়ে

যাচ্ছে। ছেলেদের জন্য যে ড্রিল-পদ্ধতি শারীরিক ব্যায়ামের দিক দিয়ে অস্বাভাবিক ও অনুপযোগী সাব্যস্ত হয়েছে মেয়েদের পক্ষে যে ইহা আরও বেশি অস্বাভাবিক ও অনুপযোগী তা বলা বাহুল্য। সুতরাং এটা জোরের সহিত বলা যেতে পারে যে, ছেলেদের ব্যায়ামের জন্য নৃত্যের প্রচলনের যতটা প্রয়োজন, মেয়েদের ব্যায়াম, শরীর-গঠন ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তার প্রয়োজন আরও বেশি।

নির্ম্মল নৃত্যকে আবার সামাজিক জীবনের অঙ্গস্বরূপ করে তুলতে হবে এবং বাঙ্গলার নিজস্ব সংকৃষ্টি প্রসূত নির্ম্মল নৃত্য গুলির পুনঃপ্রচলন করতে হবে, কারণ এগুলিতে কোনরকম নৈতিক আপত্তিজনক হাব-ভাব লেশ মাত্রও নাই। বালিকা, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা নিবির্বশেষে সকল শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যেই বাংলা দেশে এককালে ব্রত ও উৎসব নৃত্য ইত্যাদির প্রচলন ছিল। দেশের সবর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য আবার বালিকা-প্রৌঢ়া বৃদ্ধ নিবির্বশেষে সকল শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে নির্ম্মল সমষ্টি নৃত্যের প্রচলন করা আমাদের এখন একান্ত কর্ত্তব্য।

বাংলার জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় নৃত্য

জাতির জীবনে জাতীয় নৃত্য এবং জাতীয় সঙ্গীত একটি সরল সহজ আনন্দের ভাণ্ডার—ইহা জাতীয় জীবনকে নবজীবনের প্রেরণা দেয় এবং সারল্য ও পবিত্রতা মণ্ডিত করে। জাতীয় নৃত্য ও জাতীয় সঙ্গীত জাতির স্বতঃস্ফূর্ত কলাবোধ এবং আত্মবিকাশের পরিমাপস্বরূপ। জাতীয় নৃত্য ও জাতীয় সঙ্গীত জাতির চরিত্রের বিশিষ্ট সম্পদ। ইহা অতীতের সহিত জাতির সাংস্কৃতিক সংযোগের এবং আধ্যাত্মিক যোগসূত্রের একটি উজ্জ্বল এবং সতেজ বহিঃপ্রকাশ।

জাতীয় নৃত্য সরল ব্যয়বাহুল্যহীন এবং আনন্দদায়ক শারীরিক ব্যায়াম। ইহা শরীর এবং মন উভয়কে পরিতৃপ্ত করে—জাতির অধিকাংশ লোকের পক্ষে উহা আত্মবিকাশের সব চেয়ে সহজসাধ্য পন্থা। জাতীয় সঙ্গীত জাতির সংস্কৃতিগত ধারার উত্তরাধিকারের বাহক;তাহার আধ্যাত্মিক এবং গভীর আশা আকাঙ্ক্ষার ভাষা। জাতীয় নৃত্য ও সঙ্গীতের অবজ্ঞা ও অবনতি জাতির বিবেককে শিথিল এবং অন্তর্দৃষ্টিকে নিষ্প্রভ করে।

বাংলার বাউল, কীর্ত্তন, ভাটিয়ালি প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীতগুলি বাংলার বিশিষ্ট সম্পদস্বরূপ এবং সমগ্র পৃথিবীতে অতুলনীয়। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুপম সুর ও গানগুলির প্রাথমিক উপকরণ বাংলার এই জাতীয় সঙ্গীত হইতেই পাইয়াছেন। যন্ত্রসভ্যতার আক্রমণে, লৌকিক শিক্ষার অবনতিতে এবং বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক ও সংকৃষ্টিগত জীবনধারার দ্রুত-বিলোপের ফলে লুপ্তাবশেষ যে সকল জাতীয়-সঙ্গীতের ধারা আজও বাংলার গ্রামে গ্রামে প্ররক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহার পুনরুজ্জীবনের বিশেষ সুব্যবস্থিত ও বিজ্ঞানসম্মত কোনও রূপ ব্যবস্থা এতাবৎকাল করা হয় নাই।

আমার ক্ষুদ্র চেষ্টায় কয়েক বৎসর হইতে বাংলার জাতীয় নৃত্য সম্বন্ধে গবেষণার পূর্ব্বে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধারণ ছিল যে, নৃত্যকলায় বাংলার কোন নিজস্ব বিশিষ্ট

▸▸ *বাংলার শক্তি, ভাদ্র ১৩৪৫*

জাতীয় অবদান নাই। ফলে অন্য প্রদেশ হইতে নৃত্যের আমদানির চেষ্টা হইয়াছিল। এমন কি এখনও বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাংলার নিজস্ব জাতীয় কলাধারার প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণার ফলে অন্যান্য প্রদেশের নৃত্যকলাকে তথাকথিত উচ্চাঙ্গের নৃত্যকলা বলিয়া অভিহিত করা হয় ও সেগুলির চর্চ্চা করা হয়, কিন্তু বাংলার নিজস্ব নৃত্যকলা যে অন্যান্য প্রদেশের নৃত্যকলা হইতে বহু অধিক উচ্চ অঙ্গের, সে বিষয়ে অনুভূতি তথাকথিত শিক্ষিত বাঙ্গালীর এখনও জাগে নাই। আমার বিশ্বাস, অচিরে বর্ত্তমান অপশিক্ষার ফল তিরোহিত হইয়া, সেই অনুভূতি জাগিবে।

উৎসব এবং পূজা উপলক্ষে ভদ্র সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধ বনিতার যোগদানের উপযোগী বাউল ও কীর্ত্তন নৃত্য সম্বন্ধে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগ নাই—প্রাচীনতর লোক-নৃত্য যাহা তথাকথিত অবনত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ভারতের নিজস্ব শিল্পকলার বলিষ্ঠ ও জীবন্ত ঐতিহ্যের নিদর্শনরূপে এখনও বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রচলিত, তাহাদের প্রতিও যথোচিত দৃষ্টিপাত করা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে হয়, আমাদের ভদ্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায় নৃত্যকে পেশাদারের হাতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, এবং ইহার ফলে নৃত্যের আদর্শ অধঃপতিত হইয়া—বীভৎসতা, অশ্লীলতা এবং নীতিবিরুদ্ধ তার প্রতীক হইয়া—একটা অভিনয়ের বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। বাংলার গ্রাম্য জনসমাজ গভীর সৌন্দর্য্য, কলাশ্রী ও আধ্যাত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলার জাতীয় নিজস্ব নৃত্যগুলি আনুষ্ঠানিক ধার্ম্মিক ক্রিয়াকল্যাণে ও উৎসব উপলক্ষে অদ্যাবধি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ইহাদের জীবনযাত্রার এবং চিন্তার ও শিক্ষার সহিত বাংলার শহরের তথাকথিত শিক্ষিত স্ত্রীপুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই বিচ্ছেদের ফলেই নৃত্য এক দিকে যেমন, অশ্লীলতাময় হইয়াছিল, তেমনি অপর দিকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের বস্তু হইয়া জীবন হইতে এখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আধুনিক তথাকথিত উচ্চ শিক্ষার প্রভাব হইতে মুক্ত বাংলার দূর পল্লীগ্রামসমূহে অতি সম্ভ্রান্ত বংশের স্ত্রীলোকেরাও ধর্ম্মোৎসব বিবাহ প্রভৃতিতে সামাজিক কৃত্যের অঙ্গরূপে চিরাচরিত ব্রতনৃত্য অদ্যাপি পালন করিয়া আসিতেছেন।

বাংলার জাতীয় নৃত্য প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারেঃ (১) স্ত্রীলোকদিগের নৃত্য এবং (২) পুরুষদিগের নৃত্য। প্রথমোক্ত নৃত্যকে পুনরায় দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) ব্রতনৃত্য অথবা ধর্ম্মোৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্য, (খ) বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্য। এই সকল নৃত্য প্রায়ই সুললিত জাতীয় সঙ্গীত সহযোগে হইয়া থাকে।

বাংলায় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে সকল নৃত্য চলিত আছে, সেগুলিতে কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরাই যোগ দেয়—স্ত্রীপুরুষ উভয়ে একই নৃত্যে যোগদান করে না। বাংলার সম্ভ্রান্তঘরের মেয়েরাও নৃত্যে যোগ দেন এবং সেস্থলেও মুচি, ডোম প্রভৃতি জাতির

লোক চিরাগত প্রথামত ঢোল বাজাইয়া থাকে। সাধারণতঃ বিবাহ প্রভৃতি উৎসবোপলক্ষ্যে ঢোল অথবা মাদল সহযোগে নৃত্য হইয়া থাকে, এবং ব্রত ও ধর্ম্মোৎসব উপলক্ষ্যে ঢাকের বাদ্যসহযোগে নৃত্য হইয়া থাকে। সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদিগের নৃত্যের গতি সাধারণতঃ মৃদুল। ব্রতনৃত্য নৃত্যকালে সাধারণতঃ পদদ্বয় ভুমি হইতে উত্তোলন করা হয় না এই নৃত্যের "পায়তাড়া"কে "ঘট্টিত-পদ" ভঙ্গী বলা যায়। এই ভঙ্গীর গতির নৃত্য যখন অনেকগুলি মহিলা একসঙ্গে করেন তখন ইহা একটি অনুপম সৌন্দর্য্য ও কলাশ্রী সৃষ্টি করে। কোমর হইতে উর্দ্ধাংশের গতি সতেজ এবং অপ্রতিহত হয়, এবং কনুই হইতে উপরদিকের বিশেষতঃ মণিবন্ধ, করতল ও অঙ্গুলীগুলির অশেষপ্রকার সুন্দর গতিভঙ্গী করা হইয়া থাকে। প্রৌঢ়া, বয়ঃপ্রাপ্তা এবং ছোট ছোট বালিকারা সকলের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এই সকল এই নৃত্যে এমন একটি বলিষ্ঠ সংযম বিদ্যমান, যাহা প্রকৃত চারুকলার অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই নৃত্যে সামরিক কুচকাওয়াজের ন্যায় বহু ভঙ্গী আছে। ইহা সাধারণতঃ বৃত্তাকারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং বাহু ও হস্তের হাবভাবদ্বারা ধনুশ্চালনা, অসি-চালনা, বর্শা-নিক্ষেপ প্রভৃতির নির্দ্দেশ করা হয়। নৃতুগণ মধ্যে মধ্যে হাঁটু ঈষৎ নত করিয়া বৃত্তের মধ্যস্থলে লাফাইয়া অগ্রসর হইয়া হাঁটু পর্য্যায়ক্রমে যুক্ত ও বিযুক্ত করিয়া অশ্বারোহীর অশ্বচালনা ভঙ্গীর অনুকরণ করে। কখন কখন জোড়ায় জোড়ায় এই নৃত্য করা হয়। একজন নৃতুর স্কন্ধের উপর আর একজন লাফাইয়া উঠে এবং স্কন্ধের উপর সোজাভাবে দণ্ডায়মান হয়। এই অবস্থার হস্ত ও বাহুর বীরভাবব্যঞ্জক সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে নৃত্য করিতে থাকে। প্রাচীন বাংলার ও ভারতে যুদ্ধের পর বিজেতাগণ কর্ত্তৃক বিজিত কন্যার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া নৃত্য করিবার প্রথা ছিল। ইহা সেই অতি প্রাচীন প্রথারই ধারাবাহিক আচার।

এই নৃত্যের আনুষঙ্গিক একটি সম্পূর্ণ কসরৎপদ্ধতি প্রচলন আছে। এই রায়বেঁশে কসরৎগুলি অতি উচ্চাঙ্গের ব্যায়াম এবং ক্ষিপ্রতা, নির্ভীকতা ও শরীর-কৌশলের দিক দিয়া এই নৃত্যস্বরূপ তালসঙ্গত। এগুলিও ঢোল ও কাঁসির উত্তেজনা মূলক বাদ্য সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়।

এই রায়বেঁশে নৃত্যের প্রকৃতি হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে যুদ্ধের নৃত্যেই ইহার উৎপত্তি। আমি এই বিষয়ে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সবিশেষ ভাবে গবেষণা করিয়া ইহার পূর্ব্ব ইতিহাস আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। অতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে (কবিকঙ্কন, ধর্ম্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, রামপ্রসাদ প্রভৃতিতে) রায়বেঁশের উল্লেখ পাইয়াছি। 'রায়বেঁশে' শব্দটি ভল্লধারীর অর্থে প্রযুক্ত হইত, কারণ ভল্লের হাতলটি "রায়বেঁশে" অর্থাৎ নিরেট বাঁশ দ্বারা প্রস্তুত করা হইত। 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় ইহার ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা আমি করিয়াছি।

কাঠিনৃত্য

কাঠিনৃত্য ও গান বীরভূমের তথাকথিত অবনত সম্প্রদায়—বিশেষতঃ বাউরীদের মধ্যে আমি আবিষ্কার করি। সাধারণতঃ সমান সংখ্যক ব্যক্তিরা মাদল সহযোগে ইহাতে যোগদান করে। প্রত্যেকে দুই হাতে দুইটি ছোট কাঠি লইয়া বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান হয়। মাদল-বাদকেরা বৃত্তের বাহিরে এবং কখনও কখনও মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান থাকে। নৃত্যের প্রাক্কালে নৃতুগণ সমস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করে এবং নিয়মিত ব্যবধানে বামহস্তের কাঠি দ্বারা ডানহস্তস্থিত কাঠিতে একতালে আঘাত করে। তাহার পর নৃত্য আরম্ভ হইলে প্রত্যেক নৃতু পর্য্যায়ক্রমে তাহার ডানদিকের নৃতুর সহিত জুড়ী গঠন করে এবং বামহস্তস্থিত কাঠি দ্বারা জুড়ীদারের ডানহস্তস্থিত কাঠিতে আঘাত করে। তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন জুড়ী গঠন করা হয়। পূবের্ব যাহারা ডানদিকের নৃত্যুর সহিত জুড়ীগঠন করিত তাহারা এবার বামদিকের নৃতুর সহিত যোগদান করে এবং দক্ষিণহস্তস্থিত কাঠি দ্বারা জুড়ীদারের বামহস্তস্থিত কাঠিতে আঘাত করে। পুনঃ পুনঃ এই প্রকার করা হয় এবং নৃতুগণ বৃত্তের অগ্রভাগে নৃত্যে যোগদান করেন। গতি-সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে এই নৃত্যে এমন একটি পবিত্র ভাব সৃষ্ট হয়, যাহাতে মৌনভাবের লেশমাত্র থাকে না এবং একটি আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হওয়ার ফলে কোন প্রকার বিলাস-বিভ্রমের লেশ মাত্র এই নৃত্যে পরিলক্ষিত হয় না।

অবনত সম্প্রদায়ের লোকদের উপর এই নৃত্যের সময় ঢাক, ঢোল ও মাদল বাদনের ভার ন্যস্ত বটে কিন্তু এই সকল বস্তুকে স্বর্গীয় তাল, লয় ও ছন্দের প্রতীকরূপে অতি উচ্চ ও পবিত্র সম্মান দান করা হয়। পূবর্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থানে অদ্যাবধি ব্রাহ্মণবাড়ীতেও বিবাহোপলক্ষে অনুষ্ঠিত নৃত্যগুলির সহিত "ঢোল বরণ" নৃত্য অথবা "মাদল পূজা" নৃত্য হইয়া থাকে। বাদক ঢোলটি ধরিয়া থাকে, মেয়েরা নৃত্য সহযোগে কুলা হইতে ফুল দিয়া ঢোলকে পূজা করেন।

গত ত্রিশ চল্লিশ বৎসর হইতে পশ্চিমবঙ্গের সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে ব্রত ও বিবাহ উপলক্ষে নৃত্যে যোগ দেওয়ার প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কেবল মাত্র "ভাজো নৃত্য" (ইহা দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মানে ভাদ্রমাসে অবিবাহিতা বালিকাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে) আজও একটি প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে "ভাজো নৃত্যে" জাতি এবং সামাজিক শ্রেণী নিবির্বশেষে সকলেই যোগদান করিত। পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক জেলাতেই কিন্তু এখনও সম্ভ্রান্ত নারীদের মধ্যে নৃত্য প্রচলিত আছে—প্রৌঢ়া, যুবতী ও বালিকারা তাহাতে যোগদান করেন। স্বাস্থ্য ও আনন্দের এবং সমগ্র জাতির স্বাধীন ও সতেজ জীবনের পূর্ণ-বিকাশের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে ও সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে এই সকল নৃত্যের পুনঃপ্রচলন—বর্ত্তমানে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

উৎপত্তি অনুসারে বাংলার পুরুষদিগের নৃত্য তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) সামরিক অথবা বীররসব্যঞ্জক (পশ্চিমবঙ্গের রায়বেঁশে এবং কাঠি নৃত্য ও যশোহর খুলনার ঢালি নৃত্য এই শ্রেণীর) (২) সামাজিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয়। (সামাজিক ও ধর্ম্মোৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হইলেও পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর নৃত্যগুলি অনুষ্ঠানের অপরিহার্য্য অংশরূপে গণ্য হয় না। কীর্ত্তন, জারি, বাউল ও ঝুমুর নৃত্য এই শ্রেণীভুক্ত) (৩) আনুষ্ঠানিক নৃত্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের অত্যাবশ্যক অংশরূপে অনুষ্ঠিত হয়। ফরিদপুরের "অবতার" ও "ধূপ" নৃত্য, পশ্চিমবঙ্গের "ধরম পূজা" নৃত্য এবং মালদহ ও অন্যান্য জেলার "গম্ভীরা" নৃত্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

রায়বেঁশে

বাংলায় জাতীয় নৃত্যের মধ্যে রায়বেঁশে নৃত্যই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময়। ইহা পশ্চিমবঙ্গের কোনও কোনও জেলায় (বীরভূম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি) প্রচলিত। প্রথমোক্ত জেলাতেই এই নৃত্যের পুনরাবিষ্কার করিবার সৌভাগ্য আমার হয়। এক সময়ে এই নৃত্য বাংলার সকল শ্রেণীর পদাতিক সৈনিকেরা করিত। কালক্রমে বাউরী, ডোম প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এই নৃত্য প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। এই নৃত্যের সঙ্গে ঢোল ও কাঁসির বাজনা হইয়া থাকে। নৃতুদল ডান পায়ে নুপূর পরে। ইহা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ পুরুষোচিত, তেজোময় ও উচ্চাঙ্গ নৃত্য এবং অসাধারণ রূপ-তাল-লয়-সমন্বিত। ইহাই ভারতের আদিম রণতাণ্ডবের শ্রেষ্ঠ অবশিষ্ট প্রতীক। তাই রবীন্দ্রনাথ এই নৃত্যের পৌরুষব্যঞ্জক ভঙ্গী ও কলাগৌরব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন—"এরকম পুরুষোচিত নাচ দুর্লভ। আমাদের দেশের চিত্তদৌর্বল্য দূর করতে পারবে এই নৃত্য।" রায়বেঁশে নৃত্যকালে মাঝে মাঝে বিজয়-উল্লাসসূচক চীৎকার করা হইয়া থাকে। যুদ্ধের উত্তেজনা ও মাদকতার আবহাওয়ায় এই নৃত্য পরিপূর্ণ। কিন্তু রণোম্মাদনা, পৌরুষ ও পরাক্রম-ব্যঞ্জনার মধ্যেও ঘুরিতে থাকে। এই পদ্ধতিটি সরল অথচ নিয়মিত ও যথাযথ ব্যবস্থিত পাদবিক্ষেপগুলি সতেজ ও সুন্দর এবং দেহ-সঞ্চালন আনন্দপূর্ণ ও কাঠির উদ্দীপনাপূর্ণ ধ্বনির সহিত সুসমন্বিত। নৃত্যের সময় পর্য্যায়ক্রমে ভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। কখন নৃতুগণ দণ্ডায়মান ভাবে নৃত্য করে, কখন উপবিষ্ট ভঙ্গীতে লাফাইয়া করে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষী হয় যখন কোন কোন নৃতু আহত যোদ্ধার পরিকল্পনার মাটিতে চিৎ হইয়া শায়িত অবস্থায়ই নৃত্য করিতে করিতে ও তাহার দুই পার্শ্বের ঘূর্ণায়মান নৃতুদের কাঠিতে আঘাত করিতে করিতে চলিতে থাকে।

সম্ভবতঃ যুদ্ধ নৃত্যেই এই কাঠিনৃত্যের উৎপত্তি। কাঠিগুলি তরবারির প্রতীক। কাঠিগুলি যে ভাবে ঘুরানো হইয়া থাকে তাহাতে তরবারির আঘাত ও তাহার প্রতিঘাত করারই অনুকরণ করা হইয়া থাকে।

এই নৃত্যকালীন গীত সঙ্গীতগুলি পল্লীর কৃষকদিগের সরল আনন্দ এবং দুঃখের কথায় রচিত।

কাঠিনৃত্য কোনও বিশেষ ঘটনা অথবা উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় না; গ্রাম্য জীবনের সাধারণ একটি ক্রীড়া হিসাবেই ইহা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।

ঢালি

যশোহর ও খুলনার ঢালিনৃত্য সামরিক নৃত্য হইতে উৎপন্ন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের "বাহান্ন হাজার ঢালি"র কথা বাংলার সাহিত্যে সুপরিচিত। কিন্তু আজকাল আর আসল ঢাল ও তরবারি ব্যবহারের প্রচলন না থাকায় বাংলার প্রাচীন বীর সৈনিকের বংশধরগণ কাষ্ঠনির্মিত তরবারি ও বেতের ঢাল সহযোগে এবং ঢোল ও কাঁসি বাজনার সঙ্গে এই নৃত্য করিয়া থাকেন। ইহা একটি শ্রেষ্ঠ বীররসব্যঞ্জক নৃত্য। এই নৃত্যের অনেকগুলি ভঙ্গী রায়বেঁশের মতই বৃত্তাকারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ছাড়া এই নৃত্যে নৃতুগণ দুই সারিতে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধের অনুকরণে অগ্রসর ও পশ্চাদগমন এবং অস্ত্র সঞ্চারলন করিয়া থাকে। এই নৃত্য যশোহরের রাজা প্রতাদিত্যের বিখ্যাত ঢালিদিগের সামরিক নৃত্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। রাজা প্রতাপাদিত্যের ব্যহিনীর প্রধান অঙ্গের বর্ত্তমান বংশধর নমঃশূদ্র শ্রেণী দ্বারাই এই নৃত্য প্রধানতঃ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে। আজকাল যশোহর ও খুলনার মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ইহার বহুল অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

জারি

বাংলার প্রায় সব জেলাতেই বাৎসরিক মহরম উৎসবোপলক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জারি অথবা মরসিয়া নামে এই নৃত্য প্রচলিত আছে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও জেলায় বিশেষতঃ ময়মনসিংহে প্রচলিত এই নৃত্য সর্ব্বাপেক্ষা কলাসম্মত ও চিত্তাকর্ষক। ময়মনসিংহের পল্লীর বয়স্ক মুসলমান কৃষকগণ সাধারণতঃ বৃত্তাকারে এই নৃত্যে যোগদান করিয়া থাকে। মূল গায়কের নাম "বয়াতি"। "বয়াতি" বৃত্তের বাহির হইতে সঙ্গীত আরম্ভ করে। "বয়াতি" ব্যতীত সকল নৃতু এক পায়ে নূপুর বা ঘুঙুর পরে। "বয়াতি" সঙ্গীত আরম্ভ করিলে নৃতুগণ দক্ষিণপদ দ্বারা তাল ঠুকিয়া সমস্বরে সঙ্গীত যোগান করে; সঙ্গীত চরমে পৌঁছাইলে দেহসঞ্চালন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইয়া থাকে, নৃতুগণ দক্ষিণহস্তে লাল রুমাল সঞ্চালন করিতে করিতে নৃত্য করে। "জারি" শব্দের অর্থ শোক প্রকাশ, এই নৃত্যের আনুষঙ্গিক সঙ্গীত হয় আরব দেশে কারবালা মরুভূমিতে অনুষ্ঠিত ইমাম হোসেনের জীবনের ঘটনাবলী অথবা ইহা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ঐক্য ও সাধারণ সখ্যভাব

জ্ঞাপন করে। সঙ্গীতের সুরগুলি একাধারে সুললিত ও সতেজ এবং গানের বিষয়বস্তুকে উহা অতি সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত করে। ময়মনসিংহের জারি নৃত্যে নানা প্রকার পরিকল্পনা কৌশল নিবদ্ধ আছে। এই নৃত্যে একাধারে আনন্দ ও ব্যায়ামের অতি সহজ সমন্বয় রহিয়াছে।

বাউল

বাউল সঙ্গীত ও নৃত্য বাংলার প্রায় সকল স্থানেই হিন্দুদিগের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গীত ও নৃত্য একক অথবা সময় সময় সম্প্রদায়ের দলবল সহ একতারা অথবা আনন্দলহরী (সাধারণ ভাষায় এই যন্ত্র গাবগুবাগুব নামেও অভিহিত হয়) ও সময় সময় করতাল ও ডুবকী সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। সহজ আনন্দের অধ্যাত্ম আত্মপ্রকাশমূলক গতিভঙ্গী ও সুরসঙ্গীত এই নৃত্যের বৈশিষ্ট্য। বাউল শব্দের যৌগিক অর্থ আত্মহারা; অর্থাৎ শাশ্বত আধ্যাত্মিক সত্যের অন্বেষণে যে আত্মহারা সেই "বাউল"। বাউল গানগুলি প্রায়ই পার্থিব জগতের অসারতা, ধর্ম্মবিষয়ে ঔদার্য্য ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ভাব প্রকাশ করে। বাউল নৃত্য ও সঙ্গীত কোনও বিশেষ উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় না। গায়কগণ আপনার আত্মার প্রেরণার জন্য ভজন হিসাবে এই নৃত্য ও সঙ্গীত করিয়া থাকে। অবশ্য অনেক সময় জীবিকা ও উপার্জ্জনের জন্যও ইহার অনুষ্ঠান করা হয়।

কীর্ত্তন নৃত্য

বাংলার জাতীয় নৃত্যের মধ্যে কীর্ত্তন নৃত্যই সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত, এবং ইহা বাংলার সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি বিশিষ্ট সম্পদ। ইহা অতি প্রাচীন নৃত্য। বিষ্ণুর পূজার সহিত ইহার উৎপত্তি, কিন্তু বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক চৈতন্যদেবই ইহাকে আধুনিক জাতীয় রূপ দান করেন। সার্ব্বলৌকিক প্রকৃতিই ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য। জাতি-শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে একটি অথবা বহু গ্রামের যুবক, বৃদ্ধ, ধনী, নির্ধন, জমিদার-প্রজা ইহাতে যোগদান করে। মৃদঙ্গ ও করতাল সহযোগে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহার পদ্ধতি অতি সরল। দুই হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক নৃতুগণ বৃত্তাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইহাতে যোগদান করেন। আজকাল কোন কোন শহুরে সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নৃত্যহীন বৈঠকী কীর্ত্তনের প্রচলন হইতেছে, ইহা বাংলার নিজস্ব গতিশীল কীর্ত্তন নৃত্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও আসল কীর্ত্তনের পূর্ণ ও পবিত্র রসবিহীন। বলা বাহুল্য, আসল কীর্ত্তনে হারমোনিয়াম যন্ত্রের কোন স্থান নাই। এই নৃত্য গভীর পারমার্থিক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে এবং পরমানন্দেই ইহার সমাপ্তি ঘটে। সময় সময় গ্রামের মধ্য দিয়া সদলবলে কীর্ত্তন নৃত্য ও সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। ইহাকে নগরসংকীর্ত্তন বলা হয়।

অবতার নৃত্য

ফরিদপুরের ধূপ ও অবতার নৃত্য আনুষ্ঠানিক নৃত্য জাতীয়। বাংলা বৎসরের শেষভাগে অনুষ্ঠিত "চড়ক গম্ভীরা" উৎসব উপলক্ষ্যে এগুলি অনুষ্ঠিত হয়। অবতার নৃত্যে বহু প্রকারের মুদ্রা অথবা সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে, তাহা দ্বারা নৃতুগণ নানা প্রকারের অঙ্গচালনার সহিত দশাবতারের বিষয় প্রদর্শন করে। বিনা সঙ্গীতে ঢাক ও কাঁসি সহযোগে ইহা অনুষ্ঠিত হয়, এবং মাঝে মাঝে প্রধান নৃতু অথবা "বালা" যন্ত্র আবৃত্তি করিয়া থাকে।

ধূপনৃত্য

ফরিদপুরের "ধূপ নৃত্য" ও চড়ক-গম্ভীরা-উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ঢাক ও কাঁসি সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক নৃতুর হস্তে জ্বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ একটি ধুনুচী থাকে এবং বৃত্তাকারে নৃত্য আরম্ভ হইলে বৃত্তের বাহিরে দণ্ডায়মান একটি ব্যক্তির হস্তস্থিত পাত্র হইতে ধূনা লইয়া প্রত্যেক নৃতু পালাক্রমে সজোরে ধুনুচীতে নিক্ষেপ করে। ইহাতে হঠাৎ ধুনুচীতে দপ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠে এবং নৃত্য অত্যন্ত দ্রুত হওয়ার ফলে অন্ধকার রাত্রে একটি মনোরম চিত্তাকর্ষী দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। এই নৃত্যের সহিত কোনও গীত হয় না। নৃত্যের শেষে নর্ত্তকগণ হাত ধরাধরি করিয়া বৃত্তাকারে নাচিতে নাচিতে ফিরিয়া যায়।

পল্লী সঙ্গীত ও পল্লী নৃত্যরূপে যে অমূল্য জাতীয় সম্পদ এখনও বাংলার গ্রামে গ্রামে বাঁচিয়া রহিয়াছে, সেগুলির জাতীয় প্রয়োজনীয়তা অনুভূতি-সঞ্চার এবং সেই সকল নির্ম্মল আনন্দময় সঙ্গীতকে দৈনিক জীবনযাত্রায় ও শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়া সামাজিক জাতীয় জীবনকে পুনরায় প্রাণদান করা বাংলার আধুনিক শিক্ষিত সমাজের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। জাতীয় জীবনের চিরাগতধারার সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন করিয়া এবং তাহাকে শ্রদ্ধার স্থান দিয়া জাতির গভীর আত্মমর্য্যাদা সৃষ্টি করার ইহা একমাত্র ও অমূল্য পন্থা।

বাংলার জীবনে নৃত্য ও ক্রীড়ার স্থান

নৃত্য ও ক্রীড়ার পরস্পর সম্বন্ধ

আমরা দেখিয়াছি যে জাতির গভীর প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার ক্রীড়া পদ্ধতিতে। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে প্রত্যেক জাতির রসকলা-পদ্ধতি সেই জাতির গভীর আশা, আকাঙক্ষা, আদর্শ ও লক্ষ্যের লীলাময় অভিব্যক্তি। সকল রসকলা হইতে নৃত্যকলার স্ফুরণ সহজসাধ্য ও স্বাভাবিক। সুতরাং একদিকে যেমন জাতির ক্রীড়াপদ্ধতি হইতে তাহার প্রকৃতির পরিচয় অতি সহজ ও সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায় সেইরূপ জাতির নৃত্যকলাও তাহার প্রকৃতির পরিচয় সহজ ও সুস্পষ্ট ভাবে আমাদিগকে দিতে সহায়তা করে।

ক্রীড়া ও রসকলার—বিশেষতঃ নৃত্যরসকলার—মধ্যে উপরোক্ত বিষয়ে এই যে পরস্পর সমতা, ইহা হইতে ইহাদের প্রকৃতিগত কয়েকটি মূল্যবান সত্যের আভাস আমরা পাই। ক্রীড়া এবং রসকলা (বিশেষতঃ নৃত্য-রসকলা) উভয়ই একশ্রেণীর প্রক্রিয়া, অর্থাৎ উভয়ই জাতির প্রকৃতির লীলাময় আত্মপ্রকাশ অথবা অভিব্যক্তি। এবং রসকলাকে এই অর্থে মানবপ্রকৃতির একটি ছন্দাত্মক ক্রীড়া-বিশেষ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। মানুষ যখন দৈনন্দিন বাধ্যতামূলক অবশ্যকর্ত্তব্য কাজ হইতে অবসর পায়, তখনই সে ক্রীড়ার চর্চ্চা করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। দৈনন্দিন জীবনের অন্নবস্ত্রসংস্থান, উদরপূর্ত্তি ইত্যাদি জড়দেহের অনিবার্য্য প্রয়োজনমূলক ব্যাপারের সম্পাদনের ব্যবস্থা কোন রকমে সারিতে পারিলেই সে ক্রীড়ার লীলাময় আনন্দে নিজেকে ঢালিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হয়; অর্থাৎ, ক্রীড়া জড়দেহ-ধারণের বাধ্যতামূলক বেগার-খাটুনির ভাবনা হইতে মানুষের প্রাণের মুক্তির একটি অভিব্যক্তি স্বরূপ। মানুষ যখন জড়দেহের ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্ররোচনামূলক প্রবৃত্তি হইতে আপনাকে উচ্চস্তরে উত্তোলিত করিয়া আত্মার গভীর ও বিশুদ্ধ আশা,

▸▸ *বঙ্গলক্ষ্মী, পৌষ ১৩৩৮*

আকাঙক্ষা, আদর্শ ও লক্ষ্যের অভিব্যক্তি দ্বারা আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, তখনই তাহার প্রক্রিয়াগুলি রসকলার রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে রসকলা মানুষের আত্মার মুক্তভাবেরই একটি লক্ষণ এবং মানুষের আত্মার মুক্তভাব হইতেই ইহার উদ্ভব।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে জাতির জীবনে খেলাধূলার চর্চ্চা জাতির এবং তাহার ব্যক্তিসমূহের প্রাণের মুক্তভাবের পরিচায়ক। এবং বর্ত্তমান কালে থেকে সকল জাতি জগতে প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। তাহাদের দৃষ্টান্ত হইতেও আমরা ইহারই সমর্থন পাই। পক্ষান্তরে, যে সকল দেশে মানুষের প্রাণ নানা বিধিবিধানের বন্ধনে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া মুক্তভাব হইতে সঞ্চিত হইয়াছে, সেই সকল দেশে ক্রীড়া এবং নৃত্যকলার সাবর্বজনীন চর্চার অভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

আমরা পুবের্বই দেখিয়াছি, ক্রীড়া এবং নৃত্যকলা মানুষের প্রাণের এবং আত্মার মুক্তভাবের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের সহজ ও অনিবার্য্য অভিব্যক্তি। মানুষের প্রাণ ও আত্মা যেখানে পরিবারে, সমাজে, ধর্ম্মজীবনে অথবা শিক্ষাক্ষেত্রে নানাপ্রকার ভ্রান্ত বিধিবিধান-মূলক দণ্ডমুণ্ডের ভয়ে ভীত ও সঙ্কুচিত, সেইখানেই তাহার আত্মা পঙ্গু হইয়া পড়ে, এবং তাহার প্রাণের সেই ভীতির বন্ধনে তাহার খেলাধূলা ও নৃত্যের প্রবৃত্তির উৎসমুখ নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

প্রাচীন বাংলার জীবনে মুক্তভাব

একদিন ছিল যখন বাংলার প্রাণ ও আত্মা ছিল মুক্ত এবং তাহার ফলে তাহার জীবন ছিল গৌরবময়, পৌরুষময় এবং আনন্দময়। বাংলার মানুষের প্রাণের তেজ তাহার সাহস ও বাহুবলে আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়া তখন বাংলাকে প্রাচীন ভারতে একটি অত্যুচ্চ গৌরবময় স্থান দিয়াছিল। সেই যুগে গঙ্গারাঢ়ীয় বাঙ্গালীর পরাক্রম দিগ্বিজয়ী সেকেন্দরের মনেও ভীতি সঞ্চার করিয়াছিল। সেই যুগে বাঙ্গালী কি স্থলযুদ্ধ কি নৌযুদ্ধে প্রবল পরাক্রম ছিল। সেই যুগে সে কি স্থান কি জলে বাণিজ্যে অগ্রণী ছিল। তাহার নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগর এব ভারত মহাসাগরে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল—সিংহলে, নবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল—তখন সে চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ ও দ্বীপময় ভারত মহাসাগরে ধর্ম্মপ্রচার করিতে ছুটিয়াছিল। তাহার মস্‌লিন ও অন্যান সূক্ষ্ম শিল্পসম্ভার এশিয়া মহাদেশ অতিক্রম করিয়া ইউরোপের নানা দেশে খ্যাতিলাভ করিয়া সেই সকল দেশের লোকের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তখনও বাঙ্গালী তাহার নৌবাহিনী এবং বাণিজ্যপোতে

অবহেলায় সমুদ্রযাত্রা করিল, তাহাতে তাহার ভয় হইত যে, জাতিজ রাষ্ট্রগুলো। প্রাচীন বাংলার প্রাণের মুক্তির এই যে বৈচিত্র্য পরিস্ফুরণ, ইহা যেমন নানা দেশে তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তেমনই আবার পারিবারিক ও সামাজিক মুক্তভাবের ছড়াছড়ি জানিয়া তাহাদিগকে ক্রীড়ার মুক্তোর আনন্দে ভরপুর করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রাচীন বাংলার সংকৃষ্টি-বিস্মৃত আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকের কাছে এসব কথা একটি প্রহেলিকার মতই বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা সত্য। প্রাচীন বাংলার সংকৃষ্টির পরিচয় পাইবার চেষ্টা যতই আমরা করিতে পারিব ততই আমরা ইহার সভ্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব, —এবং ততই আমরা বুঝিতে পারিব যে প্রাচীন বাংলার নরনারীর প্রাণে একদিন মুক্তভাব ও পৌরুষভাবের ছড়াছড়ি ছিল, এবং ইতিহাসের দুর্ভাগ্যক্রমে পরিবর্ত্তনের ফলে সামাজিক জীবনে, ধর্ম্মে ও শিক্ষাক্ষেত্রে ভ্রান্ত আদর্শে অন্ধতামূঢ় আমরা আজ সেই মুক্তভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। হাডু ডু-ডু, নারিকেল কাড়াকাড়ি ক্রীড়া ইত্যাদি পৌরুষ-ক্রীড়ার বহুল প্রচলন যে বাংলার জীবনে একধারে ছিল, এবং আমাদের অজ্ঞতা ও অন্ধ অবজ্ঞার ফলে যে সেগুলি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। আরও যে দ্রুত গৌরবময় ও আনন্দঘন ক্রীড়াপদ্ধতি আমাদের দেশ হইতে এই অজ্ঞতা ও অন্ধতার ফলে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

বাংলাদেশে ক্রীড়া ও নৃত্যের সুমধুর সমন্বয়

ক্রীড়া এবং নৃত্যের মধ্যে বাঙ্গালী যেমন একটি অপূর্ব্ব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল, ইহাদের মধ্যে সেরূপ ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপনের দৃষ্টান্ত অন্য কোন দেশে হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ইহার তিনটি জীবন্ত উদাহরণ আমরা এখনও পাই—রায়বেঁশে ব্যায়াম নৃত্য, কাঠি-নৃত্য, লাঠি-খেলা নৃত্যে এবং পূর্ব্ববঙ্গের লুপ্তপ্রায় 'নৌকা-বাচ' খেলায়।

রায়বেঁশে পৌরুষ-নৃত্যের সঙ্গে ঢোল ও কাঁসির উদ্দীপনাময় সঙ্গতের সহযোগে যে ব্যায়ামকলার প্রথা পশ্চিমবঙ্গের অবজ্ঞাত পল্লীজীবনে এখনও প্রচলিত আছে, তাহাতে নৃত্য এবং ক্রীড়ার এই অপূর্ব্ব সমাবেশের একটি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। জাতির জীবনে আবালবৃদ্ধের শরীরগঠনের উপযোগী এইরূপ পৌরুষময় ব্যায়াম-নৃত্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দুর্লভ। তথাপি মূঢ় আমরা অবজ্ঞাভরে ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এবং শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় জীবনের এই অমূল্য প্রণালীকে গ্রহণ না করিয়া স্যাণ্ডো, মূলার ইত্যাদি বিদেশীর ব্যায়ামাচার্য্যদের ব্যায়াম-বিষয়ক ব্যয়বহুল গ্রন্থখানি পাঠ করিতে এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ব্যায়ামপ্রণালী আমদানি করিয়া অনুসরণ করিতে ব্যাপৃত হইয়াছি। রায়বেঁশে

নৃত্যের আনন্দময় প্রণালীতে অবজ্ঞা করিয়া ছিলেন নিরাময়ের যান্ত্রিক প্রণালীর অনুসরণ করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গের পৌরুষময় কাঠি-নৃত্য, ক্রীড়া ও নৃত্যের পূর্ণ-সমন্বয়ের আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। ইহা যেমন একদিকে নৃত্যের সৌন্দর্য্য ও ছন্দোবদ্ধতাপূর্ণ রসকলা তেমন আবার অন্যদিক দিয়া ইহা মানা সঙ্গীতে অসিযুদ্ধের একটি উদ্দীপনাময় অভিনয় ও পৌরুষময় ব্যায়ামক্রীড়া।

নৃত্য ও ক্রীড়ার চমৎকার সমন্বয় ও সংযোগের আর একটি যে দৃষ্টান্ত বাংলা দিয়াছে, তাহা আমরা পাই বাংলার লাঠিখেলা নৃত্যে। লাঠিখেলাকে নৃত্যসংজ্ঞাভুক্ত করাতে অনেকে হয়ত বিস্মিত হইবেন, কিন্তু বাংলার পল্লীতে এখনও লাঠিখেলার যে অতুলনীয় পদ্ধতি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে নৃত্যের সঙ্গে পৌরুষময় খেলার একটি বিচিত্র সমস্বর পাওয়া যায়। এবং আমার বিশ্বাস যে ভারতের অন্যকোন প্রদেশে অথবা পৃথিবীর অন্যকোন দেশে নৃত্যের সঙ্গে খেলার পূর্ণ-সমন্বয়মণ্ডিত এমন সুন্দর প্রণালীর প্রচলন নাই। অথচ মূঢ়তাবশতঃ আমরা এই মূল্যবান প্রণালীকে এখনও দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করি নাই, এবং আমাদের শিক্ষিত সমাজের উপেক্ষার ফলে প্রাচীন বাংলার সংকৃষ্টিজাত এই পৌরুষ নৃত্যক্রীড়া লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িতেছে।

বাংলার পৌরুষ-ক্রীড়াপদ্ধতি

আমরা দেখিয়াছি যে যোদ্ধার জাতির ক্রীড়াপ্রণালী যুদ্ধেরই অনুরূপ হইয়া থাকে; এবং বাঙ্গালী যে একদিন একটি তেজস্বী যোদ্ধার জাতি ছিল তাহার অকাট্য পরিচয় প্রাচীন বাংলার লুপ্তপ্রায় নারিকেল কাড়াকাড়ি খেলার, রায়বেঁশে নৃত্যকলা ও ব্যায়ামক্রীড়ার, কাঠি-নৃত্যের এবং লাঠিখেলা-নৃত্যের যুযৎসা-পূর্ণ পদ্ধতিগুলির ধ্বংসাবিশেষের মধ্যে এখনও আমরা পাই। তেমনই বাঙ্গালী যে একদিন নৌযুদ্ধে এবং নৌবাণিজ্য-বিহারে এক অগ্রণী জাতি ছিল, তাহার পরিচয়চিহ্ন পূবর্ববঙ্গের লুপ্তপ্রায় নৌকা বাচ প্রণালীতে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আজকাল আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও কোথায় অক্সফোর্ড ও কেম্বিজের বিখ্যাত বাৎসরিক নৌকা-বাচ প্রতিযোগিতার অনুকরণে নৌকা-বাচ খেলার প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাংলার পৌরুষময় নারিকেল কাড়াকাড়ি খেলার কথা ভুলিয়া গিয়া আমরা যেমন কেবল মাত্র বিদেশীয় 'এসোসিয়েশন' ফুটবল খেলার চর্চ্চাতেই মনঃসংযোগ করিয়াছি, সেইরূপ নৌকা-বাচের বেলাও আমাদের দেশীয় প্রাচীন নৌকা-বাচ প্রণালী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া চেষ্টা চলিতেছে হুবহু বিলাতী প্রথায় ছোট ছোট নৌকায় আট নয় জন করিয়া লোক বসাইয়া দাঁড় টানিয়া নৌকা-বাচ প্রবর্ত্তনের।

পূর্ব্ববঙ্গের নৌকা-বাচ ক্রীড়া

ইহা যে কি মূঢ়তার পরিচায়ক তাহা, যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যময় নৌকা-বাচ ক্রীড়া দেখিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। আমার বাল্যজীবনে আমাদের গ্রামের নদীতে প্রতিবৎসর বিজয়া-দশমীর দিন এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যমণ্ডিত নৌকা-বাচ পদ্ধতি দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল এবং ইহার অনিন্দ্যসুন্দর ছবি স্বর্গলোকের একটি আনন্দময় স্বপ্নের মতই তখন হইতে আমার মানসপটে চিরকালের জন্য চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। ধন্য আমি যে, বাংলার প্রাচীন সংকৃষ্টির ধ্বংসাবশেষের এই অনুপম দৃশ্য দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। বর্ত্তমান বাংলার কয়জন বালক বা প্রৌঢ়ের ইহা দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে? আবার কি আমরা বাংলার প্রাচীন সংকৃষ্টির এই অতুলনীয় অনুষ্ঠানকে তার পূর্ণ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে?

বাংলার নৌকা-বাচের অনুপম দৃশ্য

কল্পনা করুন, একশত হস্ত দীর্ঘ সঙ্কীর্ণপরিসর উন্নতফণা ক্ষিপ্রগতি দীর্ঘকায় ফণিনীর যতই যেন জীবন্ত একটি খোলা নৌকা, —বেগবত্তা, বিজীগিষা ও তেজস্ক্রিয়তার তীব্রতার মূর্ত্ত-প্রতীক-স্বরূপ অতিদীর্ঘ অতিসঙ্কীর্ণ ক্রমোন্নত স্পন্দমান সূচ্যগ্রাকার গগনস্পর্শী অত্যুচ্চ তাহার গলুই, —প্রতি নৌকায় দুই সারি করিয়া প্রতি সারিতে পঁচিশ জন ছোট ছোট বৈঠাধারী সবল মাল্লা, —নৌকার মধ্যভাগে ঢুলী ও করতালবাদক, —গগনারোহী গলুইয়ের উপর সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান পাঁচ জন দীর্ঘ বৈঠাধারী দীর্ঘকায় শুভ্র পরিচ্ছদ-পরিহিত অগ্রচালক, —তাহাদিগের গলদেশ হইতে লম্বমান দীর্ঘ উত্তরীয় বাতাসে উড়িতেছে—নৌকার মধ্যভাগে মন্দিরাকৃতি মণ্ডপের উপর উচ্চ-ধ্বজের নিশান—নৌকার পশ্চাদ্ভাগে শুভ্রবস্ত্রপরিহিত কর্ণধারের পিছনেও আর একটি নিশান বাতাসে উড়িতেছে, —নদীবক্ষে প্রতিবিম্বিত সেই অতি-দীর্ঘকার নৌকার পশ্চাদ্ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া গলুই পর্য্যন্ত আগাগোড়া কৃষ্ণ কাঠের উপর শুভ্র আলিপনার বিচিত্র শোভায় অঙ্কিত মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। নৌকার মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া ঢুলী ঢোল বাজাইতেছে, সারিওয়ালা সারি-গান গাহিতেছে, —পঞ্চাশ জন মাল্লা সারির গানের তালে তালে ক্ষিপ্রগতিতে জলে সজোরে বৈঠা টানিতেছে—প্রতি টানের পর নৌকার পার্শ্বদেশে বৈঠার গোড়া দিয়া আঘাত করিতেছে এবং সারির ধূয়া আবৃত্তি করিতেছে, —বৈঠা-বিক্ষেপের ও বৈঠার আঘাতের তালে তালে ঢোল ও করতালের শব্দ সারির সুরের সঙ্গে মিশিয়া এক অনিবর্চ্চনায় মধুর ঐক্যতানের সৃষ্টি করিতেছে। সারি-গানের ও বৈঠা বিক্ষেপের তালে তালে হালে মাঝি নাচিতেছে, মধ্যভাগে ঢুলী নাচিতেছে, —গলুইতে দীর্ঘকায় অগ্রচালকদের পশ্চাতে তিন জন নাচিয়া

নাচিয়া দীর্ঘ বৈঠা লম্বাটানে টানিতেছে এবং পুরোভাগের দুই জন লম্বা বৈঠা আকাশে উত্তোলন করিয়া নাচিয়া নাচিয়া সারির পুনরাবৃত্তি করিতেছে—এবং থাকিয়া থাকিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকারোহীদের প্রতি আস্ফালন-বাণী বিক্ষেপ করিতেছে। ছোট বৈঠাগুলির লম্বা টানের এবং পঞ্চাশোর্দ্ধ লোকের মুহুর্মুহু সমতালে অগ্রঝোঁকের বেগে প্রসারিত হইয়া প্রত্যেকটি প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকা যেন বিজীগিষার উল্লাসে কাঁপিত কাঁপিতে জীবন্ত তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। আর, নদীর উভয় তীরে লক্ষ লক্ষ লোক নিজ নিজ দলের নৌকাকে উত্তেজিত স্বরে চীৎকার করিয়া উৎসাহিত করিতেছে। সেই উদ্দীপনাময়, গৌরবময় দৃশ্য জীবনে একবার দেখিলে ভুলিবার নয়। একাধারে অনুপম সৌন্দর্য্যময়, নৃত্যময়, আনন্দময় ও বৈচিত্র্যময় পৌরুষ-জলকেলির এই দৃশ্য জগতে অদ্বিতীয়।

বাংলার বিলুপ্ত নৃত্য ও ক্রীড়া সম্পদ

যে বাংলার প্রাচীন সংকৃষ্টির ইহা একটি লুপ্তপ্রায় ধ্বংসাবশেষ মাত্র, সেই বাংলার পল্লীর বিশুদ্ধ সুন্দর জীবনের এইরকম যে কত অমূল্য, অতুলনীয় নৃত্যময় ও আনন্দময় ক্রীড়া-প্রণালী বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত বাঙালীর অন্ধতা ও অবজ্ঞার ফলে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু ইহাদের উপরোক্ত যে অল্প কয়টি সুদূর নিভৃত পল্লীগ্রামে এখনও কোন প্রকারে বাংলার আধুনিক শিক্ষার ও শিক্ষিত সমাজের প্রাণবিধ্বংসী প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া রহিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে নৃত্যের সঙ্গে ক্রীড়ার—বিশেষতঃ পৌরুষাত্মক ক্রীড়ার—কি অনিবর্বচনীয় আনন্দময় সমাবেশ প্রাচীন বাংলার সংকৃষ্টিতে হইয়াছিল।

রাজঘাটের ব্রতনৃত্য

দু-বছর আগের কথা। তখন বাংলার শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে নাচের প্রবর্তন করবার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু যেমন অন্যান্য রসকলার ক্ষেত্রে তেমনি নৃত্যকলার ক্ষেত্রেও বাংলার শিক্ষিত সমাজ আদর্শ খুঁজছিল অন্যপ্রদেশ থেকে এবং অতীত যুগের পুঁথি ও মন্দিরগাত্র থেকে। বিশেষ করে গুজরাট অঞ্চলের গরবা নাচের অনুকরণ করবার তখন খুব একটা হুজুক পড়েছিল। আমি কিন্তু শৈশব থেকেই জানতাম, বাংলাদেশে ভদ্র মেয়েদের মধ্যে এমন নৃত্য এখনও বেঁচে আছে, যা গরবার চেয়ে কোন অংশে কম নয়; এমন কি ভঙ্গীর বলিষ্ঠতার দিক দিয়ে এর স্থান আরও উচ্চে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে আমাদের দেশের ভদ্রসমাজ তখন এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।

বছর-দেড়েক আগে ফরিদপুর জেলার নলিয়া গ্রামে ব্রতনৃত্য ও বিবাহ-নৃত্যের আবিষ্কার করবার সুযোগ আমার হয়েছিল। সে-সম্বন্ধে সচিত্র আলোচনা যখন নানা কাগজে প্রকাশ করেছিলাম তখন বাংলার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে খুব একটা সাড়া পড়ে। শান্তিনিকেতনের স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় মহাশয় এ বিষয়ে আমাকে লিখেছিলেন—"এমন নৃত্য যে আজও আমাদের দেশে আছে তাহা আজ আপনার রচনা হইতে জানিলাম।"

কিন্তু এর অল্পদিন পরেই আর একটি নৃত্য আবিষ্কার করবার সৌভাগ্য আমার হল। যার তুলনায় নলিয়ার নৃত্যও ম্লান হয়ে গেল।

এই নৃত্যটির নাম ঘট-ওলানো নৃত্য। যশোহর জেলায় রাজঘাট অঞ্চলে এখনও এর প্রচলন আছে। রাজঘাট গ্রামটি ভৈরব নদীর কূলে। ঐ গ্রামের কাছাকাছি বুনা নামক স্থানে শীতলা দেবীর একটি বহু প্রাচীন মন্দির আছে। কাছেই একটি বৃহৎ বটগাছের নিচে শীতলাতলা। চারিপাশের ষাট-সত্তর খানা গ্রাম থেকে নানা বয়সের ইতর ভদ্র মেয়ে পুরুষ-দেবীর কাছে পূজা দিতে যায়। গ্রামলক্ষ্মীরা বন্ধ্যাত্ব রোগ (বিশেষ করে "মায়ের অনুগ্রহ" অর্থাৎ বসন্ত রোগ) এবং নানা ব্যাপারের সুফলের জন্য দেবীর কাছে মানত

করেন যেদিন পূজা হবে তার তিন বা পাঁচ কিংবা সাতদিন আগে যে গৃহস্থ মানত করছেন তিনি অধিবাসের আয়োজন করেন। পাড়ার বয়স্কা মেয়েদের এই উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করা হয়। মানতকারিণী সেদিন উপবাসী থাকেন। মেয়েরা সমবেত হলে উলুধ্বনি সহকারে সকলে ঘাটে যান। মানতকারিনী কুলার উপর একটি পিত্তলের ঘট বেখে সেই ঘট ও কুলা মাথায় করে জলে ডুব দেন। ঐ জলভরা ঘট ও কুলা ঘাট থেকে মাথায় করে এনে ঘরের মধ্যে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করেন। জাগরণের সময় সমষ্টি-গীত হয়ে থাকে। প্রথমে হয় বন্দনা গান—

প্রথমে বন্দিলাম আমি শ্রীগুরুর চরণ
আমার মানেক ও ধন আমার আসরে করবে আগমন
তারপরে বন্দিলাম আমি শ্রীহরির চরণ—ইত্যাদি আরও দুটি গানের নমুনা দিচ্ছি—

(১) পদ্মের আসন পদ্মের চাটন*
পদ্মের সিংহাসন
পদ্মের পাতায় জন্ম নিলেন সত্যনারায়ণ।
প্রণামনৃত্য
ঘট কেন নড়ে রে দেবী আসন কেন টলে,
ঐ আসতেছেন মা-শীতলা
এই আসরের পরে॥

(২) ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারে
গোপাল গেলে নন্দের ঘরে
আপন যদি মা ধন হত
ক্ষিদের বেলায় ননী দিত।
কৃষ্ণধন আমার কোলে আয়ে,
আয় রে গোপাল করি কোলে
তাপিত প্রাণ শীতল করি॥
আপন যদি মা ধন হত
ধূলা ঝেড়ে কোলে নিত॥
কৃষ্ণধন আমার কোলে আয়
আয়রে গোপাল করি কোলে
তাপিত প্রাণ মন শীতল করি॥
আপন যদি মা ধন হত
হাতে তুলে বংশী দিত॥ ইত্যাদি

---

* চাটন = চাটাই।

এইরূপে ঘটস্থাপনার পর প্রতিদিন সেই কুলা নিয়ে মেয়েরা বাড়ি-বাড়ি মেঙে (পূজার জন্য চাল পয়সা ইত্যাদি দান সংগ্রহ করে) বেড়ান। মেয়েরা যে বাড়িতে যান বাড়ির গিন্নী সর্ব্বাগ্রে উঠানে একখানা আসন পেতে দেন। ঐ আসনের উপর কুলা ও ঘট নামিয়ে রেখে মেয়েরা তার চারদিকে নানারূপ সুন্দর ভঙ্গিতে নাচতে থাকেন। ঢাকের তালে তালে এই নৃত্য হয়। ঋষি-জাতীয় ব্যক্তিরা ঢাক বাজায়। এই থেকে নৃত্যের নাম "ঘট ওলানো" ("ওলানো" কথাটার অর্থ নামনো)। প্রতিদিন এইরূপ নৃত্য হয়। নৃত্যকারিণীরা নিকটবর্ত্তী তিন-চার গ্রাম অবধি গিয়ে থাকেন। নৃত্যের তৃতীয় বা পঞ্চম দিনে বুনার মন্দিরে ঐ কুলা ও ঘট নিয়ে গিয়ে পূজা দেওয়া হয়।

ধর্ম্মের সঙ্গে এই নৃত্যের মূলতঃ যোগ থাকলেও পল্লীবাসীর দৈনন্দিন জীবনের অনেক ব্যাপার এবং বহু হাসি-তামাসা এই নৃত্যের মধ্যে অতি সহজভাবে রূপায়িত হয়েছে। বন্দনা নৃত্য, প্রণাম নৃত্য, আড়ুয়া নৃত্য, বায়না নৃত্য ও কল্কীদার নৃত্য মূল নাচের অঙ্গীভূত। আনুষঙ্গিক নাচের মধ্যে জোড় নৃত্য, কুচে-মোড়া, পিপড়ে-মারা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হাস্যরসাত্মক নাচের মধ্যে ক্ষুদিরামের মাথাধরা, কুলপা বৈরাগী ডাকা ও তামাক পোড়ান বিশেষভাবে উপভোগ্য। নাচের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকী ও মাঝে মাঝে গান করে থাকে। দুটো গান এখানে দেওয়া হল ঃ—

(১)

ঘোষ গেছে বাথানেরে যশোদা গেছে ঘাটে,
শন্য (১) গোয়াল পায়ে গোপাল ডাকল ননী নোটে (২)
ছড়ি হাতে নন্দরাণী যায় গোপালের পিছে
লম্ফ দিয়ে উঠল গোপাল কদম্বেরি গাছে।
পাতায় পাতায় বেড়ায় কৃষ্ণ ডালে না দেয় পাও,
তলায় থেকে নন্দরাণী কপালে ঘা খায়।
নামারে নামারে গোপাল পেড়ে দিব ফুল
ডাল ভাঙ্গিয়ে তলায় পড়ে মজাবি দুকুল।
বেন্ধো না বেন্ধো না মাগো আর বেন্ধো না এঁটে
তোমার বন্ধনে আমার বুক্ষু (৩) যায়রে ফেটে।
কাল সকালে মাগো আমি মাতুল বাড়ি যাব
হাপনি (৪) বিক্রী হয়ে মা ননীর কড়ি দিব।
রাধিকারে না'য় উঠ্যায়ে কানাইর মনে খুসী
হালির (৫) কাটায় হেলান দিয়ে বাজায় মোহন বাঁশী।।

১. শন্য-শুন্য; ২. নোটে-লুটে; ৩. বুক্ষু-বক্ষ; ৪. হাপনি-আপনি; ৫. হালির-নৌকার হাল।

(২)

পেঁচা নাচে পেঁচি নাচে নাচে পেঁচার মা,
চারি ধারে জুয়োড় (৬) পড়ে মধ্যি কেহ-ই না।
আমার আসন ছাড় মা লও অন্য ঠাঁই।
আর কি বলিব মা তোর শিবের দোহাই।।

এই নাচের সন্ধান পেয়ে আমি নিজে রাজঘাট গ্রামে গিয়ে একদল মেয়ে কলিকাতায় নিয়ে আসি। তাদের অভিভাবকেরা অনুগ্রহ করে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং কয়েকজন সঙ্গেও এসেছিলেন। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে গলষ্টন পার্কে লোকনৃত্য উৎসবে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্মুখে ঐ নৃত্য দেখান হয়। সকলেই এর সৌন্দর্য্যে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিখ্যাত কলাবিদ্ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় এই নৃত্য দেখে আমাকে লিখেছিলেন We are really indebted to you for revealing to us a phase of cultural life of Bengal, of which we had not the slighest idea before you discovered them. আপনার এই আবিষ্কারের পূর্ব্বে বাংলার সংকৃষ্টিগত জীবনের একটা দিকের সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। আপনি সেটি উদঘাটিত করায় আমরা সত্য সত্যই আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।

কিন্তু কেবল সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে নয়, শারীরিক ব্যায়াম হিসাবে এই নৃত্য মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত সকল নৃত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে আমি মনে করি। স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় মহাশয়ও এই উপকারিতা উপলব্ধি করে বাংলার বালিকা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এর প্রচলনের ব্যবস্থা করবার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিলেন।

---

৬. জুয়োড়-জকার।

ভারতীয় বিদ্যালয়ে জননৃত্য ও জনসঙ্গীত

কিছুদিন হইতে কয়েকজন মনীষী বলিয়া আসিতেছেন যে, বাঙ্গালী জাতি হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা যে সম্পূর্ণ সত্য; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু এ বিষয়ে একটা কথা বলিবার আছে এই যে, এই হাস্য অক্ষমতা বা হাস্য বিস্মৃতি কেবল উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালীর মধ্যে দেখা যায়; ইহারা আধুনিক যুগের শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই গঠিত হইয়া থাকেন। বাংলার যাহারা 'নিম্নশ্রেণী' বলিয়া কথিত হয়, তাহাদের সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা বলা যায় না। ইহাদের দৈনন্দিন জীবনে আন্তরিক হাসির খেলা খুবই আছে এবং ইহাদের জীবনে যে আনন্দ আছে তাহার যে অভিব্যক্তি তাহারা করিয়া থাকে, তাহা পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না, বাংলা দেশে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকগণকে সময়ে সময়ে হাসিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা দেঁতো হাসি মাত্র। এরূপ হাসি বায়স্কোপ বা রঙ্গমঞ্চে দেখিতে পাওয়া যায়। সুস্থ ও সবল জাতির দৈনন্দিন জীবনে যেরূপ স্বাভাবিক হাসির ফোয়ারা দেখিতে পাওয়া যায় ইহা সেরূপ স্বাধীন আনন্দময় ও সরল হাসি নয়।

বাঙ্গালা দেশের উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই যে সত্যকার প্রভেদ ইহার জন্য বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী কি কতকটা দায়ী নহে। এই প্রভেদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই ভালর দিকে আছে। আমাদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী এই বিষময় প্রভেদের জন্য কতকটা দায়ী, বঙ্গদেশের স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ত্তমান কালে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে যে অনেক দোষ আছে এবং সেই সকল দোষের যে সংস্কার হওয়া বিশেষ আবশ্যক তাহা সকলেই স্বীকার করেন এবং এ বিষয়টি শিক্ষা বিভাগ সকলের চেয়ে বেশী অনুভব করিতেছেন। সংস্কারের আবশ্যকতা সকলেই বুঝিতেছেন এখন যে সকল সমস্যার মীমাংসা আবশ্যক সেগুলি এই—

▶▶ *গ্রামের ডাক, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩৮*

প্রথমতঃ কোন বিষয়ের সংস্কার করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ এই সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে টাকার আবশ্যক হইবে, তাহা কোথা হইতে আসিবে।

বেশী হাঙ্গামায় না গিয়া সহজে হইতে পারে এরূপ পন্থা বিবেচনা করা যাক কিংবা অন্যায় খরচ না করিয়া সহজে সংস্কার করা যায় এরূপ কি ব্যবস্থা হইতে পারে তাহা দেখা যাক।

বাঙ্গলা তথা ভারতের শিক্ষা লোকের দৈনিক জীবনের সহিত এবং তাহাদের উপার্জ্জনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া যাহাতে হয় তাহা করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বোপরি কথা হইতেছে এই যে, এই অনুপ্রেরণা তাহাদের মধ্যে বিশেষভাব বদ্ধমূল করিয়া দিতে হইবে। যে আনন্দ জীবনের প্রধান অবলম্বন এবং যাহা জীবনকে রক্ষা করে যাহা বিশ্ব জুড়িয়া আছে, যাহা উপনিষদের ঋষিবৃন্দ বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং এই ভারতে ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন—যাহা পরমাত্মার সমতুল্য—সেই আনন্দই জীবনের মধ্যে অনুপ্রাণীত করিতে হইবে।

উপনিষদ্ বলিতেছেন যে, আনন্দ হইতেই সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে। ইহার দ্বারাই সমস্ত প্রাণীই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। আনন্দের দিকে তাহারা ফিরিয়া যায় এবং তাহাতেই লীন হয়। জীবনকে ইহা হইতে বঞ্চিত কর—কোন জাতীর জীবন হইতে এই সর্ব্বময় আনন্দ সরাইয়া ফেল তাহা হইলে দেখিবে প্রাণের উৎস উৎপত্তির মুখেই শুকাইয়া গিয়াছে এবং গতি অবনতির স্তরে নামিয়া পড়িয়া ক্রমশঃ লয়প্রাপ্ত হইতেছে। দেশে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ থাকিলেও ইহার অভাবে জাতি ধ্বংস মুখে পতিত হয়।

ইহা অবিসংবাদী সত্য যে, সম্পদ বৃদ্ধির সহিত এই আনন্দের কোন সম্পর্ক নাই, একথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা তথাকথিত "উচ্চশ্রেণী" এবং "নিম্নশ্রেণী"র মধ্যে পার্থক্য দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এখনও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে আনন্দ আছে তাহা উচ্চশ্রেণীর মধ্যে নাই। সম্পদ থাকিলে আনন্দ থাকে না। অপরপক্ষে যে সব নর-নারী দারিদ্র ও অনশনের সহিত অহরহ যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা তাহাদের জীবনকে আনন্দে ভরপুর করিতে পারে। কারণ এই আনন্দ প্রাচুর্য্য হইতে বা বিষয় ভোগ হইতে উৎপন্ন হয় না। বিশ্বময় যে স্বাধীনতা ও সরলতার গীতি ব্যাপিয়া আছে, সেই আনন্দের উৎস হইতে এই আনন্দের উদ্ভব। এই আনন্দ জীবনের শত দুঃখ কষ্ট অতিক্রম করিয়া পরিস্ফুট হয়।

এই সরল এবং স্বাভাবিক আনন্দের ধারা আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির ভিতর প্রবেশ করাইতে হইবে। তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের—শুধু বাঙ্গলা দেশের কেন সমগ্র ভারতের উচ্চশ্রেণীর লোক পুনরায় বিশ্বের আনন্দের স্পন্দন অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। এই আনন্দই বিশ্বকে কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে স্পন্দিত করিতেছে। ইহা বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা আবিষ্কারের দ্বারা সাধিত হইবে না, কিংবা শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্নের দ্বারাও সাধিত

হইবে না, কিংবা দর্শনের গভীর তত্ত্বালোচনাতে সাধিত হইবে না, ইহা সাধিত হইবে; সৌন্দর্য্য ও তান লয়ের সাধনার দ্বারা—ইহাই প্রাণবন্ত শিক্ষা।

সর্ব্বদেশে সর্ব্বসময়ে প্রাণের আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফুটিয়া ওঠে—নৃত্যের মধ্য দিয়া। প্রাণের পক্ষে নৃত্য অত্যাবশ্যকীয় ইহা জীবনের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত; শিশু যখন মাতৃগর্ভে তখন হইতেই স্বভাবতঃ নাচিয়া থাকে। এবং গোবৎস জন্মাইবার পর মুহূর্ত হইতেই নাচিতে আরম্ভ করে। বস্তুতঃ নৃত্য জীবনের একটা চিহ্ন। যেখানে নৃত্য নাই, সেখানে মৃত্যু আসিয়াছে বলা যায়। গীত সম্বন্ধেও একথা বলা যায়, কিন্তু নৃত্য সম্পর্কে ইহা যতটা প্রযোজ্য, গীত সম্বন্ধে ততটা নহে। কারণ ব্যক্তির জীবনে বা জাতির জীবনে গীতবাদ্য নৃত্য অপেক্ষা অনেক পরে আসিয়া দেখা দেয় সুতরাং যদি কোন জাতি ধর্ম, সমাজ বা কুসংস্কারের প্রভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবন হইতে নৃত্যকে বাদ দেয়, তাহা হইলে সে জাতি মৃত্যুকে আহ্বান করে। বাংলাদেশে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ঠিক এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। জাতিকে মরণের পথ হইতে জীবনের পথে আনিতে হইলে আবার সেই সরল আনন্দময় জীবন ফিরাইয়া আনিতে হইবে, বিশ্বের মুক্ত আনন্দে সহিত জীবনের স্বাধীনতা ও আনন্দের সুর মিলাইয়া ফেলিতে হইবে।

সুতরাং বাংলার যুবক-যুবতীদের মধ্যে নৃত্যের ভাবকে দমন করিয়া রাখিও না। যে নৃত্যের ভাব জীবনকে রক্ষা ও পুষ্ট করে ও যাহা জীবনের প্রতি গতিপথে অজস্র ধারায় বহা উচিত তাহাই আজ আমাদের দেশে কলুষিত হইয়া গিয়াছে—কলুষিত সমাজ ও ধর্ম্মের নীতিই ইহার জন্য দায়ী। সমাজকে এই সকল কলুষতা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। এবং বিশ্বের তানের সহিত ইহার তান মিলাইতে হইবে।

পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশেই শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্ম্মের অপেক্ষা নৃত্য ও গীতকে উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে জাতির জীবনে বল আসে। এবং ইহার ফলে আমরা দেখিতে পাই যে সমগ্র ইউরোপ খণ্ডের প্রত্যেক জাতি আজ তাহাদের স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবক যুবতীদের মধ্যে এই শক্তি জাগাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

প্রত্যেক দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনাবিল নৃত্য গীত কলুষিত হইয়া গিয়াছে, এবং উচ্চশ্রেণীর লোকের অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার দ্বারা তাহা কুপথে পরিচালিত হইয়াছে, কিন্তু দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে ইহার বিশুদ্ধতা এখনও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই কারণেই ইউরোপের সমগ্র দেশে জননৃত্য এবং জনগীত শিক্ষায়তনের মধ্যে জাগাইবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে এবং আমেরিকাতেও এইরূপ আন্দোলন চলিতেছে। ইংলণ্ডে শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রীমণ্ডলীর উৎসাহে ও সাহায্যে জননৃত্য ও জনগীত স্কুল ও কলেজে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে কেবল যে যুবক যুবতীদিগকে এই শিক্ষা দেওয়া হয় তা নয় সকল শ্রেণীর লোককেই এই শিক্ষা দেওয়া হয়। জার্মানীতেও যুব সমিতির যুবক-যুবতীগণ ছুটির সময় দেশ ভ্রমণ করিয়া থাকে, আর সেই সময় তাহারা জননৃত্য ও

জনগীত করিতে থাকে। শিক্ষা বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীরা ইহাকে শিক্ষার অত্যাবশ্যকী বিষয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে যেইরূপ জননৃত্য ও জনগীত আছে। পৃথিবীর কুত্রাপি তেমন আর নাই, কিন্তু এদেশে শিক্ষিত শ্রেণী অন্যান্য দেশের ন্যায় ইহার মূল্য বুঝিতে পারে না। মিথ্যা অহঙ্কার ও আভিজাত্য এ বিষয়ে তাহাদিগকে জনসাধারণের সহিত মিশিতে বাধা দেয়। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই জনসাধারণের মধ্যে এই জননৃত্য ও জনগীতের প্রাচুর্য্য তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এ বিষয়ে যে রূপ আশ্চর্য্যজনক শক্তি, বিশুদ্ধতা ও সরলতা দেখা যায়, অন্য কোন দেশে সে রূপ দেখা যায় না।

আনন্দের কথা এই যে, ভারতবর্ষের শিক্ষা বিভাগগুলি সঙ্গীতকে শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু এখনও এই সকল বিভাগকে বুঝিতে হইবে যে, যে সঙ্গীত দেশের শিক্ষার ধার পরিবর্তন করিয়া দিবে এবং শিক্ষার মধ্যে শক্তি আনিয়া দিবে, তাহা দেশের বহু স্থানে প্রচলিত জননৃত্য এবং জনগীত হইতেই আসা চাই—দেশের লোকের দৈনন্দিন জীবন হইতে ইহার উদ্ভব। যে কোন নৃত্য বা যে কোন সঙ্গীত আমাদের দেশের যুবকদের শিক্ষার উপযোগী নহে। ইহাকে সবর্বতোভাবে উপযোগী করিতে হইলে ইহা সবর্বপ্রকার অস্বাভাবিকতা হইতে মুক্ত থাকা চাই এবং ইহাতে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতাও থাকিবে না এবং তৎসঙ্গে ইহা শক্তিশালী, সুন্দর এবং উদ্দীপনাময় হওয়া চাই, আমরা দেখিতেছি যে এ বিষয়ে সমগ্র ভারতকে শিক্ষা দিবার মত বাংলাদেশে অনেক আছে, আমার বিশ্বাস যে বাংলাদেশে যেরূপ উদ্দীপনাময় সরলতা পূর্ণ, সুন্দর ও বিশুদ্ধ জননৃত্য ও জনগীত আছে, ভারতের আর কোন স্থানে সেরূপ নাই। রবীন্দ্রনাথের জন্ম অন্য প্রদেশে না হইয়া যে বাংলাদেশে হইয়াছে তাহা নিরর্থক নহে। বহুকাল হইতে এই দেশে যে শিল্পকলা, গীত, সৌন্দর্য্য ও তান লয়ের জ্ঞান চলিয়া আসিতেছে, তাহা ভারতের কুত্রাপি নাই—ভারতে কেন, পৃথিবীর আর কোন দেশেও নাই।

শুনা যায় যে, বর্ত্তমান কালে বাংলাদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক পেছনে পড়িয়া আছে। অন্যান্য বিষয়ে হয়ত পিছনে থাকিতে পারে, কিন্তু তান লয়ের জীবন্ত কলায় ইহা সবর্বদাই অগ্রগামী—আর ইহাই জাতির জীবনকে সম্পদশালী ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের পথ—প্রদর্শক হইতে পারে, এবং ইতিপূবের্বই ইহা পথপ্রদর্শক হইয়াছে। কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বর্ত্তমান ভারতের মধ্যে সবর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় সমস্ত বিদ্যালয়েই এই জননৃত্য ও জনগীত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই জেলাটি হইতেছে বীরভূম।

পৃথিবীর মধ্যে যে সকল দেশে জননৃত্য ও জনগীতি প্রচলিত আছে তন্মধ্যে ময়মনসিং জেলার মুসলমান পল্লীবাসীদের জাড়িগান ও নাচ সৌন্দর্য্যে, সরলতায় উদ্দীপনায়, সুর

লয়ে এবং বিশুদ্ধতায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এবং বীরভূম জেলার দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে ও বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার কিয়দংশ এখনও যে রাইবিশে এবং কাটিনাচ প্রচলিত আছে তাহার সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে।

লেখকের আত্মতৃপ্তির বিশেষ কারণ এই যে, তাহার চেষ্টায় এই সকল নাচ এবং জনগীত গত ছয় মাসের মধ্যে খুব উৎসাহের সহিত বীরভূমের অনেক বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

এই সকল নাচের মধ্যে রাইবিশে নাচ উদ্দীপনায়, তেজস্বীতায় এবং মহত্ত্বে খুব উচ্চ স্থান অধিকার করে, গঙ্গারাঢ় এবং পাল রাজাদের আমল হইতে ইহা যুদ্ধের নাচ রূপে প্রচলিত আছে, এবং শিবের তাণ্ডব নাচের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। শিব হইতেছে নটরাজ বা নাচের দেবতা, বীরভূম জেলার স্কুলগুলি ইতিমধ্যেই এ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে, ইহা শিক্ষার একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। ঢোল ও কাঁশির বাজনার সহিত এই রাইবিশে নাচ ছাত্রদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাদের শিক্ষার একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ শোভিত হইবে। শিক্ষক এবং ছাত্রগণ এই নাচ খুব আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। সিউড়ী, সুলতানপুর, নলহাটী এবং লাভপুর স্কুলে ও অন্যান্য স্থানেও এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষক ও ছাত্রগণ তালে তালে ঘুরিয়া ফিরিয়া, হস্ত প্রসারিত করিয়া, বুক ফুলাইয়া মুখে পৌরুষ ভাব ফুটাইয়া তুলিয়া ঢোল ও কাঁশির বাদ্যের সহিত তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতেছে। এই লাভপুর স্কুলই গত ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক এবং উচ্চ জাতির ভদ্রলোক ছাত্রগণ তথাকথিত ঘৃণিত ডোম ও বাউরীদের নিকট হইতে এই ঢোল ও কাঁশি বাদ্য শিখিবার জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতেছে। এই সকল বাদ্যই পুরাকালের যুদ্ধ বাদ্য। এতদিন অনাদৃত ভাবে অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। ইহার জায়গায় এখন হইয়াছে কি? ইহার জায়গায় এখন হইয়াছে স্ত্রীজন সুলভ মিহি সুরের জগাখিচুরী হারমোনিয়ামের বাদ্য।

আনন্দের একটা নতুন অনুপ্রেরণা, সহযোগিতার একটা নতুন ভাব, শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে একটা সখ্যতা এবং দেশের সাধারণ লোকের জীবনে যে একটা শিক্ষা নিহিত আছে তাহারই প্রতি একটা গভীর সহানুভূতি যে জাগিয়া উঠিতেছে। তাহাতে এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনিয়া দিতেছে, এবং এই পুনর্গঠনের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানগণ সমানভাবে উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন।

সুলতানপুর হাইস্কুলের হেডমাষ্টার মহোদয় জানাইয়াছেন যে, রাইবিশে এবং কাটিনাচ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যেন একটা নতুন জীবন আসিয়াছে এবং ছাত্রেরা যেন বিলাতী স্কুলের ভাব গ্রহণ করিয়াছে এবং এদেশের অন্যান্য স্কুলের ছাত্রদের অপেক্ষা তাহাদিগকে যেন আনন্দময় ও সুন্দর দেখায়। এখন বাংলাদেশের ও

ভারতের অন্যান্য স্কুলগুলি এই আদর্শ গ্রহণ করুক। আনন্দের বিষয় এই যে, বীরভূম জেলা বোর্ড ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া অবনত জাতির মধ্য হইতে কতকগুলি অভিজ্ঞ লোককে এই জেলার স্কুলের জন্য রাইবিশে ও কাটিনাচের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন, স্বাস্থ্যের উন্নতির দিক দিয়া দেখিতে গেলেও স্কুল সমূহে নাচের প্রবর্ত্তন খুবই আবশ্যক, বিশেষতঃ রাইবিশে নাচের দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য বেশ সাধিত হয়। এমন সুন্দর এবং বীরত্ব ব্যঞ্জক নাচ পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই এবং ইহার দ্বারা প্রাচীন বঙ্গে সামরিক আদব-কায়দা সুন্দরভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু ইহার আসল বিশেষত্ব এই যে, ইহার দ্বারা বাংলাদেশের এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তথাকথিত শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে যে আনন্দ আনিয়া দিবে, তাহার দ্বারাই জীবনসংগ্রাম জাতি জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে। শিক্ষার দিক দিয়ে দেখিতে গেলে জনগীত এবং নাচ প্রবর্ত্তনের প্রধান উপকারিতা এই যে, ইহার দ্বারা ছাত্রদের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যাইবে। অত্যধিক মস্তিষ্ক চালনার দ্বারা তাহাদের ঐ দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। এই দেশীয় নাচে তাহাদের হৃদয়ের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইতে থাকিবে।

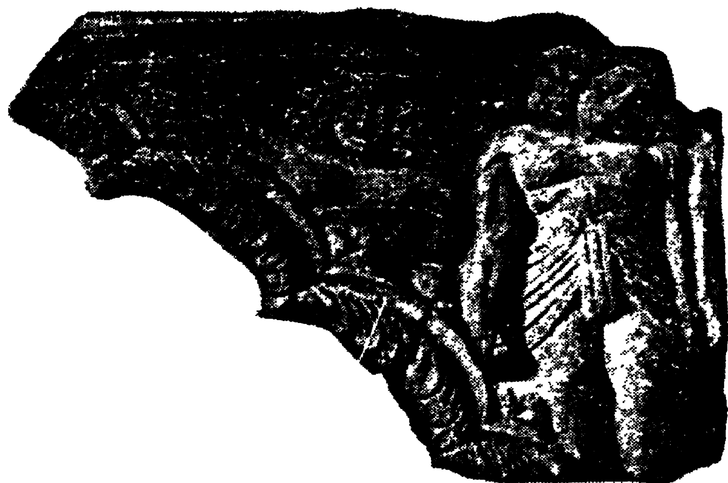
বীরভূম জেলার স্কুল সমূহের শিক্ষকগণ বাংলাদেশের এই নিজস্ব নাচ আগ্রহের সহিত শিক্ষা করিয়া এবং ছাত্রদের সহিত নিজেরাও নাচিয়া এক ভাল দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ইহা বিশেষ সংস্কার, ইহাতে কোন ব্যয় নাই বলিলেই হয়। লেখকের সৌভাগ্যক্রমে তিনি পশ্চিমবঙ্গে এই রাইবিশে ও কাটিনাচ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবং শিক্ষিত সাধারণের সমক্ষে এইগুলি এবং ময়মনসিং-এর সুন্দর জাড়িনৃত্য দেখাইয়া ছিলেন। ইহা যদি সমগ্র বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর স্কুলের শিক্ষকেরা গ্রহণ করেন তাহা হইলে লেখক তাহার শ্রম সফল হইয়াছে জ্ঞান করিবেন। আর শিক্ষকদের কার্য্য পুরাণের ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ন্যায় হইবে, কারণ তাঁহারা শিক্ষার আবদ্ধ ক্ষেত্রে এই জননৃত্য ও জনগীতের বিশুদ্ধ তাময় ও উদ্দীপনাময় প্রবাহ আনয়ন করিয়া দেশের লোকের মধ্যে এক নতুন প্রাণ আনিয়া দিবেন।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য আমি বাংলাদেশের শিক্ষকগণকে অনুরোধ করিতেছি।

গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়া গিয়াছেন—

"বাংলাদেশ আজ যাহা চিন্তা করে, কাল তাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ চিন্তা করিবে।" আজকালকার দিনে একথার সত্যাসত্য বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ যে, নাচ বিষয়ে আজ বাংলাদেশ অগ্রগণ্য—আধ্যাত্মিক তান লয় বিশিষ্ট এবং বিশুদ্ধ আনন্দময় নাচ বাংলাদেশেই আছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এই নাচই অবলম্বন করিবে।

বাংলার পল্লীজীবনের উৎস হইতে আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকুক এবং ভারতে আবার জীবন ফিরিয়া আসুক ও ভারত আনন্দময় হউক।



ইলাম বাজার মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ মাটির ফলকে রায়বেঁশে মূর্ত্তি

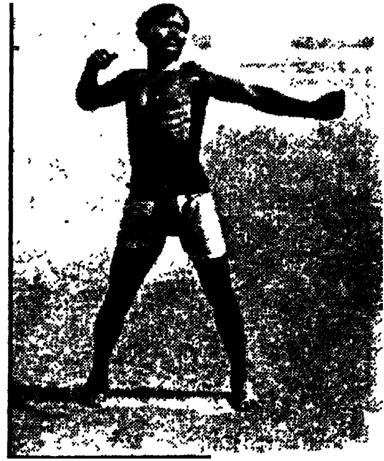


ইলাম বাজার মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ রায়বেঁশে মূর্ত্তির অনুকরণে
রায়বেঁশে উস্তাদ রামপদজী ও কালিপদজী



রায়বেঁশে দল নৃত্যস্থলে এসে দুহাত প্রসারিত করে ঢোলের বোলের তালে ইঃ আঃ ধ্বনি দিচ্ছে





রায়বেঁশে নৃত্যে কেন্দ্রমুখী হয়ে আখিন্ জাখিল্ তালে হাত নাচন

তা... তা... এই বোলের সঙ্গে প্রথমে বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে (হাতের তালু মুখোমুখি) কাঁধ বাঁকিয়ে ডান হাত ক্রমশঃ কাঁধের দিকে টেনে এনে ধনুক ধরার ভঙ্গীতে চলার অবস্থান



"ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনিতা" বোলের সঙ্গে বাঁ পা সামনে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ধনুক ধরার ভঙ্গীতে বৃত্তে এগিয়ে চলা



উর..র খিনাক তাকুর... বোলের সঙ্গে হাত ঘুরিয়ে পায়ে ছোট ছোট লাফ দিয়ে বৃত্তের কেন্দ্রে এগিয়ে যাওয়ার ভঙ্গী



জাখিন ঝাঁ...ঝাঁ...ঝাঁ বোলের সঙ্গে লাফিয়ে শরীর ঘোরান



জাখিন ঝাঁ...ঝাঁ...ঝাঁ বোলের সঙ্গে লাফিয়ে শরীর ঘোরান



তাতাক... তাতাক... বোলের সঙ্গে বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গীতে এগিয়ে যাওয়া



ঘিনাক...তাতাক্... বোলের সঙ্গে বর্শা ছোঁড়ার ভঙ্গীতে দুহাত মাথার উপর তুলে
তালে তালে এগিয়ে যাওয়া



নাচ চলতে চলতে একজন আর একজনের কাঁধে ওঠে।



রায়বেঁশে নৃত্যের ঢুলি



রায়বেঁশে নৃত্যের শেষে শুরু হয় নানা ধরনের কসরৎ



কসরৎ করতে করতে রায়বেঁশেদের নৃত্যস্থল ত্যাগ



"রায়-বাঁশের পরিবর্ত্তে ধরিতে হইল 'রাই-বেশ',— বীরধড়ির পরিবর্ত্তে ঘাগরা"

রবীন্দ্রনাথের পত্র

সুহৃদ্বর,

ইতিপূর্বে একবার বীরভূমে আপনার কৃতিত্বের পরিচয় পেয়েছি। তখন বুঝেছিলাম আপনি দফ্‌তর-দুরন্ত হাকিম মাত্র নন—আইনে-বাঁধা শাসনযন্ত্রের ঘানি ঘুরিয়া যারা পদোন্নতি করে, আপনি সেই আমলা সম্প্রদায়ের দাগা বুলানো গণ্ডীর বাইরে। দেশের যেখানে প্রাণ, পল্লীর সেই মর্ম্মস্থানের প্রতি আপনার দরদ দেখেছি, আপনার শাসনকার্য্য পালনকার্য্যের অন্তর্গত, সেটা যান্ত্রিক নয়, প্রাণবান। দিনে দিনে যারা রোগে মরছে, অন্নাভাবে মরছে, আপনি হিতৈষী বন্ধুর মত নিকটে এসে রোগ নিবারণ, অন্ন উৎপাদন সম্বন্ধে তাদের শক্তিকে উদ্বোধিত করতে চেষ্টা করেছেন। বিধি এবং ব্যবস্থা রক্ষার চেয়ে দেশের প্রাণরক্ষার কাজ অনেক বেশি মূল্যবান। আপনি সেইদিকে মন দিয়ে আপনার পদের মান রক্ষা করেছেন।

বিদেশ থেকে ফিরে এসে আপনার আর একটি যে অধ্যাবসায় দেখলুম তাতে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়েছে। দেশের স্বাস্থ্য এবং অন্নের সংস্থান খুবই জরুরী সন্দেহ নাই—কিন্তু আনন্দের প্রকাশ তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয়। দেশের জনসাধারণ বলতে যাদের বোঝায় সেই পল্লীবাসীরা তাদের নৃত্যগীতে, কাব্যকলায় অজস্র ভাবে প্রাণের আনন্দ প্রকাশ করেছে। মরা নদীর মাঝে মাঝে জলকুমিরের মতো এখনও তার অবশেষ দেখা যায়, কিছু দিনের মধ্যে তা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হবে এমন আশঙ্কা আছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মূঢ়তা তার অন্যতম কারণ। আমরা গ্রন্থ কীট দেশের গভীর প্রাণপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ নেই। আমরা ইংরাজী স্কুলের "ইস্কুল বয়"—সেই জন্য পুঁথির নজির অনুসরণ করে বিদেশীয় শিল্প কলা সম্বন্ধে পণ্ডিতি কবতে আমাদের উৎসাহ, কিন্তু সেই রসবোধ নেই যাতে ঘরের কাছে সাধারণের মধ্যে যেসব সৌন্দর্য্য প্রকাশের উপকরণ

আছে তার যথাযোগ্য মূল্য নিরূপণ করতে পারি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে নৃত্য। সরস্বতীর এই মহদ্দানকে আমাদের ভদ্রসমাজ—অবজ্ঞা করে পেশাদায়ের ঘরে ঠেলে দিয়েছে—জনসাধারণের মধ্যে আড়ালে আবডালে কিছু কিছু আছে সশংকোচে আপনি তাকে অখ্যাতি থেকে মুক্ত করে সর্বজনের মধ্যে তার আসন করে দেবার চেষ্টা করবেন। সকল রকম আনন্দের প্রকাশ মানুষের প্রাণশক্তিকে জাগরূক করে রাখে, মানুষ কেবল অন্নের অভাবে মরে না—আনন্দের অভাবে তার পৌরুষ শুকিয়ে মারা যায়। পাশ্চাত্য মহাদেশে নৃত্যকলা পৌরুষেরই সহচরী। তাই আমি কামনা করি আপনার চেষ্টা ব্যাপক হোক, সার্থক হোক।

২৭ ফাল্গুন
১৩৩৭

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

The Folk Dances of Bengal
নির্বাচিত অনূদিত অংশ

লোকনৃত্যের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

লিভিংস্টোন একটি আকর্ষণীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন যে, বিখ্যাত বান্টুজাতিগোষ্ঠীর একজন আরেকজনের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার সময় একে অপরকে প্রথম প্রশ্নটি করে যে, "আপনি কি ধরনের নাচেন?" এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের দৃষ্টান্ত যে মানবসভ্যতার আদি ইতিহাস জানলে দেখা যায় যে, মানব জাতির জীবন ও ধর্ম জুড়ে রয়েছে নৃত্যকলা। ভালোবাসা ও সামাজিক জীবন যাপনের সবকিছুরই প্রকাশ ঘটেছে নাচের মাধ্যমে। তাই প্রতিটি জাতি ও জাতিগোষ্ঠীর নাচ তাদের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিতে গড়ে উঠেছে। সেই কারণে আমরা দেখতে পাই যে পৃথিবীর সব শিল্পই যা মানুষ চর্চা করেছে তার মধ্যে নাচই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ যার মাধ্যমে প্রতিটি জাতি তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করেছে। এছাড়া নাচের মাধ্যমে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক চেতনার এবং অতীতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের যথাযথ পরিচয় দেয়। নৃত্য হল মৌলিক শিল্প যার মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত শৈল্পিক চেতনার প্রকাশ ও প্রসার ঘটে।

এ তথ্য কেবলি দেশীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা একটি জাতির সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের ওপর ভিত্তি করে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। যে নৃত্য সচেতন ভাবে অনুশীলন ও চর্চা করে পরিবেশিত হয় তার ক্ষেত্রে এ ধারণা প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ নৃতাত্ত্বিক ও জাতিবিজ্ঞানীরা গুরুত্ব দেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে ওঠা লোকনৃত্যের ওপর। আধুনিক মঞ্চে অথবা দরবারে উপস্থাপিত নান্দনিক অনুশীলিত ও পরিশীলিত নৃত্য প্রদর্শনের ওপরে নয়।

শিক্ষিত শ্রেণীদ্বারা উপেক্ষিত ভারতীয় লোকনৃত্য

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে', প্রাচীন ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় নৃত্যের পরিশীলিত কাঠামোর নৃত্যমুদ্রার জটিল ও সূক্ষ্ম কৌশলের বর্ণনা আছে। কেবলমাত্র প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় বিদ্বদ্‌সমাজ নয় এই নাট্যশাস্ত্র সমস্ত বিশ্বের বিদ্বজ্জনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ডঃ আনন্দকুমারস্বামী বলেছেন, বর্তমানে প্রচলিত নৃত্যশিল্পের যে আঙ্গিক আমরা দেখি তা ভারতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত মঞ্চে উপস্থাপিত নৃত্যশৈলির একটি ধারা হিসেবেই অবশিষ্ট রয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তা 'নাট্যশাস্ত্রের ধ্রুপদী ঐতিহ্যের মানের অবনতি হয়েছে'।

মালাবারে প্রচলিত 'কথাকলি' একটি পরিশীলিত নৃত্যকলা। এই নৃত্যশিল্প বিভিন্ন আঙ্গিকের মুদ্রা, মূকাভিনয়ের দিক থেকে এক পেশাগত দক্ষতা অর্জন করেছে। 'কথাকলি' নাচের পোশাক পরিচ্ছদ অত্যন্ত বিস্তৃত ও সুরুচিপূর্ণ। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী অবলম্বনেই কথাকলি নৃত্যাভিনয় প্রযোজিত হয়। জাভায় (যবদ্বীপ) কথাকলি শিল্পীরা বহুবছরের কঠিন পরিশ্রমসাধ্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে পেশাদারি নৈপুণ্য অর্জন করে থাকে।

এই নৃত্যের বৈশিষ্ট্য হল যে মূকাভিনয় ও চিরাচরিত জটিল মুদ্রার মাধ্যমে কাহিনী বর্ণিত হয়, আর এর সঙ্গে সঙ্গীত শিল্পী শ্লোক আবৃত্তি করেন আর ঢোলোকের (drum) মাধ্যমে তাল সঙ্গত করেন। আধুনিক শিল্পানুরাগীদের মধ্যে এ ধরনের শাস্ত্রীয় এবং শ্রমসাধ্য বিশদ নৃত্যসৃজন বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করলেও সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত লোকনৃত্যের প্রতি তাদের সামান্যই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। অথচ এই নৃত্যকলা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও ব্যাপকভাবে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে প্রচলিত। বস্তুত এগুলো হল একটি জাতির আত্মঅভিব্যক্তির শিল্প যা গড়ে উঠেছে তিনটি মহান আদিম আবেগ থেকে, —আচার-অনুষ্ঠান, যুদ্ধ ও নাটক। লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে বছর দশেক আগেও (গ্রন্থের প্রথম খসড়া রচিত হয় ১৯৩৯এ) বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীর ধারণা প্রচলিত ছিল যে বাংলার নিজস্ব এমন কোনো উল্লেখযোগ্য লোকনৃত্য নেই যার দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বলা যায়। ফলে বাঙালী পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই বাংলার বাইরের নৃত্যকলা প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ রকম ধারণা করার অর্থ হল, এটা ধরে নেওয়া যে বাঙালীরা জাতি হিসেবে শিল্পবোধের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া এবং তাদের শিল্প অভিব্যক্তির ক্ষমতা নেই। এর চেয়ে অসত্য আর কিছু হতে পারে না। আসলে বাঙালীরা হল সংবেদনশীল এবং সৃজনধর্মী। তাদের ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনের বিকাশে চিরকালই এবং এখনও গ্রামবাংলার শিল্প হল অত্যন্ত আবশ্যিক ও অপরিহার্য উপাদান।

বাউল ও কীর্তনের সাংস্কৃতিক ও শিল্পগত মূল্য 'শিক্ষিত' শ্রেণীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অথচ এখনও এই দুটি গ্রামবাংলায় সববয়সের পুরুষদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। আরও প্রাচীন যে সব নৃত্যশিল্প গ্রামের নিরক্ষর কিন্তু সংস্কৃতিবান গরিব শ্রেণীর মধ্যে জীবন্ত শৈল্পিক ঐতিহ্য হিসেবে রয়ে গেছে সেগুলো হয় লক্ষ্যই করা হয় না কিংবা যদিও বা হয় তাদের ভাগ্যে জোটে সীমাহীন ঘৃণা ও পরিহাস। শিক্ষিত শ্রেণীর সামাজিক জীবন থেকে নাচ নির্বাসিত হয়েছে বলা যায়। সম্প্রতি কদাচিত্ কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে পেশাদার শিল্পীদের দ্বারা নৃত্য প্রদর্শনী মঞ্চস্থ করা হয়ে থাকে। এ থেকে বোঝা যায় বাংলার শহরাঞ্চলের শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ গ্রামবাংলার মানুষের জীবন ও ভাবনার জগৎ থেকে নিজেদের কতটা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। গ্রামের শুধুমাত্র নিম্নবর্গের নয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্চতম বর্ণের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে ও তাদের কোনো যোগাযোগ নেই।

সৌভাগ্যবশত গ্রামবাংলার মানুষ এখন পর্যন্ত এই শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় এবং বিনোদনমূলক সৃজন কর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে। এই লোকনৃত্যগুলিতে ধরা আছে অসাধারণ গতিবেগ, শোভনতা এবং ছন্দ ভঙ্গিমার অন্তর্লীন বিরল লাবণ্য, সমন্বয় এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ।

লেখকের শৈশবে গ্রামবাংলার লোকনৃত্য-চিত্র

সৌভাগ্যবশত বাংলার লোকনৃত্য সম্বন্ধে আমার নিজস্ব আগ্রহ এবং জ্ঞান শুধুমাত্র পুঁথিগত ছিল না। অবিভক্ত শ্রীহট্ট জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম বীরশ্রীতে আমার ছেলেবেলা কেটেছে। তখনই এবিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আমার মনে গেঁথে আছে। আমাদের গ্রামে তখনও আধুনিক শিক্ষার প্রচলন হয়নি এবং অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি।

সমাজজীবনে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য তখন ও গ্রামের লোকেদের ভেতরে রয়ে গিয়েছিল। আধুনিক জগতে জীবন যাপনে নানাদিক বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা থাকে। কিন্তু আমাদের গ্রামে মানুষের জীবনের কাজকর্ম, খেলাধুলো, পুজোর অনুষ্ঠান শিল্পকর্ম কিংবা ধর্মীয় উৎসব সব কিছুর মধ্যেই পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল। গ্রামের মানুষ আনন্দ করে পরস্পরে মিলেমিশে থাকত। এবং জীবনীশক্তি তারা পেত ধর্মবোধ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা থেকে। আমাদের গ্রামের কমবেশী সব মানুষই জমিদার হিসেবে আমার বাবা ও কাকাকেও দেখেছি, দিনের বেলা লাঙল দিয়ে নিজেদের হাতে জমি চাষ করতে। সন্ধ্যে বেলায় হিন্দু সমাজের সব জাতের ও সব শ্রেণীর মানুষ, ধনী ও দরিদ্র, জমিদার ও প্রজা একসঙ্গে

কীর্তনের আসরে চিরাচরিত প্রথায় লোকনৃত্যে যোগ দিতেন। আমার পিতৃদেব তাঁর দীনতম নিম্নবর্গের প্রজার সঙ্গে শুধু যে নাচে যোগ দিতেন তা নয়, তিনি কীর্তনের সঙ্গে অতি চমৎকার মৃদঙ্গ বাজাতেন। এজন্য কীর্তনের আসরে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধার আসন ছিল। জটিলতার কীর্তনের সুরের সঙ্গে সমান দক্ষতায় তিনি মৃদঙ্গ বাজাতে পারতেন। কীর্তন গায়কেরা আমাদের বাড়ির উঠোনে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে গাইতেন ও নাচতেন। আমার পিতৃদেব কখনো কখনো কীর্তনীয়াদের মাঝখানে উঠোনের উপর শুয়ে গড়াগড়ি দিতেন তাঁর প্রজাদের পায়ে, ধুলো সারা শরীরে মাখবার উদ্দেশ্যে। একাজ তিনি করতেন সম্পূর্ণ সজ্ঞানে আত্ম নিবেদনের প্রেরণায় ও কোনো ঘোরের মধ্যে নয়। শিশু বয়সে আমিও বাবা ও অন্যান্যদের দেখাদেখি মাটিতে গড়াগড়ি দিতাম। তাছাড়া ছিল বাউলের নাচ ও গান। তাতেও আমরা সানন্দে সাধারণ গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দিতাম। মহরমের সময় আমাদের মুসলমান প্রতিবেশীরাও তাদের প্রথামত নাচত। হিন্দুরাও কখনো কখনো মহরমের উৎসবে মুসলিম ভাইদের সঙ্গে যোগ দিত। আমি নিজেও একাধিকবার এই নাচে যোগ দিয়েছিলাম মনে পড়ে। দুর্গোৎসবের সময়ে আমাদের মুসলমান ও হিন্দু প্রজারা সন্ধ্যেবেলা আমাদের পূজাপ্রাঙ্গনে এসে নৌকোবাইচের নৃত্যাভিনয় করত সুপ্রচলিত সারি গানের সুরে। দুধারে কাপড় দিয়ে নকল নৌকো তৈরি করা হত। তার ভিতরে দাঁড়িয়ে দুহাত দিয়ে বৈঠা চালাবার ভঙ্গি করত তারা।

আমার মা গৃহকর্মেই শুধু নিপুণা ছিলেন না, নিজের হাতে কোদাল দিয়ে বাড়ির সব্জির বাগানে কাজ করতে গর্ববোধ করতেন। আমি এবং আমার বোনেরাও সকল শ্রেণীর হিন্দু মহিলাদের সঙ্গে বছরের বিভিন্ন ঋতুতে ব্রতপার্বণে এবং বিয়ের উৎসবে গান ও নাচের আসরে যোগ দিতাম। এই নাচ গানগুলো হত উৎসববাড়ির খোলামেলা উঠোনে। আড়াল দেওয়া নিয়ে কারোর কোন মাথাব্যথা ছিল না। রাস্তা দিয়ে গ্রামবাসীরা যেতে যেতে তা দেখতে পেত। বিশেষ কোন নজর দিত না তারা। ওরা জানত এগুলো হল স্ত্রীআচার নারীজীবনের স্বাভাবিক অংশ। গ্রামের মেয়ে ও পুরুষদের এই সব নাচ ও গান ছিল অত্যন্ত সরল, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবন্ত এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণাময়। ধ্রুপদী বা দরবারি গান ও নাচের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে ধরণের আকর্ষণের কথা জড়িয়ে আছে এইসব লোকগান ও নাচে তার চিহ্নমাত্র থাকে না। গ্রামের কিশোর কিশোরী থেকে শুরু করে বয়স্ক মহিলা ও পুরুষেরাও এই নৃত্যকলাকে জীবনের স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্মেরই অংশ বলে মনে করে। আমার জীবনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণার অনেকটার জন্য আমি ঋণী ছেলেবেলার তাদের সান্নিধ্যলাভের অভিজ্ঞতার কাছে।

এই পরিবেশেই আমার শৈশব ও প্রথম যৌবনের দিনগুলি কেটেছিল। তারপর আমি প্রথমে গেলাম জেলা শহরে এবং পরে এলাম কলকাতায় পড়াশুনোর জন্য।

এখানে এসে আবিষ্কার করলাম যে 'শিক্ষিত' শ্রেণীর লোকেরা এইসব গ্রামীণ লোকগান ও নাচকে বর্বর ও অ-সভ্য সমাজের সৃষ্টি বলে গণ্য করে। দেখা গেল যখনই মানুষ 'শিক্ষিত' হয় তখনই এইসব সহজসরল লোকশিল্পের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এভাবেই একটা গোটা প্রজন্মের মানুষ বড় হয়ে উঠল যারা জানলই না তাদের রাজ্যের মানুষের বলিষ্ঠ, সুন্দর শিল্পের ঐতিহ্যের কথা যা গ্রামের সরল মানুষের মধ্যে এখনও জীবন্ত রয়েছে অথবা তারা এই শিল্পকলার মধ্যে যে আত্মিকমূল্য এবং সৌন্দর্য আছে তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ। নাগরিক শিক্ষা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ক্রমশ অত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত হবার ফলে গ্রামীন সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে একধরণের হীনমন্যতা বোধ সংক্রামিত হল। তারাও ক্রমশ এই সব অস্পৃশ্য প্রাচীন লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য বর্জন করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রধানত গ্রামের দরিদ্র এবং তুলনামূলক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মধ্যেই তার অবশিষ্ট থেকে যায়।

একারণেই শহরে আমি যে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছি তা আমাদের দেশের গ্রামের চিরায়ত নৃত্যকলা ও সঙ্গীতকে ভালবাসতে শেখায়নি। এমনকি এই শিল্পকলার তাৎপর্য ও ইতিহাস সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসাও জাগেনি আমার মনে। এবং যে হীনমন্যতার কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি আমার অবচেতন মনে তাই সংক্রামিত হতে থাকে। আমি যখন ১৯০৫ সালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দিই, ততদিনে আমার দেশের প্রাচীনসংস্কৃতি ও লোকসঙ্গীত ও নৃত্যকলার গুরুত্বের দিক থেকে আমার দৃষ্টি সম্পূর্ণ সরে গেছে। অথচ ছেলেবেলায় এই সব লোকনৃত্য ও গানে বাবার সঙ্গে আমি যোগ দিয়েছি। কিন্তু তখন এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ আমার আর ছিল না।

ভারতীয় লোকনৃত্য আন্দোলনের উৎস ও ব্রতচারী আন্দোলন

সেটা হল ১৯২৮ সালের শীতকাল। চতুর্থবারের জন্য ইংলণ্ডে গেছি। সে সময়ে আমার ইংলিশ লোকনৃত্য সমিতির সঙ্গে যুক্ত হবার সৌভাগ্য হয় এবং লণ্ডনের এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত সারা ইংল্যণ্ড লোকনৃত্যোৎসব দেখবার সুযোগ হয়। এই অনুষ্ঠান দেখে আমি উপলব্ধি করতে পারি আধুনিক ইংল্যাণ্ড গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জাতীয় লোকনৃত্যের পুনরুজ্জীবন কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ এবং এই ব্যাপারে কতটা উচ্চমূল্য দেয় তা দেখে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হই। আমার তখন মনে পড়ে যায় যে ছেলেবেলায় এবং যুবা বয়সে আমার দেশের লোকনৃত্যে আমার অংশগ্রহণের কথা ইংরেজদের লোকনৃত্য উৎসব দেখতে দেখতে আমি ঠিক করে ফেলি যে দেশে ফিরে গিয়ে এমনি একটা লোকনৃত্য আন্দোলন শুরু করব। দেশে ফিরে আমি ১৯২৯ সালের হেমন্ত কালে ময়মনসিংহ জেলার শাসক হিসেবে কাজে যোগ দিই। সেখানে

মুসলমান গ্রামবাসীদের মধ্যে অত্যন্ত প্রচলিত আশ্চর্য সুন্দর জারি নৃত্য আমার নজরে আসে। তখন আমি বাউল ও জারি নৃত্য পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন শুরু করতে কাজে লেগে গেলাম। এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করলাম ময়মনসিংহ লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত সমিতি। তার কিছুদিন পরেই আমি বীরভূম জেলায় বদলি হয়ে যাই জেলা শাসক রূপে। সেখানে গিয়ে আমার সৌভাগ্য হয় প্রাচীন বাংলার জীবন্ত ঐতিহ্য রায়বেঁশে রণনৃত্য এবং কাঠিনৃত্য আবিষ্কার করার। আমার দেখার সুযোগ হয় প্রাচীনবাংলার পটচিত্র, কাঠ খোদাই স্থাপত্য নিদর্শন ও পোড়ামাটির মতো মূল্যবান লোকশিল্পকলার জীবন্ত ঐতিহ্য। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে আমি বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি সংগঠিত করি। তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু বাংলার লোকনৃত্য এবং লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সে বিষয়ে গবেষণাই নয়, তার পাশাপাশি বাংলার লোকশিল্পের ও সংরক্ষণ ও নিয়মিত অনুশীলনের উৎসাহ দান। সমিতির সভাপতি হিসেবে আমি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লোকশিল্প ও লোকনৃত্যের ধারা আবিষ্কার করে সে বিষয়ে গবেষণার কাজ শুরু করে দিলাম। আমি অর্ন্তদৃষ্টিতে বুঝতে পারলাম যে, আমাদের শহুরে জীবনের ভাসা ভাসা শিক্ষা এবং ভারতীয় সম্পদ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই এতদিন তা আমার চোখ অন্ধ করে রেখেছিল। অবশেষে আমার দৃষ্টি খুলে গেল।

প্রতিটি নাচ দেখবার এবং প্রতিটি গান শোনবার সময় তাদের অন্তর্নিহিত ভাব ও অর্থ ক্রমশ আমার কাছে পরিস্ফুট হতে লাগল। আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে গ্রাম বাংলায় বেঁচে থাকা এই নাচ ও গানের মধ্যেই শত শতাব্দী ধরে সংরক্ষিত রয়েছে বাংলার মানুষের জীবনবোধ, ব্যক্তিত্ব ও ছন্দচেতনার সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য। আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে এই লোকনৃত্যগুলি শুধু সুরুচিকর অঙ্গসঞ্চালন বা বিনোদনই নয় এতে রয়েছে নৈতিক, সামাজিক ও নান্দনিক প্রক্রিয়া, পূর্বপুরুষ পরম্পরা ও জাতিগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের সংহত প্রকাশ লোককথার শিকড় যা প্রাচীনকালের সঙ্গে একালের মানুষের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। এগুলিতে রয়েছে এমন তথ্যের উপাদান এবং নায়কের কথা যারা তার জাতি গোষ্ঠীকে সংহত করেছে এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে রূপ দিয়েছে। তারাই হল ইতিহাসের অবশিষ্ট বাড়তি উপাদান যা অস্পষ্ট আকারে সক্রিয় পদ্ধতিতে বর্ণিত।

বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতির উদ্যোগে এবং বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় আমি ১৯৩২ সাল থেকে শুরু করে প্রতি বছরেই স্কুল শিক্ষক ও অন্যান্যদের নিয়ে বাংলার লোকনৃত্য ও লোকক্রীড়া সম্পর্কে শিক্ষাশিবির প্রবর্তন করি। ১৯৩৩ সালে আমার উদ্যোগেই দিল্লিতে লোকনৃত্যসমিতি এবং আমার সভাপতিত্বে সারা ভারত লোকনৃত্য সমিতি গঠিত হয়। তাতে কেন্দ্রিয় আইনসভার বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণও সদস্য হিসেবে যোগ দেন। ১৯৩৪ সালে বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি বাংলার ব্রতচারী সমিতির সঙ্গে মিশে যায়। লোকনৃত্য আন্দোলনও ব্রতচারী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ব্রতচারী আন্দোলন পরিণত হয়, নবজীবনের আন্দোলন রূপে।

তার লক্ষ্য লোকনৃত্যের ও লোকসঙ্গীতের পরিসীমা ছাড়িয়ে নাগরিকতা, সমাজসেবা, কাজ ও আনন্দ এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রীভাবনায় প্রসারিত হয়।

ব্রতচারী আন্দোলনে বাংলার কয়েকটি লোকনৃত্য যেমন রায়বেঁশে, ঢালি ও কাঠিনাচ অপরিবর্তিত অবস্থাতেই তার চিরাচরিত গান ও নাচের আদল সহ গ্রহণ করা হয়। অন্যান্য লোকনৃত্য যেমন জারি, বাউল এবং কীর্তনের মৌলিক নাচের পদ্ধতি ও তার সুরগুলিকে এমনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে যাতে দেশের সকল সম্প্রদায়ের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয় এবং কোন জনগোষ্ঠীকেই ধর্মীয় আবেগ যাতে ক্ষুন্ন না হয়। যে সমস্ত নাচে জাদু বা কুসংস্কারের উপাদান আছে কিংবা যে নাচ স্পষ্টতই ধর্মীয় সেগুলোকে একই কারণে ব্রতচারী আন্দোলনের বাইরে রাখা হয়েছিল।

বর্তমান গ্রন্থের পরিধি

বর্তমান গ্রন্থটিতে আমি চেষ্টা করেছি যে সমস্ত নাচ এখনও গোঁড়া চিরাচরিত-রীতি-অনুযায়ী যাদের মধ্যে অনুশীলিত হয় তার পূর্ণ বিবরণ দিতে। রায়বেঁশে বা ঢালি রণনৃত্যের সঙ্গে কোনও গান বা স্তোত্র আবৃত্তি করা হয় না। তাদের নামকরণ থেকেই বোঝা যায় তাদের উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কী তার উদ্দেশ্য, বাংলা সাহিত্যে তার উল্লেখ এবং চিরাচরিত রীতির যা এখনও টিকে আছে সেগুলি থেকে এই নৃত্যের নামকরণের সার্থকতা বোঝা যায়। অন্যান্য নাচে অপরিহার্যভাবেই গান এবং বিভিন্ন স্তোত্র বা মন্ত্রোচ্চারণ সহযোগে পরিবেশিত হয়। এই সব গান, স্তোত্র বা মন্ত্রের মধ্যেই নাচের নামকরণ ও উদ্দেশ্য বর্ণিত রয়েছে। যে জন্যই আমি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে সব গান ও স্তোত্র নাচগুলিকে ধরে রেখে তার তর্জমা করে দিয়েছি।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে মেয়েদের ব্রত ও বরণ নাচ এবং চড়ক, গম্ভীরা, ধর্মপূজা এবং মনসা ভাসানের মিছিল নৃত্য ছাড়া অন্য কোনও নাচ যা এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে তাদের পরিবেশনা বা উৎস ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নয়।

বাংলার লোকনৃত্যে কোনো অনুকরণীয় জাদুর উপাদান নেই। বাংলার আদিবাসীদের নাচ থেকে তা সম্পূর্ণ আলাদা। এমনকি কোরাদের চেইন—ঝুমুর, আদিবাসী জনগোষ্ঠী থেকে যার উদ্ভব সেখানেও পুরো নাচটাই সামাজিক প্রেরণায় নির্মিত তাতে অনুকরণীয় জাদুর কোনো উপাদান নেই।

বাংলার লোকনৃত্যের শ্রেণীবিভাগ

বাংলার বিভিন্ন লোকনৃত্যের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও গবেষণার বিষয়। এ নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগও করা যায়। নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ বাংলার বিভিন্ন

লোকনৃত্যের পারস্পরিক বিশিষ্টতা এবং তাদের মূল প্রতিবাদ্য নিরূপণে সহায়তা করবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে একদিকে নাচের প্রেরণা ও অন্যদিকে তার আরেক বিষয়ের বৈশিষ্ট্য দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও এটাও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যে বিভিন্ন শ্রেণীর নাচ যা এখনও প্রচলিত তাদের সাধারণ কাঠামো ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেবার সময় একথা বলা বোধহয় ঠিক হবে যে ৩ থেকে ১১ পর্যন্ত যে নাচগুলি গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো প্রত্যক্ষভাবেই ধর্মীয় প্রেরণায় সৃষ্ট। ২নং গোষ্ঠীতে উল্লিখিত ধামাইল নাচ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

১. যুদ্ধ-প্রেরণা

প্রাচীন গ্রীস দেশের মতো ভারতেও বলিষ্ঠ নৃত্যের প্রচলন ছিল সৈনিকদের শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের অঙ্গ হিসেবে। রায়বেঁশে এবং ঢালি নৃত্যও ছিল প্রাচীনকালের রণনৃত্য। বাংলা সাহিত্যে তার উল্লেখ থেকে এবং নামকরণ থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায়। এই নাচগুলির প্রেরণা আসে সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দেবার প্রয়োজন থেকে। এই দুটি নাচের উপাদানের মধ্যে রয়েছে শারীরিক কসরৎ, নকল যুদ্ধের মহড়া এবং সামরিক শৃঙ্খলার বিবর্তন।

২. খেলার প্রেরণা

এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় প্রধানত কাঠি, লাঠি, ঝুমুর এবং ধামাইল নাচ। তার সঙ্গে উল্লেখ করা যায় ব্রত ও বিবাহ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ছোটখাটো নাচগুলির কথা। এই নাচগুলির প্রধান প্রেরণা খেলার আনন্দ হলেও এদের প্রত্যেকটির বিষয়বস্তু ও উপাদানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিভিন্ন ধরণের লাঠি নৃত্যের মূল প্রেরণা হল খেলা। স্বভাবতই এদের উপকরণ হল নকল যুদ্ধের মহড়া এবং শরীরচর্চা। কাঠি নাচের উপাদানে রয়েছে গোষ্ঠী সংহতি এবং সামাজিক অভিব্যক্তি। এর সঙ্গে যে গান গাওয়া হয় এবং যেভাবে ঘুরে ঘুরে নাচবার সময় একজন আরেকজনের সঙ্গে অবিরত শারীরিক স্পর্শ বজায় রাখে তা থেকেই এটা বোঝা যায়। কাঠি নাচের মতোই কোরা-ঝুমুর নাচের মধ্যেও রয়েছে গোষ্ঠি সংহতি এবং ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি। এ ধারণা স্পষ্ট হয় শুধুমাত্র শেকলের আকারে অবিরাম নাচের মধ্যেই নয়, তার সঙ্গে যে গান গাওয়া হয় তার ভাবনার প্রকাশ থেকেও।

ধামাইল হল মেয়েদের যৌথ নৃত্য। এতে শুধু ক্রীড়া কৌতুকের আনন্দই একমাত্র প্রেরণা নয়। তার বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে গভীরতর ব্যাঞ্জনা কৃষ্ণ ভাবনার আধ্যাত্মিক প্রেমানুভূতির। গানগুলিতেই তা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। ব্রত ও বিবাহের নাচে খেলাচ্ছলে কিছু সাধারণ মূকাভিনয় থাকে যেমন ধান রোয়া, ধান তোলা, ধান ভানা এবং কুল কুড়ানো নাচ। এগুলোতে অবশ্যই রয়েছে খেলা ও আনন্দ। এতে নানারকম গ্রামীণ

ক্রিয়াকলাপ এবং কৌতুক হাস্যের বিষয়বস্তুও থাকে। অন্যান্য ছোটখাটো নাচের মধ্যে কুচে মোড়া, জোড় নাচ প্রভৃতিতে রয়েছে শারীরিক কসরৎ, খেলা ও আনন্দ প্রেরণা।

৩. ক. আনুষ্ঠানিক অভিবাদন, বরদান ও বর প্রার্থনার প্রেরণা

এই গোষ্ঠীতে পড়ে বরণ ও আরতি নৃত্য।

বরণ নৃত্য হল পুষ্পাঞ্জলি এবং অনুষ্ঠান উপলক্ষে অন্যান্য শুভ উপহার প্রদান। বরণ নৃত্যের মতোই আরতি নৃত্যেরও প্রেরণা হল বিগ্রহের পূজা তাছাড়া এতে রয়েছে তাল ও ছন্দের সঙ্গে সাযুজ্য বোধ।

৩. খ. আদর্শ সিদ্ধিলাভ ও পরিপূর্ণ আত্মঅভিব্যক্তির প্রেরণা

ব্রত নৃত্যগুলি এই শ্রেণীতে পড়ে। দু-রকম প্রেরণা থেকে এই নাচের অনুষ্ঠান হয়।

(ক) কোনো একটা মনোবাঞ্ছা পূরণের আকাঙ্খা।

(খ) উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আত্মসংযম পালন। কোনো আদর্শ বা আকাঙ্খা সব সময়েই ব্যক্ত করা হয় দেহ ও মনে ও আত্মার সুসংহত শৃঙ্খলাবোধ উপাদানের মাধ্যমে। তার প্রেরণা হল বিশ্বের সঙ্গে সানন্দ একাত্মবোধ।

ব্রত ও নৃত্যের উপাদান হল কোনও ফল বা বাসনার সিদ্ধিলাভের জন্য সারাদিন উপবাস এবং গান ও নাচের মাধ্যমে কোন বিশ্রাম গ্রহণ না করে আত্মসংযম পালন। বর প্রার্থনা করা হয় কোনো বিগ্রহের বা প্রকৃতির শক্তির কাছে।

৪. সামাজিক কল্যাণ ও শুভ কামনার প্রেরণা

এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হল বিবাহোৎসবে মেয়েদের নাচ। এর বিষয় উপাদান নির্ভর করে বিবাহ উৎসবের নির্দিষ্ট কোনও অনুষ্ঠানের ওপর যার জন্য এই নাচ গ্রামের মেয়েরা করে থাকেন।

৫. আনন্দময় অন্তর্মিলনের প্রেরণা

এই শ্রেণীর নাচের মধ্যে পড়ে বাউল এবং মুর্শেদি নৃত্য। উভয় নাচেরই প্রেরণা হল নিজের মধ্যে অসীম অন্তরাত্মার সঙ্গে আনন্দময় মিলন। বহিরাত্মা এবং অন্তরাত্মার মধ্যে রূপকাকারে নানাবিধ সম্পর্ক অর্থাৎ সীমিত ও অসীম সত্তার সম্পর্ক এতে পরিবেশিত হয়।

৬. আত্মনিবেদন ও আত্মশুদ্ধির প্রেরণা

কীর্তন নাচ এই শ্রেণীতে পড়ে। রূপক আকারে জীবন কীভাবে পরিবেশিত হয় তার ওপর নির্ভর করে কীর্তনের বিষয়বস্তু। কীর্তনে ইহজীবনের সঙ্গে নিরাসক্ত জীবন যাপনের বৃহত্তর প্রেরণার সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়। এর লক্ষ্য হল গৃহী হিসেবে সংসারধর্ম পালন করেও অন্তরের মুক্তি সাধন।

৭. নীতিশিক্ষাদানের প্রেরণা

এই শ্রেণীর নাচের মধ্যে পড়ে বিভিন্ন পালাগানের নৃত্য যেমন রামায়ণ, সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, পদ্মপুরাণ, গাজীর গান, মানিকপীর, শ্লোক, বোলান এবং বাঁশী। এর উদ্দেশ্য হল এই গাথাকাব্যে বর্ণিত ধর্মের বিভিন্ন দিক প্রচার করা। প্রতিটি নাচের বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয় নাচের সঙ্গে পরিবেশিত গানের মাধ্যমে। নাচিয়েরাই এই গান গেয়ে থাকে।

৮. স্মরণানুষ্ঠানের প্রেরণা

এই শ্রেণীর নাচের অন্তর্ভুক্ত হল জারি এবং দধি নাচ। জারি নাচের উদ্দেশ্য হল কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসেনের লড়াই ও মৃত্যু বরণের ঐতিহাসিক কাহিনী স্মরণ। নাচের বিষয় হল সঙ্গীতের মাধ্যমে কারবালার করুণ কাহিনী বর্ণনা ও তার জন্য শোকপ্রকাশ। জারি নৃত্যের ভঙ্গি হল পূর্ববাংলার নৌকোর মাঝিরা যেমনভাবে নৌকো চালায় মাটির ওপরে তারই অনুকরণ। দধি বা দই নাচ করা হয় জন্মাষ্টমী উৎসবের সময়। কৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষেই এই স্মরণোৎসব।

৯. ব্যাখ্যামূলক উপস্থাপনার প্রেরণা

এই শ্রেণীর নাচ হল মুখোস নৃত্য। এই নাচের নিহিতার্থ হল শৈব ও শক্তি সাধনার মহা জাগতিক দর্শনের নিগূঢ় ভাবনা ঈশ্বরের ওপর মানাত্ব আরোগ করে নৃত্যের আঙ্গিকে পরিবেশন। প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজমান অনন্ত অসীমের আনন্দময় রূপ ও এই নৃত্য প্রদর্শনে প্রেরণা।

১০. শারীরিক সুস্থতা প্রমাণের প্রেরণা

ধর্মপূজা এবং চড়ক-গম্ভীরা নৃত্যগুলি এই পর্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ। এই নাচগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ হল পূণ্যার্থী ভক্ত পূজারীরা নানাবিধ শারীরিক কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে নিজেদের নির্ভীকতা ও শারীরিক যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করায় ক্ষমতা অর্জন করে। এর দ্বারা ইষ্ট দেবতার উপযুক্ত ভক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

১১. দেবদেবীকে তুষ্ট করার প্রেরণা

মনসা ভাসান উপলক্ষে মিছিল নৃত্য এই শ্রেণীতে পড়ে। এই নাচের উদ্দেশ্য হল সাপের দেবী মনসাকে তুষ্ট করা।

বাংলার মাটি লোকনৃত্যের সমৃদ্ধির অনুকূল

বাংলার লোকনৃত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল তার বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা। দৈহিক কামনা বাসনার কোনো ইঙ্গিত নাচের ভাব ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। রাজসভার নৃত্য, মন্দিরে উপাসনার নৃত্য বা মঞ্চের নৃত্যকলা যা প্রাচীন ভারতে রাজদরবারে এবং আরও পরিশীলিত সংস্কৃতি অনুরাগী মহলে প্রচলিত ছিল বাংলায় বিশেষত পাল, সেন রাজাদের আমলে

তাই চর্চার অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। প্রথমত পাল ও সেন রাজত্বের পতনের পর বাংলায় এমন কোনো রাজসভার অস্তিত্ব ছিল না যারা বাংলার নাচের ঘরানা রীতি প্রবর্তন করতে পারে। বস্তুত একাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বাংলায় ছোট ছোট সামন্তরাই শাসন করত। সুতরাং তারা নিজেরাও নিজের দেশের গ্রামীণ মানুষের সংস্কৃতি উপভোগ করত। এমন কোনো রাজকীয় সংস্কৃতি তাদের ছিল না যা গ্রামের জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায়। দ্বিতীয়ত উল্লিখিত সময়ে বাংলায় বৈষ্ণবদের আখড়া ও মঠ ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠিত ধর্মাবলম্বীদের কোনো মন্দির ছিল না। ফলত বাংলায় দেবদাসী বা মন্দিরের নৃত্যশিল্পী প্রথা বাংলার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল।

এমনকি উত্তর ভারতের শহরগুলি থেকে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে বাইজির নাচ এবং খেমটা নাচের আমদানি করা হলেও বাংলার পরিবেশে তা খাপ খায়নি। বাংলার মানুষের কাছে তা কখনই জনপ্রিয় বিনোদন রূপে গৃহীত হয়নি।

তৃতীয়ত, প্রাচীন ভারতে ধ্রুপদী নৃত্যও বাংলার মাটিতে তেমন সমাদরের জায়গা পায়নি বলে মনে হয়। বাংলার নৃত্য প্রথাসিদ্ধ-ধ্রুপদী মুদ্রা বর্জিত। প্রাচীন ভারতের ধ্রুপদী নৃত্যকলার ভিত্তি হল সূক্ষ্ম পরিশীলিত নৃত্যভঙ্গিমা।

এ কারণেই বাংলা এবং ভারতের আরও কয়েকটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে লোকনৃত্য চর্চার অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে। বিশিষ্ট গবেষক স্ট্যানলি হলের মতে, এই লোকনৃত্যগুলি ধীরে ধীরে বহুশত সহস্র বছরে গড়ে উঠে জাতির অন্তরের অভিব্যক্তি পরিণত হয়েছে, প্রকাশের উপযুক্ত শিল্পরূপে। এই নৃত্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে জাতির অতীত স্মৃতির উপাদান তার মনস্তাত্ত্বিক বিশিষ্টতার লক্ষণ এবং আশা আকাঙ্খা। এই উপকরণগুলি দিয়েই নির্মিত শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান। এতেই জনমানসের প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়েছে যাদের দ্বারা এই শিল্পকলার উন্নয়ন এবং যার ফলে তাদেরও শিল্পবোধের উত্তরণ ঘটেছে।

অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় যে, এই লোকনৃত্যগুলি আসলে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত নৃত্যকলার বিকৃত রূপ কিনা। এ বিষয়ে বলা যায় যে ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় নিঃসন্দেহে ওপরতলার সংস্কৃতি পরিশ্রুত হয়ে নিচের তলায় এসেছে তেমনি নিচের তলার সংস্কৃতিও ওপর তলায় পৌঁছেছে তা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীন সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত যে বাংলার লোকনৃত্য এবং তার অন্তর্নিহিত প্রেরণা মূলত সাধারণ মানুষের সৃষ্টি। অভিজাত শ্রেণীর সংস্কৃতি থেকে তা সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রখ্যাত সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ কর্ণেল টি. মি. হডসন এবং ড. এ. কে. কুমার স্বামীও এই অভিমত সমর্থন করেন। তাঁদের মতে আদিম সংস্কৃতির গর্ভ থেকেই উচ্চতর সংস্কৃতির সৃষ্টি। লোকনৃত্যের নিজস্ব আকর্ষণ তো আছেই। উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর নৃত্যের উপাদানও তার কাছ থেকেই পাওয়া।

বাংলার রণনৃত্যের প্রকৃতি ও তার উৎস

রায়বেঁশে এবং ঢালি লোকনৃত্য প্রাচীন রণনৃত্যের উদ্দীপক ভাব কিছুটা ধরে রেখেছে। এই নাচগুলিতে সামরিক তেজ শৃঙ্খলা এবং এতে যে সামরিক উদ্দীপনা তৈরি হয় তা বিস্ময়জনক। শিল্পীদের বলিষ্ঠ পুরুষোচিত অঙ্গসঞ্চালন এবং মাদলের উদ্দীপক বোল অত্যন্ত ভীরুদের মনে ও সাহসিকতা ও নির্ভীকতা জাগিয়ে তোলে। এতে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রমাণ হয়। বাঙালীদের অসামরিক জাতিগোষ্ঠী বলে মনে করা হয়। এই নাচগুলি মনে করিয়ে দেয় যে তারা একসময়ে সামরিক শক্তির জন্য বিখ্যাত ছিল এবং সামরিক পেশায় তারা যুক্ত ছিল। মেগাস্থেনিস, টলেমি, প্লিনি ও কুইনটাস কার্টিয়াসের লেখায় জানা যায় যে আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের সময়ে দক্ষিণ পশ্চি ম ও মধ্য বাংলায় গঙ্গারিডি নামে একটি শক্তিশালী সামরিক জাতির বাস ছিল। তাদের বসতির বিস্তার ছিল বাংলার উত্তর ও উত্তরপশ্চিম থেকে গঙ্গার মোহানা পর্যন্ত। এই প্রাচীন অঞ্চ লের অধিবাসীদের সামরিক ঐতিহ্য, উত্তরপশ্চিমের আজকের বর্ধমান, বীরভূম এবং বাঁকুড়া জেলায় পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ আকারেই বর্তমান ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। এই রণবিদ্যার অবশিষ্ট নমুনাই মনে হয় রায়বেঁশে নাচ এবং তার শারীরিক কসরৎ। মধ্যযুগে বর্শাধারী রায়বেঁশে সৈন্যরাই সম্ভবত সমাজের সকল শ্রেণী থেকে সংগৃহীত হত। তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে উচ্চতর শ্রেণী সদগোপও ছিল। এই যোদ্ধৃজাতি এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের গোপালভূমে রাজত্ব করত। নিম্নবঙ্গের ঢালি যোদ্ধাদের মতো উচ্চতর জাতের পুরুষ যারা রায়বেঁশে যোদ্ধাদের দলে যোগ দিত তারা সামরিক চর্চা থেকে তখনই বিরত হল যখন তাদে: আর সৈনিক হিসেবে গ্রহণ করা হত না। কিন্তু দরিদ্র জাতির লোকেরা জীবিকাহিসাবে প্রাচীন রণনৃত্য রায়বেঁশের প্রচলন বাঁচিয়ে রেখে ছিল বলে মনে হয়। বিবাহ উপলক্ষে যে শোভাযাত্রা বেরত তাদের রক্ষী হিসেবে যেত এবং নাচ ও মল্লক্রীড়া কসরৎ প্রদর্শন করত।

একইভাবে মেয়েদের ব্রত নৃত্য উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা ছেড়ে দেওয়ায় নিম্নবর্গের লোকেরাই পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে। পাল রাজা এবং সেন রাজাদের প্রথম যুগে বাঙালীর সামরিক শক্তি ছিল সুবিদিত। ইতিহাসের ছাত্ররা তা জানেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙালি সামন্ত নৃপতিরা প্রায়শই স্থানীয় ভাবে জোর করে সৈন্যদলে লোক এবং পাইক সংগ্রহ করত। নিজেদের মধ্যে বিরোধ মেটাতেই শুধু নয়, মোগল সম্রাটের সৈন্যদের বিরুদ্ধে ও তাদের কাজে লাগানো হত। মোগল সম্রাটগণ মাঝে মাঝেই এই সমস্ত নৃপতিদের দমন করার জন্য সেনাভিযান চালাত। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাবহিনীতে বহু সংখ্যক স্থানীয় সৈনিক ছিল। এদের মধ্যে নিশ্চিতই রায়বেঁশে ও ঢালি

যোদ্ধারা ছিল। বীরভূমের তাঁতিপাড়া ও গোহলিয়ারীর রায়বেঁশে নাচিয়েরা ঘাটোয়াল বা নদীর ঘাট রক্ষী নামেও পরিচিত। এরা নিশ্চিতই রাজনগরের মুসলমান রাজাদের সেনাদের উত্তর পুরুষ। এই সেনারা পলাশি যুদ্ধের অনেক পরেও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল। তাদের বসতি ছিল রাজনগরের রাজাদের রাজধানীর বহুবিস্তৃতট পাঁচিলের অন্যতম প্রধান ফটকের পাশে।

ব্রত নৃত্যে ব্যবহৃত ছড়ায় দেখা যায় মেয়েরা বাণিজ্যযাত্রা থেকে স্বামী, পিতা ও ভাইদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা করছে।

বিবাহিতা রমণীরা প্রার্থনা করছে তাদের যেন যুদ্ধের দরুণ বৈধব্যদশা না ঘটে। এগুলি হল তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষী যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে বাণিজ্য অভিযান ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনা প্রচলিত ছিল।

ভারতের একটা প্রাচীন ঐতিহ্য হল যে নৃত্যকলা হল একজন সৈনিকের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ। এ হল শৌর্যেরই সহচর। এই ধারণা অন্তত ঋগ্বেদের সময় থেকে চলে আসছে। ঋগ্বেদের শ্লোকে মহাযোদ্ধা ইন্দ্র বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে নর্তক এবং গায়ক হিসেবে। একইভাবে উল্লেখ আছে তার প্রধান সহচর অশ্বিনীদ্বয় সম্পর্কেও। এই প্রথা পরবর্তী যুগেও প্রচলিত ছিল। তার সাক্ষ্য মেলে যখন মহাভারতের প্রধান যোদ্ধা অর্জুনকে ছদ্মবেশে একজন সুদক্ষ নৃত্যশিল্পীরূপে বাস করতে দেখা যায় একজন নৃত্য শিক্ষক হিসেবে।

বাংলার লোকনৃত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

বাংলার লোকনৃত্যের বৈশিষ্ট্য হল তার বলিষ্ঠতা তাতে বিগলিত কমনীয়তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাতে পাওয়া যাবে না ইন্দ্রিয় সুখকর সঙ্গীতের আবেদন যা পাওয়া যায় তথাকথিত প্রাচ্য বা ওরিয়েন্টাল নৃত্যে এবং বাইজি নাচে কিংবা প্রাচীন ভারতের রাজসভা বা মঞ্চ নৃত্যে। তার যন্ত্রানুষঙ্গে, এমনকি মেয়েদের নাচেও থাকে জোরালো মাদল। কোথাও সেতার বা এস্রাজ জাতীয় নরম বাজনা ব্যবহার করা হয় না। এমন কি সবচেয়ে নরম যে বাংলার লোকনৃত্য মেয়েদের ও বিবাহিতা রমনীদের ব্রতনৃত্যের সঙ্গেও বাজে ঢাক। তেজোদৃপ্ত বলিষ্ঠতা এই বাজনার বৈশিষ্ট্য তাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কমনীয়তার ইঙ্গিত নেই কোথাও।

বাংলার লোকনৃত্যের একটি আকর্ষণীয় দিক হল নারী ও পুরুষের নৃত্যে তাদের দেহের উপযোগী করে অঙ্গসঞ্চালনা রীতি। পুরুষের ক্ষেত্রে তাদের শরীরের ঊর্ধ্বাংশ বিশেষ করে বুক ও হাতের ভঙ্গিমার ওপর জোর দেওয়া হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে দেহের নিম্নাংশ, তলপেট ও শ্রেণী ব্যবহারই প্রাধান্য পায়। শিক্ষিতশ্রেণী এই চিরায়ত গ্রামীণ নৃত্য প্রদর্শন তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন থেকে বাদ দেওয়ায় জাতিব প্রভূত ক্ষতি

হয়েছে। জাতির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে, বিশেষত মেয়েদের! প্রসবকালীন মেয়েদের মৃত্যুর সংখ্যা বিপজ্জনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নাচ বর্জন করার আগেকার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রাচিন গ্রীসের সঙ্গে ভারতীয় গ্রামীণ জনজীবনে নৃত্যকলাশিল্পের তুলনামূলক অবস্থান

বলা হয়ে থাকে যে গ্রীসের ডরিন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের সমগ্র রাজনৈতিক, সামরিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মূলে ছিল নাচ এবং গান। অনুরূপভাবে সত্যতার সঙ্গে একথাও বলা যায় বাংলার রাজনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই শুধু নয় তার সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূলেও ছিল নৃত্য ও সংগীত শিল্প। তবে গ্রীস দেশে উচ্চতর শ্রেণীর নাগরিকদের মতো নয়, বাংলার জনসাধারণ এমনকি উচ্চতম বর্ণের লোকেরাও ছিলেন কৃষিজীবী এবং কারুশিল্পী। সেজন্যই বাংলার লোকনৃত্যে এক লোকগানে আমরা শুধু আধ্যাত্মিক ভাবনা বা রণশৈলীর অভিব্যক্তিই লক্ষ্য করি না তাতে পাওয়া যায় তাদের কর্মনিষ্ঠা এবং সামাজিক সৌভ্রাত্যেরও প্রকাশ।

বাংলার গ্রামীণ জীবনে নৃত্য ও সঙ্গীতের সামগ্রিক ভূমিকা প্রসঙ্গে একটি তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে বঙ্গসংস্কৃতিতে রূপায়িত হয়েছে ভারতীয় জীবনদর্শন যার মূল প্রতিপাদ্য (প্রাচীন গ্রীসের চেয়েও যার আবেদন গভীরতর) হল নৃত্যকলা ও সঙ্গীত জীবনের মৌল শিল্প এবং মানবীয় আবেদন পূর্ণ শিক্ষার ভিত্তি।

ভর্তৃহরির নীতি শতক গ্রন্থের একটি সুবিখ্যাত শ্লোকে নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রতি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় শাস্ত্রে সঙ্গীতের তিনটি উপাদান কণ্ঠসঙ্গীত যন্ত্রবাদন এবং নৃত্য। প্রাচীন গ্রীসে সঙ্গীত বলতে শুধু কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতই বোঝাত। নৃত্য ছিল শারীরিক ক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত। ভর্তৃহরি বলেছেন—

সঙ্গীত-সাহিত্য-কলা বিহীনঃ সাক্ষাৎ পশুঃপুচ্ছবিষান-হীনঃ।

সঙ্গীত এবং সাহিত্যকলা বিষয়ে যার জ্ঞান নেই সে লেজ ও শিং বর্জিত সাক্ষাৎ পশুমাত্র। এখানে সাহিত্য বলতে আজকের বাণিজ্যিক যুগের মতো শুধু পড়া ও লেখার দক্ষতাই বোঝাত না, তার দ্বারা বোঝান হত জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়, জাতীয় গাথাকাব্য অবৃত্তি এবং তার তাৎপর্য অনুধাবন করার ক্ষমতা।

আমরা তাই লক্ষ্য করি যে প্রাচীন ভারতীয় মান অনুযায়ী মানুষের মৌলিক শিক্ষা যা মানুষ ও পশুর পার্থক্য বোঝায় তার অন্তর্ভুক্ত ছিল কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্যকলায় পারদর্শিতা অর্জন এবং জাতির মৌখিক ও লিখিত সাহিত্যের আবৃত্তি ও তার তাৎপর্য গ্রহণ করার ক্ষমতা। এই নীতির ওপরেই গড়ে উঠে ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয়

শিক্ষাপদ্ধতি। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা আরও প্রসারিত ছিল। তারা কণ্ঠসঙ্গীত ও নৃত্যকলা এবং করতালের মতো সহজ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে পারদর্শিতা অর্জন ছাড়াও মেঝেতে আলপনা দেওয়া এবং মাটির পুতুল তৈরিতেও দক্ষতা অর্জন করত। ব্রত অনুষ্ঠানে এ সমস্ত শিক্ষাই মেয়েদের কাজে লাগাত। হিন্দুসমাজের সকল শ্রেণীর মেয়েরাই এই শিক্ষা গ্রহণ করত। সংক্ষেপে বলতে গেলে গোঁড়া ভারতীয় সারাজীবনকেই একটা শিল্প বলে ভেবেছে। তার লক্ষ্য ছিল প্রত্যেকটি ছেলে ও মেয়েকে এবং বয়স্ক নরনারীকে ও ছোটবেলা থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত পরিপূর্ণ শিল্পী হিসেবে গড়ে ওঠার শিক্ষা দেওয়া যাতে তারা নিজেদের যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে।

এর সঙ্গে একটি গভীরতর নীতিও জড়িত ছিল। ভারতীয় দর্শন অনুসারে সমস্ত প্রাণসত্তারই উদ্ভব আনন্দ থেকে, আনন্দেই তারা বেঁচে থাকে এবং পরিণামে আনন্দেই তারা ফিরে যায়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আনন্দই একমাত্র প্রকৃত সত্তা। আনন্দস্বরূপ অসীম অনন্ত শক্তি হল নিখুঁত সুর, ছন্দ ও আনন্দেরই অপর নাম। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রমতে ঈশ্বর হলেন এমন এক শক্তি যিনি সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন। শিব, শক্তি ও কৃষ্ণভাবনার ও উপাদান হল এটাই। আধ্যাত্মিক প্রেরণায় নৃত্য ও গীত হল নিজেকে উন্নততর স্তরে এবং একই সঙ্গে উন্নততম সত্তার সঙ্গে মিলনের উপায়। এই মৌলিক সত্য সমস্ত আদিম সমাজের মানুষই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। হ্যাভলক এলিসের মতানুসারে এই বোধই পৃথিবীর সমস্ত ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি।

গ্রামবাংলায় এই সত্যের বাস্তব রূপায়নের ধারা এবং আত্মিক প্রকাশভঙ্গি চলে আসছে সভ্যতার উন্নত স্তর পর্যন্ত। এর ফলে জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে যা আজও বজায় আছে।

বাংলার লোকনৃত্যের একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল যে এই নাচে বিশেষ ধরণের কোনও পোশাকের প্রয়োজন হয় না। এর জন্য অংশত দায়ী বাংলার উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া যার ফলে নাচের সময়ে বিশদ পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা অস্বাস্থ্যকর। তার চেয়েও বড় কারণ হল বাংলার লোকশিল্পীদের সরল সাদাসিধে জীবনযাত্রা বাংলার লোকশিল্পকে দিয়েছে নিরাভরণ সৌন্দর্য।

বস্তুত গ্রামবাংলার লোকশিল্পের সর্বত্রই আমরা লক্ষ্য করি প্রধানত সোজাসুজি প্রকাশের ভঙ্গি। আনুষ্ঠানিক উপাদান অথবা অলংকারের ওপর নির্ভরতা খুব কম। বাংলার লোকনৃত্যের ভাবাদর্শ সে কারণেই মালাবারের কথাকলি এবং প্রাচীন হিন্দু রাজসভায় বা মঞ্চে প্রদর্শিত নৃত্যকলার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সব নাচে জাঁকজমক পূর্ণ বিশদ পোষাক পরিচ্ছদ এবং অলংকার ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটমঞ্চে র দার্শনিক নৃত্যকলার জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকপরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে বাংলার মুখোস নৃত্যের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। এই লোকনৃত্যে মুখোস এবং পোশাক ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেগুলো ও

খুবই সাদাসিধে ধরণের। বাংলার লোকনৃত্যে প্রথাসিদ্ধ কোনও মুদ্রা বা অঙ্গভঙ্গির সম্পূর্ণ অনুপস্থিত একে দিয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের বিশিষ্ঠতা। এই নাচ সম্পূর্ণ কৃত্রিমতা বর্জিত। বাউলদের আলখাল্লা সম্পর্কেও একথা খাটে। গেরুয়া রঙের এই পোশাক সস্তা সাধারণ কাপড়ে তৈরি। এতে কোনো অলংকরণও থাকে না।

বাংলার লোকনৃত্যের আসর জমে সাধারণত খোলা আকাশের নিচে বাড়ির উঠোনে অথবা গ্রামের মাঠে। এছাড়াও প্রত্যেক গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ ব্যক্তির বাড়ির গৃহদেবতার মন্দিরের সামনে নাটমঞ্চ বা নৃত্যশালা নির্মাণ করা নিজেকে সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেন। বৈষ্ণবরা একে বলেন নাটমন্দির, শাক্তরা একে বলেন নাটমন্দির অথবা চণ্ডীমণ্ডপ। শৈব সম্প্রদায়ের লোকেদের কাছে উত্তরবঙ্গে এর পরিচিতি গম্ভীরা হিসেবে। সম্প্রদায়ের সকলের সহযোগিতায় তা গড়ে ওঠে।

মেয়েদের নাচের জায়গা হল খোলা উঠোন। তাদের নাচের প্রেরণা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার অনুষ্ঠান।

লোকনৃত্যের সুস্পষ্ট গণতান্ত্রিক ভিত্তি রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল গ্রামীন সমাজের পুরুষ ও নারীদের মধ্যে সংহতি, একতা এবং সহযোগিতা গড়ে তোলা।

ধর্মপূজা ও চড়ক গম্ভীরা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পশ্চাদপদ শ্রেণীর লোকেদের মধ্যেই প্রচলিত। এর মধ্যে রয়েছে জাদুর ওপর বিশ্বাস এবং অনুরূপ ক্রিয়াকর্ম। ভক্তিবাদ থেকে উৎসারিত বাউল ও কীর্তন নৃত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত এই পদ্ধতি ব্রতানুষ্ঠান ও নৃত্যের মতো প্রকৃতি নির্ভর উৎসবের সঙ্গেও তা মেলে না। গ্রাম বাংলার হিন্দুসংস্কৃতির উচ্চস্তরের প্রতিনিধিত্ব করে এই সব অনুষ্ঠান যার মূল প্রেরণা হল করুণাময় অনন্তশক্তির ওপর সানন্দ বিশ্বাস ও নির্ভরতা।

গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি এবং চাষবাসের •.মৃদ্ধি নিঃসন্দেহে এর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে। আধুনিক বণিজ্যিক সভ্য জগতের প্রতিযোগিতামূলক ও শোষণমূলক মনোভাবের ফলে গ্রামীন অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে যার ফলে কাজ ও আনন্দের মধ্যে সরল জীবনযাপন করা বিনষ্ট হয়ে গেছে। মধ্যযুগের চীনের সমাজজীবন সম্পর্কে হ্যাভলক এলিস যা বলেছেন তা সঠিকভাবেই আমাদের এই গ্রামীণ সংস্কৃতি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সরল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এখনও তা টিকে রয়েছে।

হ্যাভলক এলিস উপরোক্ত প্রসঙ্গে বলেছেন, এদের সভ্যতা এত সুন্দর এবং পরিশীলিত, এতো মানবিক এত শান্তিপূর্ণ এবং আনন্দময়, এত সুশৃঙ্খল এবং সানন্দে দেশের সমস্ত অধিবাসীর সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে যে আমরা বলতে পারি এখানেই মানুষের অভীষ্ট নাগরিক সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌছেছে।

চীনের সভ্যতা প্রসঁঙ্গে বার্ট্রান্ড রাসেলের বক্তব্য ও বাংলার লোকসভ্যতা সম্পর্কে সমানভাবেই প্রযোজ্য।

রাসেল বলেছেন ঃ জীবন সম্পর্কে শিশুসুলভ অথচ গভীর দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম দিয়েছে আবেগের মুক্তি এবং তার উপভোগ। তার ফলে পাশ্চাত্যের চরম নিষ্ঠুরতার পরও এদের জীবন শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময়।

গ্রামবাংলায় অতি সাম্প্রতিককালেও মানুষের গোটাজীবন এবং তার নীতিবোধও ছিল শিল্প দ্বারা উজ্জীবিত। শিল্পকলার এই সার্বিক উপস্থিতি প্রকাশ পেত ক্ষুদ্রতম আসবাবপত্রে এবং জীবনের চলার ছন্দে বিশেষত নারীদের।

চীনের মতোই বাংলার জনসাধারণও গোটা মানবজীবনই একটা শিল্প এই সত্যের বাস্তব রূপায়ণের দ্বারা নিজেদের সভ্যতাকে ইতিহাসের হাজার নিঠুর উত্থান পতনের পরও রক্ষা করতে পেরেছে। চীনের সঙ্গে ভারতের সভ্যতার নিকট সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় প্রকৃতির প্রতি চীনের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বাংলার ব্রত নৃত্যকলার সাদৃশ্য থেকে। বাংলার মেয়েদের এই ব্রত নৃত্যের ভিত্তি হল প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে ও সাহিত্যেও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট। শান্তিনিকেতনে ১৯২৯ সালের অগাস্ট মাসে, বৃক্ষরোপণ উৎসবে কবি এই তাৎপর্যপূর্ণ কথা উচ্চারণ করেছিলেন। লরেন্স বিনিয়ন একে বলেছেন কবি শিল্পী ও দার্শনিকদের মনের লোকগ্রাহ্য বিশ্বাস প্রবণতা যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে একটি দৃষ্টিভঙ্গির অতুলনীয় সম্পূর্ণতা এবং এই বিশ্বে মানুষের কী স্থান সে বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত উপলব্ধি এবং মনুষ্যজীবনের সঙ্গে তার বাইরের জীবজগতের সম্পর্ক নির্ণয় পাশ্চাত্যে কখনও তা ছিল না। য়ুরোপীয় শিল্পকলার ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পর্যন্ত দেখা যেত মানুষ তার নিজের কাজকর্ম ও আশা আকাঙ্খা নিয়েই একাগ্র চিত্ত। তার বাইরে যে জীবন তার সঙ্গে সম্পর্করহিত। পরবর্তী যুগে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বৌদ্ধিক কৌতুহলবশত স্বাভাবিক সমবেদনাবশত নয় সে অনুধাবন করতে লাগল অন্তর্বর্তী যে জগৎ (মানুষের এবং তার সত্তার বহির্ভূত দূরবর্ত্তী বিশ্বের গভীরতর রহস্য) তার বিষয়।

জীবনের প্রতি ভারত ও চীনের যে সমধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি তার সঙ্গে য়ুরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি বৈপরীত্য লরেন্স বিনিয়ন (Lawrence Binyon) তার চীন সভ্যতা বিষয়ে রচনায় নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

চীনারা কিন্তু সেই অন্তর্বর্তী জগতের জীবনের সঙ্গে কখনো সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। তারা ক্রমশ তা আরও বেশিমাত্রায় আবিষ্কার করেছে। য়ুরোপীয়দের মতো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা থেকে না হলেও তারা যেন বা বিশ্বনাগরিক হিসেবেই তা করেছে। ফলত শুধু শিকারের জন্তুই নয়, পাখি, কীটপতঙ্গ এবং তাকেও ছাড়িয়ে যাকে আমরা অপ্রাণের জগৎ বলি সেটাও তাদের প্রাণময় বিশ্ব চেতনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে জীবনের চরম লক্ষ্য হল সেই অনন্তশক্তির সঙ্গে দেহ ও মনের সাঙ্গীকরণ যাকে বলা হয়েছে পরম ছন্দ, পরম সমন্বয় ও আনন্দের আধার। বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণ ও হরি, বাউলদের মনের মানুষ, মোর্শেদের প্রেমিক হল সেই পরম অনন্ত শক্তিরই অন্য নাম। ভারতীয় এবং বঙ্গসংস্কৃতির অন্বিষ্ট হল এটাই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র জীবনই সেই অনন্তের অন্বেষণে এক সর্বাঙ্গীন শিল্পে পরিণত হয়। এভাবে সমস্ত জীবন ভক্তিবাদে আপ্লুত হয়ে পড়ে। সমন্বয়ী ও সর্বগ্রহিষ্ণু বাঙালি মানসে এবং দক্ষিণের তামিল অঞ্চলে ও শিবও শক্তির আরাধনা ভক্তিবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। এ সমস্ত আরাধনা পদ্ধতিই একই পরিবারে বিভিন্ন ঋতু উৎসবের মাধ্যমে পালিত হয় সারা বছর।

সেই অনন্তরূপ হল মানুষেরই উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর সত্তা। বাংলার শৈব উপাসনা হল যোগী ও সংসারী মানুষের দেবতায়ন আসক্তি ও নিরাসক্তির সমাহার। বাংলার শক্তি উপাসনাও হল আত্মার শক্তি ও দৈহিক শক্তির ওপর দেবত্ব আরোপ। কৃষ্ণ ভাবনায় নিহিত রয়েছে ছন্দ, সঙ্গীত, নৃত্য, রাঘলিয়া জীবন আত্মিক ও দৈহিক শক্তির দেবানুভূতির প্রকাশ।

সে কারণেই কাজ, খেলা এবং উপাসনা সবই ছিল একটি সরল কিন্তু গভীর জীবন দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

বাংলার হিন্দু সমাজের নর নারীদের মধ্যে এটা ছিল বাতাসে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের মতো সহজ ও স্বাভাবিক।

এই বইয়ে আমি বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্গত বাংলা ভাষীদের লোকনৃত্য নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। সে জন্যই বাংলার পূর্বাঞ্চলে গারো এবং হাজং এবং পশ্চিমাঞ্চলে সাঁওতাল আদিবাসী জনগোষ্ঠির নৃত্যকলা বিষয়ে আলোচনা এতে স্থান পায়নি।

এটা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ যা জাতিবিজ্ঞানী (ethnologist) এবং নৃবিজ্ঞানীদের (anthropologist) অনুসন্ধান যোগ্য যে একমাত্র কোরাদের শেকল ঝুমুর (chain jhumur) ছাড়া যার সঙ্গে ছোটনাগপুরের কোল, মুণ্ডা ও ওরাঁও জনগোষ্ঠীর নাচের সাদৃশ্য আছে, আর কোনো বাংলার লোকনৃত্যের সঙ্গে এইসব জনগোষ্ঠীর নাচের মিল নেই।

রায়বেঁশে, ঢালি, জারি, কীর্তন এবং ব্রতনৃত্যের মধ্যে রয়েছে একটা জটিল কাঠামো যার সঙ্গে রয়েছে একটা জটিল সঙ্গীতের কাঠামো। এতে পাওয়া যায় একটা সুনির্দিষ্ট নৃত্যগীত এবং স্বর বৈচিত্র্য যার সৃষ্টি একই উৎস থেকে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নাচে এমন ধরণের কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। তার নৃত্যের গতি একঘেঁয়ে এবং একই ছন্দের পুনরাবৃত্তি। তার মধ্যেও কোনো জটিল নৃত্য ছন্দ কাঠামো নেই।

বাংলার সন্নিহিত মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর নাচ যেমন মণিপুরীদের যারা বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও মানসিকতা অনুগামী, নেপালের অধিবাসী যারা শাক্তুতন্ত্র অবলম্বন করেছে এবং তিব্বতীরা যারা বাংলা থেকেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের নাচের সঙ্গে বাংলার লোকনৃত্যের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যের বিস্তারিত আলোচনার স্থান এই গ্রন্থের পরিধির বাইরে।

যুদ্ধ নৃত্য ঃ ঢালি নৃত্য

ঢালি নৃত্যের নাম থেকেই বোঝা যায় এটি হল একটি রণনৃত্য। ঢাল অর্থ বর্ম। প্রাচীন বাংলার রাজাদের ঢালধারী সৈন্যদলের নৃত্য হল এটি। এই সাহসী যোদ্ধারা দক্ষিণ বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সামন্ত নৃপতিদের অধীনে কাজ করত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই যোদ্ধাদের সাহসিকতার কথা অনেক উল্লেখ আছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার বারো ভুইঞাঁর অন্যতম যশোহরের প্রতাপাদিত্যের ঢালি সৈন্যদের খ্যাতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঢাল শব্দটা সংস্কৃত। সুতরাং ঢালিনৃত্য প্রাক-মুসলিম প্রাচীন যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। মুসলমান রাজত্বের সময়ে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় থেকেই ঢালি যোদ্ধা সংগ্রহ করা হত। ঢালিরাই প্রতাপাদিত্যের সেনাবাহিনীর প্রধান অংশ ছিল। কথিত আছে যে তাঁর ৫২০০০ হাজার ঢালি যোদ্ধা ছিল। ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল কাব্যে একজন নৃপতির উল্লেখ আছে যার সেনাবহিনীতে ছিল ১৬ হালকাস (ব্রিগেড) গজারোহী সৈন্য, ১০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৫২ হাজার ঢালিসৈন্য এবং যুদ্ধের উপযোগী বহু সুসজ্জিত নৌবহর। ঢালিযোদ্ধার বাঁহাতে থাকত ঢাল এবং ডানহাতে বর্শা।

ঢালের ঢাকনাটা তৈরি হত বেতের ঝুড়ি ও গণ্ডারের চামড়া দিয়ে। সে সময়ে যশোহর ও খুলনার দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর গণ্ডার পাওয়া যেত। এখানেই ছিল প্রতাপাদিত্যের রাজত্ব। সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্য থেকেই ঢালি সংগ্রহ করা হত। ব্রাহ্মণরাও যোগ দিত।

ঢালি সেনানীদের বংশধরেরা এখনও ঢালি পদবী দ্বারা পরিচিত। যশোহর ও খুলনা জেলায় এখনও অনেক ঢালি পরিবার আছে। বৃটিশরা ক্ষমতা লাভের পর ঢালি সৈন্য সংগ্রহ বন্ধ হয়ে যায়। ঢালিরা সামরিক পেশা হারায়। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ঢালিদের বংশধররা যে এখনও ঐতিহ্যপূর্ণ রণনৃত্য এবং সামরিক শারীরিক কসরৎ দেখানোর প্রথা প্রচলিত রেখেছেন সেটা আমার জানা ছিল না। ১৯৩২ সালে যশোহর জেলার রাজঘাট গ্রামে গিয়ে একটি মুসলিম ঢালিনৃত্যের দলকে আমি আবিষ্কার করি।

নাচিয়েদের অস্ত্রশস্ত্র

ঢালিরা এখন আর সত্যিকারের সামরিক বর্শা অথবা গণ্ডারের চামড়া দিয়ে তৈরি ঢাল ব্যবহার করে না। ঢাল এখনও কোনো কোনো ঢালি পরিবারে পুরুষানুক্রমে পাওয়া সম্পত্তি হিসেবে রক্ষা করা হয়। আসল ঢালের পরিবর্তে এই নাচিয়েরা বেতের বা বাঁশের তৈরি ঢাল ব্যবহার করে। বেতের তৈরি ঢালগুলো খুবই শক্ত ও টেঁকসই। এদের পরিধি আট থেকে আঠারো ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। এক পায়ে থাকে পেতলের পাহজোর ছোট্ট ঘুঙুর লাগানো। নাচিয়েরা ছাড়া সঙ্গে থাকে একজন বা তার বেশি ঢোলবাদক যারা যুদ্ধের দামামা বাজায়। একজন কাঁসি বাজায়। নাচিয়েরা বিশেষ ধরণের কোনো পোশাক পরে না। কোমরে শক্ত করে বাঁধা ধুতি, খালি গা। অবশ্য সব জায়গায় একই রকম পোশাক পরা হয় না। কোথাও কোথাও হাতকাটা কুর্তা এবং সবুজরঙের কাপড়ের কোমরবন্ধ পরতে দেখা যায়।

ঢালিদের নাচের সময় সর্বত্র একই রকম পোশাক না পরার কারণ হল মল্লক্রীড়ায় আনন্দ পাবার জন্য তাদের নাচের চাহিদা কমে যাচ্ছে।

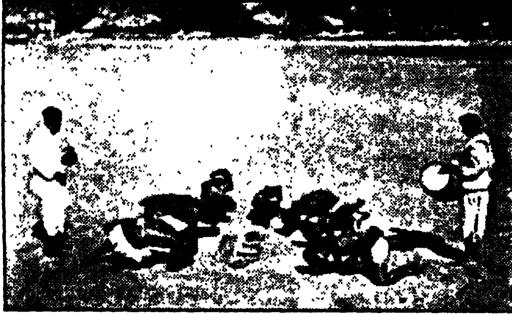
এখন এই নাচ দেখানো হয় সাধারণত মহরম উপলক্ষে কিংবা কোনো বিবাহ উৎসবে। পশ্চিমবঙ্গে রায়বেঁশে নাচিয়ের দলের মতো ঢালিদেরও মধ্যবাংলার কোনো কোনো জেলায় ডাকা হয় বিয়ের সময় বরযাত্রীদের কনের বাড়িতে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যাতে মাঝপথে কোনো ডাকাতের আক্রমন থেকে তাদের রক্ষা করা যায়। ঢালি নাচিয়েরা আসে মুসলমান এবং নমঃশূদ্র শ্রেণী থেকে।

প্রাথমিক অনুষ্ঠান ও রণধ্বনি

নৃত্যশিল্পী দলের নেতা প্রথমে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায় ডান পায়ের গোড়ালির ওপর এমনভাবে ভর দিয়ে যে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়াবার সময় গোড়ালির চাপে অনুষ্ঠানপ্রাঙ্গনের খানিকটা মাটি উঠে আসে। সে তক্ষুনি তাড়াতাড়ি সেই মাটি বাঁ হাতে তুলে নিয়ে জাদুমন্ত্রোচ্চারণ করে যাতে তার দলের কোনো অনিষ্ট না হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে বা শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে তাদের জয় সুনিশ্চিত হয়। তারপর সে তার দলের অন্যান্যদের জন্য অপেক্ষা করে। তারাও একে একে ঢাল ও লাঠি হাতে নিয়ে নৃত্যপ্রাঙ্গনে প্রবেশ করে। দলের সঙ্গীরা একে একে নেতার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দলনেতা তার ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে বাঁ হাতে ধরা মন্ত্রপূত সেই মাটির এক চিমটি তুলে নেয়। তারপর সংক্ষেপে একটা জাদুমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ডানহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে প্রত্যেকে কপালে সেই মাটির একটা চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়। দলের প্রত্যেককেই

কপালে এই চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয় যাতে শত্রুপক্ষের দুরভিসন্ধি থেকে তারা রক্ষা পায়। তারপর ঢালির দল সমস্ত প্রাঙ্গনটি প্রদক্ষিণ করে। দলের প্রত্যেক সদস্য প্রাঙ্গনের এক কোণায় পৌঁছুলে তারা মাথার ওপর ডান হাতে চক্রাকারে ঘুরিয়ে সেই কোনাকে বন্দনা করে। এভাবে চারটি কোণা বন্দনা শেষ হবার পর সমস্ত নাচিয়েরা দ্রুতগতি হে হে হে ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে আসে। তারপর তারা গোল হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের হাতের ঢাল ও লাঠি সামনে মাটিতে রাখে।

তারপর তারা ডান হাঁটু ও ডান কনুই বেঁকিয়ে নিচু হয়। বাঁ হাত পিঠের দিকে এবং বাঁ পা পেছনের দিকে সোজা করে রাখে। এই ভঙ্গিতে থাকার সময় দলনেতা যতক্ষণ দম রাখা যায় ততক্ষণ তীব্রকণ্ঠে হে হে হে আওয়াজ করতে থাকে। এই শব্দ করার সময় বাঁহাতটি মুখের এক ইঞ্চি নিচে আনুভূমিক অবস্থায় দ্রুত সঞ্চালিত করা হয় তাতে রণধ্বনি আরও তীব্র হয়ে ওঠে।



এই তীব্র আওয়াজ শেষ হবার পর সমস্ত নাচিয়েরা হাঁটুমোড়া অবস্থাতেই বাঁদিকে সম্পূর্ণ ঘুরে যায়। কিন্তু এবারে তাদের বাঁ হাঁটুতে ভর দিয়ে বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপর নিচু হয়ে থাকতে হয়। ডান পা পিছনের দিকে সোজা করে ছড়ানো এবং ডান হাত থেকে পিঠের দিকে। এই অবস্থায় তাদের মাথা প্রণামের ভঙ্গিতে নত করা হয় এবং তারা সকলে লাফ দিয়ে উঠে সমতালে শারীরিক কসরৎ দেখাতে থাকে।

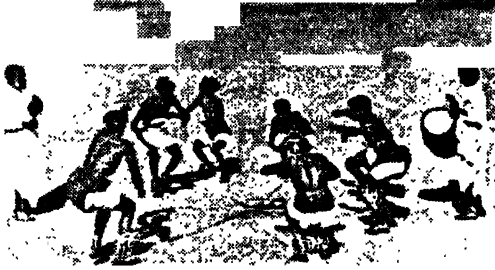


ঢালি নৃত্যের পাঁচটি সুস্পষ্ট বিভাগ আছে। সবগুলিই ঢোল ও কাঁসি সহযোগে করা হয়।

১. প্রাথমিক অনুষ্ঠান ও রণহুংকার। ২. খালি হাতে ব্যায়াম।

৩. আসল নাচ বলিষ্ঠ তাণ্ডব ভঙ্গিতে নাচিয়েরা খালি হাতে গোল হয়ে দাঁড়ায়।

তাদের ঢাল ও লাঠি থাকে মাটিতে। তারপর তারা দুপাশে দুহাত পুরো বাড়িয়ে দেয়। আঙ্গুলগুলোও প্রসারিত থাকে। হাতের চেটো থাকে নিচের দিকে ঘোরানো, পা দুটো ফাঁক করা। হাত দুটো অনড় অবস্থায় ও রকমভাবে রেখে নাচিয়েরা ঢোলের বাজনার তালে তালে পায়ের গোড়ালি ওঠানামা করে।

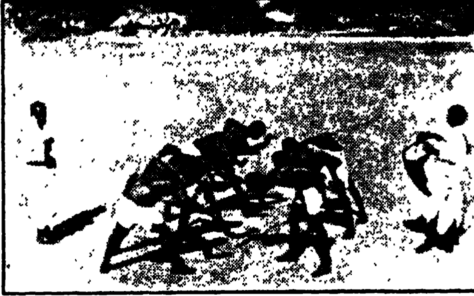


৪. দুই প্রতিপক্ষ দলের নাচিয়েদের ঢাল ও লাঠি দিয়ে দর্শনীয় নৃত্য প্রদর্শন।

৫. দু দল নৃত্য শিল্পীদের মধ্যে ঢাল ও লাঠি নিয়ে সমতালে নকল যুদ্ধের মহড়া।

এ হল মূল নৃত্যছন্দ যা হাত পা তলপেটের নানাধরণের বলিষ্ঠ ক্ষিপ্র তৎপরতার ব্যায়ামের ফাঁকে ফাঁকে দেখানো হয়। এর উদ্দেশ্য হল শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে খেলানো। শারীরিক তৎপরতার ব্যায়ামের মধ্যে অন্যতম প্রধান হল বৈঠক। এর কৌশলটা হল দ্রুত হাঁটুমুড়ে বসা এবং ক্ষিপ্রগতিতে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে থাকা। এছাড়াও থাকে একবার সামনে একবার ভেতরের দিকে কাঁপানো এবং লাফানো। এসবই করা হয় যখন ঢালি নর্তকেরা গোলাকার হয়ে তালে তালে নাচে যাতে গোটা নাচের গতিটাই হয়ে যায় শারীরিক ব্যায়াম ও নাচের মিলিত রূপ চটপটে শারীরিক ব্যায়ামে নাচিয়েরা তালে তালে দর্শনীয়ভাবে সামনে এগিয়ে যায়। তাদের একপা থাকে সামনে প্রসারিত বাঁকানো অবস্থায়, অন্য পা থাকে সম্পূর্ণ ডান দিকের পেছনে। এক হাতের পেছনের দিকটা কপালে ছোঁড়ানো, অন্য হাতের পেছনের দিকটা থাকে কোমরের পেছনে। এই নমনীয় পদক্ষেপের প্রচলিত নাম 'বীরচলন'। শরীর চাঙ্গাকারী এই ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে নানাধরণের রণহুংকারও দেওয়া হয়। এই কুচকাওয়াজ বা শারীরিক ব্যায়াম শেষ হলে ঢালি নর্তকেরা তাদের ঢাল ও লাঠি হাতে তুলে নিয়ে সোজা দুটি সারিতে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে। দুটি সারিতেই মোটামুটি একই সংখ্যার নর্তক থাকে।

প্রত্যেক নর্তক তার বাঁ হাত দিয়ে শরীরের বাঁদিকে বা কোমরে চাপ দেয় এবং ডান হাত দিয়ে ডান দিকের কোমরে। লাঠিটির গোড়াটা ধরে সামনে ওপরে তুলে ধরা হয়। তারপর সারিবদ্ধ নর্তকেরা ঢোল বাজনার তালে তালে পরস্পরের দিকে এগোতে থাকে। এগোবার সময় তারা তাল সহযোগে দুপায়ে পালাক্রমে লাফ দিতে থাকে। প্রত্যেকটি পা পালাক্রমে একবার সামনে এবং একবার পেছনে রাখা হয়। শরীরের ঊর্ধ্বভাগ থাকে সামনের দিকে বাঁকানো। দু দল যখন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় তখন তারা উচ্চকণ্ঠে



রণধ্বনি দেয়। তারপর তারা হঠাৎই ঘুরে গিয়ে একই ধরণের পদক্ষেপে নিজেদের পূর্বতন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর এই দু-সারির নর্তক আবার একই ভঙ্গিতে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু একবার না থেমে তারা প্রতিপক্ষের সারিতে ঢুকে পড়ে যেন তারা শত্রুপক্ষকে বর্শাবিদ্ধ করছে। এভাবে খানিকটা এগোবার পর এবং দুপক্ষই পরস্পরের সীমারেখা অতিক্রম করার পর তারা আবার ফিরে তাকায় এবং হাতের ঢাল ও লাঠি মাথার ওপরে রেখে কতকগুলি সামরিক কৌশল প্রদর্শন করে। কখনো কখনো ঢালটা থাকে বুকের ওপর এবং লাঠি থাকে ডানদিকের কাঁধের পিছনে। এভাবে তারা পরস্পরের সারির দিকে কয়েকবার এগোয় এবং সেখান থেকে পশ্চাদ্ অপসরণ করে আসে।



কখনো মুখোমুখি পদক্ষেপ কখনো সারির পাশের দিকে একপায়ে লাফ দিয়ে এগোনা হয়। এসব সামরিক কৌশল পরিকল্পনা অনুসারেই করা হয় যোদ্ধাদের শিবিরে প্রত্যাবর্তনের সংকেত দিয়ে। দেখতে খুবই চমৎকার। তার প্রধান আকর্ষণ হল সংক্ষিপ্ত সংখ্যায় সারিবদ্ধ যোদ্ধাদের পরস্পরের গা ঘেঁষে সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্য।



এর পরবর্তী ধাপ হল প্রতিপক্ষ দুই দলের বলিষ্ঠ নৃত্যছন্দে নকল যুদ্ধের মহড়া। ঢোলকের বাজনা প্রথমে মৃদুতালে শুরু হয়ে ক্রমশ দ্রুততালে পৌঁছয়। প্রতি জোড়ার খেলোয়াড়রা পরস্পর পরস্পরকে পালাক্রমে একবার ঢালে আঘাত করে পরের বার লাঠি দিয়ে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার বিভিন্ন কৌশল প্রদর্শন করে। তারা কখনো এগোয়,



কখনো পিছোয়, কখনো হাঁটুতে ভর দিয়ে কখনো লাফ দিয়ে ওঠে, যতক্ষণ না নাচ চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়।

এই নাচের তুঙ্গ মুহূর্ত হল পরপর অনেকগুলি উচ্চপর্যায়ের তাণ্ডব নৃত্যভঙ্গি—যোদ্ধারা ক্রমান্বয়ে ডান পা ও বাঁ পা পাশের দিকে উঁচু করে তুলে ধরা হয়।

সামগ্রিক পর্যালোচনা

ঢালি নাচের অঙ্গসঞ্চালনের ভঙ্গি রায়বেঁশে নাচের চেয়ে অনেক বেশি পরিকল্পিত, প্রথাসিদ্ধ এবং আকর্ষণীয়। এই নাচ মূলত শারীরিক ক্রীড়া প্রদর্শনের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু এতে পাওয়া যায় না রায়বেঁশে নাচের সহজাত প্রত্যক্ষতা, তেজোদৃপ্ত বলিষ্ঠতা, দ্রুততা, নমনীয়তা এবং স্থাপত্যকলা ভঙ্গিমার মতো অঙ্গ-সঞ্চালন। তা সত্ত্বেও ঢালিনৃত্য তার সূক্ষ্ম সঞ্চালনা এবং সুশৃঙ্খল গঠনভঙ্গিমার জন্যই নান্দনিক দিক দিয়ে খুবই উঁচুদরের, শিল্প। বিশেষজ্ঞরা এই নাচের উচ্চ শারীরিক ক্রীড়ামূল্যের কথাও স্বীকার করেছেন। রণনৃত্য হওয়ার দরুণ ঢালিনৃত্যের সঙ্গে কোনো গান থাকে না।



ক্রীড়াভিমুখী নৃত্য

কাঠি নৃত্য

চিরায়ত নৃত্য হিসেবে কাঠি নৃত্যের অনুশীলন পশ্চিমবাংলার বীরভূম জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষত বাগদি ও বেহারা/বাউড়ি শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে প্রচলিত। আমি, ১৯৩১ সালে রামপুরহাট থানার অন্তর্গত বরসাল গ্রামে গিয়ে তা আবিষ্কার করি। নাচিয়েরা গোল হয়ে দাঁড়ায়, দুহাতে দুটি ছোট কাঠি নিয়ে। তাদের পরণে থাকে মালকোচা মেরে ধুতি এবং খালি গা, নাচের সঙ্গে বাজে মাদল। বয়স্ক ব্যক্তিরা জোড় সংখ্যায় চার, ছয় বা



আটজন করে গোল হয়ে দাঁড়ায়। হাতে থাকে দেড় ফুট লম্বা কাঠি। যিনি মাদল বাজান তিনি বৃত্তের বাইরে বা বৃত্তের মাঝখানে থাকেন। শুরুতে অল্প বিরতি ছাড়া নাচিয়েরা অবিরাম নাচতে থাকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকের গতিতে। নাচের শুরুতে একজন অন্তর একজন নাচিয়ে তার ডানদিকের নাচিয়ের সঙ্গে জোড় বাঁধে এবং বাঁ হাতের কাঠি দিয়ে তার জোড়ের নাচিয়ের ডান হাতের কাঠিতে আঘাত করে। প্রত্যেকে তখন তার বাঁহাতের কাঠি দিয়ে নিজেরই ডান হাতের কাঠিতে আঘাত করে নাচে। তারপর বিভিন্ন জোড় গঠন করা হয়।

যারা ডানদিকের নাচিয়ের সঙ্গে জোড় বেঁধেছিল তখন তারা জোড় বাঁধে বাঁহাতের দিকে নাচিয়ের সঙ্গে এবং তার জোড়ের বাঁহাতের কাঠির ওপর নিজের ডানহাতের কাঠি দিয়ে আঘাত করে। এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং তারা বৃত্তের মধ্যে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকের গতিতে নাচতে থাকে। নাচের পদক্ষেপ হয় দ্রুত এবং লাবণ্যমণ্ডিত। দেহের এবং বাহুর সঞ্চালন হয় অত্যন্ত নমনীয় কাঠির এবং মাদলের তালের সঙ্গে সঙ্গে। সর্বক্ষণ নাচিয়েদের হাঁটু থাকে বাঁকানো। অনেক সময় একজন নাচিয়ে কাঠিতে আঘাত করে।

আরেকটি নাচিয়ের দল তখন মাটিতে বসে থাকে এবং নাচের সহযোগী গানটি গায়। কারণ নাচটি এত দ্রুততালে চলে যে নাচিয়েদের পক্ষে নাচের সঙ্গে সঙ্গে গান গাওয়া কঠিন। প্রাথমিক অঙ্গসঞ্চালন শেষ না হওয়া পর্যন্ত গান শুরু করা হয় না। গানও মাঝে মাঝে থামে যাতে কাঠির আঘাতের শব্দ শোনা যায়।

এই নৃত্যশৈলীর ছ' রকম বিভিন্ন ধরণ আছে। একটি ধরণের নাচে নৃত্যশিল্পীরা হাঁটুমুড়ে নত হয়ে প্রায় গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে বসে পড়ে এবং হাঁটুমোড়া অবস্থাতেই মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে ওঠে। তারা গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে এবং পরস্পরের কাঠিতে আঘাত দিতে থাকে। যেভাবে আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। কখনো সখনো একজন নাচিয়ে মাটিতে পিঠ দিয়ে শুয়ে পড়ে। তার মাথাটা থাকে বৃত্তির কেন্দ্রবিন্দুর দিকে ঘোরানো। মনে হবে যেন তাকে আঘাত করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সে পিঠে ঝাঁকানি দিয়ে বৃত্তের মধ্যে ঘুরতে থাকে। একই সময়ে সে কাঠি দিয়ে আঘাত করতে এবং আত্মরক্ষার জন্য আঘাত ঘোরাতে থাকে। নাচ যত এগোতে থাকে গানের গতিও দ্রুততর হতে

থাকে। যতক্ষণ না তা তুঙ্গে গিয়ে পৌঁছয়। কাঠি সঞ্চালিত হয় আঘাত করা ও আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে তৎপরতার সঙ্গে তীব্রভাবে।

কাঠি নাচ ভারতের সব অঞ্চলেই মোটামুটি প্রচলিত। মনে হয় এ নাচ অনেক প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রাচীনকালে পুরষ ও মেয়েরা আলাদাভাবে এই নাচের চর্চা করত সামাজিক বিনোদক্রীড়া হিসেবে। ভারতের প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত মন্দিরের দেওয়ালে বিশেষত দক্ষিণভারতের পুরুষ ও মেয়েদের কাঠি নাচের অনেক চিত্র উৎকীর্ণ আছে। প্রাচীন পেতলের কারুকর্মেও তা লক্ষ্য করা যায়।

কলকাতায় ভারতীয় যাদুঘরে পাবনা জেলা থেকে পাওয়া পালযুগের দুটি পাথরের স্তম্ভ রক্ষিত আছে। তাতে উৎকীর্ণ রয়েছে উচ্চবর্ণের মেয়েদের কাঠিনাচের দৃশ্য। এতে বোঝা যায় যে অতীতে সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর মেয়ে ও পুরুষদের মধ্যে এই নৃত্যের চর্চা ছিল। এখন কয়েকটি গরীব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কাঠিনাচের চর্চা সীমাবদ্ধ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এই নাচটি যেভাবে টিকে রয়েছে তার সঙ্গে রণনৃত্যের খুব সাদৃশ্য রয়েছে তার পরিবেশনার বলিষ্ঠতা ও ক্ষিপ্রতার জন্য।

কাঠি দিয়ে নাচ পরিবেশিত হয় বলেই এর নাম কাঠিনাচ। বর্তমানে এই নাচ কোন একটি বিশেষ উৎসবের সঙ্গে যুক্ত নয়। কিন্তু আদিতে হয়ত কৃষ্ণ আরাধনার অঙ্গ রাসমণ্ডল নৃত্য হিসেবে এই নাচ পরিবেশিত হত। শেষোক্ত অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায় দক্ষিণ ভারতের পেতলের সামগ্রীতে। তাতে উৎকীর্ণ চিত্রের কাঠিনাচকে রাসমণ্ডলের নাচ হিসেবে দেখানো হয়েছে। কালাত্তম বা রাসনৃত্য এখনও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কাঠি দিয়ে করা হয়। প্রচলিত এই লোকনৃত্যের মধ্যেই এই প্রাচীন নৃত্যকলা এখনও বেঁচে আছে। এই নাচের মধ্যে স্পষ্টতই নিহিত রয়েছে। সামাজিক ঐক্য বন্ধনের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়াস অথবা নাচিয়ে দলের সঙ্গে নৃত্যছন্দের মাধ্যমে সংহতি স্থাপন। এই নৃত্যের গতিছন্দ আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের সুসংহত পরিক্রমারই অনুকরণে সৃষ্ট।

এই নাচের সঙ্গে যে গানগুলি গাওয়া হয় তার ভাষা অতি সরল ও সাদাসিধে। তাতে থাকে কৃষকজীবনে সুখ দুঃখের কথা। করুণ সুরে তা গাওয়া হয়।

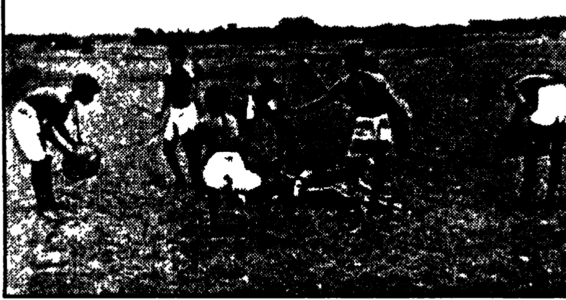
অত্যাচারী জমিদারদের দালালবাবুরা প্রজাদের থেকে কী রকম অবৈধভাবে খাজনা আদায় করত এই গানে তারই বর্ণনা আছে।

লাঠি নৃত্য

লাঠি নাচ করা হত জন্মাষ্টমী এবং মহরম উৎসব উপলক্ষে।

দুজন বা তার চেয়ে বেশী সংখ্যার মানুষ এই বলিষ্ঠ নাচে যোগ দেয়। লাঠি হাতে নিয়ে ছন্দিত লয়ে চলে এই নাচ। মহরম ও জন্মাষ্টমী উৎসবে এই নাচ সর্বত্র করা হয়।

জন্মাষ্টমী উৎসবে লাঠি নাচ ও নকল যুদ্ধের মহড়া সাধারণত হিন্দুরা করে থাকে। অতি সাম্প্রতিক কালে ইচ্ছা হলে মুসলমানরাও এই নাচে যোগ দেয়। তেমনি হিন্দুরাও মহরমের উৎসবে লাঠি নাচে ও নকল লড়াইয়ের মহড়ার অংশগ্রহণ করতে পারে।



লাঠিগুলি হয় বাঁশের। লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুট। লাঠি কখনো ডান হাতে কখনো বাঁ হাতে ধরা থাকে, কখনো দুহাতে দুটি লাঠি ধরা থাকে। লাঠি প্রচণ্ডভাবে ঘোরানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে চলে নাচ বলিষ্ঠ অঙ্গ সঞ্চালন। নাচিয়েরা লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে, কখনো পিছিয়ে এবং কখনো শরীর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমনভাবে নাচে যেন মনে হয় প্রতিপক্ষের লাঠির বাড়ি থেকে নিজেকে বাঁচাচ্ছে। লাঠিনাচের তালে তালে বাজে ঢোল ও কাড়া বাদ্যযন্ত্র।

ঝুমুর নাচ

ঝুমুর একটি বর্গনাম। যে নাচ বা গান কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীতে পড়ে না কিন্তু যার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্য আছে বিশেষত আদিরসাত্মক তাকেই বলা হয় ঝুমুর।



ঝুমুর গানকে বলা যায় বিবিধ ধরণের আদি রসাত্মক গানের মিশ্রণ। ঝুমুর নাচ ও পাঁচমিশেলী ধরণের নাচ। ঝুমুর নামটি হয়তো এসেছে শিল্পীর পায়ের নুপুরের ঝুম ঝুম শব্দ থেকে। ঝুমুর একাও নাচা যায় দুজনে মিলে কিংবা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবেও নাচা যায়।

ক. একক ঝুমুর

একক ঝুমুর নাচ করে থাকে বাগদি, ডোম ও বারুই জাতির পুরুষ এবং মেয়েরা। তার সঙ্গে থাকে ঢোল বা মাদলের বাজনা। একক ঝুমুরের ভঙ্গিটা সব সময়েই হয় তাণ্ডব নৃত্যের শৈলীতে। হাত পা ও শরীরের প্রসারিত ভঙ্গিতে সঞ্চালনই তার প্রদর্শন কলা।

খ. দ্বৈত ঝুমুর

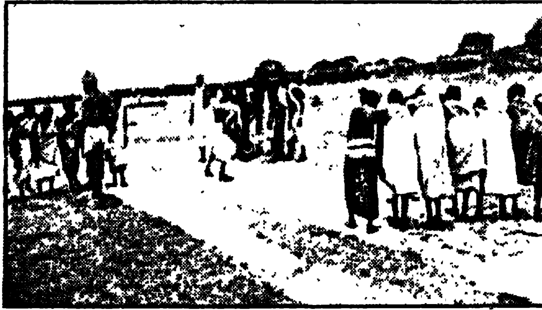
দ্বৈত ঝুমুর নাচ সাধারণ করে দুজন মেয়ে। নাচের সঙ্গে বাজে ঢোল। নাচের সময়ে

দের শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন ভঙ্গিতে সঞ্চালিত হয়, যেমন মাটিতে বসা, দাঁড়ানো, শরীর বাঁকানো প্রভৃতি। তার সঙ্গে শারীরিক কসরৎও দেখানো হয়।

গ. দলবদ্ধ ঝুমুর



সাধারণত মেয়েদের দলবদ্ধ ভাবে যে কোনো নাচকেই ঝুমুর নাচ বলা হয়। ভদ্রসমাজের লোকেরা সাধারণভাবে মঞ্চে প্রদর্শিত মেয়েদের দলবদ্ধ নাচকেই ঝুমুর নাচ বলে। কিন্তু লোকনৃত্যের শ্রেণীতে যখন ঝুমুর নাচের উল্লেখ করা হয় তখন তা একমাত্র বোঝায় 'কারা ঝুমুর' নাচ। কারা জাতির মেয়েরাই এই নাচ করে থাকে। তাদের নাচে মেয়েরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে কয়েকটি সারিতে বিভক্ত থাকে। এভাবে প্রত্যেক সারিতে মেয়ে নাচিয়েরা এই অবস্থায় এক একটা শেকলের আকার নেয়। মেয়েদের কাঁধ পরস্পরের কাঁধ স্পর্শ করে ঘনসন্নিবদ্ধ শেকল গাঁথে। এটা হল আদিবাসী জাতির গভীর সংহতির প্রতীক। এই নাচে আলাদা আলাদা ভাবেও নাচিয়েদের পরস্পরের হাত ধরে ও কাঁধ স্পর্শ করে শৃঙ্খলের আকার দেওয়া হয়। শেকলাকৃতির ঝুমুরে সরল পদ্ধতিতে সাধারণত এক এক বারে সাত পা করে নাচের পুনরাবৃত্তি করে নাচিয়েরা। এতে কোনো বৈচিত্র্য থাকে না। ডান দিকের নাচিয়ে নেতৃত্ব দেয় এবং নৃত্যপ্রাঙ্গণে গোলাকারে নাচের ও নেতৃত্ব তারই। সপ্তম পদক্ষেপটি হয় লম্বা। এর দ্বারা নাচিয়েরা সামনের দিকে না এগিয়ে বাঁ দিকে বা ডান দিকে ঘুরে যেতে পারে।



শেকলাকৃতির ঝুমুর নাচ যে আদিবাসী গোষ্ঠীর তার প্রমাণ হল এই নাচ বাংলায় একমাত্র কোরা জনগোষ্ঠীর মেয়েরাই করে থাকে যাদের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে ওঁরাও এবং মুণ্ডা উপজাতিদের। এরা হল আদি অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর যাদের মধ্যে ঝুমুর নাচের প্রচলন খুব বেশি। অবশ্য এদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্যও আছে। ওঁরাও, মুণ্ডা এবং সাঁওতালদের মধ্যে শেকল ঝুমুর নাচে যোগ দেয় পুরুষ ও মেয়ে উভয়েই। পুরুষদের

আলাদা সারি। মেয়েদের সারির মুখোমুখি হয়ে তারা নাচের তালে তালে এগোয় এবং পিছোয়।

কোরা উপজাতিরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। কোরা পুরুষরা নাচে যোগ দেয় না। বাংলার অন্যান্য লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে যা হয় এখানেও একজন পুরুষ নাচের সময় মাদল বাজায়। কোরাদের শেকল ঝুমুর সাঁওতালদের রৈখিক বিন্যাসের ঝুমুরের চেয়ে আলাদা এবং আরও বলিষ্ঠ ধরণের।

তাছাড়া কোরাদের নাচে শরীরের মধ্যাঙ্গের দুলুনি থাকে না যা সাঁওতাল মেয়েদের নাচে খুবই দৃশ্যমান। কোরাদের পেশা হল মাটি কাটা এবং রাস্তা তৈরি করা। তাদের ঝুমুর নাচের সঙ্গে যে গান গাওয়া হয় তাতে তাদের সরল জীবন ও কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত।

কোরাদের শেকল ঝুমুর মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর মেয়েরাও নাচে যেমন দার্জিলিং জেলার পাহাড়ি মেয়েরা। কিন্তু তারা হাত ধরাধরি না করে প্রত্যেক নাচিয়ে মেয়ে তাদের দুটি হাত দিয়ে তার দুপাশের মেয়ের কোমর জড়িয়ে নাচে।

চক্র ঝুমুর

সামাজিক অবসর বিনোদনের জন্য শ্রমজীবী শ্রেণীর মহিলারা ও বালিকারা এই ঝুমুর নাচ করে থাকেন তাৎক্ষণিকভাবে কোন বিষয়ে নিজেরাই ছড়া তৈরি করে। একে চক্র ঝুমুর বলা হয়। গোল হয়ে তারা নাচেন।



বিদ্যুৎচালিত পাখা এবং রেলগাড়ি প্রবর্তনের ফলে শ্রমজীবী মেয়েদের জীবিকা হারানোর করুণ কাহিনী ও বিক্ষোভই এই গানের মধ্যে প্রকাশিত।

ধামাইল নাচ

ধামাইল শব্দটি সম্ভবত ধামাল (সংস্কৃতে ধামা, তেজ) অথবা ধামালি (ধায়ালি সংস্কৃত ধাবন অর্থাৎ দৌড়ানো বা দ্রুত পদক্ষেপ) থেকে উৎপন্ন।

শব্দার্থ থেকে বোঝা যায় এই নাচ হল বলিষ্ঠ অঙ্গসঞ্চালনের যা ব্রত বা বরণ নৃত্যের বিপরীত। শেষোক্ত নাচ দুটিতে পা ফেলা হয় হালকাভাবে পায়ের পাতা এপাশে ওপাশে ঘষে ঘষে চলে। মাটির ওপরে কখনো পায়ের পাতা তোলা হয় না। এই নাচের মেজাজ শান্ত ও নম্র।

অন্যদিকে ধামাইল নাচে খুব জোরে লাফিয়ে উঠে পা দুটি ওপরে তোলা হয়। নাচিয়েরা বৃত্তের আকারে পালাক্রমে একবার সামনে এবং একবার ভিতরের দিকে পা টেনে ঘড়ির কাঁটার গতির বিপরীত দিকে এগোতে থাকে।

ধামাইল নাচের চলার গতিতে দুটি প্রধান রীতি আছে। একটি রীতি অনুযায়ী পালাক্রমে ডান পা সামনের দিকে ও ভিতরের দিকে চালনা করা হয়। বাঁ পায়ের কাজ হল শুধু ছোট পদক্ষেপ করে বৃত্তের সঙ্গে ঘড়ির কাঁটার গতির বিপরীতে তাল রেখে চলা।

দ্বিতীয় রীতিটি অনেকটা মেয়েলি ধরণের। প্রতিটি পা পালাক্রমে একটু হালকাভাবে পিছনের দিকে ফেলে। মাটিতে আস্তে করে পায়ের পাতা দিয়ে ঠোকা দেওয়া হয়। পায়ের গোড়ালি তখন ওপরের দিকে উঁচু করা থাকে। নৃত্যশিল্পীদের তলপেটের পেশী তখন প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়। ধামাইল নাচের সময় হাততালি অথবা করতালের সহযোগিতা থাকবেই।

ধামাইল হল আনন্দ উল্লাসের নাচ। কিন্তু তার গানগুলি কৃষ্ণভাবনা থেকে উৎসারিত, আধ্যাত্মিক এবং রূপকাশ্রয়ী। ধামাইল নাচ বিবাহ এবং অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে এবং প্রায়শই ব্রত অনুষ্ঠানের শেষে পরিবেশিত হয়।

ব্রত ও বরণ অনুষ্ঠানের তাৎপর্য

ব্রত ও বরণ নৃত্যের প্রকৃতি ও তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে বুঝতে গেলে তার মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি উপলব্ধি করা দরকার।

ব্রত শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়।

সাধারণভাবে শব্দটির অর্থ হল কর্তব্য এবং একাগ্রচিত্ত হয়ে সেই কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন ও তা উদ্‌যাপন করা। বিশেষভাবে বলতে গেলে ব্রত হল নৃত্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য আত্ম অভিব্যক্তির মাধ্যমে শারীরিক ও আত্মিক শৃঙ্খলা ও সংযম পালন। তার উদ্দেশ্য আত্মোন্নতি এবং অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ। বাংলার নারীদের ব্রত নৃত্য হল তারই প্রকাশ।

ব্রত অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হল বরণ যার অর্থ বর বা পছন্দ, নির্বাচন বা উপহার দিয়ে শ্রদ্ধা, অভিনন্দন বা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন। বর দেওয়াও যায়, প্রার্থনাও করা যায়। ব্রত, বরণ ও বর এই তিনটি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সব সময়েই ব্রত অনুষ্ঠানের করা হয় মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য বর প্রার্থনার উদ্দেশ্যে।

বাঙালির ঘরে কোনো শ্রদ্ধাভাজন বা স্নেহভাজন ব্যক্তি এলে বাড়ির মেয়েরা তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানায়। এটাই হল চিরাচরিত প্রথা। এই অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল ঈপ্সিত আশীর্বাদ জ্ঞাপন অথবা বরপ্রার্থনা করা। আগত ব্যক্তি বয়সে ছোট হলে বাড়ির মেয়েরা তাকে বরণ করে বা আশীর্বাদ করে। বয়োঃজ্যেষ্ঠ কেউ এলে তাঁর

মনোস্কামনা পূরণের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয় এবং তাঁর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়।

বরণ শব্দটি স্পষ্টভাবে দুটি অর্থে ব্যবহার হয়। প্রথমক্ষেত্রে 'বর' বা আশীর্বাদ এবং বিশেষত মহিলাদের ব্রতপালন সম্পর্কিত অর্থে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, বিবাহের সময়ে নতুন বর-কনেকে মহিলাদের দ্বারা বরণ করা অর্থে ব্যবহার হয়। আবার যখন কোন মহিলা ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনে শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কারণে বাধাপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি প্রতিনিধি হিসেবে কোন পুরোহিতকে তার হয়ে 'বরণ' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে বলেন। যদিও এই অনুষ্ঠানটি কেবল মহিলাদের জন্যই সাধারণত কোন দেবতা বা প্রাকৃতিক শক্তির জন্যই এই ব্রত করা হয়। এরা হল সূর্য, নক্ষত্র অথবা পৃথিবী।

এ সব ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানটি হয় ঘরোয়া ধরনের। কোনো পুরোহিত থাকে না। কারণ অনুষ্ঠান পালন করেন কেবল মহিলারই। কারণ যারা করেন তার নিজেদের সোজা সরল ভাষায় মনোবাসনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করেন। ব্রত উদ্‌যাপনের সময়েও মেয়েরা ছন্দলয়ের সাহায্য অথবা নাচের মাধ্যমে মন্ত্র আবৃত্তি করে বর প্রার্থনা করেন। মন্ত্র আবৃত্তি করে প্রার্থনা করলেও এর মধ্যে কোনো তুকতাক বা জাদুর উপাদান নেই। ব্রত হল গ্রামীন মহিলাদের সমন্বয়ী আদর্শের একটি বিশেষ প্রকাশরীতি। তাদের কাছে সমস্ত প্রকৃতিই প্রাণময়। প্রকৃতির সমস্ত বস্তু সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি নদীসমূহ, বৃক্ষাদি সবই প্রাণসত্তাময় এবং মহাজাগতিক বিশ্ব পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সদস্য। সে কারণে এদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে আনন্দময় ঐক্যবোধ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক তারই বাস্তব অভিব্যক্তি হল সহজ ভাষার সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে এবং মেঝেতে প্রকৃতির এই সমস্ত প্রতীকের আলপনা অঙ্কন।

মেয়েদের ব্রত পালনের নিহিতার্থ হল প্রকৃতির নাট্যায়ন। আনন্দ সঙ্গীত, নৃত্য, ছড়া আবৃত্তি ও আলপনার মাধ্যমে মনোস্কামনা সিদ্ধির প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয় প্রকৃতিরই সমস্ত উপদানের প্রতি সক্রিয় সহানুভূতি জ্ঞাপন করে। বরণ বা আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা অনেক সময়েই ব্রত উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পালন করা হয়। এতে থাকে প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ (যা অংশত চিরাচরিত এবং অংশত অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেয়েদের দ্বারা তাৎক্ষণিক ভাবে তৈরি)।

ব্রত ও বরণ উভয় অনুষ্ঠানই সহজ নৃত্যের সহযোগ পালন করা হয়।

ব্রত পালনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত করণীয় হল প্রস্তুতিপর্বে আত্মশুদ্ধির জন্য উপোস অথবা পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান। অথবা দুটোই। ব্রতের বিষয়বস্তু যা অনেক সময়ে ব্রত অনুষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা শেষ হয় যথোপযুক্ত কাহিনী কথনের দ্বারা যার মধ্যে থাকে গভীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। কিংবা সূর্যের সঙ্গে তরুণী চাঁদের অথবা সূর্যের সন্তান বসন্তের সঙ্গে বসুন্ধরার বিবাহ দেওয়া। এমনি ধরনের সহজ সরল রূপক

উপাখ্যানের নাট্য পরিবেশনা। এরপর থাকে বর প্রার্থনা করে সহজভাষায় মুখে মুখে বানানো তাৎক্ষণিক ছড়া আবৃত্তি। গোটা অনুষ্ঠানটি হল আনন্দময় এক গীতি নাট্য।

ব্রত নৃত্য এবং সঙ্গীতকে গণ্য করা যায় একটি আনন্দময় উৎসবের একটি অংশ যাতে ষড়ঋতুর কর্মধারা ও তার মেজাজ বর্ণনায় উঠে আসে। তাকে তুলে ধরা হয় সূর্য, চন্দ্র ও প্রকৃতির অন্যান্য শক্তির বিকাশের চিত্র। মানুষের ভূমিকা এখানে সেই মহাজাগতিক গ্রহাদি, প্রানবন্ত, নদী প্রবাহ, বৃক্ষাদিরই একটা অংশ হিসেবে উপলব্ধি করা হয়েছে। মহাবিশ্বের এই পরিমণ্ডলে মানুষ তাদের সঙ্গে ভাবনা বিনিময় করে, তাদের মনের ভিতরে প্রবেশ করে, তাদের জীবনের সঙ্গেও তার আত্মীয়তা।

ব্রত পালনের এই প্রতীতি হয় যে নরনারীর জীবন ধারণের মতোই মহাবিশ্ব প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুই প্রাণময় জীবনের অধিকারী। কল্পনা করা হয় যে তারাও মানবজীবনের প্রতি সক্রিয়ভাবে আগ্রহী। অভীষ্ট সিদ্ধি র জন্য বর প্রার্থনা করলে তা তারা পূরণ করে।

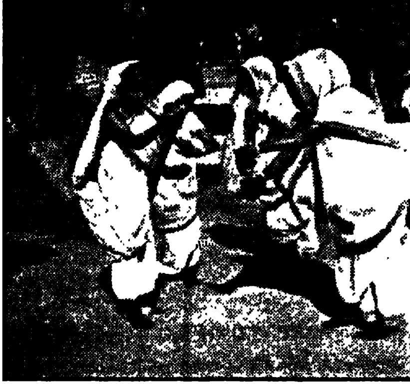
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাংলার ব্রত গ্রন্থে বলেছেন ঃ "আমরা এখানে দেখতে পাই মানুষের সঙ্গে মহাবিশ্বের এক গভীর সম্পর্ক। মানুষের আর অরণ্যের নিশ্বাস প্রশ্বাসের ছন্দ একই।" ব্রতের উদ্ভব বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় এবং আলপনার একটা জাতির মনের তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই। বেদের সূত্র গুলিতেও সমগ্র আর্য জাতির একটা চিন্তা তার উদ্যম উৎসাহ ফুটে উঠেতে দেখি। এ দুয়ের মধ্যে লোকের আশা আশংকা চেষ্টা ও কামনা আপনাকে ব্যক্ত করেছে এবং দুয়ের মধ্যে এই জন্য বেশ একটা মিল দেখা যাচ্ছে।"

অবনীন্দ্র নাথ দেখিয়েছেন যে লোকপ্রচলিত ব্রত কথায় সূর্যের মাতা, প্রকৃতির শক্তিকে যে সহৃদয় প্রতিবেশী হিসেবে কল্পনা করে যে ছড়া উচ্চারিত হয় তার সঙ্গে বৈদিক শ্লোকের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। বাংলায় ব্রতকথায় সূর্যের মাতার উদ্দেশ্যে যে শ্লোক উচ্চারণ করা হয় তা হল ঃ

উরু উরু দেখা যায় বড় বড় বাড়ি
ঐ যে দেখা যায় সূর্যের মার বাড়ি
সূর্যের মা লো! কি কর দুয়ারে বসিয়া!
তোমার সূর্য আসতেছেন জো ঘোড়ায় চাপিয়া।

বরণ নৃত্য

বরণ উৎসব পালন করা হয় সাদরে বর বা বধূকে স্বাগত জানাবার জন্য, কোনো দেবতার বিগ্রহ অভ্যর্থনার জন্য অথবা কোনো অতিথিকে সম্মান প্রদর্শন বা সস্নেহে স্বাগত জানাতে কোনো অনুষ্ঠানে যেমন ভাইফোঁটা উপলক্ষে বোনেরা ভাইয়ের কপালে



চন্দনের ফোঁটা দিয়ে আশীর্বাদ জানাবার সময় ও বরণ নৃত্য করা হয়। নাচের সময়ে মেয়েদের হাতে নানা ধরনের জিনিস থাকে যেমন কুলা, প্রদীপ, ধান ও দূর্বা ঘাস। অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত বরণ কুলাতে থাকে একতাল মাটি, নানারকম শস্য, এক টুকরো পাথর. সিঁদুর, হলুদ ইত্যাদি। বরণ নাচের সময় ঢোলের তালে তালে দুটো পা ক্রমান্বয়ে ওঠা নামা করে। নাচিয়েরা হেলে দুলে পা ঘষে ঘষে নাচেন বরণীয় বিগ্রহ বা ব্যক্তির সামনে। নাচবার সময় ধীরে ধীরে ডাইনে বা বাঁয়ে সামান্য এগোনো হয় কখনো কখনো। কিন্তু আসল মনোযোগ থাকে হাতের আন্দোলনের ওপর বা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং দেখবার মতো সুন্দর। নিয়মানুযায়ী হাতের আঙুল ও চেটো (করতল) শক্ত করে ধরা থাকে। সমস্ত নাচের ভঙ্গিটাই নির্ভর করে কব্জি ও কনুইয়ের গ্রন্থির ওপর। নাচিয়েদের হাত কখনো কখনো পরস্পরের আঙুল অথবা দুজনের কব্জি স্পর্শ করে। কখনো বা হাত দুটো অবাধে আন্দোলিত হয় নাচের ছন্দে। হাত বা বাহুদুটো কখনো নিচের দিকে ওপরের দিকে বা এপাশে ওপাশে আন্দোলিত হয়। কোনো ব্যক্তিকে বরণ করা হয় তাঁকে বসিয়ে। বিগ্রহ রাখা হয় দণ্ডায়মান অবস্থায়। বরণের সময়ে মেয়েদের হাতগুলি এভাবে আন্দোলিত হয় যার দ্বারা বরণীয়দের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রূপ রেখা শূন্যে অঙ্কিত হয়ে যায়। সংস্কৃতে বরণ শব্দের দ্বারা বরণ করা এবং আবৃত করা দুইই বোঝায়। ব্যক্তিকে বরণ করার সময় নাচিয়েরা তাদের হাতে ধরা ধান দূর্বা তাঁর মাথায় রেখে আশীর্বাদ করেন। বরণ নৃত্যে হাত, কব্জি, কাঁধের গ্রন্থি সহ সমস্ত দেহের কোমর থেকে ঊর্ধাংশ সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানো হয়। পায়ের আন্দোলনও পায়ের পেশি ও শ্রোণীদেশের প্রবলব্যায়াম হয় যা স্বাস্থ্যকর।

আরতি নৃত্য

মহিলাদের বরণ নৃত্যেরই প্রতিরূপ হল মন্দিরে বা পারিবারিক বিগ্রহ দেবতার সামনে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আরতি নৃত্য।

প্রদীপ হাতে বিগ্রহের সামনে সন্ধ্যাবেলায় বা দিনের অন্য সময়েও উপাসনার সময় আরতি করা যায়। (সংস্কৃত আরত্রিকা থেকে আরতি যার অর্থ সান্ধ্য অনুষ্ঠান) ডান হাতে বা দুহাতেই পঞ্চ প্রদীপ নিয়ে মৃদু লয়ে নেচে নেচে আরতি দেন দেবতার উপাসনায়।

মন্দিরের ভিতরে বা বারান্দায় আরতি নৃত্য করার সময় একজন সেবক ঘণ্টা বাজায়। কখনো কখনো পঞ্চপ্রদীপের বদলে হাতে ধূপদানি নিয়েও আরতি নৃত্য করা হয়। এই নৃত্য উপাসনা এবং আত্মশুদ্ধির প্রতীক।

ব্রত নৃত্য

বাংলার মেয়ে ও কুমারীরা যে ব্রত নৃত্য করেন তার দুটি শ্রেণী—শাস্ত্রীয় এবং লোক প্রচলিত মেয়েলি ব্রত।



শাস্ত্রীয় ব্রত পালন করা হয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডেকে এনে তাঁরই পরিচালনায়। মেয়েলি ব্রতে আনন্দ এবং স্বতঃস্ফূর্ততাই প্রধান উপাদান। শাস্ত্রীয় ব্রতে সাধারণত নাচ বা গানের কোনো বিধান নেই। লোকপ্রচলিত মেয়েলি ব্রতের উৎসব প্রকৃতির মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে বাংলার মেয়েদের সহজাত কাব্যপ্রেরণা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এই ব্রত উৎসবের মাধ্যমে বাঙালি মেয়েদের সমন্বয়ী অন্তর্ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। তাদের ভাবনার এই বিশ্বের গঠনের মধ্যে রয়েছে একটা মহাজাগতিক নাট্য প্রক্রিয়া যাতে মানুষ রয়েছে এক আনন্দময় ভূমিকায়। প্রকৃতির সঙ্গে গ্রহ নক্ষত্রের গভীর সম্বন্ধ রয়েছে বলে তারা উপলব্ধি করেন। তারই প্রকাশ দেখা যায় ব্রত পালনের সময়ে সহজ সরল ছড়া এবং নাটক তৈরি করেন মেয়েরাই। ব্রত নৃত্য ও গান অধিকাংশই করে থাকে বালিকারা। বিবাহিত মেয়েরা যোগ দেন সূর্যব্রত ও কার্তিক ব্রতে। ব্রত নৃত্যের বৈশিষ্ট্য হল—



১. পায়ের চালনা ভঙ্গি

২. হাত ও কব্জির চালনার ভঙ্গি

কুমারী মেয়েরা বা বয়স্কা মহিলারা দলবদ্ধ হয়ে নাচেন। কখনো বৃত্তাকারে গোল হয়ে নাচিয়েরা ধীর ছন্দে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরে ঘুরে নাচেন তারা। কোমর থেকে দেহের উধর্বাংশের বিশেষত হাত ও বাহু দুটোর নানারকম ভঙ্গিতে আন্দোলিত করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ নাচের ক্ষেত্রে পা চালনা করা হয় মসৃণভাবে মাটিতে ঘষে ঘষে।

কখনোই পা মাটির ওপরে ওঠে না। এভাবে চলার সময়ে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ও গোড়ালি পালা করে পরস্পর যুক্ত করা হয়। এইভাবে কখনো বৃত্তাকারে অথবা



অর্ধবৃত্তাকারে ডান দিকে বাঁ দিকে কিংবা তার বিপরীত দিকে একই জায়গায় নাচ করা হয়। এই পদ্ধতির নাচ বাংলার সর্বত্র ব্রত ও বরণ উৎসবে অপরিহার্য। এতে মেয়েদের শ্রোণী, তলপেট ও পায়ের পেশির বলিষ্ঠ ব্যায়াম হয়ে থাকে। পা ঘষে ঘষে নাচা ছক বাঁধা হলেও বাংলার মেয়েদের দেহ লাবণ্য, মর্যাদা ও গাম্ভীর্য ব্রত নৃত্যকে বিশিষ্ঠতা প্রদান করেছে। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হল এই নাচের বিভিন্ন পর্যায়ে হাতের কাজের অপরূপ বৈচিত্র্য। তবে কুমারী মেয়ে ও বিবাহিতা মহিলাদের পদচালনার ভঙ্গিতে একটা সূক্ষ্ম এবং তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য আছে। বিবাহিতা মহিলাদের নাচের সময় দুটো পা পালাক্রমে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল এবং গোড়ালি পরস্পরকে স্পর্শ করে। ততক্ষণ গোল হয়ে তাদের নাচ চলতে থাকে পায়ের গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে।

কুমারীদের নাচের সময়ে গোড়ালি বা বুড়ো আঙুল পরস্পরকে স্পর্শ করে না। পা দুটো আলাদা থাকে এবং একই সঙ্গে গোল হয়ে গোড়ালি দিয়ে পা ঘষে ঘষে নাচা হয়। বিবাহিতাদের ক্ষেত্রে শ্রোণীও তলপেটেব পেশির প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়। কুমারীদের ক্ষেত্রে শুধু গ্লুটিল (gluteal) পেশীর ব্যায়াম বেশি হয়। এই দুটি ভিন্ন পদ্ধতির কারণ হল বালিকা ও বিবাহিতা মহিলাদের শারীরিক প্রয়োজনীয়তা। বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় মেয়েরা বুঝতে পেরেছেন যে কুমারী মেয়েদের দেহের সেই সব পেশীর সঞ্চালন প্রয়োজন যা ভবিষ্যতে তাদের মাতৃত্বের প্রস্তুতি হিসেবে দরকার। বিবাহিতা রমনীদের ক্ষেত্রে শ্রোণী দেশের হাড়, পেশী এবং তলপেটের দেওয়ালগুলির ব্যায়াম প্রয়োজন যাতে গর্ভাবস্থায় পেশীগুলো নমনীয় থাকে ও প্রসব সহজ হয়।

১. সূর্য ব্রত

সূর্য ব্রত (অবিভক্ত) বাংলার ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ এবং শ্রীহট্ট জেলায় মেয়েদের মধ্যে খুবই প্রচলিত। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, সূর্যব্রত সমাজের ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকল শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি গ্রামবাংলায় এক ধরনের শহুরে মনোভাব ছড়িয়ে পড়ায় গ্রামীন চিরাচরিত অনুষ্ঠান সম্পর্কে নিচুধারণা তৈরি হয়েছে। উচ্চবর্ণের মেয়েদের মধ্যে ব্রত ও তার আনুষঙ্গিক নাচ বর্জন করার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।



মাঘ মাসের প্রতি রবিবার সূর্যব্রত করেন মেয়েরা তাদের পরিবারের সকলের কল্যাণের জন্য। মাটির উঠোনের মাঝখানে মাটি খুঁড়ে বর্গাকৃতি যজ্ঞপুকুর তৈরি করে তার পাড়ে একটি ছোট্ট কলাগাছ পুঁতে দেওয়া হয়। কলাগাছটি ফুল দিয়ে সাজানোর পর পুকুরের চার ধারে মেয়েরা বিভিন্ন রঙের চালের গুঁড়ো দিয়ে নানা ধরণের নক্সা আলপনা আঁকেন। তারপর মেয়েরা করতাল ও কাঁসি বাজিয়ে নেচে নেচে গান করেন।

ব্রত পালনকারী মেয়েরা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে সারাদিন ওঁরা বসবেন না, দাঁড়িয়ে থাকবেন। এই সময়ের কষ্ট অনেকটা লাঘব হয় নাচে ও গানে। সূর্যাস্তের পর ব্রতিনীরা বসেন। সাধারণত গ্রামেই এই ব্রত পালন হয়। প্রতি সপ্তাহে যে বাড়িতে সূর্যব্রত হবে বলে নির্ধারিত হয় সেখানে গ্রামের মেয়েরা গিয়ে জড়ো হল।

২. ভাঁজো ব্রত বা ভাদুলি ব্রত

ভাদ্র মাসে ঋতুর প্রকৃতি বর্ণিত হয় যে ব্রতে পূর্ববঙ্গে তাকে ভাদুলি এবং পশ্চিমবঙ্গে বলা হয় ভাঁজো ব্রত। বর্ষার ধারাজলের স্রোত এবং প্রকৃতির উর্বরতা রূপকাকারে ছড়ায় ও আলপনায় আঁকা হয়। তার সঙ্গে দেবীর কাছে প্রার্থনা করা হয যা বাড়ির পুরুষ মানুষরা যারা বিদেশে বাণিজ্য করতে গেছে তারা যাতে নিরাপদে ঘরে ফিরে আসেন। অন্যান্য ব্রতের মতো ভাদুলি ব্রত হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণীর মেয়েরাই পালন করতেন।

এখন দরিদ্র শ্রেণীর মেয়েদের জন্য তা বরাদ্দ করার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। বয়স্কা মহিলা এবং বালিকারা ব্রত নৃত্যে যোগ দেয়। বয়স্কা মহিলারা আজকাল একটু রাত হলে পুরুষের দৃষ্টিতে বাইরে গোপনে এই নাচে যোগ দেন। বালিকাদের বেলায় অবশ্য এ ধরণের কোনো নিষেধ নেই। ভোরবেলা ইন্দ্রদ্বাদশী তিথিতে যখন ইন্দ্রের পূজা হয় গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা তখন জড়ো হয়ে কাছের কোন জায়গা থেকে বালি সংগ্রহ করতে। গ্রামের কাছে ছোট নদীর পাড় থেকেই সাধারণত বালি সংগ্রহ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে পাশাপাশি দুই গ্রামের বালিকাদের মধ্যে এ নিয়ে বেশ প্রতিযোগিতা হয় কোন কোন দল সবার আগে বালি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারে। আগে গাঁয়ের যুবকরা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিত। সেটা ছিল অনেকটা শারীরিক শক্তির প্রতিযোগিতার মতো। বালি তোলবার সময় মেয়েদের দুদলের মধ্যে হাসি ঠাট্টা এবং পরস্পরকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। তারপর

তাদের মধ্যে শারীরিক শক্তির প্রতিযোগিতাও হয় কে আগে বালি তুলে নিতে পারে। বিজয়ীদল বালি নিয়ে চলে যাবার পর বিজিত দল বালি নিয়ে ফিরে যায়।

বাড়ি ফিরে মেয়েরা তাদের কুঁড়ে ঘরের দাওয়া থেকে এবং ইন্দ্রপূজার জায়গা থেকে কাদামাটি এনে বালির সঙ্গে মিশোয়। প্রত্যেক বালিকা সেই কাদামাটি বালি মেশানো খানিকটা এক একটি মাটির সরার ওপর রাখে। প্রত্যেক সরার মাটিতে মেয়েরা তখন পঞ্চ শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেয় এবং তারপর তার ওপর এক প্রস্থ বালি ছড়ায়। এজন্য একে কখনো শাসপাতার অর্থাৎ শস্য পাতার ব্রতও বলা হয়। অর্থাৎ বীজ পুঁতে শস্য ফলানোর ব্রত। তারপরের সাতদিন বালিকারা খুব ভোরবেলা বাড়ির পুকুরে স্নান করে জল এনে সবার ওপরে বীজতলায় জল সিঞ্চন করে। তারপর মেয়েরা সরা ঘিরে নেচে নেচে গান করে। নাচের বিরতির সময়ে বালিকাদের মধ্যে হাসিঠাট্টার মেজাজে বাক্যবিনিময় হয়। মুখে মুখে ভঞ্জের উদ্দেশে ছড়া কাটাও হয়। সবটাই সাম্প্রতিক কোনো ঘটনা নিয়ে মজা করে বলা।

দেবীকে পরিবারেরই একজন বলে মনে করা যাকে নিয়ে অনায়াসে হাসিমস্করা করা চলে। কিন্তু এই ব্রতের আরও গভীর তাৎপর্য আছে। তা বোঝা যায় যখন আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়। ভাদুলি ব্রতে নিম্নলিখিত ছড়া আবৃত্তি করা হয়।

এ নদী সে নদী একখানে মুখ
ভাদুলি ঠাকুরাণী ঘুচাবেন দুখ।
এ নদী সে নদী একখানে মুখ
দিবেন ভাদুলি তিনকুলে সুখ।
নদী, নদী! কোথায় যাও?
বাপ ভায়ের বার্তা দাও।।

৩. মাঘমণ্ডল ব্রত

মাঘ মাসের ব্রতের নাম মাঘমণ্ডল ব্রত। এই ব্রত পালন করে কুমারী মেয়েরা। এই ব্রতের নাট্যভাবনায় সূর্য ও বসন্তই হল প্রধান ভূমিকায়।

মাঘমণ্ডলে সূর্যের সঙ্গে তরুণী চাঁদের প্রেম নিয়েই লোকপ্রচলিত নাটক। এ নাট্যভাবনা মেয়েদেরই সৃষ্টি।

৪. তোষলা ব্রত বা তুঁষ-তুঁষলি ব্রত

এই ব্রতটি হয় পৌষ মাসে। ভূমি তখন সার পেয়ে সমৃদ্ধ। এ হল তারই প্রতীকি উৎসব। ধানের তুষের সঙ্গে গোবর মেখে ছোট ছোট মণ্ড করা হয়। সারি সারি মাটির সরা সাজানো হয়। প্রত্যেক সরায় একটি করে বেগুন পাতা। পাতার ওপরে সেই সারের মণ্ড এক একটা করে রাখা হয়। প্রত্যেক মেয়ে হাতে সরা ও সারমাখানো মণ্ডটি হাতে

তুলে নেয়। তারপর তারা শোভাযাত্রা করে যায় মাঠে এবং সেখানে গিয়ে ছড়া কেটে এবং নেচে নেচে ব্রত পালন করে। একটি প্রচলিত ছড়ার শেষাংশে এই কামনা প্রকাশ করা হয় ঃ

ঘর করব নগরে
মরব গিয়ে সাগরে
জন্মাব উত্তম কুলে
তোমার কাছে মাগি তাই বর
স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।

৫. ঘট ওলানো ব্রতনৃত্য

ঘট ওলানো অর্থাৎ ঘট স্থাপন ব্রত নৃত্যটি আমি যশোহর জেলার রাজঘাট গ্রামে আবিষ্কার করি ১৯৩২ সালে। হিন্দু সমাজের সম্ভ্রান্ত মহিলারা তা করতেন। রাজঘাট গ্রামটি ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত। সেখান থেকে অল্প-দূরত্বে রয়েছে বুনা বলে একটি জায়গা সেখানে শীতলাদেবীর (যিনি গুটি বসন্ত রোগ থেকে রক্ষা করেন বলে লোকের বিশ্বাস) প্রাচীন একটি মন্দির আছে। মন্দিরের কাছে একটি বিরাট বটগাছের তলায় রয়েছে শীতলাতলা। কাছাকাছি ষাট-সত্তরটি গ্রামের মেয়েরা এখানে আসে শীতলাদেবীর পূজো দিতে। মেয়েরা বন্ধ্যাত্ব দূর করার জন্য, বসন্ত রোগ থেকে বাঁচার জন্য এবং অন্যান্য বাসনা পূরণের জন্য দেবীর কাছে মানৎ করেন। পূজোর জন্য নির্ধারিত দিনের তিন, পাঁচ অথবা সাতদিন আগে যিনি মানৎ করেছেন তাঁর বাড়িতে অধিবাস অনুষ্ঠান করা হয়। সেদিন তিনি নিজে উপোস পালন করেন। এই উপলক্ষে গ্রামের সব বয়স্কা মহিলাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

আমন্ত্রিত মহিলারা এলে সকলে শোভাযাত্রা করে নদী বা পুকুরের ঘাটে যান উলুধবনি দিতে দিতে। এই উলু দেওয়া একটি চিরপ্রচলিত প্রথা হিন্দু সমাজে। সকল শুভ অনুষ্ঠানেই মেয়েরা মিলে উলুধবনি দেন। যিনি দেবীর কাছে মানৎ করেছেন সেই মহিলা তখন একটি কুলোর ওপরে পেতলের ঘট বা কলসী বসিয়ে জলে ডুব দিয়ে স্নান করেন। কুলোর ওপর কলসীটি থাকে তার মাথার ওপর। স্নান সেরে উঠে কুলোর ওপর জলে ভরা ঘটটি মাথায় করে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। অন্যান্য মেয়েরাও একসঙ্গে শোভাযাত্রা করেন ফিরে আসার সময়ে। বাড়ি ফিরে উৎসর্গীকৃত জলভরা পাত্রটি পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করেন। আমন্ত্রিত মহিলারা সেই কুঁড়ে ঘরেই সারারাত জেগে ঘট পাহারা দেন। সেই রাতে তাঁরা খালি গলায় সকলে মিলে গান গেয়ে সময় কাটান। প্রথমে গাওয়া হয় বন্দনা গান।

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর বেশ কয়েকদিন ধরে মহিলারা এবং কুমারীরা সেই উৎসর্গীকৃত পবিত্র কুলো নিয়ে শোভাযাত্রা করে বাড়ি বাড়ি যান দান প্রার্থনা করতে—চাল বা টাকাকড়ি যা সংগ্রহ হবে তা দিয়ে সাড়ম্বরে পুজো করা হবে এই বাসনায়।

যে বাড়িতে ভিক্ষার দান গ্রহণ করতে যাওয়া তার গৃহকর্ত্রী তখন উঠোনে একটি আসন পেতে দেন। কুলো এবং জলভরা পবিত্র পাত্রটি সেই আসনে স্থাপন করা হয়। (তা থেকেই ঘট আওলানো নাচ কথাটির উৎপত্তি। ব্রতী মেয়েরা তখন সেই আসনটি ঘিরে নাচেন। সঙ্গে ঢাক বাজায় একজন পুরুষ। এরা হল চিরাচরিত ঢাকী শ্রেণীর। তাদের ঋষি জাতের লোক বলা হয়।

এভাবে তারা পালা করে এক একটি বাড়িতে যান কাছাকাছি গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় তিন, পাঁচ বা সাতদিন ধরে যেমন প্রয়োজন হয়। তারপর মহিলারা দল বেঁধে যান মন্দিরে মানতের পূজো দিতে। এটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও নাচগুলো শুধু চিরাচরিত রীতিতে হয় না। কতকগুলো নাচ অবশ্যই লোকাচার অনুযায়ী হয়। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয় গ্রামীন মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও জীবনের আনন্দ প্রকাশ। কতকগুলি নৃত্যভঙ্গিমায় স্পষ্টতই ফুটে ওঠে গ্রামজীবনের দৃশ্য ও ঘটনাবলীর কৌতুক রসশ্রিত মূকাভিনয়। ঘটওলানো ব্রত নৃত্যের প্রধান তিনটি ভাগ ঃ

১. বন্দনা ২. অরুণা ৩. বায়েনা

১. বন্দনা নৃত্যের কয়েকটি উপশাখা আছে। ক. কোমর থেকে শরীর আনত করে হাতের আঙুল নিচের দিকে রেখে করতল দিয়ে ভূমি স্পর্শ করা হয়। তারপর ধীরে ধীরে হাত দুটো ওপরের দিকে তোলা হয়। সোজা হয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত হাতের আঙুলগুলোকে কাঁপানো হয়।

খ. শরীরটাকে আনত করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর ডগা দুটো যুক্ত করা হয়। অন্যান্য আঙুলে ধরা থাকে দুর্বা ধান বা বেল পাতা অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মাঝখানে। হাতগুলো কব্জি থেকে এই অবস্থায় বারে বারে ঘোরানো হয়। নাচিয়েরা তখন গোল হয়ে হালকা পায়ে বাঁ দিকে ও ডাইনে ঘুরে ঘুরে নাচেন।

গ. শরীর ও আঙুল উপরোক্ত অবস্থায় ধরা থাকে। হাত দুটো কখনো ডান দিকে কখনো বাঁ দিকে একই সময়ে কাঁপানো হয়।

ঘ. শরীর সামনের দিকে আনত করা হয়। ডান দিক থেকে বাঁ দিকে হালকাভাবে পা দুটো ফেলা হয়। ডান হাতটি ধীরে ধীরে মাথার ওপরে এমনভাবে তোলা হয় যেন মাথায় কিছু ঢালা হচ্ছে।

হাতের ভঙ্গি একই রেখে শুধু দিক বদল করা হয়। বাঁ দিকে ডান দিকে পা দুটো হালকা চালে চালানো হয়। এভাবেই বন্দনা নৃত্য শেষ হয়। মূল ভঙ্গি হল ডান দিক

থেকে বাঁ দিকে হালকা ভাবে পদ চালনা। কোমর থেকে শরীর আনত করা হয়। দুই হাত ও করতল থাকে ওপরের দিকে ওঠানো। বাঁ হাতের আঙুল ডান হাতের আঙুলের ওপর রেখে এই জোড়া হাত কব্জি থেকে নাড়ানো হয়। মূল নৃত্যভঙ্গি শেষ হবার আগে করতল দুটি খুব কায়দা করে একই সঙ্গে নিচে নামানো হয়। একবার ডান দিকে এবং পরের বার বাঁ দিকে।

২. অরুণা নৃত্যের তিনটি উপশাখা ঃ

ক. অর্চনা খ. অঞ্জলি এবং গ. প্রণাম।

ক. কোমর থেকে শরীর থাকবে আনতভঙ্গিতে। পা দুটো ডান দিকে থেকে বাঁ দিকে হালকাভাবে চলবে। হাতগুলো থাকবে সামনের দিকে করতল নিচের দিকে। সঞ্চালিত হবে ঢেউয়ের মতন।

খ. শরীর এই অবস্থায় তাকবে। পা দুটো চলবে হালকাভাবে বাঁ দিকে ডান দিকে। করতল মাটির দিকে ওল্টানো। তারপর ধীরে ধীরে তা উঠবে কব্জি ঘুরিয়ে। দু হাতই অঞ্জলি দানের ভঙ্গিতে সামনের দিকে অবস্থান করবে। পা চলবে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে মাটি ঘষে ঘষে।

গ. শরীর থাকবে সোজা, মাথা সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকে। বাঁ পা এগুনো থাকবে গোড়ালি দিয়ে মাটি ঠুকে। একই সঙ্গে বাঁ হাতটিও থাকবে কপাল পর্যন্ত ওঠানো। ডান পা ও ডান হাতেরও একই রকম সঞ্চালন হবে। একই সঙ্গে ঢাকের বাদ্যির তালে তালে নাচিয়েরা ডান দিকে সম্পূর্ণ ঘুরে থাকেন। এ কাজ করার পর দুহাত দিতেই কোমর ধরে আরেকবার সম্পূর্ণ ঘুরে যাবেন তারা হালকা পা ফেলে। কিন্তু এবারে বাঁ দিকে সম্পূর্ণ ঘুরে যাবার সময় শরীরটা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে থাকবে।

৩. বায়েনা নাচে বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জনীর আঙুল দুটো জোড়া থাকে। অন্যান্য আঙুল থাকে সামনের দিকে প্রসারিত। প্রথমে বাঁ হাতটি থাকে সামনে প্রসারিত। ডান হাতে থাকে বুকের কাছে দুটো হাতই ঢেউয়ের মতন কম্পন তুলে নাচিয়ে হালকা পদক্ষেপে সম্পূর্ণ ঘুরে যায়। কোমর দুলতে থাকে এপাশ থেকে ওপাশ। হাতদুটো একটার ওপর আরেকটা রেখে মাথা সামান্য বাঁ দিকে কাৎ করে রাখা হয়। এই নাচের আরেকটা ধরন হল হাতদুটো শরীরের সামনে না রেখে কাৎ করা অবস্থায় মাথার ওপর তুলে ধরা হয়। উপরোক্ত পদ্ধতিতেই নাচের আচরণীয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। তারপর আরও কয়েকটি নাচ হয় যা আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে পড়ে না। মেয়েরা তখন নাটকাভিনয়ের মতো গ্রামজীবনের নানা ঘটনা যেমন কুল কুড়ানো, কিসমিস খাওয়া, পুদিরামের মাথার যন্ত্রণা, বৈরাগীর ডাক, তামাক পোড়ানো, ধানভানা ইত্যাদি। খালি হাতে মূকাভিনয় করা হয় এগুলো প্রত্যেক নাচের বিষয়ের নাম উল্লেখ করা হয়। শরীরটা তখন থাকে হালকাভাবে কোমর থেকে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে।

ক. কুচিয়া বা কুঁচে মোড়া (শরীর বাঁকানো) নৃত্য

মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতটি চিবুক স্পর্শ করে রাখা হয়। চিবুকটি সামান্য ওপরের দিকে তোলা অবস্থায় রেখে বাঁ হাত দিয়ে কোমর ধরা থাকে। এই অবস্থায় কোমর থেকে



দেহের ঊর্ধবাংশ ঝাঁকুনি সহ ক্রমশঃ বাঁকানো হতে থাকে ঢাকের বাদ্যির তালে তালে এবং এভাবেই শরীরটাকে ধীরে ধীরে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘোরানো হতে থাকে। ঢাকের বাজনার সঙ্গে পা দিয়ে তাল রাখা হয়। এই ভঙ্গিটি হাত দুটি আড়াআড়িভাবে রেখে কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করা হয়। নাচটি প্রথমে ধীর লয়ে শুরু হয়ে ক্রমশ দ্রুত তালে করা হয়। এ নাচটি সম্পূর্ণ শারীরিক কসরৎ যার ফলে তলপেটের পেশীর ব্যায়াম হয়।

খ. পিঁপড়ে-মারা নাচ

এই নাচের প্রথম ভঙ্গি হল হাঁটুমুড়ে বসে থাকা অবস্থান থেকে উঠে দাঁড়ানো। ঢাকের বাজনার প্রতিটি তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচিয়েরা শরীরে ঝাঁকুনি দেয় প্রত্যেকবার। মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি থাকে মাটির কাছাকাছি। হাতের কব্জি শিথিল করে বারে বারে ঘোরানো হয় যতক্ষণ না শরীরটা সম্পূর্ণ সোজা দাঁড়ানো অবস্থায় পৌঁছয়। তারপর হঠাৎই হাতদুটো পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। করতল থাকে প্রসারিত অবস্থায়। এই ভঙ্গিটির পুনরাবৃত্তি করা হয়। হাত দুটো পর্যায়ক্রমে কাঁধের এ পাশে এবং ওপাশে রাখা হয়।



গ. জোড় নৃত্য

নাচিয়েবা জোড়ায় জোড়ায় হাত ধরাধরি করে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে মুখো-মুখি দাঁড়ায় বাহুর সামনের দিকটা থাকে ওপরের দিকে কনুইয়ের ওপরের দিকের

বাহু থাকে নিচের দিকে। এই অবস্থায় নাচিয়েরা দুপায়ে থপ্ থপ্ করে কয়েকবার লাফ দিয়ে একটা কেন্দ্র বিন্দুর দিকে এগোয়। এভাবে বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুর যতটা সম্ভব কাছে থাকার পর তারা কনুইয়ের ওপরকার বাহু দুটি ওপরের দিকে তুলে সামনের বাহু নিচের দিকে নামায়। এভাবে তারা বৃত্তের পরিধির কাছে চলে যায় লাফ দিতে দিতে। এটা কয়েকবার করা হয়ে থাকে।



ঘ. ধানভানার নাচ

এই নাচ জোড়ায় জোড়ায় কমবয়সী মেয়েরা ঢেঁকিতে ধানভানার অনুকরণ করে নাচে। একটি মেয়ে দুহাত ওপরে তুলে দাঁড়ায় যেন কুঁড়ে ঘরের চাল থেকে ঝোলানো দড়িতে হাত দিয়ে ধরে আছে। একবার ডান পা রাখে ঢেঁকির পেছনের দিকটাই যার ওপর পায়ের চাপ দিয়ে ধান ভানা হয়। আরেকবার বাঁ পা একই ভাবে তার ওপর রাখে। তার সামনে বসে অন্য মেয়েটি হাত দিয়ে বারবার ধান উল্টে দেবার অভিনয় করে। ধানের ওপরে দিয়ে ঢেঁকির সঙ্গে লাগানো থাকে ধানভানার হাতুড়ি মতো লোহার একটা খণ্ড। এভাবে ঢেঁকি পাড় দেওয়া হয়। একবার লোহার দিকটা পড়বে আর উঠবে। তার ফাঁকে ফাঁকে ধান উল্টে পাল্টে দেবে আরেকটি মেয়ে। এই হল ধানভানার নৃত্যছন্দ। সঙ্গে সঙ্গে তারা গান গায়। তার নমুনা দেওয়া হল।

মেঘরানীর নাচ

মেঘরানীর নাচ অত্যন্ত সুন্দর এক নৃত্যশিল্প। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, বর্ষার আগে বৃষ্টিকে আবাহন করে মহিলারাও বালিকা মেয়েরা যে ব্রত করেন তাতে এই নৃত্য পরিবেশন করা হয়। শাড়ির আঁচলের দুটো দিক মাথার ওপরে সুন্দর ভাবে টেনে দিয়ে এই নাচে তারা যোগ দেন।



পা দুটো হালকাভাবে কখনো তুলে মাটি ঘষে ঘষে চালনা করা হয় সঙ্গীতের তালে তালে।

গান গাইবার সময় নাচিয়ে মেয়েরা হঠাৎ অর্ধবসা অবস্থায় ফিরে গিয়ে ডান দিকে ঘুরে যান আবার সোজা উঠে দাঁড়িয়ে গানটি শেষ করেন।

সামাজিক অনুষ্ঠান ও কল্যাণ কামনার প্রেরণা

বিয়ের নাচ

বাংলার হিন্দুসমাজে বিবাহ উপলক্ষে সম্প্রদানের মতো পুরোহিত কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান থাকলেও আসলে বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকর্ম হল একগুচ্ছ স্ত্রীআচার যা পরিবারের মেয়েরা ও গ্রামের মেয়েরা নিজেরাই স্বতন্ত্রভাবে পালন করে থাকেন। এই আচার অনুষ্ঠান প্রায় পক্ষকাল ধরে হয়ে থাকে এবং সঙ্গে থাকে বিয়ের গীত ও নৃত্য। এই গান মেয়েরা ঢোলের বাজনার সঙ্গে করে থাকেন। ঢোল বাদক হলেন একজন পুরুষ। প্রথানুযায়ী এইসব গানগুলিতে কোন বিশেষ বর বা কনের নামোল্লেখ থাকে না। এই আচার অনুষ্ঠানগুলিতে রাম-সীতা বা শিব ও উমার বিবাহের প্রতীক রূপে ধরা হয়। এই গানগুলি মেয়েদেরই রচনা এবং তার সুরও তাদেরই দেওয়া।

নাচের ভঙ্গি ব্রতনৃত্যের মতন। তেমনি হালকা পায়ে ঘষে ঘষে চলা। এ উপলক্ষে ধামাইল নাচও করা হয়। ফরিদপুর জেলায় বর্তমানে বাংলাদেশের কোন কোন জায়গা বিয়ের নাচ এখনও যা প্রচলিত আছে তার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছেঃ

ক. গঙ্গাবরণ নাচ
খ. অষ্টসখীর নাচ
গ. সাজানো নাচ
ঘ. ঢোল বা মাদল পূজানৃত্য
ঙ. ধূপী নৃত্য
চ. ফুলশয্যা নৃত্য
জ. দ্বিরাগমন নৃত্য

ক) গঙ্গাবরণ নাচ ঃ বিয়ের আগের দিন মেয়েরা দল বেঁধে পুকুরে গিয়ে কলসীতে করে জল ভরে আনেন এবং গঙ্গাদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে একটি অনুষ্ঠান করেন। এজন্যই এর নাম গঙ্গাবরণ অনুষ্ঠান। এজন্যই এর নাম গঙ্গাবরণ অনুষ্ঠান।



খ) অষ্টসখীর নাচ ঃ বরণডালাটি সোহাগ হাঁড়ির ওপর রেখে তাকে ঘিরে মহিলারা ঘুরে ঘুরে নাচেন ঢোলের বাজনার তালে তালে হালকাভাবে পা ফেলে ও মাটি ঘষে ঘষে এগিয়ে। একটি হাত থাকে সম্পূর্ণ প্রসারিত,

অন্য হাতটি পর্যায়ক্রমে একবার শরীরের সামনে ও একবার দূরে সরিয়ে আনা হয়। তার সঙ্গে অনুষ্ঠান উপযোগী গান গাওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষ করে মেয়েরা বাড়ি ফিরে আসেন। বর বিয়ের উদ্দেশে কনের বাড়ি যাত্রা করার আগে তারা অষ্টসখী নৃত্য পরিবেশন করেন।

গ) সাজানো নাচ ঃ সাজানো নৃত্য পরিবেশিত হয় যথোপযুক্ত ভঙ্গিতে এবং ক্রিয়াকর্মে যেমন বরের মাথায় মুকুট পরানো এবং বাঁশিতে সুর তুলে।

ঘ) ঢোল বরণ বা মাদল পূজা নৃত্য

বিয়ের আগের দিন কনের বাড়িতে মাদল পূজা বা ঢোল বরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঢোল বাজান সমাজের দরিদ্রতর ঢোলবাদক শ্রেণীর পুরুষেরা। ঢোলটি শ্রদ্ধা-সহকারে মাথার ওপরে রেখে দৈব ছন্দের প্রেরণা প্রার্থনা করা হয়। মাদলপূজা বা ঢোলবরণ ব্রাহ্মণ পরিবারেও প্রচলিত আছে। ঢোলবাদক তার ঢোলটি খাড়া করে সামনে ধরে থাকেন গৃহকর্ত্রী তখন উৎসর্গীকৃত কুলো ভর্তি ধান নিয়ে নাচতে নাচতে কুলো সামান্য কাৎ করে ঢোলকাঠির ওপর আশীর্বাদী ধান ঢেলে দেন। ঢোল বাজনদার আবার সেই ধান তুলে কুলোর ওপর রাখেন। গৃহকর্ত্রী কুলোভর্তি ধান নাচতে নাচতেই আবার সেই ধান ঢোলের ওপর ঢেলে দিতে থাকেন। এভাবে কয়েকবার অনুষ্ঠানটি হয়।





তারপর কুলোটি মাটিতে রাখা হয়। গৃহকর্ত্রী সেই কুলোর ওপর বসে পড়েন এবং তাকে ঘিরে ধান কুড়িয়ে আবার কুলোর ওপর রাখার ভঙ্গি করে নাচেন।

ঙ) ধূপী নৃত্য

বিবাহের সময় মেয়েরা ধূপী নৃত্য করেন যখন কনে চিরাচরিত প্রথায় বরের চারদিকে সাত পাক দেয়। এ সময়ে নিম্নলিখিত গান গাওয়া হয়।

বিয়ের পর দিন বাড়ির মেয়েরা গান করেন।

নাচবার সময় হালকা পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে হাত দুটি একবার কোমরে আর একবার কপাল স্পর্শ করে। কখনও কখনও বিয়ের আগে কনের স্নান অনুষ্ঠানের সময়ও এই গান গাওয়া হয়।



চ) ফুলশয্যা নৃত্য

বিয়ের পর দ্বিতীয় দিনে ফুলশয্যার নাচ পরিবেশিত হয়। এই নাচের সময় শাড়ির আঁচল মাথার ওপরে তুলে দেওয়া হয় এবং লঘু ভাবে পদচালনা করা হয়।

ছ) প্রণাম নৃত্য

বিয়ে হবার পরদিন যখন নববধূ তার বাপের বাড়ি ছেড়ে বরের বাড়িতে যাত্রা করে তখন বাড়ির মেয়েরা বরবধূর সামনে প্রণাম নৃত্য পরিবেশন করেন। এই নাচের সময় ডান ও বাঁ পা পর্যায়ক্রমে মাটি থেকে ওপরে তোলা হয় এবং দুটি হাত পর্যায়ক্রমে করতলের উল্টোপিঠ দিয়ে কপাল স্পর্শ করে।

জ) দ্বিরাগমন নৃত্য

দ্বিরাগমন উপলক্ষে নানারকম বৈচিত্র্যময় নাচ পরিবেশিত হয়। উপলক্ষ হল যখন বালিকাবধূ তরণী হয়ে বাপের বাড়ি থেকে বরের বাড়িতে বাস করতে যায়। এরই নাম দ্বিরাগমন। এই নাচের বিষয়বস্তু নাটকীয়ভাবে গ্রামীণ জীবন আলেখ্য প্রদর্শন—ধান বোনা, ধান পাকলে ঘরে তোলা, ধানের সঙ্গে মেশানো আগাছা ছাড়ানো, ধান মাড়াই, গরু বিক্রয় করা, কররেখা বিচার করে ভবিষ্যদ্বাণী করা। এগুলো কৌতুক হাস্যময় উপাদান দিয়ে তৈরি। বিয়ের সময়ে যে সানন্দ আগ্রহ নিয়ে নাচ ও গান করা হয় তার থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। পূর্বোক্ত ব্রত নৃত্যের মতোই এই নাচের ভঙ্গি ও পদচালনা। হাতের মুদ্রা দিয়ে প্রত্যেকটি বিষয়ের মূকাভিনয় করে দেখানো হয়। কয়েকটি বিষয় যেমন গরু বেচা কিংবা হাত দেখে ভাগ্য গণনার সময় যথারীতি উপযুক্ত সংলাপও বলা হয়। প্রাচীনকালে কনে যখন শ্বশুরবাড়ি যেত তখন তার নাচের দক্ষতা একটি আবশ্যিক গুণ বলে বিবেচিত হত। নতুন বউকে সবার সামনে নেচে তার দক্ষতা প্রমাণ করতে হত। নাচের সময় নতুন বউকে পায়ে ঘুঙুর পরা মল পরতে হত। যে নববধূ নাচে দক্ষতা দেখাতে পারত না তার পক্ষে কোনো ওজর আপত্তি শ্বশুর বাড়ির লোকেদের মনঃপূত হত না।

আনন্দময় স্ব-মিলনের প্রেরণা

বাউল নৃত্য

বাউল গান ও নাচ বাংলার সর্বত্র প্রচলিত। একা অথবা দলবদ্ধ ভাবে বাউলেরা নাচেন এবং গান করেন। সঙ্গে থাকে আনন্দলহরী (প্রচলিত কথায় গাবগুবা) এবং



একতারা। কোনও কোনও জায়গায় করতাল ও ডুরকি ব্যবহার করা হয়। বাউলদের পরণে থাকে আজানুলম্বিত সোজা সেলাই করা আলখাল্লা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ পোশাক পরা হয় না।

কখনও কখনও উৎসব উপলক্ষে বাউলের পোশাক পরে এবং আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাউল গান করেন ও নাচেন। এসবক্ষেত্রে একজন গানের নেতৃত্ব দেন অন্যরা সমবেত কণ্ঠে গানের ধুরা দেন। বাউল গান কোনও বিশেষ উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে হয় না। তারা স্বাধীন ভাবে আনন্দময় আত্মিক সাধনার অভিব্যক্তি এবং সমাজের জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান হিসেবে গান করেন নেচে নেচে। বাউল শব্দের অর্থ বাতুল বা পাগল। অনন্ত শক্তিময়ের সঙ্গে আত্মিক মিলনের আকুলতার প্রকাশ বাউলের গান। তাদের গানেও পার্থিব বস্তুর অবাস্তবতার কথাই উচ্চারিত হয়। বিশ্বজনের সঙ্গে সৌভ্রাত্র্য এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বার্তা প্রচার করেন তারা। অনেক সময় বাউলরা বসেও গান করেন। তাতে নৃত্য থাকে না।

বাউল একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। তাদের নিজস্ব এবং বিশিষ্ট ধর্মভাবনা আছে তারা পার্থিব বস্তুর প্রতি অনাগ্রহী। জীবন ধারণের উপযোগী ন্যূনতম প্রয়োজন ছাড়া কোন আকাঙ্খা নেই। তারা জাতপাতে বিশ্বাস করেন না। তারা কোন দেবতার বিগ্রহ পূজো করেন না। কখনও কোনও মন্দিরেও প্রবেশ করেন না। তাদের কাছে নিজের দেহটাই পবিত্র মন্দির। বাউল জানেন সেখানেই অবস্থান করেন তার মনের মানুষ, সর্বশক্তিমান বিশ্ববিধাতা যা তারই নিজস্ব উচ্চস্তরে বিরাজমান সত্তা। নিজের দেহের মধ্যে দেবী সত্তার সহাবস্থানের এই ভাবনাই বাউলকে মনের মানুষের অন্বেষণে প্রেরণা দেয়। সেই অন্বেষণ তো অন্তহীন। কারণ একই দেহে খুবই সন্নিকটে দয়িতের অবস্থান সত্ত্বেও তা তার আয়ত্তের বাইরে। বাউল সেজন্যই তার দয়িতের জন্য চিরঅন্বেষণে চিরকালের উন্মাদ। বাউলের গানকে বলা হয় দেহতত্ত্বের গান।



বাউলের একমাত্র উপাসনা গানের অর্ঘ্য সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত খোলামেলা ভাষার গান। বাউল ভাবেন একমাত্র এর দ্বারাই জীবাত্মার সঙ্গে অন্তরাত্মার মিলন সম্ভব। বাউল গান ও নাচের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল আনন্দময় আত্মভোলা ভাবনা এবং সেই ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সহজভঙ্গিতে নাচ। মনে হয় বিশাল কোন দিঘি বা সরোবরের জলের ওপর দিয়ে বসন্তের দক্ষিণা বাতাস বয়ে যাচ্ছে মৃদু কম্পন তুলে।

বাউল নাচের পদ্ধতি হল এইরকম। বাউল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শরীরের সমস্ত ভার পালাক্রমে ডান ও বাঁ পায়ের ওপর রাখে। একপায়ে দাঁড়াবার সময় অন্য পাটি সেই পায়ের কাছে এনে তার ওপরে রাখা হয়। কখনই তা মাটির ওপর স্থাপন করা হয় না দুটো হাঁটুই সামান্য আনত অবস্থায় থাকে। যে পাটি সামনের দিকে আনা হয় সেটি সামান্য পাশের দিকে নিয়ে দেহের ভার অন্য পায়ের ওপর স্থানান্তরিত করা হয়। অন্য পা দিয়ে নৃত্যভঙ্গিমার পুনরাবৃত্তি চলে। অনেকসময় ডান পা সামনে লাথির মতন ছুঁড়ে দিয়ে বাঁ পায়ে লাফ দেওয়া হয়। বাদ্যযন্ত্রটি সাধারণত তখন একহাতে বাজানো হয় কখনও বা দুহাতেই। সাধারণত একটি হাত থাকে কোমরের কাছে অন্য হাত মাথার ওপরে বেশ উঁচুতে তুলে ধরা হয়। বাউল নাচ হল আধ্যাত্মিক প্রেম এবং আধ্যাত্মিক মিলনের নাচ।



মুর্শিদি গান ও নাচ

বাউল গানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যপূর্ণ হল মুর্শিদি গান ও নাচ। এই গান রচনা করেন মুসলমান ফকির ও তাপসেরা। সহজ তাদের নাচের ভঙ্গি। গ্রাম বাংলার মুসলমান গায়কেরা সারেঙ্গা বা একতারা বাজিয়ে এই গানে গেয়ে থাকেন। 'মুর্শিদ' কথার অর্থ হল গুরু বা শিক্ষক। মানুষের মধ্যে যে অনন্তশক্তির অধিষ্ঠান মুর্শিদি গানেও তারই কথা বারবার



উচ্চারিত হয়। বাউল গানের মতো সুফি দর্শনেও সঙ্গে বাউল দর্শনের ভাব সাধনা একই রকম। সুফিগানের সঙ্গে বাউলের রাধাকৃষ্ণের ভাবনারও সাদৃশ্য রয়েছে। সুফি দর্শনে মানবতা ও জাতীয়তার প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি মুর্শিদি গানে প্রতিফলিত। সমস্ত সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে এই দর্শন। সে কারণে অনেক সময় মুর্শিদি গানও বাউল সুরে গাওয়া হয়ে থাকে। মুর্শিদি গানের সঙ্গে খুবই সরল সহজ ছন্দে হাঁটু সামান্য আনত করে সময়ের তালে তালে নাচা হয়। নাচ এই গানের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। অধিকাংশ সময়ই মুর্শিদি গায়কেরা বসে গান পরিবেশন করেন।

আধ্যাত্মিক আত্মনিবেদন ও আত্মশুদ্ধির প্রেরণা

কীর্তন নৃত্য

কীর্তন নৃত্য বাংলা লোকনৃত্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত বাংলার গ্রামাঞ্চলে হিন্দুদের মধ্যে। কীর্তন বহু প্রাচীনকালের নাচ, বিষ্ণুর উপাসনায় নিবেদিত। কিন্তু তাকে জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন চৈতন্যদেব। কীর্তন কথার অর্থ প্রশস্তি কথন বা জয়ধ্বনি দেওয়া। উদ্দেশ্য হল কীর্তনীয়ারা আত্মনিবেদন করে দেবতার মাহাত্ম্য সঙ্গীতের মাধ্যমে বর্ণনা করেন। কীর্তনের সবচেয়ে উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য সম্ভবত তার গণতান্ত্রিক পরিবেশনা। গ্রামের ছেলে, বুড়ো, ধনী, নির্ধন জাতি নির্বিশেষ কীর্তনে যোগ দেন। কীর্তনের সময় খোল ও মৃদঙ্গ ব্যবহৃত হয়। কীর্তনীয়ারা বৃত্তাকারে নৃত্য পরিক্রমা করে থাকেন। কখনও কখনও মিছিল সহকারে কীর্তনীয়ারা গ্রামে পরিক্রমা করেন। তাকে বলা হয় নগর-কীর্তন। কীর্তন সর্বতোভাবেই বাংলার গ্রামীণ হিন্দু সমাজের জাতিগত নৃত্য ও সঙ্গীত। স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত এবং কৃত্রিমতা বর্জিত আধ্যাত্মিক আত্মনিবেদনের প্রকাশ হল কীর্তন। মৃদঙ্গের বোল হয় প্রবল ও বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে। কীর্তন নাচিয়েদের বলয়ের মাঝখানে অবস্থান করেন মৃদঙ্গ বাদকরা। তারা মৃদঙ্গ বাজান বেশ প্রবল শক্তিতে এবং নাচেনও। কীর্তনের সুর সহজ ও সরল হলেও কখনও তা খুবই কঠিন জটিলও হয়ে থাকে। বিরতির সময় প্রধান কীর্তন গায়ক সামনে এগিয়ে এসে পায়চারি করতে করতে আবৃত্তির ভঙ্গিতে গানের নিহিতার্থ শ্রোতাদের বুঝিয়ে বলেন। তখন মৃদঙ্গের তালে তালে তিনি সহজ নাচের ভঙ্গি করেন।



কীর্তন নৃত্যের মধ্যে দুটি আকাঙ্খার মিলিত রূপ দেখা যায়। জীবনের পরিবর্তন এবং আত্মশুদ্ধি। এই দুটি প্রেরণা নিয়েই তারা পরমেশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন করেন। তাকে ডাকা হয় হরি। হরি শব্দের ধাতুগত অর্থ হল যিনি আধ্যাত্মিক জীবনের পথে সমস্ত বাধা দূর করেন। নাচের প্রধান ভঙ্গিটিও হল সহজ ও অকৃত্রিম। দুহাত নমনীয় ভঙ্গিতে ওপরে তুলে প্রার্থনা বা আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে তারা নাচেন। নাচের অঙ্গ সঞ্চালনে কোনো রকম পূর্ব কল্পনা থাকে না। পা ফেলা হয় সহজ হাঁটার ভঙ্গিতে। প্রধান বৈচিত্র্য যা আনা হয় তাহল দুতিন বা চারপা কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া বাঁদিকে প্রায় সম্পূর্ণ উল্টোমুখো হয়ে আবার ডান দিকে সম্পূর্ণ উল্টোমুখো সেই কটি পা বৃত্তের কেন্দ্র থেকে দূরে চলে যাওয়া। এ ধরণের ছোটখাটো নৃত্যভঙ্গি করার সময়ে বৃত্তাকারে কীর্তনীয়াদের মূল গায়নভঙ্গি ও নৃত্যভঙ্গি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে অপরিবর্তিত অবস্থাতেই অব্যাহত থাকে।

কীর্তনের নাচের ভঙ্গি ও তার সুরের সারল্য ও অকৃত্রিম আন্তরিকতা নাচিয়েদের ওপর এক গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। যা অন্য কোনো জটিলতর ও পরিশীলিত এবং নাচের দ্বারা কিছুতেই সম্ভব না। কীর্তনের পদাবলী ও তার গায়নের সুর নৃত্যভঙ্গির সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐকতানে মিলে যায়। কীর্তনের মূল উপাদান নির্ভর করে মৃদঙ্গের বোলের ছন্দ ও লয়ের কাঠামোর ওপর। সমস্ত নাচের প্রেরণা জোগান দেয় মৃদঙ্গের বাজনার দক্ষতা এবং তা থেকেই নাচ ও গানের পরিবেশনায় বৈচিত্র্য গড়ে ওঠে মূল কীর্তনে।

কীর্তনের গান, নাচ এবং মৃদঙ্গের ছন্দিত বোল সবই একস্রোতে প্রবাহিত। বাংলার গ্রাম প্রবাহিনী নদী স্রোতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য। মৃদঙ্গ বাদকেরা যেমন প্রবলভাবে এবং মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে কীর্তন করেন তা দেখে মনে হয় যেন মাঝ নদীতে স্রোতের ঘূর্ণি উঠেছে। ধীর লয়ে কীর্তন যখন গাওয়া হয় নেচে নেচে তখন মনে হয় যেন হেমন্তের বাংলার শান্ত নদীর স্রোত বয়ে চলেছে। কীর্তনের সুর যতই চরমে ওঠে নাচের গতিও ততই দ্রুততর হতে থাকে। গ্রামের মানুষ অধিকাংশই খেত খামারে কাজ করে বা হাতের কাজ করে যেমন তাঁত বোনা অথবা কামারশালায়। সবই কঠিন পরিশ্রমের কাজ। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাবেলায় গ্রামবাসী প্রতিবেশীদের সঙ্গে তারা এসে কীর্তনে যোগ দেন দিব্যজীবনের সঙ্গে আত্মসংহতি স্থাপন করে পার্থিব জীবনের বিষয় আশয় সম্পর্কে নির্লিপ্ত নিস্পৃহ হতে। এটা তাদের সামনে সুযোগ এনে দেয়। স্ব স্ব শিল্পকর্মে এবং আত্মসংযমে প্রাথমিক শৃঙ্খলা ও দক্ষতা অর্জনের। আত্মভাবনার প্রকাশের এবং সকলের সঙ্গে সমতা, একতা ও সৌভ্রাত্র্য স্থাপনের সুযোগ করে দেয় কীর্তন গান ও নাচের মাধ্যমে। এতে প্রত্যেক শারীরিক ব্যায়ামেরও অভ্যাস হয়।

একাধিক দিক দিয়েই কীর্তন গান ও নাচের প্রক্রিয়া স্বভাবতই গণতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রথমত, কীর্তনের নাচ এবং তার গানের ভাষা এতই সহজ ও সরল সে অশিক্ষিত হলেও প্রত্যেক মানুষেরই তা বোধগম্য। এ কারণে সহজেই তারা তাতে যোগ

দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, অসীম অনন্ত দেবসত্তার প্রতি প্রত্যক্ষভাবে নিজেরাই প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করতে পারে পুরোহিতের সাহায্য ছাড়াই। তৃতীয়ত হিন্দুসমাজের ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ থেকে তথাকথিত নিম্নতম বর্গের মানুষ তাতে যোগ দিতে পারেন কীর্তনের আসরে সবাই সমান; উচ্চ নিচ ভেদাভেদের জায়গা নেই। চতুর্থত, কীর্তন যখন চরমে পৌঁছয় তখন নাচের আসরের প্রত্যেক একে একে নৃত্যগীতের বলয় থেকে বেরিয়ে এসে (খালি গায়ে শুধু একটা খাটো ধুতি কোমরে জড়ানো অবস্থায়) কীর্তনের আসরের মাটিতে গড়াগড়ি দেয় ভক্তদের পবিত্র পদধূলি শরীরে লেপনের জন্য উচ্চনিচ শ্রেণী নির্বিশেষে প্রত্যেক ভক্তের চরণ স্পর্শ করে পবিত্র হবার জন্য এভাবেই ধরিত্রী মাতার সস্নেহে আলিঙ্গনে ধন্য হয় তারা। কোনো ভাবঘোরের মধ্যে নয়, সম্পূর্ণ সচেতনভাবে তারা এই কাজ করেন আত্মশুদ্ধি ও আত্মপ্রসারের মহৎ উদ্দেশ্যে। প্রত্যেক ভক্ত এভাবে কয়েকবার কীর্তন প্রাঙ্গনের মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে আবার গিয়ে কীর্তনে যোগ দেয়।

এ সমস্ত উপাদান মিলিত হয়ে কীর্তন গান ও নাচ তৈরি হয়েছে একটি অকৃত্রিম আচনী অনুষ্ঠান হিসেবে যার লক্ষ্য হল অনন্ত অসীম বিধাতার সঙ্গে ব্যক্তির অন্তর্লীন মিলন এবং গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আত্মীয়তার প্রসার।

কীর্তন গান ভবনদী হিসেবে মানবজীবনকে কল্পনা করা হয়েছে সেই নদী বা সাগর সাঁতরে বা নৌকো করে ওপারে পৌঁছনোই মানবাত্মার পরম লক্ষ্য। এই নদী পার হতে যে বাধা বিপত্তি ও বিপদের আশংকা থাকে তাকে ভাবা হয়েছে আবহাওয়ার কারণে ঝড়তুফান এবং গভীর জলের ভিতরের বিপদ হিসেবে। এরা সাফল্যের সঙ্গে ভাব সাগর পথে বাধা দেয় দুর্নীতিগ্রস্ত করে বা; এবং জলমগ্ন করে যাতে মানবাত্মা সেই পরমকান্ত ও অনন্ত পরম পুরুষ হরি বা কৃষ্ণের সঙ্গে লীন হয়ে যেতে না পারে। সেই পরমপূর্ণ ও পরমসংহত সাদির্থ (হরি) পারে সমস্ত বাধা দূর করে যাত্রীকে (সাঁতারু বা নৌকোর মাঝি) ওপারে নিরাপদে পৌঁছতে সাহায্য করে। (যেখানে পরমপূর্ণ ও পরম সংহতির উদ্দীপ্ত পূণ্যভূমি)।

গ্রামের হিন্দুসমাজে সরলভাবে কৃত্রিমতা বর্জিত কীর্তন গান ও নাচ যেভাবে করা হয় এই পরিচ্ছেদে আমি তার বিবরণ দিয়েছি। এই সহজ সরল গায়নভঙ্গি ভিত্তি করে তাতে অনেক অলংকরণ যোগ করে আজকাল কীর্তন গানের অনেক বিবর্তন ঘটেছে। শেষোক্ত গায়কেরা সাধারণত বসে গান করেন অথবা নাটকীয়ভাবে পরিবেশন করেন। কিন্তু গ্রামীণ কীর্তনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগাপ্লুত সুর বা নৃত্যভঙ্গি তাতে থাকে না।

নীতি শিক্ষাদানের প্রেরণা

গাথা কাব্যের নৃত্য

গ্রাম বাংলার একটি বিশিষ্টতা হল তার গাথা গায়কদের নৃত্য। এই উপাখ্যানগুলি হল রামায়ণ, মহাভারত, পদ্মপুরাণ, রাধাকৃষ্ণের কথা থেকে নেওয়া। একদল গ্রামবাসী ধুতি পরে এই নাচ ও গান পরিবেশন করে। দলের একজন মূল গায়ক থাকেন। এই গানকে পাতা গান বা কিস্তিতে কিস্তিতে গান বলা হয়। গায়কের দল সমবেত কণ্ঠে গান করেন এবং গানের প্রাঙ্গনে বৃত্তাকারে যে গান হয় তার মাঝখানে তারা চলে আসে। অনেক সময়েই গ্রামের সমস্ত লোক জড়ো হল গাথাকাব্যের গান শুনতে ও নাচতে দেখতে। খুবই সরলভঙ্গির নাচ ও গান। একমাত্র মূল গায়েন গাথা আবৃত্তি বা নাচবার সময় হস্তসঞ্চালন করেন বিষয়টি প্রাঞ্জল করার জন্য। অন্যান্য নাচিয়েরা তা করে না। তারা শুধু ঘুরে ঘুরে নাচেন সহজ পদক্ষেপে। মূল গায়েনের হাতে সব সময় একটি চামর থাকে। গাইবার হাতে সব সময় একটি চামর থাকে। গাইবার ও নাচবার সময় তিনি চামরটি এপাশে ওপাশে দোলান। গানের বাদ্যযন্ত্রের অনুষঙ্গ হল খোল বা মৃদঙ্গ কীর্তনে যেমন ব্যাবহৃত হয়। বাংলার গাথা নৃত্যের চারটি প্রধান শাখা সত্যপীরের নাচ, সত্যনারায়ণ নাচ পদ্মপুরাণ এবং রামায়ণ নাচ।

১. সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ

গ্রামবাংলায় হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় সমন্বয়ের জন্য মুসলমানদের শুভ প্রয়াস হল সত্যপীরের সাধনা। তেমনি দুই ধর্মের সমন্বয় সাধনের জন্য হিন্দুদের মহৎ প্রচেষ্টা হল সত্যনারায়ণের সাধনা।



সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের পালাগান নাচের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই দলের নাচে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই যোগ দিয়ে থাকে।

সত্যপীরের নাচে মূল নাচিয়ে হল একজন মুসলমান। সত্যনারায়ণের নাচে হল একজন হিন্দু। সত্যনারায়ণের পালার উপাখ্যান রামায়ণ মহাকাব্য থেকে নেওয়া। সত্যপীরের পালাগানের উৎস হল গ্রামীণ মুসলমান কবিদের দ্বারা রচিত মুসলিম পীরদের কাহিনী। সত্যপীরের পালায় মুসলিম পীর বা সন্তদের মহিমা বর্ণনা করা হয়। তাতে থাকে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি উদার সহিষ্ণুতা। সত্যনারায়ণ পালাগানের মূলভাবনা হল



হিন্দুধর্ম। তবে তাতে মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি উদারতা ও সহিষ্ণুতার মনোভাব। এই দুই গাথাকাব্যতেই সত্যপীর ও সত্য-নারায়ণকে এক ও অভিন্ন বিগ্রহ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. পদ্মপুরাণ নৃত্য

পদ্মপুরাণ হল চাঁদ সদাগরের কাহিনী। সর্পদেবী মনসাকে পুজো না করায় তার কী শাস্তি হল তার কথাই বর্ণিত হয়েছে।

৩. রামায়ণ নৃত্য



রামায়ণ নৃত্যে প্রধান নর্তক বলিষ্ঠ অঙ্গসঞ্চালনে নাটকীয় ও ছন্দিত ভঙ্গিতে রামায়ণের কাহিনী পরিবেশন করে। তার সহযোগীরা বসে বসে কিছুক্ষণ পর পর গানের ধুয়া দেয়।

৪. শ্লোক নৃত্য

শ্লোক নৃত্যও এক ধরণের গাথা ভিত্তিক নৃত্য যা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় প্রচলিত। মূল গায়েন উপাখ্যানের পালা সুর করে গান করেন। সঙ্গীরা ঢাক ও কাঁসি বাজিয়ে সমবেত কণ্ঠে ধুয়া দেন নেচে নেচে। এই নাচে সকলের জন্যই অবারিত দ্বার। হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই এতে যোগ দেন। নাচিয়েদের



পদচালন সোজা হাঁটার মতন সামনে পিছনে এবং ঘুরে ঘুরে হাঁটা। নাচবার সময় হাঁটু সামান্য নত থাকে। ঢাকগুলো সহজ অঙ্গভঙ্গিতে তখন তুলে ধরা থাকে।

শ্লোকের বিষয়বস্তু প্রচলিত হিন্দুধর্মীয় সমগ্র সাহিত্যের নানা আখ্যান

থেকে সংকলন করা। বিশেষ পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের কাহিনী যেমন কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, শিবদুর্গালীলা ইত্যাদি।

৫) বোলান নাচ

বোলান নাচবীরভূম জেলার লাভপুর অঞ্চলে প্রচলিত। বোলান শব্দের অর্থ আবৃত্তি। নাচটির এই নামকরণ হয়েছে এই কারণে যে একজন একটি লিখিত পুঁথি হাতে নিয়ে তা থেকে কাহিনীটি বা গাথাকাব্যটি আবৃত্তি করে যান। নাচিয়েরা দুসারিতে দাঁড়িয়ে নাচবার সময় সমকোণে গিয়ে মেশে ইংরেজি 'L' অক্ষরের আকারে। সঙ্গে বাজে মৃদঙ্গ। সাধারণত দুজন মৃদঙ্গী



বাজান বোলান নাচে। একজন বাজনদার থাকে সমকোণের কাছে। দ্বিতীয়জন থাকেন সমকোণের একটি বাহুর একেবারে শেষের দিকে। এভাবে তার আকার ধারণের কারণ হয়তো দুদল গায়ক মিলে এই নাচ ও গান করেন। 'L' আকৃতির সমকোণের দুটি বাহু একেকটি দল গিয়ে গঠিত। একটি নাচিয়ে দলের হাতে একটি প্রতীক চিহ্ন থাকে। অন্যদলের নাচিয়েদের হাত থাকে খালি। একটি দল হঠাৎ হাত প্রসারিত করে সামনে লাফ দিয়ে গান শুরু করে। তাদের গান শেষ হলে তারা ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় দলটিও তেমনিভাবে লাফ দিয়ে এগিয়ে সেই গানের পুনরাবৃত্তি করে। এভাবেই দুটি দল চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে গান করে। মৃদঙ্গ বাদক দুজন দুদলের মাঝখানে অবস্থান করে। এ নাচের বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেক নাচিয়ে এবং গায়কের মাথায় জড়ানো থাকে একটি ফুলের মালা এবং আরেকটি ফুলের মালা থাকে গলায় ঝোলানো। গানগুলির বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ এবং মহাভারতের কাহিনী। গানের কথাগুলো প্রায়ই থাকে অমার্জিত। এ গানগুলি রচনা করে গ্রাম্য নাচিয়েরাই। এরা সাধারণত খুবই গরীব শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষ। এই নাচ উপলক্ষে তারা তাদের সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরে আসরে নামে।

৬. বাঁশি নৃত্য

বাঁশি বা বংশী নৃত্যও বাংলায় প্রচলিত এক ধরণের গাথা বা আখ্যানমূলক নাচ। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষত বীরভূম জেলার শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে এই নাচটি খুবই প্রচলিত। দু জন বা তিনজন পুরুষ বাঁশি বাজায়। বাঁশিটি একটু বিশেষ ধরণের ইংরেজি 'T' অক্ষরের মতো তার আকৃতি বাঁশিটি তিনটিভাগে তৈরি করা। দুটো অংশ বাঁশের, প্রত্যেকটা প্রায়

এক ফুট লম্বা এবং দেড়ইঞ্চি পরিমাণ তার ব্যাস। আনুভূমিক আকৃতির মূল বাঁশিটির গায়ে গোলাকার পেতলের বন্ধনী দিয়ে মোড়া। এর মাঝখানে প্রায় এক ফুট লম্বা এবং এক ইঞ্চি বও সামান্য কম ব্যাসযুক্ত একটি মুখ লাগানো হয় ফুঁ দেবার জন্য। বাঁশির মুখ দিয়ে খুব জোরে বাতাস বয় এবং সুর প্রবল হয়। প্রচলিত আখ্যান মূলত রাধাকৃষ্ণের কথা দিয়েই নাচিয়েরা গান করে এবং নাচে পালাক্রমে। দুজন মাদল বাজায়। তারাও তাদের সঙ্গে নাচে।



স্মরণ অনুষ্ঠানের প্রেরণা

জারি নাচ

জারি শব্দটি পারস্যের ফার্সি ভাষার 'জার' থেকে উৎপন্ন যার অর্থ হল 'বিলাপ' বা যন্ত্রণায় কাতরতা প্রকাশ। জারি হল 'ক্রন্দন' বা 'বিলাপ করা'। বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা অংশ আরবের কারবালা প্রান্তরে যে ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত যুদ্ধ হয় তারই স্মরণে মহরম উৎসব পালন। শোক প্রকাশ অনুষ্ঠানের সঙ্গে মহরমের সময় গান, নাচ, লাঠিখেলা এবং কারবালার যুদ্ধের নকল মহড়া প্রদর্শন করা হয়। দৃপ্তভঙ্গীতে নাচ ও গান পরিবেশিত হয়। মহরমের নাচ ও গানকেই জারি নৃত্য ও জারি গান বলা হয়। এগুলো হল সমষ্টি নৃত্য ও সমষ্টি গান। বাংলার বিশেষত পূর্ববাংলার জেলাগুলিতে সাধারণ মুসলমান কৃষিজীবিরা প্রজন্ম পরম্পরায় চিরাচরিত প্রথায় এই গান ও নাচ মহরম উপলক্ষে পরিবেশন করে আসছে। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরাই জারি গান ও নাচে যোগ দেয়। বিভিন্ন জেলায় গান ও নাচের ধরন আলাদা। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও শিল্পরুচিসম্মত জারি গান ও নাচ ময়মনসিংহ জেলায় প্রচলিত।



নাচিয়েদের পরণে থাকে ধুতি বা লুঙ্গি এবং গায়ে কুর্তা। তাদের ডান পায়ে পরা থাকে ঘুন্টি বা পেতলের ঘুঙুর এবং ডান হাতে থাকে সাধারণত লাল রঙের রুমাল।

গান ও নাচের নেতৃত্ব দেন যিনি তাকে বলা হয় বয়াতি। বয়াতির পায়ে ঘুন্টি বা ঘুঙুর থাকে না। নাচিয়েরা দুহাতে রুমাল মাথার ওপর ধরে সারি বেঁধে নাচের প্রাঙ্গনে ঢোকে। তারা অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে ঢোকে বাঁ পায়ে লাফ দিয়ে এবং একই সঙ্গে ডান পায়ে সামনের দিকে ছোট্ট লাথি দিয়ে। তাতে বেজে ওঠে পায়ের ঘুঙুর। নাচের গোটা সময়টাতেই ঘুঙুরধ্বনিই হল বাজনার পটভূমি। এভাবে এগোতে এগোতে প্রধান নাচিয়ে গেয়ে ওঠেন 'ভালো, ভালো, ভালো রে ভাই',—অন্যান্য গায়কেরা তার উত্তরে সুর করে বলে— 'আহা বেশ, ভাই'। তারপর প্রধান গায়ক বলেন—'আমরা আল্লাহর নাম করি রে ভাই সব'। প্রাঙ্গনের মাঝখানে গোল হয়ে নাচিয়েরা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। নাচবার ভঙ্গিটা হল ওপরে বর্ণিত বাঁ পায়ে লাফ, ঘুঙুর শুদ্ধ ডান পায়ে সামনে ছোট্ট লাথি। নাচবার সময় হাতের রুমাল মাথার ওপরে ঘোরাতে থাকে এবং বয়াতির সঙ্গে অন্য গান নাচিয়েদের ছড়াকাটা চলতে থাকে।

কারবালার কাহিনী শুরু করার আগে বয়াতি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে একটি বন্দনা গান করেন। এই বন্দনায় মুসলমান ও হিন্দু উভয় ধর্মের লোকই যোগ দেন।

বন্দনা গান শেষ হবার পর বয়াতি যিনি নাচিয়েদের বৃত্তের বাইরে থাকেন। সামান্য মাথা নিচু করে হাততালি দিয়ে গাথা কাব্য থেকে গান শুরু করেন। এই গাথাগুলি চিরাচরিত মুসলিম সাহিত্য থেকে নেওয়া ইসলামের বীর পুরুষদের গৌরব কাহিনী। তাতে কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসেনের বীরত্ব ও শৌর্যের আখ্যানও থাকে। বয়াতি যখন গাথা উপাখ্যান বর্ণনা করতে থাকেন তখন নাচিয়েরা চক্রাকারে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে ঘুঙুরের তাল দেয় ডান পায়ে লাফ দিয়ে এবং একই সঙ্গে ঘুঙুরের তাল দেয় ডান পায়ে লাফ দিয়ে এবং একই সঙ্গে ডান হাতে ধরা রুমাল সামনে ও পিছনে দুলিয়ে। চক্রের বাইরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ বয়াতি নেচে নেচে উপাখ্যান বর্ণনা করে সুবিধামত একটা জায়গায় পৌঁছুনোমাত্র তিনি নাচিয়েদের সংকেত দেন সমবেত কণ্ঠে কোরাস গাইবার জন্য। নাচিয়েরা তক্ষুনি সেই সংকেত ধরে নিয়ে কোরাস গাইবার পর তারা ডানদিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে গোল হয়ে চক্রের চারিদিকে নাচতে থাকে। এভাবেই নাচ ও গান ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকে। বয়াতি পালা বদল করে অন্য উপাখ্যান পরিবেশন করেন। নাচিয়েরাও কোরাসে কণ্ঠ মিলিয়ে পালা জমিয়ে দেয়। বয়াতি নিজে নাচেন না। তিনি শুধু একদিকে থেকে



অন্যদিকে পদচারণা করতে করতে আখ্যান আবৃত্তি করে যান। বয়াতি যখন পালা আবৃত্তি করতে থাকেন তখন কিন্তু নাচিয়েরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে না। ঘুঙুর পরা ডান পা দিয়ে তারা কথার সঙ্গে মিলিয়ে ছন্দিত লয়ে তাল দেয়। এই নাচে খুব সহজ পদভঙ্গিতে বহুরকমের বৈচিত্র্য আনে নাচিয়েরা। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তারা বলয়ের ভিতরের দিকে মুখ করে থাকে, বাঁ পায়ে হালকা ভাবে লাফ দেয়। একই সঙ্গে ডান পা লাথির ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দেয় সামনে। এভাবে তারা নাচের এই ভঙ্গী পুনরাবৃত্তি করে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকের গতিতে ঘুরে ঘুরে। ডান হাতের লাল রুমাল নিচের দিকে হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আবার ওপরে তুলে দোলাতে থাকে, জারি নাচের এটাই বলতে গেলে মৌলিক পদ্ধতি। এই মূল ভঙ্গি থেকেই অন্যান্য ভঙ্গির কাঠামো গড়ে তোলা হয়। সেটা আবার মূল পদক্ষেপের কাঠামোতে ফিরে আসে নতুন একটা ভঙ্গি গড়ে তোলবার আগে। সবচেয়ে উল্লেখ্য বৈচিত্র্য হল—যে মুহূর্তে নাচের পদক্ষেপে বলিষ্ঠতা প্রদর্শিত হয় তখন প্রত্যেক নাচিয়ে পালা করে একবার বলয়ের ভিতরে ঢোকা এবং একবার বাইরে বেরিয়ে আসার নৃত্য ভঙ্গি। আবার চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে প্রত্যেক নাচিয়ে নির্ভুলভাবে স্বস্থানে ফিরে আসে নৃত্য বলয়ের মধ্যে।

পদ্ধতিটা হল নাচিয়েরা বাঁ পায়ে স্থির দণ্ডায়মান থেকে ডান পা অনেকটা প্রসারিত করে ভেতরের দিকে বাঁয়ে ঘুরে যায়। তারপর বাঁ পায়ে একটা ছোট পদক্ষেপ বলয়ের দিকে ঘড়ির কাঁটার গতির বিপরীত ভঙ্গিতে (অর্থাৎ ডান দিকে বাঁয়ে)। এই ভঙ্গি শেষ করার পর ডান পায়ে অনেকটা প্রসারিত অবস্থায় ডান দিকে ঘুরে বলয়ের কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যায়। বাঁ পা স্থিরভাবে খাড়া থাকে মূল দণ্ড হিসেবে। এরপর বলয়ের গতির সঙ্গে মিলিয়ে বাঁ পায়েএকটা ঝটকা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এভাবে প্রত্যেক নাচিয়েই বলয়ের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে ঝটিতি ঝুঁকে পড়ে এবং তারপর আবার বাঁ পায়ে ঝটকা পদক্ষেপ নিয়ে বলয়ের কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যায়। রুমাল ধরা ডান হাত ডানপায়ের চলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সঞ্চালিত হতে থাকে। এই পদসঞ্চালন চলে যখন নাচিয়েরা একটা বলয়ের বা বৃত্তের চারিদিকে ঘড়িকাঁটার গতির বিপরীতে ঘুরে ঘুরে নাচে। গোটা নাচের সময়ে নাচিয়েরা তাদের ধুতির কোঁচা বাঁহাতে ধরে রাখে। নাচের বলয়ের কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে কখনো কখনো নাচিয়েরা তাদের জোড়া পরিবর্তন করে বিভিন্ন



নাচিয়ের সঙ্গে জোড়া তৈরি করে নাচে। তারা কখনো কখনো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজনে একই সঙ্গে তাল মিলিয়ে একবার সামনে এবং একবার পেছনে পদচালনা করে এবং নৃত্যবলয়ের বিপরীত দিক থেকে অগ্রসরমান নতুন প্রতিবেশী নাচিয়ের সঙ্গে নতুন জোড়া বাঁধে কখনো কখনো তারা পর্যায়ক্রমে এপাশে ও ওপাশের নাচিয়ের সঙ্গে জোড়া বাঁধার জন্য হাত মেলায়।



নাচের মাঝে মাঝে মূল নাচের ছন্দ থেকে উৎসারিত অন্যান্য বেশ মিশ্রপ্রকৃতির জটিল নৃত্য ভঙ্গিমাও গড়ে তোলা হয়। সবগুলিই খুব চিত্তাকর্ষক তার নিখুঁত সাদৃশ্য ছন্দিত বলিষ্ঠতা এবং বাহু চালনার ভঙ্গিমার জন্য। অনেক সময় নাচিয়ে আধা উপবিষ্ট অবস্থাতেও এই নৃত্য পরিবেশন করে।



জারি গান ও নাচ শুধুমাত্র কারবালার করুণ ঐতিহাসিক ঘটনা বা মুসলিম বীরদের জীবনগাথা ভিত্তিক হয় না। বয়াতি মাঝে মাঝেই হিন্দুমুসলিম ধর্মীয় সম্প্রীতির ভিত্তিতে গান রচনা করেন। সব নাচিয়েরা কোরাসে অর্থাৎ সমবেত কণ্ঠে সেই গানে গলা মেলায়। এই গানগুলি ভাটিয়ালি সুরে গাওয়া হয়। পূর্ববাংলার প্রশস্ত নদীবক্ষে নৌকো চালাবার সময় মাঝিদের কণ্ঠে এই সুরের গান শোনা যায়। তারই নাম ভাটিয়ালি গান।

জারি নাচের উৎস

পূর্ববাংলার বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে বার্ষিক নৌকা বাইচের সময় নৌকোর প্রধান দাঁড়ি মাঝিরা গলুইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে যেভাবে বাইচের নেতৃত্ব দেয় তার সঙ্গে জারি নাচের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য আছে। জারি নাচের সময় মাথার ওপর রুমাল তুলে ধরে এবং একপায়ে লাফ দিতে যেভাবে নাচের প্রাঙ্গনের দিকে এগোয় তার সঙ্গে নৌকো বাইচের প্রধান দাঁড়িরা তাদের বৈঠা বা দাঁড় মাথার ওপর বৈঠা তুলে ধরে গলুইয়ের

পাটাতনের ওপর এক পায়ে লাফায় তার সঙ্গে মিল রয়েছে। জারি নাচের সময় নাচিয়েরা ডান হাত যেভাবে ব্যবহার করে বাইচের সময় দাঁড়িদের ডান হাতের বৈঠা পরিচালনার ভঙ্গি হুবুহু একরকম। তাহলে দেখা যাচ্ছে জারি নাচ বৃত্তিমূলক অনুষ্ঠান থেকে উৎপন্ন। কিন্তু এখন যারা নৌকোর মাঝি নয় তাদের মধ্যেই এটি খুব বেশি প্রচলিত।

জারি নাচের সঙ্গে য়ুরোপীয় দেশগুলিতে প্রচলিত মারিস নৃত্যের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। সেই নাচেও নাচিয়েরা পায়ে বেল পরে ও একহাত দুহাতেই রুমাল নিয়ে নাচে। এই দুটি নাচের অঙ্গভঙ্গিমার মধ্যে সাদৃশ্য দেখা গেলেও জারি ও মারিস নাচের উৎসও সম্পূর্ণ আলাদা। জারি নাচের প্রধান প্রেরণা শোকপ্রকাশ হলেও তাতে কবির আবেগের প্রকাশ রয়েছে তার গানে যা রচনা করেন বয়াতি ও গান করে অন্যান্য নাচিয়েরা। সাধারণভাবে একটা শোকজ্ঞাপনের পরিবেশন থাকলেও জারিগান ও নাচে লক্ষ্য করা যায় গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সামাজিক সহানুভূতি। যার ফলে পশ্চি মবঙ্গে হিন্দু গ্রামবাসীরা সাগ্রহে মুসলমান ভাইদের সঙ্গে জারি নাচে যোগ দেয়।

দধি নৃত্য

রাধাকৃষ্ণ লীলাতত্ত্ব থেকে বাংলায় অনেক ধরনের নাচের উদ্ভব হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন উপলক্ষে ভক্তরা দধি ও লাঠিনৃত্য করে জন্মাষ্টমী পালন করে।

দধিনৃত্য প্রধানত দুগ্ধবিক্রেতা বা গোয়ালা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা নন্দ ঘোষ এই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। দধি অর্থাৎ দইয়ের হাঁড়ি বাঁশের বাঁকের দুপ্রান্তে দড়ির শিকেতে ঝুলিয়ে কাঁধে করে ভারসাম্য রক্ষা করে চিরাচরিত প্রথায় গ্রামের গোয়ালার বাড়ি বাড়ি যায়। এই উৎসবে একদল গোয়ালা এভাবে বাঁকে দইয়ের হাঁড়ি ঝুলিয়ে শিকের দড়ির মাঝখানটা মুঠো করে ধরে তেজোদৃপ্তভঙ্গিতে দধি নৃত্য করে মৃদঙ্গের বোলের তালে তালে। এ হল শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে আনন্দোৎসব।

প্রতিরূপ প্রদর্শন ও বিশ্লেষণ প্রেরণা

মুখা (মুখোশ) নাচ

চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় উৎসবে গ্রাম বাংলার বিস্তৃত অঞ্চ লের মানুষের কাছে মুখোশ নৃত্য বিশেষ আকর্ষণীয়। বিশেষত পূর্ববাংলার (বর্তমানে বাংলাদেশ) ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। ময়মনসিংহ জেলায় মুখোশ তৈরি হয় কাঠ দিয়ে, বিক্রমপুরে ব্যবহার করা হয় শোলার মুখোশ। মুখোশ নাচে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যও যথেষ্ট কৃতিত্বপূর্ণ। কোনো কোনো জেলায় লাউয়ের শুকনো খোল দিয়ে মুখোশ তৈরি করা হয়।

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার (বর্তমান টাঙ্গাইল বাংলাদেশের একটি জেলা) মুখোশ নৃত্য হল বৈশিষ্ট্যের দিকে থেকে সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক। তার বৈচিত্র্যের



প্রধান কয়েকটির বর্ণনা এখানে দেওয়া হল। বাংলার মুখোশ নৃত্যের শিল্প সম্পূর্ণভাবেই লোকায়ত গ্রামীণ। কাঠের মুখোশ তৈরি করে। গ্রামীণ কাঠের কারিগররা। তাতে স্থানীয় মৃৎশিল্পী বা কুমোররা রঙ লেপন করে অত্যন্ত জোরালো ও ব্যঞ্জনাধর্মী চমৎকার সব সচিত্র নক্সা এঁকে দেয়। নাচিয়েদের পোশাক আশাকও অত্যন্ত সাধারণ ধরণের গ্রামের শিল্পীরাই তা তৈরি করে। এই মুখোশ-নৃত্য বাংলার একটি অতি প্রাচীন লোকশিল্প যার মূল্য ও তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। গ্রামের এই শিল্পীরা এই নাচের আদি রূপটির সারল্য সযত্নে রক্ষা করেছে বলে মনে হয় যার মাধ্যমে বিশ্বশক্তির মহাজাগতিক খেলার শিল্পরূপ প্রতিফলিত। মুখোশ নৃত্য নিঃসন্দেহে নৃত্যের আদিরূপের অন্যতম যা প্রচলিত রয়েছে। তা থেকেই বিস্তারিত হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যকলার বিভিন্ন ধরণের নাচ যা সঞ্চারিত হত। প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্রে তা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এই মুখোশ নৃত্য একান্তভাবেই তার উপকরণে ও পরিবেশনের পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও লোকপ্রচলিত। গ্রামবাংলায় হিন্দুদের মধ্যে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল মুখোশ নৃত্য। এ শিল্প জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, সাজানো এবং আনুষ্ঠানিক শিল্প প্রদর্শন নয় যা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা চলে। চৈত্রসংক্রান্তি উৎসব উপলক্ষে সম্পূর্ণ মুক্তাঙ্গনে হয় তার অনুষ্ঠান। হিন্দু সমাজের সকলশ্রেণী থেকেই আসে শিল্পীরা। ভক্তপ্রাণ



শিল্পীরা ব্যক্তিগত সাধনা হিসেবেও এই নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেয়। মুখোশগুলি গ্রামের সমষ্টিগত সম্পত্তি। নাচের দলপতি এবং ঢোলক বাদ্য নির্দেশককে বলা হয় বায়েন। নৃত্যপ্রদর্শনের সময় তাঁকে বিশেষ নামে ডাকা হয়। তখন তিনি হন সাধুলি অর্থাৎ যিনি ছন্দায়িত সাধনা বা আত্মিকশক্তির অনুশীলনের প্রেরণাদাতা। এই কারণে তিনি সকলের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং সকল জাতের মানুষ তাঁকে সম্মান করে।

ময়মনসিংহের মুখোশ নৃত্যের শিল্পের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা তা বলা কঠিন। কোনটাকে উল্লেখ করব—গ্রামের সূত্রধর যার হাতের দক্ষতায় অপূর্ব সুন্দর কাঠের মুখোশ তৈরি হয়, অথবা যে অসাধারণ নৈপুণ্যে তার ওপর চিত্রাঙ্কন



করে গ্রামের কুমোর শিল্পীরা অথবা সেই মুখোশধারী নাচিয়েদের অগ্‌বলে বলিষ্ঠ অঙ্গ ভঙ্গিমা গঠনের ক্ষমতা অথবা ছন্দিত লয়ে ঢাকের বাজনা। এ সব কিছু মিলিয়েই মুখোশ নৃত্যের উপাদান একাত্ম হয়ে গ্রামবাংলার দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে তার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে।

ক. মহাদেব নৃত্য

সাধুলি এবং তাঁর সহকারী প্রথমে এসে খোলা প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়ান। তাঁরা কোনো সাজসজ্জা করে আসেন না। তাদের পোশাক সাধারণ গ্রামবাসীদের পোশাকের মতন। এসেই তারা খুব সজোরে কয়েক পর্যায়ে ঢাকে কাঠি দিয়ে বাজনা শুরু করেন। এটা হল নাচের অন্তর্লীন শক্তির আবাহন প্রক্রিয়া। এর মধ্যে মঞ্চাভিনয়ের কোনো মায়া বা মোহ সৃষ্টির কোনো চেষ্টা থাকে না। কোনো ছদ্মবেশ কারো নেই। তারা সাধারণ গ্রামবাসী। দর্শকরা খুব ভালভাবেই তাদের জানে এই নৃত্য সাধনায় রত নাচিয়ে হিসেবে। তাদের পরণে সে জন্যই থাকে একটা বিশেষ ধরনের পোশাক। যিনি মহাদেবের ভূমিকায় তার পরণে শুধু একটা সাধারণ কাপড়ের লাল কৌপিন।



দেহের অন্যান্য সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরাভরণ। সারা দেহে সাদা ছাই ও চকখড়ির গুঁড়ো দিয়ে আচ্ছাদিত। গলায় দুগাছি রুদ্রাক্ষের মালা। পিঠে হাঁটুর সামান্য নিচে পর্যন্ত ঝোলানো একটা লাল আচ্ছাদন। মাথায় কালো চুলের পরচুলা। দুটো লম্বা জটা গলার দুদিকে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। দুহাতে অত্যন্ত ভক্তিভরে মহাদেবের মুখোশটি ধরা, এখনই নাচিয়ে তা পরবেন। এই অবস্থায় দর্শকদের সমাবেশের এক কোণ থেকে নাচিয়ে এগোতে থাকেন হাতে ধরা মুখোশটি উঁচুতে তুলে ধরে। তারপর নিচু হয়ে মাটিতে মাথা স্পর্শ করেন। এ হল দৈবশক্তির মুখোশ পরার ভক্তিপূর্ণ প্রস্তুতি। মুখোশটি পরার সঙ্গে সঙ্গে তার দুই সহচর নাচিয়ের মাথার পিছনে দুটো সুতো দিয়ে বেঁধে দেয়। তারপর নাচিয়ের ডান হাতে সঙ্গীরা তুলে দেয় একটি লোহার ত্রিশূল, উঁচু করে তার হাতে না ধরা এবং তার প্রসারিত বাঁ হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি ছোট শঙ্খ। দুই গোড়ালিতেই সূতো দিয়ে বাঁধা পেতলের ঘুঙুর সারিয়ে দেওয়া হয়। এই হল সমগ্র সাজসজ্জা। মহাদেবের মুখোশের

মর্যাদা খুব বৃদ্ধি পায় মাথায় সাপের মুকুট পরিয়ে দেবার পর। মুকুটের সাপের সংখ্যা হয় তিন অথবা পাঁচ।

সাপের মুকুটসহ মহাদেবের মুখোশ আমগাছ বা কেঁদ গাছের এক টুকরো কাঠ খোদাই করে তৈরি করা হয়। কাঠটিকে মসৃণ ও চকচকে দেখাবার জন্য কাঠের মুখোশের ওপরে প্লাস্টার করে কাদামাখানো এক টুকরো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। সেটি শুকিয়ে গেলে তার ওপর ঘন রঙের প্রলেপ লাগানো হয়। শিবের মুখোশের রং হয় খুব সাধারণ সাদা ও কালো। মাথার দিকটা কাল ও গলার সামনেটা সহ গোল করে একটা লাল কাপড় দিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। যাতে মুখোশটা নাচিয়ের মুখে ঠিকঠাক অবস্থায় থাকে। দেবী শক্তির প্রতীক হিসেবে মুখোশের কপালে একটি তৃতীয় নয়ন এঁকে দেওয়া হয় চিরাচরিত প্রথার অনুসরণে।

এই মুখোশ ও তার বর্ণ বিলেপন শিল্পের পিছনে যে ভাবনা বা উপলব্ধি কাজ করে তার মৌলিক উপাদান সম্ভবত এই যে এর দ্বারা মহাজাগতিক শক্তির একটা বিশেষ অনুভূতি ও বোধকে ঢাকের বাদ্য এবং মুখোশধারী নাচিয়েদের দেহের নৃত্যভঙ্গিমার মাধ্যমে জাগিয়ে তোলার মনোবাসনা।

মহাদেব মুখোশের পরিকল্পনায় সাংস্কৃতিক এবং চিত্রায়ণ শৈল্পিক উভয় দিক দিয়েই, সবচেয়ে তাৎপর্যময় ভাবনা হল সেই পরমশক্তির মহান নিরাসক্তি, অপরাহত স্বাধীনতা এবং সহজ স্বাভাবিকতা যা অনায়াসেই মহাবিশ্বে সবচেয়ে অবাধ্য অসংযত উপাদানকে দমন করতে পারে, মুখোশের শিরোভূষণ সাপের ফণাগুলোতে তাকেই চিত্রিত করে দেখানো।

মুখোশ নৃত্যে মহাদেব শিল্প উপাদানের উল্লেখ্য দিক হল এই যে বাঙালির মানস চেতনায় শিবের প্রতিরূপ এতে পরিস্ফুট। দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলায় শিবের যে রূপ কল্পনা আবর্তনশীল ঘূর্ণ্যমান মহাবিশ্বের প্রেক্ষিতে এক দূরবর্তী অতিপ্রাকৃত বিমূর্ত দার্শনিক চেতনা তার সঙ্গে বাংলার শিবের কোনো মিল নেই। বাংলার শিব একদিকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, আত্মভোলা অসংসারী, যোগী তাঁর হাতে ত্রিশূল। অন্যদিকে তিনি এক বিবাহিত পুরুষ, বাড়িতে তাঁর স্ত্রী আছেন, যিনি জানেন স্বামী হিসেবে তাঁর কর্তব্য হল তাঁকে শঙ্খ এনে দেওয়া যা থেকে তৈরি শাঁখা পরতে ভালবাসেন তাঁর স্ত্রী। এই ভাবনা অনুসারে শিবের মাথায় ফণা তোলা সাপ হল মানুষের ভিতরকার অবাঞ্ছিত আবেগ দমনের প্রতীক।

মহাদেবের এই ঘরোয়া এবং মানবিক ভাবনা গ্রামবাংলার এক বিশিষ্ট মানসিকতার দিক। এই আদর্শ গ্রামীন হিন্দুসমাজ চেতনার গভীরে প্রোথিত ও তার অন্তর্ভুক্ত এক অংশ। প্রকৃতপক্ষে এ হল মানবজীবন ও মানুষের আত্মিক শক্তি যাদের ভিতর নিরন্তর নাটকীয় দ্বন্দ্ব চলছে সর্বস্বত্যাগ করবে অন্তরের আহ্বান এবং অন্যদিকে সংসার জীবনের কর্তব্য পালন করা। তারই প্রতীক হলেন বাংলার শিব। শিবের কাহিনীর শিল্পরূপ গ্রাম

বাংলায় শুধু গান ও নাচেই সর্বত্র পরিচিত নয়, পটুয়াদের গাথা উপাখ্যানে ও পট চিত্রে এবং শিব ঠাকুরের মাটির পুতুল গড়ার মাধ্যমে তা বর্ণনা করা হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে বাংলার গ্রামের লোকদেবতাগণ আসলে মানুষের ওপর দেবত্ব আরোপেরই প্রতীকী রূপে। তার ভিত্তি হল বাংলার সহজিয়াতত্ত্ব যাতে বলা হয়েছে সবার উপরে মানুষ। শ্রেষ্ঠত্ব উপনীত মানুষ সমস্ত কিছুর উপরে, তাকে দিয়েই সব কিছুর পরিমাপ। সুফি দর্শনেও তার প্রতিধ্বনি রয়েছে ফার্সি ভাষায় নিম্নলিখিত দ্বিপদীতে ঃ

আজ খোদা খুদী তলব
আজ খুদী খোদা তলব।

মহাদেব নৃত্যের মূল বৈশিষ্ট্য হল তার ভারসাম্য, সংযম ও ছন্দায়িত ভাবে প্রথমে ধীর গতিতে মাপা পদক্ষেপ থেকে শুরু করে ক্রমশ চরমে গিয়ে পৌঁছনোর পদ্ধতি। নাচিয়ের দেহের কোমর থেকে উর্দ্ধাংশ এবং হাত দুটি খুব অনড়ভাবে থাকে। যা কিছু অঙ্গসঞ্চালন সবই পা দুটির। দেহের উর্দ্ধাংশ শুধু খুব সংযতভাবে নাচের গতির সঙ্গে তাল রেখে এপাশ থেকে ওপাশে আন্দোলিত হতে থাকে। পা দুটির অনায়াস ও সংযত সঞ্চালন সত্ত্বেও তাতে থাকে তাণ্ডব নৃত্যের হালকা আভাস। অবশ্য শিবের নৃত্যের পরিশীলিত প্রদর্শনেই যে আকর্ষণীয় অঙ্গসঞ্চালন সাধারণভাবে প্রত্যাশিত এখানে সে রকম কিছুই থাকে না। এই লোকনৃত্যে মুদ্র প্রদর্শন বা মঞ্চাভিনয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি বা অন্যান্য প্রচলিত নৃত্যভঙ্গিমা অথবা বিগ্রহপ্রতিম কোনো মনোভাব প্রদর্শনের চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। এই নাচের সমস্ত ভঙ্গিই গড়ে ওঠে শিল্পীর স্বাধীন ও স্বাভাবিক আত্মঅভিব্যক্তির অন্তর প্রেরণা থেকে। প্রকৃতপক্ষে একই দলের বিভিন্ন নাচিয়ের যখন একই চারিত্রিক ভূমিকায় নৃত্য পরিবেশন করে তখনও তাদের দেহভঙ্গিমায় এক শিল্পীর সঙ্গে আরেকজন শিল্পীর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মহাদেব নৃত্যের প্রধান প্রেরণা হল মহৎ নিরাশক্তির সাধনার দৃশ্যায়ন তার সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে অন্তরের আনন্দময় প্রশান্তি। মহান হৃদয় নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর আদর্শ এভাবেই রূপায়িত হয় এই নৃত্য পরিবেশনায়।

বাংলার লোকশিল্প ও দর্শনে উদ্দাম গতিভঙ্গি এবং কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা হয়েছে শুধু শক্তি উপাসনার ক্ষেত্রে। এই শক্তিকে উজ্জীবিত করেন মহাদেব। তিনি নিজে তখন থাকেন শান্ত সমাহিত শক্তির এক সমুন্নত স্তরে। এই শক্তি তিনি প্রদর্শন করেন পরিমিত ও অত্যন্ত সংযত ছন্দোময় নৃত্যভঙ্গিতে। মহাদেব নৃত্য পরিবেশনার উদ্দেশ্য হল দর্শকদের মনে সমুন্নত, প্রশান্ত নিরাসক্তির সঙ্গে সংসার জীবনের কর্তব্য পালনের এবং পার্থিব জীবনের সঙ্গে অন্তরজীবনের প্রেরণার সমন্বয় ও সমতা সাধন। সংসার জীবনের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেও উচ্চতর অধ্যাত্মজীবনের তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর।

খ. কালীর নৃত্য

কালী হলেন সর্বোচ্চ মহাজাগতিক শক্তির প্রতীক প্রতিমা। কালী নৃত্যের সঙ্গে গভীর দার্শনিক তাৎপর্য যুক্ত। এই নাচের সময় শিল্পী নারীর পোশাক পরিধান করে। পোশাক বলতে একটি সাধারণ হাতকাটা ব্লাউজ। বুকের মাঝখানে হীরের আকৃতি একটি এম্ব্রয়ডারির কাজ। নিচে পরনে থাকে একটি স্কার্ট, দুটুকরো লাল কাপড় মাঝখানে কাপড়টা নীল রঙের। দুপায়েই ঘুন্টি, দুহাতের কব্জি ও কনুইয়ে পরা থাকে সাধারণ চুড়ি বা বালা। গলা থেকে একটি ফুলের মালা ঝোলানো, চুলের জটা থেকে তৈরি খসখসে ধরনের একটি পরচুলা থাকে কোমর পর্যন্ত প্রলম্বিত। মহাদেবের বেলায় যেমন তেমনি ভাবে কালীর মুখোশ পরানো হয়। কালীর মুখোশও একটি মাত্র কাঠের খোদাই করা খোল থেকে তৈরি হয়। ব্যতিক্রম হল একটি আলাদা কাঠের টুকরো ব্যবহার করা হয় কালীর মুখ থেকে বের করা লাল রঙের জিভ তৈরি করতে। কাঠের মুখোশের ওপর রঙ-করা পেস্ট বোর্ড দিয়ে খুব সাধারণভাবে এঁকে কালীর মুকুট পরানো হয়। কালীর চোখের সাদা এবং চোখের দুটি মণির কালো রঙ ছাড়া সারা মুখেই দেওয়া হয় নীলরঙের প্রলেপ। মুখের দুই কষ বেয়ে রক্তের ধারা চুঁইয়ে পড়ছে দেখানোর জন্য দুধারে লালরঙের রেখা এঁকে দেওয়া হয়। চোখের ভুরু এবং গায়ের অলঙ্কার গুলোও হয় লাল রঙের রেখা দ্বারা চিহ্নিত। মুখ থেকে বের করা জিভ হল কালের প্রতীক (যা থেকে কালী নামের উৎপত্তি)।



নৃত্য শিল্পী মুখোশ পরবার পর তার দুই সঙ্গী তার ওপরে তোলা ডান হাতে একটি খাঁড়া (বলিদানের খড়্গ) তুলে দেয় এবং সামনে দৃঢ়ভঙ্গিতে প্রসারিত বাঁ হাতে দেয় একটি গোলাকৃতি মাটির প্রদীপ তাতে থাকে জ্বলন্ত সলতে। কোনো কোনো সময়ে খাঁড়া থাকে বাঁ হাতে এবং প্রদীপ থাকে ডান হাতে। খাঁড়া হাতে সক্রিয় ডান হাতটি হল অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের প্রতীক। শত্রুর বিরুদ্ধে এবং অপশক্তির বিরুদ্ধে যা সতত আক্রমণে নিরত। যে প্রদীপটি স্থির ভাবে কালীর হাতে ধরা থাকে, কোনো কোনো লোকশিল্পীর মতে তা হল নিষ্কম্প জীবন শিখার প্রতীক। অন্যান্যদের মতানুসারে এই জ্বলন্ত শিখা হল সমস্ত পার্থিব বন্ধন এবং আসক্তি বিনষ্ট করে পরমজ্ঞানের উজ্জীবনের শক্তির প্রতীক।

এইভাবে বণসজ্জায় সজ্জিত বিশ্বসৃষ্টির শক্তি অথবা মহাজাগতিক শক্তিরূপিণী কালী তার আনন্দনৃত্য শুরু করেন ঢাকের বাজনার তালে তালে। এই নৃত্যের ছন্দিত তালের

আনন্দ শক্তিই একমাত্র পারে জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা এবং আত্মোপলব্ধির লাভের সংগ্রামে ও অগ্রগতির সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধে সাহস ও তেজ জোগাতে।

কালীর নাচ শুরু হবার আগে মহাদেব পূর্বোল্লিখিত পোশাকে এসে চিৎ হয়ে নাচের প্রাঙ্গণের মাঝখানে মাটিতে শুয়ে পড়েন, সম্পূর্ণ নিথর অবস্থায়। শক্তি তখন অতিদ্রুত গতিতে ভূমিতলে শয়ান তাঁর দিব্য স্বামীর চারদিকে ঘুরে নেন। একবার সম্পূর্ণ ঘোরা শেষ হলে কালী তাঁর পায়ের কাছে এসে পড়েন। তখন কালী ইচ্ছাকৃতভাবে মহাদেবের প্রসারিত দুটি পায়ের মাঝখানে এগিয়ে গিয়ে নিজের ডান পা তাঁর বুকে স্থাপন করেন।



এই অবস্থান থেকে কালী অতিদ্রুত কয়েকটি সহ নৃত্য ভঙ্গিমা প্রদর্শন করেন ঢাকের বাজনার তালে তালে। নাচ হয়ে গেলে শায়িত মহাদেবের বুক থেকে কালী তাঁর ডান পা সরিয়ে নেন। তারপরই শুরু হয় তাঁর আনন্দনৃত্য সৃষ্টি ও স্থিতি রক্ষায় এবং জীবনের শত্রুবিনাশের জন্য। ইতিমধ্যে মহাদেব যিনি সেজেছিলেন সেই শিল্পী মাটিতে শয়ান অবস্থা থেকে উঠে নাচের প্রাঙ্গণ থেকে চলে যান। কারণ তাঁর কাজ ছিল শক্তিকে তাঁর নিজস্ব কর্মপথে প্রেরণ করা, সে-কাজ হয়ে গেছে। সাময়িকভাবে শক্তি যে তাঁর স্বামীর বুকের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়েছিলেন, কালী ও শিবের এই বিষয়টি খুবই পরিচিত বাংলার লোকসমাজে। নানাভাবে এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটি ব্যাখ্যা হল, যা ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার লোকশিল্পীদের মধ্যেও প্রচলিত, শক্তি যখন বিশ্বসৃষ্টি বিনাসের জন্য নাচ শুরু করতে যাচ্ছেন তখন তাঁর রোষ থেকে বিশ্বের ন্যায়পরায়ণ ও নির্দোষ প্রাণীকুলকে রক্ষা করার জন্য মহাদেব তাঁর পায়ের তলায় শুয়ে পড়েন যাতে তিনি সংযত হন। কালী তাঁর স্বামীকে মাটিতে শুয়ে থাকতে দেখেন। কিন্তু অসতর্কতার জন্য তাঁর বুকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দেন। ভুল বুঝতে পেরে তিনি তৎক্ষণাৎ সংযত হন। তার ফলে তাঁর বিস্ময় ও বিহ্বলতা প্রকাশের জন্য নিজের অজ্ঞাতেই লজ্জায় জিভ বের করে দাঁত দিয়ে কাটেন। এই আকস্মিক বিরতির ফলেই তিনি তাঁর বিনাশ কর্মে সংযত হন যাতে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে না যায়। শিবের প্রভাবেই কালী সৃষ্টির জগতে যারা নির্দোষ ও ন্যায়পরায়ণ তাদের ধ্বংস না করে অধর্মপরায়ণ অসুরদের বিনাশ করার ক্ষেত্রেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন। অসুরদের বিরুদ্ধে তাঁর সুদীর্ঘ কাল ধরে তীব্র যুদ্ধ চলছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁর হাতেই অসুরদের বিনাশ হয়। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের আনন্দই কালী নাচের মাধ্যমে বর্ণনা করা

হয়েছে। তান্ত্রিক মতে, এই নৃত্যের প্রধান লক্ষ্য অশুভশক্তির বিনাশ হলেও, ক্ষণকালের জন্য মাটিতে শায়িত মহাদেবের সঙ্গে তাঁর শারীরিক সংযোগ হল শিব-শক্তির তান্ত্রিক মিলন যার ফলে কালী তাঁর পুরুষ স্বামীর দ্বারা তেজোদৃপ্ত হলেন সমস্ত অশুভ শক্তি বিনাশের কাজ সানন্দে পালন করার জন্য।

নাচ যত এগোতে থাকে, প্রথমে মৃদু লয়ে, পরে তা বাড়তে থাকে এবং পরের কাজ তীব্র হতে হতে শেষ পর্যন্ত তাণ্ডব নৃত্যের মতো হয়ে যায়। শক্তি কখনো নিচু হয়ে, কখনো বাতাসে লাফ দিয়ে ওঠে। এ নাচের সময় শক্তির দৃষ্টি থাকে সামনের দিকে নিবদ্ধ দুষ্কৃতি বিনাশের জন্য হাতে ধরা খড়্গ ভয়ংকরভাবে ঘুরতে থাকে। ঢাকের বাজনা ও নাচের গতির প্রভাবে নাচিয়ে মানুষটি দৈবশক্তিসম্পন্ন অভিব্যক্তিতে যেন রূপান্তরিত হয়ে যায় যিনি সমস্ত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর জয় লাভ করেছেন। নাচেব সমস্ত উদ্দামতা সত্ত্বেও তার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে একটি জোরালো আধ্যাত্মিক ও কল্যাণকর উদ্দেশ্য যার ফলে এই নাচের ভঙ্গিমা দর্শকদের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য নয় বরং তাদের মনে সদভাবনা ও ন্যায়পরায়ণতার শক্তি এবং অদম্য সাহস সঞ্চার করাই উদ্দেশ্য। লোকশিল্পীদের প্রতিভার গুণে কালী নৃত্যে পুঁথিগত বর্ণনার চরিত্র বর্জন করে একান্ত নিজস্ব ও মানবিক আকর্ষণের শিল্পে পরিণত হয়েছে।

এই নৃত্যে মূর্তি বা প্রতিমা পূজার কোনো উপাদান নেই। দর্শকদের মনেও সে রকম কোনো অনুভূতি সৃষ্টির প্রয়াস নেই। নাচ যত এগোতে থাকে দর্শক তাদের সামনে দেখতে পায় জীবনের প্রদীপ্ত শিখার প্রতীক যা আনন্দের সঙ্গে নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছে তার অস্তিত্ব রক্ষার ও আত্মোপলব্ধির সংগ্রাম শত্রুবিনাশের মাধ্যমে যারা অগ্রগতির পথ অবরুদ্ধ করে রাখছে। নৃত্যশিল্পী কখনই আনন্দ আত্মহারা হয়ে সীমা ছাড়িয়ে যায় না। অন্যদিকে গোটা নৃত্যপ্রদর্শন অনুষ্ঠানটিই পরিকল্পিত ও যুক্তিপূর্ণ প্রতীকি পরিবেশনা যার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে অশুভ শক্তির বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে জীবনের আনন্দময় সংগ্রাম। তাই কালী নৃত্যকে বলা যায় মানবাত্মার কাঠোর জীবনসংগ্রামের আনন্দনৃত্য। এই নৃত্য মূলত শক্তির ও বলিষ্ট জীবনীশক্তির। এই নৃত্য দর্শকদের মনে জোগায় সক্রিয় সাহসিকতা, মননের ও কর্মের বলিষ্ঠতা। এই নাচে চিরাচরিত মুদ্রা সম্পূর্ণ বর্জিত, কোনো বিগ্রহ ভঙ্গিমাও নেই। আন্তরিকতা, স্বাধীনতা, সোজাসুজি ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৃত্য-ভঙ্গিমা প্রদর্শনের ফলে এই নাচের অন্তর্নিহিত



অর্থ সহজবোধ্য হয় সকল দর্শক এমনকি ছোট শিশুদের কাছেও। এই শিল্পীদের প্রযোজনায় অন্যান্য আকর্ষণীয় নাচও আছে যেমন রাধাকৃষ্ণ নাচ, হরপার্বতী নাচ, গঙ্গা নাচ প্রভৃতি।

গ. বাঘ নাচ, কুমির নাচ এবং বাঁদর নাচ

এই লোকশিল্পীদের অন্তর্লীন জীবনস্পৃহা এবং তাদের দেহের নৃত্যভঙ্গিমা গঠনের নিপুণতা শুধুমাত্র পৌরাণিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়। জগতের সব রকমের দৃষ্টির আনন্দ রূপায়িত করার এবং যে কোনো স্তরের প্রাণীকে নৃত্যের মাধ্যমে জীবন্ত ভাবে শিল্পিত রূপায়ণের নৈপুণ্য আছে তাদের। এর দৃষ্টান্ত হল কী রকম যথাযথভাবে দক্ষতার সঙ্গে স্বার্থকভাবে তারা আনন্দের প্রেরণা বাঘ, কুমির, বাঁদর প্রভৃতি জন্তুর জীবনে প্রবেশ করে এবং সঠিক ভাবে তাদের মুখোশ তৈরি করে নাচে। এই নাচের দেহভঙ্গিমায় প্রতিটি জন্তুর বিশিষ্টতা ফুটে ওঠে। এই নাচের সঙ্গে ঢাক বাজানো হয়।

ঘ. বুড়া-বুড়ি নাচ

একই দক্ষতা লক্ষ্য করা যায় বুড়া-বুড়ি নাচের অপরূপ শিল্প নৈপুণ্য। এটা হল বিবাহিত বৃদ্ধ ও তার মধ্যবয়সী স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের রূপায়ণ। এই দম্পতির যুগলনৃত্য পরিবেশিত হয় ঢাকের বাদ্যের তালে তালে। দাম্পত্য জীবনের আনন্দ ও মিলন এবং কাজ ও আনন্দের মেজাজই এতে রূপায়িত। বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও তা থেকে বাদ যান না এই নাচে তাই দেখানো হয়ে থাকে। এতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মিশ্রণ করা হয়েছে কৌতুক ও গভীরতার শিল্পরস। এর দ্বারা এই নাচ সাধারণ বিনোদনের স্তর ছড়িয়ে প্রকৃত শিল্পে পরিণত হয়েছে।



শারীরিক কর্মক্ষমতা প্রমাণের চেষ্টা

ধর্মপূজা (শোভাযাত্রা) নৃত্য

ধর্মপূজা (শোভাযাত্রা) নৃত্য পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার পশ্চিম অঞ্চলে ধর্মপূজা অত্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণীর পুরুষরা করে থাকেন। ক্ষয়প্রাপ্ত বৌদ্ধ ধর্মের অবশেষ ও হিন্দু ধর্মের তান্ত্রিক সাধনার সংমিশ্রণে ধর্মপূজা উদ্ভূত। বীরভূমে এই পূজা বৈশাখ মাসের শেষে শ্রমজীবী সম্প্রদায় বাউরী, বাগদী, হাড়ি জাতের পুরুষরা উদ্‌যাপন করে। 'ধর্মরাজ' এই উৎসবে পূজিত হন। সিঁদুর মাখানো লম্বা কাঠের গুঁড়িকে 'বাণেশ্বর' ভেবে পুজো

করা হয়। 'বাণেশ্বর' (শরের দেবতা) চড়ক-গম্ভীরা নাচের পট-ঠাকুর হিসেবে প্রসিদ্ধ। মহাদেব বা শিবের সঙ্গে 'বাণেশ্বর' তুলনীয়। এই পুজোয় ভক্তরা সারাদিন উপবাস করে থাকেন। মাসের ত্রয়োদশীতে 'বাণেশ্বর' দেবতাকে শোভাযাত্রা করে একবাড়ি থেকে আরেক বাড়ি ঘুরিয়ে শেষে নদীর তীরে বা জলাশয়ের ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময় সবাই একসঙ্গে গান গায় ও নাচতে থাকে। প্রতিটি ভক্তের ডান হাতে থাকে একটি লম্বা আখ এবং আখের শেষ মাথায় দড়ি একটি ফাঁস দিয়ে লাগানো।



একজন ভক্ত মাটির পাত্রে ধূপ-ধুনো জ্বালাতে থাকে এবং আরেকজন সেইসময় খেলনা ঘোড়ায় চেপে ঢাকের বাজনার সঙ্গে নাচতে থাকে। নাচিয়েদের মুখোমুখি এবং পেছন ঘুরে ঢাকীরা ঢাক বাজাতে থাকে। বাণেশ্বরকে জল স্নান করিয়ে আবার শোভাযাত্রা করে তাঁর নিজের 'ধর্মরাজতলায়' ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

চতুর্দশীর রাতে এই অনুষ্ঠানটি একটু অন্যভাবে হয়। এই ভক্তরা 'ধর্মরাজতলায়' কাঠের গুঁড়ি আগুনে জ্বালিয়ে মাটিতে চারিদিকে ছড়িয়ে তার ওপরেই উন্মত্তের মতো নাচতে থাকে। এই অনুষ্ঠানকে বলে 'ফুল খেলা'। এই 'ফুল খেলা' 'চড়ক-গম্ভীরা' উৎসবের 'ফুল সন্ন্যাস' নাচের খুবই কাছাকাছি। পরের দিন সকালে তারা সবাই শোভাযাত্রা করে খালি পাত্র মাথায় করে জলের ধারে যায় এবং তা তিনচতুর্থাংশ পূর্ণ করে ফিরে আসে। এরপর তারা দেশী মদের দোকান থেকে ঐ পাত্রের এক চতুর্থাংশ মদিরা দিয়ে পূর্ণ করে। এরপর তারা ঐ পাত্র মাথায় করে ঢাকের বাজনার সঙ্গে নাচতে থাকে। যখন তারা নাচে সেইসময় তাদের হাতে থাকে ধূপধুনোর মালসা। এই পাত্র তারা তাদের মুখের কাছে নিয়ে সেই ধোঁয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং যখন তারা নিঃশ্বাস ছাড়ে সেইসময় মুখে ঐ পাত্রের তরল অংশ মুখে ছিটিয়ে নেয় আর ভাবোল্লাসে নাচতে থাকে। এই অবস্থাকে 'ভর' হওয়া বলে (ভূতাবেশ)। এর অর্থ ধর্মরাজের আত্মা তাদের ওপর সেইসময় ভর করেন।



দেবতা বাণেশ্বরের সম্মুখে আগুন জ্বালানো হয়। ভক্তদের মাথা থাকে নীচে এবং পা দুটি বাঁধা থাকে ছয় থেকে সাত ফুট উঁচুতে বাঁধা একটা কাঠের গুঁড়ির সঙ্গে। এই অবস্থায় (ঝুলন্ত) তারা দোল খেতে থাকে ঐ আগুনের ওপর এবং দুলতে দুলতে পার হয়ে বাণেশ্বরের সম্মুখে তাদের পুষ্পার্ঘ দিতে থাকে। এই অনুষ্ঠানকে বলে 'দোলন পূজা'।

সহ্যশক্তি ও সাহসিকতার এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য দেবতার মতোই নির্ভীকতা ও দৃঢ়তা অর্জন করা। যাতে তাঁর মতোই যন্ত্রণা ও কষ্টকর পরিস্থিতিতে পূজারী নির্লিপ্ত থাকতে পারে। এর দ্বারা উপাসকের শারীরিক সুস্থতা প্রমাণিত হয় যার ফলে দেবতার আশীর্বাদ লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন তিনি।

চড়ক-গম্ভীরা নৃত্য

চৈত্রসংক্রান্তির দিনে চড়ক-গম্ভীরা উৎসব হয়ে থাকে। চৈত্র মাসে বিশেষভাবে শিবের মাস বলে চিহ্নিত। চড়ক-গম্ভীরা ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে শিবের সঙ্গে সম্পর্কিত।



বাঙালীর মনে ধারণা ও বিশ্বাস যে মহাদেব আসক্তিহীন, নির্ভীক, দুঃখবেদনায় অবিচলিত দেবতা। তাঁর ভক্তদেরও উদ্দেশ্য হল আরাধ্যদেবতা শিবের মতোই অকুতোভয় এবং দুঃখবেদনা ও শারীরিক যন্ত্রণায় অবিচিলতি থাকার শক্তি অর্জন করা, এইসব প্রকাশের জন্য তারা তীক্ষ্ণশলাকা এবং বেদনাদায়ক অনেক কিছু শরীরে বিঁধিয়ে শিবের পায়ে আত্মনিবেদন করে। 'চড়ক' শব্দটি √চড়্ ধাতু ('চড়া') এবং যা মূল শব্দ 'সচর' (গতিশীল) থেকে উৎপন্ন। 'গম্ভীরা' শব্দের অর্থ 'যে গৃহে শিব পূজিত হন'। পূর্ববাংলায় চড়ক-গম্ভীরা উৎসবে হিন্দুসমাজের কায়স্থ, নমঃশূদ্র, মাঝি, পাল (কুমোর) এই শ্রেণীর মানুষরা যোগদান করে। চড়ক-গম্ভীরা উৎসব সাধারণত শুরু হয় চৈত্র মাসের সংক্রান্তির পাঁচ-ছয় দিন আগে। উপাসকগণ ঐ সময় একনাগাড়ে টানা উপবাস করেন। দেবতা পূজিত হন 'কাঠের গুঁড়ির' আকারে। এই কাঠের গুঁড়িকে বলা হয় 'পাট ঠাকুর'। পশ্চিমবাংলার ধর্মপূজায় ঠিক যেমন বাণেশ্বর পূজিত হন। উপবাসের প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় ভক্তরা 'অবতার নাচ' নাচেন। 'ধুনুচিনাচ' ও 'ফুলসন্ন্যাস' নাচও নাচেন। পাটঠাকুরের ওপরে ত্রিশূল প্রতিষ্ঠিত করা হয়। দলপতি অথবা 'বালা' যথোচিত মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে

দেবতা শিবের পুজো করেন। এই মন্ত্রগুলির খুব সাদৃশ্য আছে বাংলার শিবের গাজনের সঙ্গে। পুজোর শুরু হয় ঢাকের বাজনার সঙ্গে আবাহন নৃত্য দিয়ে।

ক. অবতার নৃত্য

অবতার নৃত্যে 'বালা' বিষ্ণুর দশাবতারের কাহিনী বর্ণনা করে থাকেন। বিষ্ণু দশাবতার হলেন—মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, বলরাম, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বুদ্ধ ও কল্কি অবতার।



মন্ত্রোচ্চারণের পর তিনি প্রতিটি অবতারের কর্মবিধি 'মুদ্রা'র মাধ্যমে প্রকাশ করেন। যেমন—সন্তরণরত মৎস্যমুদ্রা—মৎস্য অবতারের জন্য; হলকর্ষন মুদ্রা- -বলরাম জন্য; শরনিক্ষেপ মুদ্রা—রামাবতারের জন্য তিনি বর্ণনা করেন।



সারিবদ্ধ ভাবে ভক্তরা দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে ছড়া বারবার আবৃত্তি করেন ও তার সঙ্গে ঐ মুদ্রাগুলি প্রদর্শন করে নাচতে থাকেন। নাচের সঙ্গে ঢাক কাঁসি বাজতে থাকে। ধুনুচি ও ধূপ সামনে রেখে তারা নাচতে থাকেন।

খ. ধূপ নৃত্য

ধূপ নৃত্যও ঢাক ও কাঁসির সঙ্গে পরিবেশিত হয়। প্রতিটি নাচিয়ের হাতে ধুনুচি থাকে এবং ধুনুচির ভেতর জ্বলন্ত কাঠকয়লা। ঘড়ির কাঁটার গতি বিপরীত মুখে গোল হয়ে নাচতে থাকে। নৃত্যবলয়ের বাইরে দাঁড়ানো একজনের হাতে পাত্রভর্তি ধুনো থাকে। নাচতে নাচতে নাচিয়েরা ডান হাতে মুঠোভর্তি ধুনো তার কাছ থেকে নিয়ে তাদের ধুনুচিতে প্রবলভাবে ছুঁড়তে থাকে। এর ফলে রাতের অন্ধকার ঐ আগুনের ফুলকি এবং নাচ সব মিলিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। এই নাচের সঙ্গে কোন



গান গাওয়া হয় না। ধূপ নৃত্যের শেষে তাদের ধুনুচি মালসা মাটিতে রেখে 'সাতগাঁয়ে' নাচ নাচতে থাকে। এইসময় তারা একে অপরের হাত ধরাধরি করে হাত ওপরে তোলে আর দুই পা আড়াআড়ি করে নাচতে থাকে।



গ. ফুল-সন্ন্যাস নৃত্য

ফুল সন্ন্যাস নৃত্যের একধরণের বন্যতা আছে। প্রতিটি ভক্তের হাতে থাকে একটা করে লম্বা বেত তার ওপরের দিকটা বাঁকানো ফাঁসের মতো। নৃত্য প্রাঙ্গনের মাঝখানে গুটি কয়েক জ্বলন্ত কাঠের গুঁড়ি স্থাপন করা হয়। দলপতি বা 'বালা' বেলপাতা ঐ জ্বলন্ত কাঠে প্রদান করেন অগ্নিদেবতার উদ্দেশে আর গনগনে আগুনও যেন তার জাদুবিদ্যার গুণে কিছুটা প্রশমিত হয়। এই সময় প্রাঙ্গণময় জ্বলন্ত কাঠের টুকরো এদিক ওদিকে ছড়িয়ে যায় আর ভক্তরা ঐ গরম জ্বলন্ত টুকরোর ওপর উন্মত্তের মতো নাচতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে তাতে তাদের পায়ের লক্ষণীয় কোন ক্ষতি হয় না। ধুনুচি নৃত্যের মতনই এই 'ফুল-সন্ন্যাস' নৃত্য রাতের বেলায় হয়ে থাকে।



অনেকসময় ধারালো খাঁড়ার ওপরেও নাচিয়েরা নাচে। উদ্দেশ্য হল, ধর্মপূজার ও চড়ক-গম্ভীরার কষ্টসহিষ্ণুতার মতোই শরীর ও মানসিক শক্তিকে চাঙ্গা রাখা যাতে জীবনের সমস্ত বঞ্চনা ও দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে শিবতুল্য হতে পারে এবং তাঁর যোগ্য ভক্ত হবার মতো শারীরিক সুস্বাস্থ্য অর্জন করতে পারে। হিন্দু সমাজের দরিদ্রশ্রেণীর পৌরুষসম্পন্ন তেজস্বী সক্ষম মানুষেরাই এই নাচ নেচে থাকে।



ঘ. চালান নৃত্য

চৈত্রসংক্রান্তির দিনে 'চড়ক-গম্ভীরা' নৃত্য পর্যায়ের শেষ নৃত্য উৎসব 'চালান নৃত্য' পরিবেশিত হয়।

'চালান নৃত্য' হল দেবতার আবাহন নৃত্য। ভক্তরা মাথায় করে ঐদিনে পাট ঠাকুর অর্থাৎ পবিত্র 'কাঠের গুঁড়ি' বহন করে নিয়ে আসে। ঐ সময় তাদের ডান হাতে থাকে বেতের দণ্ড যার শেষ প্রান্ত ফাঁসের আকারে বাঁকানো ও বাঁধা থাকে। সেই সময় ঢাকের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে তারা নাচতে থাকে। সেইসময় 'বালা' ধুনুচির জ্বলন্ত মাটির মালসা নৃত্যরত ভক্তদের মুখের কাছে ধরে যাতে তারা ঐ ধোঁয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে নিতে পারে।

পরিশিষ্ট

বাংলার লোকনৃত্যশিল্পী দ্বারা ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের তালিকা ও বিবরণ ঃ

	নাম	ব্যবহারকারী
১.	আনন্দলহরী (অথবা গাব-গুবা-গুব)	বাউল
২.	বাঁশি	বাঁশি নৃত্যশিল্পী
৩.	বায়ান	বাউল
৪.	বেহালা (Violin)	বাউল
৫.	ঢাক	ঘট ওলানো ব্রত শ্লোক, মুখা (মুখোশ) ধর্মপূজা এবং চড়ক-গম্ভীরা নৃত্যশিল্পী
৬.	ঢোল	রায়বেঁশে, ঢালি, বিবাহ, বরণ এবং ভাঁজো নৃত্যশিল্পী
৭.	একতারা	বাউল
৮.	কাঁসি	রায়বেঁশে, ঢালি, শ্লোক, ধর্মপূজা এবং চড়ক-গম্ভীরা নৃত্যশিল্পী
৯.	খঞ্জনি (ডুবকি)	বাউল
১০.	মাদল	কাঠি এবং ঝুমুর (কোরা) নৃত্যশিল্পী
১১.	মন্দিরা	বাউল, সত্যপীর, বোলান এবং মনসা-ভাসান নৃত্য
১২.	মৃদঙ্গ (খোল)	কীর্তন, পদ্মপুরাণ, সত্যপীর, বোলান, মনসা-ভাসান নৃত্যশিল্পী

লোকগীতি

বাউল, জারি, কাঠি, ঝুমুর প্রভৃতি লোকনৃত্যের প্রত্যেকটির সঙ্গে তার আনুষঙ্গিক লোকগীতি গাওয়ার প্রচলন আছে। ঐ সকল গানের অনুষঙ্গ বিনা ঐ লোকনৃত্যগুলির অঙ্গ-ভঙ্গ হয়। আবার তেমনি প্রত্যেকটির আনুষঙ্গিক নৃত্য বাদ দিয়ে শুধু সুর-সহযোগে গীতগুলি গাইলে সেই সঙ্গীত ভগ্নাঙ্গ, অপূর্ণ ও ভগ্নরস হয়ে পড়ে। এই সকল লোকনৃত্যের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এদের প্রত্যেকটির আনুষঙ্গিক লোকগীতিগুলি পল্লীবাসীদের মুখ থেকে শুনে আমি নিজে সংগ্রহ করেছি। সেই সংগ্রহের সম্পূর্ণ প্রকাশের স্থান এ নয়; এখানে আমার সংগ্রহ থেকে প্রথম-শিক্ষার্থীর উপযোগী সহজ সুর ও ভাবের কয়েকটি গান ছাপানো হল।

জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন করতে হলে জাতির প্রত্যেক নরনারী ও প্রত্যেক বালক-বালিকা যাতে করে জাতির নিজস্ব সংস্কৃতির আবহমান ধারার সঙ্গে পরিচয় ও সংযোগ স্থাপন করতে পারে এবং সেই সংস্কৃতিগত মনোভাব, আচরণ ও কলাচর্যাকে নিজের জীবনে ওতপ্রোতভাবে প্রবাহিত করে নিতে পারে, তার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। এতে করে জাতির জীবনে যেমন পারস্পরিক ঐক্য ভাব ও অধিজাতীয়তার গৌরব জাগিয়ে তোলা যায় তা অন্য কোন প্রকারে সম্ভব নয়। দেশের সকল শ্রেণীর মধ্যে সারল্য, সহজতা, সৌহার্দ্য ও সাম্যভাবে জাগিয়ে তোলবারও ইহা একটি অদ্বিতীয় উপায়। এই কারণে লোকনৃত্য ও লোকগীতির চর্চা অধিজাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে যে একটি অপরিহার্য ও অমূল্য উপাদান, তা উপলব্ধি করে বাংলার লোকগীতি ও লোকনৃত্যের চর্চা বাংলার প্রত্যেক ব্রতচারী ও ব্রতচারী সঙ্ঘের কৃত্যরূপে নির্ধারিত করা হয়েছে।

সারি নৃত্যের গান

(১)

ও কাইয়ে[১] ধান খাইল রে
খেদানের মানুষ নাই;

খাওয়ার বেলায় আছে মানুষ—
কামের বেলাই নাই—
কাইয়ে ধান খাইল রে।।
ওরে হাত পাও থাকিতে তোরা
অবশ হইয়া রইলি;
কাইয়ে না খেদাইয়া তোরা—
খাইবার বসিলি—
কাইয়ে ধান খাইল রে।।
ওরে ও পাড়াতে পাটা[২] নাই পুতা নাই
মরিচ[৩] বাটে গালে,
তারা খাইল তাড়াতাড়ি
আমরা মরি ঝালে—
কাইয়ে ধান খাইল রে।।
ওরে তারে না না রেনা নারে
তারে নারে রে
তারে না না রে না নারে
তারে নারে রে
কাইয়ে ধান খাইল রে।।
আরে হিও হিও হিও হিও!
আ-ব্-ব্-ব্-ব্-ব্-ব্-ব্-ব্-ব্-ব্!
[(১) কাকে, (২) শিল নোড়া নাই, (৩) লঙ্কা]

(২)

দেওয়াল্যা[১] বানাইলা মোরে সাম্মানের[২] মাঝি—এ—
চাঁদ-মুখে মধুর হাসি, (দাদা) চাঁদ-মুখে মধুর হাসি।
বাহার মাইর‍্যা যায় গোই[৩] সাম্মানরে, দাদা—
না মানে উজান-ভাটি, (দাদা) না মানে উজান-ভাটি।।
দেওয়াল্যা বানাইলা মোরে সাম্মানের মাঝি।।
কুতুবদিয়ার পশ্চিম ধারে সাম্মান-আলার ঘর;
লাল বাওটা[৪] তুইল্যা দিছে সাম্মানের উপর।
বাহার-মাইর‍্যা—ইত্যাদি।।
[(১) দেউলিয়া, (২) সাম্পান নৌকা, (৩) যায় গো ঐ, (৪) পাল]

বাউল নৃত্যের গান

হ'ল মাটিতে চাঁদের উদয়
কে দেখবি আয়
এমন যুগল চাঁদ কেউ দেখিস নাই—
দেখ্‌সে নদীয়ায়।
তোরা কে দেখবি আয়,
তোরা কে দেখবি আয়—
এমন যুগল চাঁদ কেউ দেখিস নাই—
দেখ্‌সে নদীয়ায়।
অকলঙ্ক অনুরাগ হৃদে পুরা,
ধন মান তেয়াগি ডোর কৌপীন পরা;
আছে ভগবানের নামে আঁখি জলে ভরা—
আবার আপনি কাঁদিয়ে গোরা জগৎ কাঁদায়।
হেরিয়া গৌরাঙ্গের মুখশশী
লাজে গগনের চাঁদ পড়ে খসি;
এ চাঁদ ষোল কলা পূর্ণ দিবানিশি—
হেরি ভরে হৃদয় মন আনন্দ সুধায়।
যজ্ঞসূত্র শোভে গলে
তুলসীর মালা গলে হেলে দুলে
আবার যে শুনেছে ঐ বদনে হরিবলা
ও তার হরিবলা এ জনমে কভু না ফুরায়।
হরলাল ডাকিয়ে বিনোদে কয়
গৌরাঙ্গের চরণে লহরে আশ্রয়
(ও তোর) যাবে ভয় হবে জয় শমন আলয়
সদা মতি গতি রাখো রাধারমণের পায়।

ঝুমুর নৃত্যের গান

(১)

আগা ডালে ব'স কোকিল
মাঝ ডালে বাসা রে—
ভাঙ্গিল বিরিখির ডাল
জীবনে নাই আশা রে।

অকালে পুষিলাম পাখী
ঘির্‌ত মধু দিয়া রে—
সুকালে পলাইলেন পাখী
দারুণ শেল দিয়া রে।।
অকালে পুষিলাম পাখী
খুদ কুঁড়া দিয়া রে—
সুকালে পলাইলেন পাখী
দারুণ শেল দিয়া রে।।
হেনু ব্রেনু রামে কয়
বহুত মিলানি রে—
সুকালে পলাইলেন পাখী
দারুণ শেল দিয়া রে—
(হাতে হাতে ধরাধরি তালে তালে পা রে—
হেসে খেলে নেচে ভুলি ভয় আর ভাবনা রে।)

(উপরোক্ত ২টি লাইন গ্রন্থকারের নিজের রচিত।)

ঝুমুর নৃত্যের মাদলের বোল

ধাতিন্‌ তাতাক্‌ তিন্‌ধা ধাতিন্‌ ধাতিন্‌ তাতক্‌ খি
ধাতিন্‌ তাতাক্‌ তিন্‌ধা ধাতিন্‌ ধাতিন তাতাক্‌ খি
ধাতিন্‌ তাতাক্‌ তিন্‌ধা ধাতিন খি খি খি।

জারি নৃত্যের গান
ডাক

আরে ভালো ভালো ভালোরে ভাই
আরে ও ও আহা বেশ ভাই
আমরা আল্লার নামটি লইয়ারে ভাই
আমরা নাইচা নাইচা সবায় যাই
আরে শোন ক্যান্‌ শোন ক্যান্‌ মোমিন ভাই
আমরা বেয়াদপির মাপটি চাই।।
ঐ যে তিলেতে তৈল হয় দুধে হয় দই—(বয়াতি)
ঐ যে ধানেতে তৈয়ার হয় মুড়ি চিড়া খই—(সকলে)
ঐ যে বেশ বেশ বেশ ভাই—(বয়াতি)

সাবাস্ সাবাস্ সাবাস্ ভাই—(সকলে)
সাবাস্ সাবাস্ সাবাস্ ভাই—(বয়াতি)
বেশ বেশ বেশ ভাই—(সকলে)

সাবাস্ ভাই—(বয়াতি) বেশ ভাই—(সকলে)
বেশ ভাই—(বয়াতি) সাবাস্ ভাই—(সকলে)
সাবাস্ গো—(বয়াতি) বেশ গো—(সকলে)
চুপ কর ভাই—(বয়াতি), সবুর—(সকলে)

ঐ যে মৌমাছিরা বলে মোরা চৌদিকেতে ধাই—(বয়াতি)
ঐ যে ভুরে (ভোরে) উঠি কত দৌড়ি ফুল যেথায় পাই—(সকলে)
ঐ যে কি যতনে রাখি মধু মুমেরি (মোমেরি) কুঠায়—(বয়াতি)
ঐ যে কি কৌশলে কর ঘর কে দেখিবি আয—(সকলে)
ঐ যে বেশ বেশ বেশ ভাই—ইত্যাদি।
ঐ যে সবুজ বরণ ঘাস পাতা লাল শিমূল ফুল—(বয়াতি)
ঐ যে হলুদ-বরণ পাকা কলা কালো মাথার চুল—(সকলে)
ঐ যে বেশ বেশ বেশ ভাই—ইত্যাদি;

বয়াত

সভা কইরা বইস ভাইরে হিন্দু মুসলমান।
বন্দনা সারিয়া আমি (আমরা) গাইমু জারির গান।।
মুসলমান ভাইদের জানাই মোর সালাম।
হিন্দু ভাইদের আমি করি গো পরনাম।।
আল্লার নামে বাইন্দা ঘর রসুলের নামে ছাইও।
সেই ঘরের মাঝে বান্দা সুখে নিদ্রা যাইও।।
সেই ঘরের মাঝে ভাইরে তীর্থ বারাণসী।
মুসলমানের তিরিশ রোজা হিন্দুর একাদশী।।
মুসলমান বলেন খোদা হিন্দু বলেন হরি।
মনে ভাইব্যা দেখ ভাইরে দুই নামেতেই তরি।।

গান

তাইরিয়া নাইরিয়া গো
নাইরিয়া নারে নার;
তাইরিয়া নাইরিয়া গো
নাইরিয়া নারে নার—

তাইরিয়া নাইরিয়া নারে নারে নারে নারে রে
এ এ ফুলের ভারে গো ভারে
আরে ও ও ফুলের ভারে গো ভারে
ফুলের ভারে ডাল পড়ে আলিয়া
ও কি বেশ বেশ—
নিশাকালে ফুটে ফুল নীহুর লাগিয়া—
ও কি বেশ বেশ—
ভোমরা না করে রুদন (রোদন) মধুর লাগিয়া রে-এ এ
ফুলের ডোরে গো ভারে ফুলের ভারে ডাল পড়ে আলিয়া।।

বয়াত

জগৎ পিতার অংশ মোরা যতেক ভগ্নি ভাই
মানুষে মানুষে কোন জাতের বিভেদ নাই।।
ছোট বড় কেউ নয় সকলে সমান
সকলেই করি মোরা সকলে সম্মান।।
আয় জাতি ভেদ ভুলে সবাই গলায় জড়াজড়ি
এই দেশেতে জন্ম আয় এই দেশের কাজেই মরি।।
একের গুরু অবতার বা ইমান নবী যাহারা
অপরের শ্রদ্ধা উপহার পাবেন ভাই তাহারা।।
তাইরিয়া নাইরিয়া নারে নারে—ইত্যাদি।

গান

*এ এ দেশের কাজে গো কাজে, দেশের কাজে আয় সবে নামিয়া
(ওকি বেশ বেশ), স্বার্থজালের মায়া মোহ আয় ফেলি ভাঙ্গিয়া
আয়রে দেশের কাজে সবে পরাণ দেই ঢালিয়া রে—

বয়াত

কারবালাতে ইমাম হোসেন, কাসেম দিলেন প্রাণ।
তারি লাইগা বাংলায় কান্দে হিন্দু মুসলমান
আয়রে হিন্দু মুসলমান ভাই গলায় জড়াজড়ি
একদেশেতে জন্ম আয়রে দেশের কাজে মরি।
তাইরিয়া নাইরিয়া ইত্যাদি

---

*এই গানের তারকা চিহ্নিত অংশ গুরুসদয় দত্ত রচিত।

আরে ও ও হানিফ আইস গো আইস
আইস লয়ে মদিনার বারি;
ও কি বেশ বেশ—
ভাইয়ের শুকে (শোকে) জান দিব গলায় দিব ছুরি—
আইস রে মদিনার লুক (লোক) গলায় গলায় মিলি রে-এ এ
এ হানিফ আইস গো আইস, আইস লয়ে মদিনার বারি।।

বন্দনা

*বন্দনা সারিয়া আমরা গাইমু জারির গান
*কারবালার কাহিনীর দুঃখে বিদরে পরান।।
কান্দে সাকীনা হায় হায় পিয়ারা আমার
কে মাইল শ্যালের ঘা বদনে তোমার।।

কাঠির নৃত্যের গান

মাদল বাজনা ও উহার বোল ঃ—
ধাতিন্ তাং ধাতিন্ তাং
ধাতিন্ তাতাক্ ধাতিন্ তাং
তাক্‌তা ধাতিন্ ধাতিন্ তাং
তাতাক্ ধাতিন্ ধাতিন্ তাং
(২)
ধাতিন্ তাতাক্ ধিনদা ধাতিন্ তাং তাং

কাঠিনাচের গান

(১)
কাঠিনাচ করিতে সবে রে,
ভাইরে ভাইরে, না করিও হেলা;
সবে না করিও হেলা;
সকল খেলার বড় খেলা রে—
ওরে মোদের ভাই,

*এই গানের তারকা চিহ্নিত অংশ গুরুসদয় দত্ত রচিত।

কাঠি নাচের খেলা—
কিবে কাঠি নাচের খেলা।।
(২)
কাঠি সামালো, রে ভাই, কাঠি সামালো—
চোখে মুখে লাগে যদি রে,
ওরে মোদের ভাই,
নাম দোষ নাই—
সবে কাঠি সামালো।।
(৩)
বাবুদের বাড়িতে, হায়রে হায় কিবে
শঙ্খ-চিলের বাসা—
কিবে শঙ্খ-চিলের বাসা,
ছো মেরে নিয়ে গেল রে,
ওরে মোদের ভাই,
মনে রইল আশা—
কিবে মনে রইল আশা।।

রায়বেঁশে নৃত্য

বাংলার জাতীয় নৃত্যের মধ্যে রায়েবেঁশে নৃত্যই সর্বাপেক্ষা গৌরবময়। এক সময় এই নৃত্য বাংলার পদাতিক সৈন্যরা অনুশীলন করত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই নৃত্যের পৌরুষব্যঞ্জক ভঙ্গী ও কলাগৌরব দেখে মুগ্ধ হয়ে লেখেন, "এ'রকম পুরুষোচিত নাচ দুর্লভ। আমাদের দেশের চিত্তদৌর্বল্য দুর করতে পারবে এই নৃত্য।" যুদ্ধের উত্তেজনা ও মাদকতার আবহাওয়ায় এই নৃত্য পরিপূর্ণ। নৃত্যে সামরিক কুচকাওয়াজের ন্যায় বহু ভঙ্গী আছে এবং বাহু ও হস্তের হাবভাব দ্বারা ধনুশ্চালনা, অসিচালনা, বর্শা নিক্ষেপ, অশ্বচালনা, রণ-পায়ের ভঙ্গী প্রভৃতির নির্দেশ করা হয়। কখনও কখনও একজনের কাঁধের উপর আর একজন দণ্ডায়মান হয়ে নৃত্য করে থাকে। প্রাচীন বাংলা ও ভারতে যুদ্ধের পর বিজিত বন্দীর কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য করার প্রথা ছিল এটা সেই প্রাচীন প্রথারই ধারাবাহিক আচার।

রায়বেঁশে নৃত্যের শেষে বহু প্রকার কসরৎ হয়ে থাকে। যথা ঃ—দাঁড়িপাল্লা, তালগাছ, হনুমানডন্, ব্যাঙভাসা, পালট্, লাঠিখেলা ইত্যাদি। উপরোক্ত কসরৎগুলি খুবই উচ্চাঙ্গের ব্যায়াম এবং বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশের জিমনাস্টিক থেকে কোন অংশের কম নয়।

রায়বেঁশে নৃত্যে ঢোল ও কাঁসির ব্যবহার অপরিহার্য। এই নৃত্যে ধুতি মালকোঁচা (আটোসাটো) করে লাল শালুকে ধুতির উপর বাঁধতে হয় এবং উন্মুক্ত শরীরে নৃত্যানুষ্ঠান করতে হয়।

রায়বেঁশে নৃত্যের বোল

১। দ্রুত লম্ফনে প্রবেশ ও দিক্‌বন্দনা

ঘিউর গিজ্জা ঘিউর গিজ্জা....
(উরর্) ঘিনিতা ঘিনিতা ঘিউর তা তা তা (ইয়া)
(উরর্) জাঘিন্ জাঘিন্ জাঘিন্ ঝাঁ—তা তা তা তাতাক্ তা

২। ধনুশ্চালনার ভঙ্গী

ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনিতা—তিলিতা—তিলিতা তা তা (২) (উরর্)
ঝাঁউর গিজার গিজি ঘিনি—

৩। সামরিক কসরৎ

(উরর্) ঘিনাক্ তাকুর কুরতা, কুরা কুরাক্ তাকুর কুরতা—
ঘিনাক্ তাকুর কুরতা, কুরা কুরাক্ তাকুর—
তাকুকুর. তাকুকুর, কুরা কুর তা—কুরাকুর তা—কুরা কুর তা—
কুরাকুর কুরা—
গিজাঘিন্—গিজাঘিন্-গিজা ঘিন্—তা—
জাঘিন্ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ, জাঘিন্ তা তা তা তা
জাঘিন্ ঝাঁ জাঘিন্ তা (২)
জাঘিন্ জাঘিন্ জাঘিন্ ঝাঁ, ত তা তা তাতাক্ তা (ইয়া)
(উরর্) ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনিতা—তিলিতা—তিলিতা তা তা (২)
ঝাউর গিজার গিজা ঘিনি

৪। অশ্ব চালনার ভঙ্গী

(উত্তর্) তাতাক্ তাতাক্ তাতাক্ তা, তাক্‌তা খিতা খিতা
ঝাঁ জাঘিন্ ঘিনা তা
তাতাক্ তাতাক্ তাতাক্ তা, তাক্‌তা খিতা খিতা
ঝাঁ জাঘিন্ ঘিনা—
ঘিনা ঘিনা ঘিনা ঝাঁ ঝাঁ, ঘিনা ঘিনা ঘিনা তা তা
জাঘিন্ ঝাঁ জাঘিন্ তা (২)
জাঘিন্ জাঘিন্ জাঘিন্ ঝাঁ, তা তা তা তাতাক্ তা (ইয়া)
(উরর্) ঝাঁউর গিজারা গিজা ঘিনিতা—তিলিতা—তিলিতা তা তা (২)
ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনি

৫। ভল্ল নিক্ষেপ ভঙ্গী

(উরর্) ঘিনাক্ তাতাক্ তাক্তা, উরর্ তাক্তা খিতা তাকতা (২)
জাঘিন্ ঝাঁ জাঘিন্ তা (২)
জাঘিন্ জাঘিন্ জাঘিন্ ঝাঁ, তা তা তা তাতাক্ তা (ইয়া)
(উরর্) ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনিতা—তিলিতা—তিলিতা তা তা (২)
ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনি

৬। রণ-পা আরোহণের ভঙ্গী

(উরর্) ঝাঁউর ঘিনাক্ তা তা তা, ঝাঁউর ঘিনাক্ তা তা
জাঘিন্ ঝাঁ জাঘিন্ তা (২)
জাঘিন্ জাঘিন্ জাঘিন্ ঝাঁ, তা তা তা তাতাক্ তা (ইয়া)
(উরর্) ঝাঁউর গিজা গিজা ঘিনিতা—তিলিতা—তিলিতা তা তা (২)
ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনি

৭। অসিচালনার ভঙ্গী

(উরর্) ঘি ঠক্ ঠক্—ঠক্ ঠক্ গিজার ঝাঁ (২)
ঠঠক্ ঠঠক্ ঠঠক্ ঠক্ (উরর্)—ঠক্ ঠকা ঠক্ ঠঠক্
ঠক্—ঠঠক্ ঠক্ ঠক্—ঠক্—ঠঠক্ ঠক্ ঠক্
(উরর্) ঘিনাক্, ঘিনাক্ (২)
জাঘিন্ জাঘিন্ জাঘিন্ ঝাঁ
তা তা তা তাতক্ তা (ইয়া)

ঢালি নৃত্য ও ঢোলের বোল

ঢালি সামরিক নৃত্য। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বাহান্ন হাজার ঢালি সৈন্যের কথা বাংলার সাহিত্যে সুপরিচিত। ঢাল, তরবারি কিংবা সড়কী, ঢালি সৈন্যের প্রধান অস্ত্র ছিল। দক্ষিণবঙ্গে নদী নালা থাকায় অশ্ব পরিচালনার পক্ষে অসুবিধা বিবেচনা করে প্রতাপাদিত্য “ঢালি” সেনা গঠন করেন। বর্তমান ঢালিনৃত্যটি খুলনা যশোহরের অতীত স্মৃতি বহনকারী কয়েকজনের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। নৃত্যে কাঠের তরবারি বা বাঁশের ছোট লাঠি ও বেতের ঢালের ব্যবহার হয়ে থাকে। নৃত্যটি ঢোলের তালে তালে অনুষ্ঠিত হয় এবং ঢোল বাদকই প্রকৃতপক্ষে নৃত্যটি পরিচালনা করে থাকেন। নৃত্যের কয়েকটি পর্যায় ও ঢোলের বোল দেওয়া হল।

১। আসর বন্দনা

ঘিওর গিজ্জা গিজ্জা গিজ্জা......(কয়েকবার)

২। কসরৎ

(ক) শরীরের ভারসাম্য পিছনদিকে রেখে লাফিয়ে লাফিয়ে পা ছোঁড়া;

(খ) লাফের শূন্যে ঘোরা; (গ) বৈঠক; (ঘ) বীরচলন; (ঙ) শ্বাসত্যাগ ও গ্রহণ, ব্যায়াম।

ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ তা তা.......(কয়েকবার)

৩। **বীরনৃত্য**

(তা) গিজার গিজা ঘিনিতা তা........ (কয়েকবার)

৪। **যুদ্ধ প্রস্তুতি ও যুদ্ধ**

ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ তা তা তা (কয়েকবার)
ঝাঁ ঘিনা ঘিনা ঝাঁ তা তা (কয়েকবার)
কুর কুর কুর কুর তা তা (কয়েকবার)
ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ তা তা (যুদ্ধের সময় দ্রুত লয়ে)

৫। **যুদ্ধ শেষ ও তাণ্ডব নৃত্য**

গিজার গিজ ঘিনিতা তা (কয়েকবার)

ব্রত নৃত্যের ঢাক বাজানোর বোল ও নৃত্যের বিষয়

বরণ নৃত্য—ঢ্যাং ঢ্যাং ঢ্যাং নাক ট্যানা ট্যাং—নাক ট্যানা ট্যাং
(কয়েকবার) ঢ্যাঢ্যাং ঢ্যাং—ঢ্যাঢ্যাং ঢ্যাং—ঢ্যাঢ্যাং ঢ্যাঢাক

নমস্কার—ঢ্যাং নাতেন নাক্‌তে নাতেন
ঢ্যাঢ্যাক নাতেন নাক্‌তে নাতেন
বরণনৃত্যের বাজনা উপরি-উক্ত প্রকার

পিঁপড়ে মারা নৃত্য— ঢ্যাঢ্যাং—ঢ্যাঢ্যাং-ট্যাং ট্যাং (কয়েকবার)
ঢ্যাক ঢ্যা না ঢ্যাং—ট্যাং ঢ্যাং (কয়েকবার)
বরণনৃত্যের বাজনা উপরিউক্ত প্রকার

কুঁচে মোড়া নৃত্য—ঢাক ঢ্যাং ঢ্যাং—নাক ঢ্যা . ঢ্যাং (কয়েকবার)
বরণনৃত্যের বাজনা উপরিউক্ত প্রকার

সই পাতানো নৃত্য— ঢ্যাং—না তেন্ ট্যাং ট্যাং (কয়েকবার)
ঢাক ঢ্যা না তেন্ ট্যাং ট্যাং (কয়েকবার)

বরণনৃত্যের বাজনা—উপরিউক্ত প্রকার

জোড় নৃত্য— ঢ্যাং, নাট্যাং, ট্যাং ট্যাং
ঢ্যাকঢ্যা নাট্যাং ট্যাং ট্যাং (কয়েকবার)
(উরর্) ঢ্যাং নাতেন ঢ্যাং ঢ্যাং
পরে উপরিউক্ত বোলে উল্টাজোড় নৃত্য হবে।

বরণনৃত্যের বাজনা—উপরিউক্ত প্রকার।

কুল পাড়া নৃত্য, কুল কুড়ান নৃত্য, কুলের বোঁটা ছাড়ান নৃত্য, কুল কাটা নৃত্য, কুল মাখান নৃত্য, কুল খাওয়া নৃত্য, কুল খাওয়া মুখ ধোওয়া নৃত্য, দাঁত মাজা নৃত্য, পেঁচা উড়া নৃত্য।

উপরিউক্ত প্রত্যেক নৃত্যের বাজনার বোল

ঢ্যাং ঢ্যাং ঢ্যাং নাকতে নাতেন্
নাকতে নাতেন.....।

শেষ বরণনৃত্যের বাজনা

ঢ্যাঢ্যাং ঢ্যাং ঢ্যাঢ্যাং ঢ্যাং ঢ্যাঢ্যাং ঢ্যাঢ্যাক।

ধানভানা

ও ধান ভানরে ভানরে মুরলী গান শুনি
বৃন্দাবনে ভানে ধান ষোলশ, গোপিনী!
ঢেঁকিটা বলেরে ভাই আমি নারদের হাতি
অষ্ট অঙ্গ ছেড়ে আমার ল্যাজে মারে লাথি।
পায়া দুটো বলেরে ভাই আমরা জোড়া ভাই
মাটির ভিতর থেকে আমরা কৃষ্ণগুণ গাই।
আসলাইটা বলে আমি আটে কাটে দড়
আমি না থাকিলে ঢেঁকি কাত হ'য়ে পড়।
মুষলাইটা বলে রে ভাই লোহায় বাঁধা মুখ
আমার এঁটো খেয়ে লোকের চাঁদ পারা মুখ।
কুলোটা বলেরে ভাই করি হোঁস ফোঁস
ঢেঁকি ভায়া ভানে ধান আমি উড়াই তুষ।
ঝাঁটাটা বলেরে ভাই আমার গোড়া দড়
ঢেঁকি ভায়া ভানে ধান আমি করি জড়।
উঠানটা বলেরে ভাই আমার নাম নীলে
ঢেঁকি ভায়া ভানে ধান আমি রাখি মিলে।
পোয়া পুশুরি বলেরে ভাই আমার নাম চাঁপা
ঢেঁকি ভায়া ভানে ধান আমি দিই মাপা।
ধামাটা বলেরে ভাই ডোম বাড়িতে হই
ঢেঁকি ভায়া ভানে ধান কাঁখে করে বই।

মেঘারাণী

ওলো মেঘারাণী, হাত পা ধুইয়া ফেলাও পানি
চিঙা বনে চিক চিকানি; ধান বনে হাঁটু পানি
কলাতলায় গলাজল গবগবাইয়া নাইম্যা পর।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ্ ও প্রবন্ধ পরিচয়

পটুয়া সঙ্গীত ঃ ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত গুরুসদয় দত্ত ছিলেন বীরভূম জেলার কালেক্‌টার। সেই সময়কালে জেলার পটুয়াদের কাছ থেকে পট ও পটুয়াগীতি সংগ্রহ করেন। সেইসব সংগ্রহের মুদ্রিত রূপ 'পটুয়া সঙ্গীত' গ্রন্থটি। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে।

গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে গ্রন্থকার লিখেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থটি প্রকাশে উদ্‌যোগ নেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থের 'নিবেদনের' শেষে তারিখ রয়েছে ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।

গ্রন্থটিতে প্রারম্ভ-চিত্র ছাড়াও কয়েকটি পটচিত্র মুদ্রিত হয়েছিল। কালীয়দমন, শ্রীকৃষ্ণের ভারবহন ও পুতনা-বধ, গোষ্ঠলীলা, তাড়কা-বধ, অহল্যা উদ্ধার, যমরাজা, কদম্বমূলে শ্রীকৃষ্ণ, সিন্ধুবধ ও বস্ত্রহরণ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯+১১৬। এই গ্রন্থের শেষে গুরুসদয় দত্ত লিখিত একটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবিতাটি পটুয়াদের প্রতি লেখকের বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ। আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। কবিতাটি 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

বাংলার বীরযোদ্ধা রায়বেঁশে ঃ বীরভূম জেলায় কর্মরত অবস্থায়ই তিনি রায়বেঁশে নৃত্যের আবিষ্কার করেন। এই লৌকিক নৃত্যের আবিষ্কার থেকে পুনরুজ্জীবনের গোটা ইতিবৃত্ত তিনি লিখেছিলেন অনেক আগে। লিখেছেন অনেক বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ। কিন্তু এ বিষয়ে গোটা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় অনেক পরে। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৪ সালে। প্রকাশক বাংলার ব্রতচারী সমিতি, ১৯১/১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১২, প্রকাশকের নিবেদন লিখেছিলেন বাংলার ব্রতচারী সমিতির প্রধান সচিব শিশিরকুমার মিত্র।

The Folk Dances of Bengal : গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় রচিত। গুরুসদয় দত্ত প্রয়াত হন ২৫ জুন ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালের ১৫ আগস্ট।

মৃত্যুর আগেই গুরুসদয় দত্ত এই গ্রন্থটির খসড়া প্রায় সম্পূর্ণ করে রেখেছিলেন। সমস্ত ছবিও তিনি নির্বাচন করে গিয়েছেন, ছবিগুলির পরপর সংখ্যা ও পরিচিতিও সাজিয়ে রেখেছিলেন।

মৃত্যুর তেরো বছর পরে The Estate of Late Gurusaday Dutt-এর তরফ থেকে গ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয় আই সি এস অশোক মিত্রকে। প্রকাশক ছিলেন গুরুসদয়ের পুত্র বীরেন্দ্রসদয় দত্ত। ৩২ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা-৯ থেকে শ্রীসরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত হয়। প্রকাশকের ঠিকানা ৬/১ গুরুসদয় রোড, কলকাতা-১৯। সম্পাদক অশোক মিত্র পাঁচ পৃষ্ঠার একটি অনন্য ভূমিকা লেখেন।

গ্রন্থটিতে সাদা-কালো ছবি রয়েছে ৪২ পৃষ্টার, ছবির সংখ্যা ৮৩, —ছবিগুলি হল রায়বেঁশে নাচের ১৪টি, ঢালি নাচের ৭টি, কাঠি নাচের ২টি, দ্বৈত ঝুমুরের ৪টি, কোরা ঝুমুরের ১টি, বরণ নাচের ৩টি, ঘট ওলানো নাচের ৬টি, বিয়ের নাচের ৪টি, গীতকা নাচের ৬টি, জারি নাচের ৬টি, —এছাড়া ভাঁজো ব্রতের নাচ, বাউল নাচ, কীর্তন নাচ, মহাদেব নাচ, কালী নাচ, বুড়াবুড়ির নাচ, বাঘ নাচ, ধর্মপূজা নাচ, চড়ক-গম্ভীরা নাচ প্রভৃতির আলোকচিত্র রয়েছে। মুখোশের তিনটি ছবি রয়েছে, কালী ও মহাদেব নাচের।

এই গ্রন্থের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে এই সংকলনে।

প্রবন্ধাবলি

বাংলার রসকলা-সম্পদ : প্রবাসী, বর্ষ ৩২, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৯

বাংলার রসকলা-প্রতিভা : বিচিত্রা, বর্ষ ৬, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩৩৯

বাংলার গণ-শিল্প : বাংলার শক্তি, বর্ষ ৪, তৃতীয় সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৬

ভারতের সংস্কৃতিতে গণ-শিল্পের স্থান : বাংলার শক্তি, বর্ষ ৩, দ্বাদশ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৬

ভারতের সংস্কৃতিতে বাংলার গণ-শিল্পের স্থান : বাংলার শক্তি, বর্ষ ৪, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৬

চিত্রকলায় বাংলার স্থান : বঙ্গলক্ষ্মী, বর্ষ ৭, ষষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৯

বাংলার মেয়েদের আল্‌পনা ও প্রাচীর-চিত্র : বঙ্গলক্ষ্মী, বর্ষ ৭, অষ্টম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩৯

পশ্চিম বাংলার মেয়েদের প্রাচীর-চিত্রশিল্প : বঙ্গলক্ষ্মী, বর্ষ ৭, নবম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৯

বাংলার মেয়েদের কলা-প্রতিভা ঃ বঙ্গলক্ষ্মী, বর্ষ ৮, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৩৯
বাংলার পুতুল ঃ বাংলার শক্তি, বর্ষ ৩, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪৫
বাংলার পোড়ামাটি-শিল্প ঃ বাংলার শক্তি, বর্ষ ৩, দশম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪৬
মথুরাপুর দেউল ঃ প্রবাসী, বর্ষ ৩৩, দ্বিতীয় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪০

রায়বেঁশে, ঢালি ও কাঠিনৃত্যের পোষাক ঃ বাংলার শক্তি, বর্ষ ২, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪৪
পূর্ববঙ্গের বিবাহ-উৎসবের নৃত্যগীত ঃ বঙ্গলক্ষ্মী, বর্ষ ৮, সপ্তম সংখ্যা, জৈষ্ঠ, ১৩৪০
বাংলার মেয়েদের নৃত্যগীত ঃ বঙ্গলক্ষ্মী, বর্ষ ৮, প্রথম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯
বাংলার জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় নৃত্য ঃ বাংলার শক্তি, বর্ষ ৩, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৫
বাংলার জীবনে নৃত্য ও ক্রীড়ার স্থান ঃ বঙ্গলক্ষ্মী, বর্ষ ৭, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৩৮
রাজঘাটের ব্রতনৃত্য ঃ প্রবাসী, বর্ষ ৩৩, দ্বিতীয় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪০
ভারতীয় বিদ্যালয়ে জননৃত্য ও জনসঙ্গীত ঃ গ্রামের ডাক, বর্ষ ৫, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৩৮